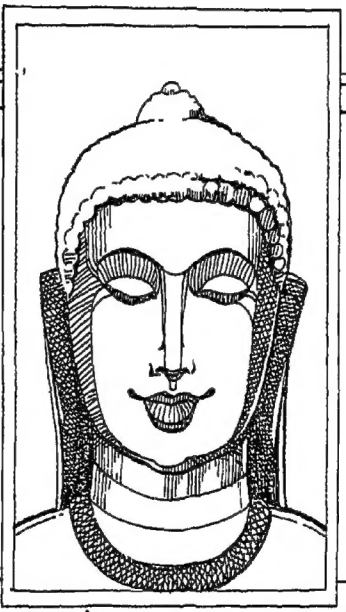

কিশোর জাতক সমগ্র

মান গ্রন্থাগার
14837
বিশ্ব ভারতী, শান্তি

KISHORE JATAK SAMAGRA

This is a GRANTHIK publication
Edt: by Sudhanshu Ranjan Ghosh

Price: Rs:- 50-00 only

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মুদ্রণ বিশ্বরূপ ভৌমিক
ইম্প্রেসিভ ইম্প্রেশন
প্রচ্ছদ মুদ্রণ স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং, কলকাতা-৯
বাঁধাই গোল্ডেন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস, কলকাতা-৯
আর্টপুল শ্রীরাধাশ্রী প্রেস কলকাতা-৬
শ্রী শিশির বসু
শ্রী হীরেন পাল

কিশোর জাতক সমগ্র

গ্রন্থিক প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৮৫

1985

গ্রন্থিক

১এ কলেজ রো ॥ কলকাতা ৭০০ ০০৯

গ্রন্থিকের পক্ষে শ্রীঅঞ্জন ভৌমিক কর্তৃক প্রকাশিত এবং বিশ্বরূপ ভৌমিক কর্তৃক
ইম্প্রেসিভ্ ইম্প্রেসণ্ হইতে মুদ্রিত

বর্ধমান গ্রন্থাগার
14837
বঙ্গ বিশ্ব ভারতী, লাভপুর

মূল্য ৫০ টাকা মাত্র

'কিশোর জাতক সমগ্রে'র রূপশিল্পীরা

সম্পাদনা : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

সম্পাদনা সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

রূপায়ন ও পরিমার্জনা রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও জাতক

কাহিনীগুলির অলঙ্করণ গৌতম রায়

কাহিনীগুলির মুদ্রণ-রূপদান

বরুণ গুপ্ত

সূচীপত্র ও পরিশিষ্ট-অংশ

অলঙ্করণ সোমনাথ রায়

অলঙ্করণ-সহযোগী বরুণ সাহা ও পুণ্যব্রত পত্রী

বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা হরিদাস ঘোষ

কর্মসচিব কুমার বাবলু

শ্রদ্ধাস্পদ : অঞ্জন ভৌমিক

প্রকাশক অঞ্জন ভৌমিক

উৎসর্গ

বাংলার কিশোর-কিশোরীদের উদ্দেশ্যে—
'জাতক সমগ্র' যাদের নতুন জীবনাদর্শে
উদ্বুদ্ধ করবে

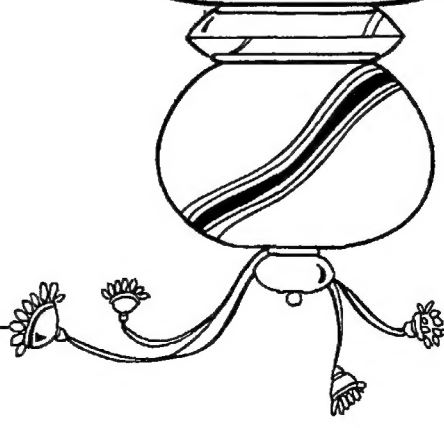

কিশোর জাতক সমগ্র

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

যে কেহ এই গ্রন্থের ভাষান্তর ও অলংকরণ পরিকল্পনা এবং পুস্তকের অন্যান্য বিষয়বস্তু নকল করিলে অথবা কোন কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া প্রকাশ করিলে, ভারতীয় কপিরাইট আইনের মধ্যে পড়িতে হইবে এবং সম্পূর্ণ খেসারত দিতে বাধ্য থাকিবে।

গ্রন্থিক

১এ কলেজ রো ॥ কলকাতা ৭০০ ০০৯

কেন 'কিশোব জাতক সমগ্র' ?

জাতকেব কাহিনীগুলিকে বাংলা ভাষায প্রথম যোগ্য অনুবাদ কবেছিলেন মনীষী ঈশানচন্দ্র ঘোষ। এ জন্য তিনি পালি ভাষা শিখেছিলেন। আজ থেকে প্রায ষাট বছব আগে পর্যাপ্ত টীকা, মূল্যবান নিবন্ধ ইত্যাদি সমেত ছটি খণ্ডে তিনি জাতকেব অনুবাদ প্রকাশ কবেন। অনুবাদ ও প্রকাশনায তাঁব সময লেগেছিল ষোল বছব—এই তথ্য থেকেই বোঝা যায কি অপবিসীম নিষ্ঠা ও পবিশ্রম-সহকাবে তিনি কাজটি সম্পন্ন কবেছিলেন।

ঈশানচন্দ্রেব অনুবাদ-সম্বন্ধে সবচেযে বড কথা, তাঁব অনুবাদে কাহিনীগুলিব বস ও উৎকর্ষতা দুই-ই পবিপূর্ণভাবে উপস্থিত। সেই সমযেব পক্ষে অনুবাদেব ভাষাও যথেষ্ট প্রাঞ্জল। স্বভাবতই এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উঠবে, তাহলে কেন আবাব বর্তমান বইটিব আযোজন ?

ঈশানচন্দ্রেব অনুবাদ-গ্রন্থে বযেছে ধর্মবিষযে সুবিস্তৃত তত্ত্বকথা এবং দীর্ঘ গাথায প্রশ্নোত্তব। এই পবিশ্রমসাপেক্ষ কাজটি অপবিণত পাঠকেব পক্ষে ঐ অমূল্য গ্রন্থটি পডাব ও বসগ্রহণেব পক্ষে অনেকসময একটি বাধাবিশেষ বলে আমাদেব মনে হযেছে। এ ছাডা পুনবাবৃত্তি, একই গল্প ও 'মোটিফেব' বাব বাব ঘুবে ফিবে আসাও একটি অন্তবায। সর্বোপবি সাম্প্রতিক বাংলা ভাষা থেকে এই অনুবাদ স্বভাবতই কিছুটা দূবেব। এই ত্রিবিধ অন্তবায দূব কবে জাতক-কাহিনীগুলিকে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায কিশোব-কিশোবী তথা সাধাবণ পাঠককে পবিবেশনই এই 'জাতক সমগ্র' প্রকাশেব মুখ্য উদ্দেশ্য। পুনরুক্তিমূলক গল্প ও নীতিকথা-সর্বস্ব গল্প বর্তমান সংগ্রহে বাদ দেওযা হযেছে। কিশোব-কিশোবীব গ্রহণে অসুবিধে হতে পাবে, এমন কিছু গল্পও বর্তমান সংগ্রহে বাখা হয নি। একই উদ্দেশ্যে গল্পেব শবীবেও কিছু কিছু পবিবর্তন ঘটানো হযেছে।

সম্পূর্ণভাবে ঈশানচন্দ্রেব অনুবাদকর্মেব ওপব নির্ভবশীল এই বইটি ঈশানচন্দ্রেব অনুবাদে প্রবেশেব একটি দবজা হিসেবে কাজ করুক, এ বইযেব পেছনে এই একটি উদ্দেশ্যই কাজ কবেছে। তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতিব নিখুত বিববণ-সম্বলিত এই জাতক-কাহিনীগুলি যদি কিশোব-কিশোবী তথা সাধাবণ পাঠককে নতুন জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ কবে, তাহলেই 'কিশোব জাতক সমগ্রে'ব প্রকাশনা সার্থক হবে।

বাঘব বন্দ্যোপাধ্যায

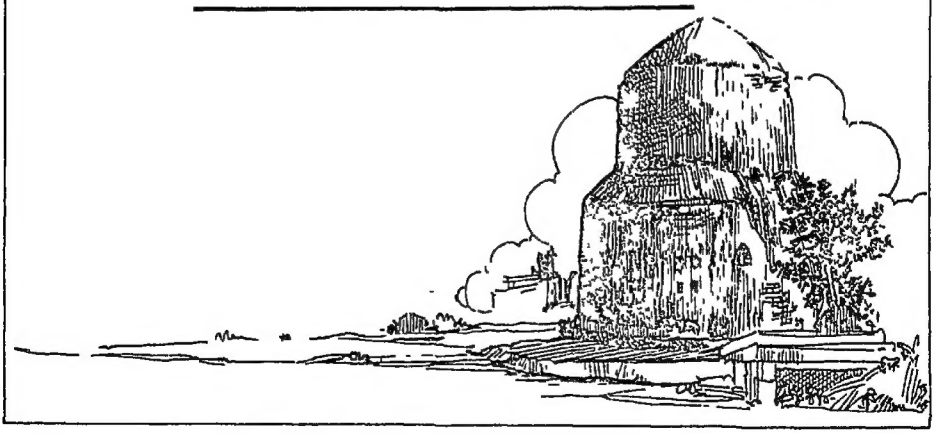

প্রকাশকের বক্তব্য

আজ থেকে ছ মাস আগে শ্রদ্ধেয় সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ 'কিশোর জাতক সমগ্র' প্রকাশনার পরিকল্পনা আমার কাছে রাখেন। প্রস্তাবটি তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করতে আমি কোন দ্বিধাবোধ করিনি, কারণ প্রাচীন ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে এ যুগের কিশোর-কিশোরীকে সচেতন করতে এমন ধরনের বইয়ের প্রয়োজন যথেষ্ট। নিজের দেশের ঐতিহ্য সম্বন্ধে যে যুবসমাজ সচেতন নয়, সে কখনও সার্থক সমৃদ্ধ দেশ গঠন করতে পারে না—এই সহজ সত্যই সুধাংশুবাবুর প্রস্তাব গ্রহণের পেছনে কাজ করেছে।

কিন্তু প্রস্তাবে সম্মতি দান এবং প্রস্তাবকে কর্মে রূপায়ণের মধ্যে ফারাক কতটা, তা বুঝলাম কাজে নামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই—প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটি বিভাগেরই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে এত বড় বইয়ের প্রকাশনা প্রথম থেকেই খুব দুর্বহ হয়ে পড়ে। তার ওপর প্রচার ও বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটি এর সঙ্গে জুড়ে গিয়ে পরিস্থিতিকে আরও শোচনীয় করে তুলল। এই সঙ্কটময় পরিবেশে প্রথমে বন্ধুবর রফিকুল ইসলাম মল্লিক এবং পরে শ্রদ্ধেয় কবি-সাহিত্যিক হরিদাস ঘোষের উদার সহযোগিতার হস্ত আমার আবদ্ধ কার্য-সম্পাদনে মূল সহায়ক হয়ে উঠল। হরিদাসবাবুর অকুণ্ঠ সহযোগিতায় জাতক-কাহিনী প্রকাশের আলো দেখেছে। তাঁর সময়োচিত নির্দেশাবলী আমাকে নানাভাবে এত সাহায্য করেছে যে শুধু ধন্যবাদজ্ঞাপনে সেই অকুণ্ঠ ঋণভার থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না।

আমার অগ্রজপ্রতিম অকৃত্রিম সুহৃদ রণেন গুপ্তের কাছেও 'কিশোর জাতক সমগ্র' প্রকাশের জন্য আমি নানাভাবে ঋণী রয়েছি। এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিশ্রম আমাকে তাঁর কাছে অপরিশোধ্য ঋণভারে আবদ্ধ রেখেছে। পরম সুহৃদ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আশা রাখি, এতগুলি মানুষের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক পরিশ্রমের ফসল যে বইটি তা সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছেই আদরণীয় হবে।

অঞ্জন ভৌমিক

আর্যশূরের জাতকমালা

ভূমিকা

জাতক দুটি ভাষায় লেখা হয়, পালি ও বৌদ্ধসংস্কৃতি। পালি জাতকই সংখ্যায় বেশি, প্রায় সাড়ে পাঁচশ এবং এগুলিই প্রথমে রচনা করা হয়। অনেক পরে সংস্কৃত ভাষায় আর্যশূর চৌত্রিশটি জাতক রচনা করে নাম দেন 'জাতকমালা'। আর্যশূর সম্ভবত খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের (৩৫০ থেকে ৪০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে) কোনো সময়ে 'জাতক মালা' রচনা করেন। ষষ্ঠ শতকের সাহিত্যে দেখি 'জাতকমালা' শুধু বিখ্যাতই নয় বেশ জনপ্রিয়ও। 'জাতক মালা' ছাড়া আরও চার পাঁচটি বই এঁর লেখা বলে বিখ্যাত, এগুলি ইনি নিজে পুরোপুরি রচনা না করলেও সম্ভবত এঁর কিছু কিছু রচনা এগুলির মধ্যে রয়ে গেছে। ('দিব্যাবদান' নামে বৌদ্ধ গ্রন্থে মৈত্রকন্যকাবদান ২২, ও ৩২ নং অবদান ও সম্ভবত এঁরই রচনা, কিংবা ইনি এগুলি পরিমার্জনা করে দিয়েছিলেন। আর্যশূর নামের দুজন কবি ছিলেন, 'জাতকমালা'র লেখকই আগেকার, পরের আর একজন 'সুভাষিতরত্নকরণ্ডককথা' বলে একটি কাব্য লেখেন। অনেক পরের একজন সংস্কৃত কবি, নাম অভিনন্দ, বলেন 'আর্যশূর হলেন শুদ্ধ কথার কবি' (বিশুদ্ধোক্তি: শূর:। এটি পাই 'সদুক্তি কর্ণামৃত' বলে একটি কবিতা সংগ্রহের বইতে ৫।২৬।৫ নং শ্লোকে ও 'সুভাষিত রত্ন কোষ' নামে আর একটি কাব্য সংকলনের ১৬৯৮নং শ্লোকে।) এর থেকে বোঝা যায় পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যও আর্যশূরকে কবি বলে সম্মান করেছে।

পাদটীকা

আকর ও বিষয়

আর্যশূর 'জাতকমালা'র গল্পগুলি পেলেন কোথা থেকে? না, এগুলো তিনি মন থেকে বানিয়ে লেখেন নি। চৌত্রিশটার মধ্যে আঠাশটাই পালিজাতক বা পালি 'চরিয়াপিটক' বা 'অপাদান' নামের বইতে আছে, 'বিনয়পিটক' ও 'মহাবস্তু' থেকেও কিছু কিছু নেওয়া হয়েছে। বাকি ছ'টি কোথা থেকে নেওয়া তা ঠিক জানা যায়না, এগুলি তাঁর কল্পিত কাহিনীও হতে পারে। গল্পগুলির মূল বক্তব্য হল নানান পারমিতা। পারমিতা হল কয়েকটি গুণ যেমন দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন এগুলির চর্চা করে মানুষ ধাপে ধাপে ভাল হতে হতে ক্রমে বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে।

উপাদান

পালি জাতক এবং অন্যান্য যেসব বই থেকে জাতকমালার গল্পগুলি এসেছে মোটের ওপর তাদের তিনটি উৎস আছে: প্রথমত, ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের গল্পগুলি যা আমরা রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণগুলিতে পাই, দ্বিতীয়ত, বুদ্ধ কাহিনী অর্থাৎ বুদ্ধ সম্বন্ধে ইতিহাস ও বুদ্ধকে ঘিরে যেসব কাহিনী গড়ে উঠেছে সেগুলো। তৃতীয়টি হল এদুটিরই উৎস, অর্থাৎ লোকের মুখে-মুখে চলে আসা বিরাট একটি কাহিনী-সাহিত্য। যার থেকে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যই হোক, বৌদ্ধ সাহিত্যই হোক কাহিনীগুলি নিয়ে আত্মসাৎ করেছে।

গঠন

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে 'জাতকমালা'র প্রত্যেকটি গল্পের একেবারে প্রথমেই বলা হয়েছে সে-গল্পটি বলার উদ্দেশ্য কি, অর্থাৎ কোন্ বিশেষ পারমিতার মাহাত্ম্য প্রচার করবার জন্যে গল্পটি তৈরি হচ্ছে। তারপরে কোথাও কোথাও সে সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন, কখনো বা সরাসরি গল্পটি শুরু হয়ে যায়, 'যেমনটা শোনা যায়' (তদ্ যথানুশ্রূয়তে)। গল্পের শেষে সেই গল্পের কেন্দ্রে যে পারমিতা আছে তার সম্বন্ধে খানিকটা বুঝিয়ে বলা কিংবা সরাসরি ফলশ্রুতি অর্থাৎ ঐ গুণটির অনুশীলন করলে কি সুফল হয় তার উল্লেখ। কোথাও কোথাও গল্প শুরু হবার সময়কার ভূমিকাটিই হুবহু ফিরে এসেছে গল্পের শেষে। (কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন গল্পের শেষের অংশগুলি আর্যশূরের রচনা নয়, পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এরকম মনে করার কোনো যুক্তি নেই, সমস্তটাই আর্যশূরেরই লেখা।)

জাতকমালার প্রথম গল্প 'ব্যাঘ্রীজাতক' পালিজাতকে নেই বটে কিন্তু ক্ষুধার্ত বাঘের

জন্যে নিজের শরীর কেটে মাংস দেওয়ার কাহিনী ঐ সময়কার অন্যান্য অনেক বৌদ্ধ বইতে আছে। অবদানশতকের ৩২ নং কাহিনীতে এই গল্পটি দুটি শ্লোক শুদ্ধই পাওয়া যায়। আবার জাতকমালার প্রভাবও পরবর্তী সাহিত্যে মাঝে মাঝে দেখা যায়।

(যেমন সিংহলের 'হত্থবনগল্লবিহারবংশ' বলে বইটিতে জাতকমালা থেকে কুড়িটি শ্লোক পালি অনুবাদে পাওয়া যায়। একাদশ শতকের কবি বিদ্যাকর 'সুভাষিতরত্নকোষ' নামে একটি গ্রন্থে আর্যশূরকে 'জাতকমালা'র রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছেন এবং ৩৩ নং জাতকের একটি শ্লোক ঐ বইতে সংকলন করেছেন।)

জাতকগুলি সংস্কৃত গদ্যে ও কবিতায় লেখা। কখনো গদ্যে খানিকটা গল্প বলে। সেটাই ছন্দে বলা, কখনো বা ছন্দেই প্রথমে ঘটনা বলে নিয়ে সেটা পরে গদ্যে বলা; কথোপকথন কখনো ছন্দে কখনো গদ্যে, নীতিকথাও তাই। কবিতা অংশগুলির নাম 'গাথা'। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন সহজে মনে রাখবার জন্যে বহু কাহিনী বা কাহিনীর অংশ প্রাচীনকাল থেকেই লোকের মুখেমুখে শ্লোকের আকারে ঘুরছিল; ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ দুই সাহিত্যই এগুলোকে ব্যবহার করেছে। 'হিতোপদেশ' যেমন পশু পাখিরা গল্পের নায়ক নায়িকা হয়ে কথা বলছে এখানেও তেমনি মোট এগারোটি গল্পের নায়ক পশুপাখী, এইসব জন্মে বুদ্ধ যেন পশু বা পাখি হয়ে জন্মেছিলেন। বৌদ্ধরা অহিংসার কথা বেশি বলতেন, জীবে দয়া এ ধর্মের খুব বড় কথা হয়ত সেজন্যে মানুষের চেয়ে নিচের জীবজন্তুর আকারে বুদ্ধ পৃথিবীতে থেকে গেছেন একথাটির মধ্যে জীবমাত্রের প্রতি সদয় ব্যবহারের একটা নির্দেশও এগুলির মধ্যে আছে। (পশু-পাখিকে নায়ক করে গল্প লেখার ইতিহাস খুব প্রাচীন, 'ইসপস্' ফেব্‌লস্' 'পিল্‌-পইস্ ফেব্‌লস্ ইত্যাদিও আমাদের 'পঞ্চতন্ত্র' হিতোপদেশের মত ঐ জাতীয় গল্প সংগ্রহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মধ্যেই আছে। তবে বেশিরভাগ গল্পে মানুষই নায়ক সে মানুষ বুদ্ধ, যিনি রাজা, বণিক ইত্যাদি নানা ভূমিকায় পৃথিবীতে এসেছেন। এর কারণ মানুষকে উপদেশ দেবার জন্যই বইটি রচিত, তাই পশুপাখির আকারেও যখন বুদ্ধ পৃথিবীতে এসেছিলেন তখনও তিনি যে সাধ্য-মত তাঁর দলের প্রাণীদের উপকারের চেষ্টা করেছিলেন এইটে বলার জন্যেই ঐ পশু-পাখিদের নায়ক করা হয়েছে, অর্থাৎ ওরা যদি পরের উপকারের জন্যে স্বার্থত্যাগ করতে পারে তবে মানুষের ত আরোই পারা উচিত। স্বার্থত্যাগের পরীক্ষা যখন চূড়ান্ত-ভাবে হয়, তখন প্রায়ই একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে, পরীক্ষা শেষ হয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

বুদ্ধ বুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মানুষ; তাঁর মৃত্যুর প্রায় হাজারখানেক বছর পরে আর্যশূর 'জাতকমালা' রচনা করেন। ততদিনে বুদ্ধ প্রবাদপুরুষ, ইতিহাস ছেড়ে ধর্মে তাঁর স্থান হয়েছে, লৌকিক কাহিনীতে, কিংবদন্তীতে তিনি আর্যাবর্তের মানুষের মনে একটি বিশিষ্ট আসন পেয়েছেন। এ সময়ের প্রায় দেড়শ বছর আগেই রামায়ণ রচনা শেষ হয়ে গেছে, মহাভারত রচনা তখনো চলছে, মানে, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ ভগবানের অবতার বলে বিখ্যাত হয়েছেন 'ব্রাহ্মণ্যধর্মে' ও সমাজে। সেই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য ইতিহাসের বুদ্ধকে যুগপুরুষ বলে সম্মান করে নায়কের জায়গা দিচ্ছে সাহিত্যে। এঁরই নানা অবতারের কাহিনী হল জাতক। আর এই সময়েই কৃষ্ণের নানা অবতারের কাহিনী নিয়ে প্রথম পুরাণগুলোও লেখা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ অবতারের কথা দিয়ে নানা ছড়ানো ধর্মকাহিনীকে গাঁথবার যুগ এটা। সেদিক থেকে জাতকমালার একটা পথিকৃতের স্থান আছে। তাছাড়া এগল্পগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত, বাহুল্যবর্জিত। মনে করা যায় খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দী নাগাদ ভগবানের

অবতারের কল্পনাটা ছড়াতে আরম্ভ করে, শ' দুই বছরের মধ্যে রামায়ণের আদি ও উত্তর কাণ্ড—শুধু এ অংশেই রাম বিষ্ণুর অবতার—এবং মহাভারতে কৃষ্ণকে অবতার করে দেখানোর কাহিনীগুলো রচিত হতে শুরু করে। সেদিক থেকে জাতকের বুদ্ধের বৈশিষ্ট্য অনেকঃ জীবজন্তুর ভূমিকায় তাঁর সহজ ও স্বাভাবিক আচরণ, মানুষের ভূমিকাতেও তাঁর দয়া স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি মানবিক গুণের উৎকর্ষ তাঁকে সত্যিই আদর্শ পুরুষে পরিণত করেছে।

হীনযান ও মহাযান

বৌদ্ধ ধর্মের দুটি পর্বঃ হীনযান বা স্থাবরযান ও মহাযান (প্রথমটির সাহিত্য পালিভাষায়, দ্বিতীয়টির সংস্কৃতে। হীনযানে বুদ্ধ ভগবান নন, পথপ্রদর্শক ও উপদেষ্টা মাত্র। এ সাহিত্য তত্ত্বপ্রধান, এসে মানুষের সেবা করবে। যেমন জাতকমালায় বুদ্ধ নানারূপে ফিরে ফিরে জন্ম নিয়ে মানুষের উপকার করে উন্নতির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। জন্মান্তরবাদ তখন হাজার বছরের পুরনো তত্ত্ব। কিন্তু এই প্রথম তত্ত্বটিকে কাজে লাগানো হল ধর্মপ্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে। পালি জাতকেই প্রথম এ কাজটি হয় অনেক আগে। আর্যশূর খানিকটা শুষ্ক, উপনিষদের ঠিক পরবর্তী ধর্মসাহিত্য এটা এবং উপনিষদের মতই সাধারণের কাছে কঠিন, দুর্বোধ্য। এ ধর্মে প্রত্যেক মানুষকেই সারাজীবন ধরে একমাত্র নিজের নির্বাচনের বা মুক্তির জন্যেই সাধনা করে যেতে হবে। মহাযান ধর্ম বুদ্ধকে দেবতায় পরিণত করল, শুরু হয়ে গেল বুদ্ধের মূর্তিনির্মাণ, চৈত্য, বিহার, স্তূপ নির্মাণ, ধূপ দীপ গান দিয়ে বুদ্ধের পূজা, ছবিতে সাহিত্যে ভাস্কর্যে বুদ্ধের জীবনী দেখানো হতে লাগল। ধর্মটি এসে গেল সাধারণ লোকের নাগালের মধ্যে। মহাযানে মানুষ শুধু নিজের মুক্তির চেষ্টা করবেনা, আশপাশের মানুষদের মুক্তির দিকে এগিয়ে দেওয়াই তাদের প্রধান কর্তব্য। এজন্যে দরকার হলে তারা জন্মে জন্মে ফিরে সেখানকার কিছু গল্প ও অন্যান্য পালি বৌদ্ধ সাহিত্যের কিছু গল্প ব্যবহার করে মহাযান ধর্ম প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগালেন।

কাদের জন্য

যারা শক্ত তত্ত্বকথা বোঝেন প্রধাণত সেই সব সাধারণ খেটে খাওয়া অশিক্ষিত লোকদের জন্যেই বৌদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু সংস্কৃতে রচনা হবার ফলে মহাযান সাহিত্য কতকটা সরে এল তাদের থেকে কারণ সাধারণ লোক প্রাকৃতে কথা বলত, সংস্কৃত বুঝত না। তাই মাঝে মাঝে বড় বড় সমাসও পাই এতে। তবে মনে হয় ধর্ম উপদেশে যাঁরা এসব গল্প ব্যবহার করতেন তাঁরা কথকঠাকুরের মত ব্যাখ্যা করে ভাষ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন লোককে, যাতে তাদের কাছে দুরূহ না ঠেকে তাদের উদ্দেশ্য করেই যে এগুলো লেখা তার প্রমাণ নানা অতিশয়োক্তি, অর্থাৎ ঐশ্বর্যের বা প্রতাপের বর্ণনার বাড়াবাড়িতে, আর নানা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে। উপনিষদের সময়ে সাধারণ লোক অনেকটাই ফাঁকিতে পড়েছিল, একদিকে জাঁকজমকের যজ্ঞও কমে গেছে অনেকটা, আবার উপনিষদের ঐ কঠিন তত্ত্ব তাঁরা ঠিকমত বুঝতে পারত না। সেই ফাঁকটা ভরাল একদিকে রামায়ণ মহাভারত, ব্রাহ্মণ্য সমাজে অন্যদিকে প্রথমে পালি বৌদ্ধসাহিত্য হীনযানে ও পরে সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য মহাযান বৌদ্ধ সমাজে। বৌদ্ধ ধর্মের সাহিত্য, ব্রাহ্মণ্য সমাজ থেকে লোককে বুদ্ধের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করাই এর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের একটা উপায় হচ্ছে নানা জন্মে বুদ্ধ যেমন নৈতিক উন্নতি প্রকাশ করেছেন তাঁর জীবনে, অন্যদের জন্যে কেমন দয়া, দান সত্যবাদিতা, সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ দেখিয়েছেন তার কাহিনী বলা। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের হীন করে দেখানো, তাই শত্রু বা ইন্দ্র নানা কাহিনীতে বুদ্ধকে পরীক্ষা করতে এসেছেন (উন্মাদয়ন্তী, সুপারগ, মৎস্য অন্যান্য জাতকেও)। ইন্দ্র ঐ সময়কার ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে দেবরাজ এবং বৃষ্টির [illegible], বৌদ্ধ সাহিত্যে যেমন জাতক-

মালায় কিন্তু তিনি বৃষ্টির দেবতা হয়ে মধ্যে মধ্যে দেখা দিলেও দেবরাজ একেবারেই নয়, বরং বেশ নিচু জায়গাতেই তাঁকে দেওয়া হয়েছে। তিনি বুদ্ধের অধীনে এবং অনেকটা হীন চরিত্রের যখনই ছদ্মবেশে বুদ্ধকে ছলনা করতে আসেন তখনই ব্রাহ্মণের বেশে আসেন। এটা লক্ষ্য করি। মহাভারতেও ইন্দ্র নিজের ছেলে অর্জুনের স্বার্থে যখন কর্ণের কবচ-কুণ্ডল হরণ করতে এসেছিলেন তখনও ব্রাহ্মণের বেশেই এসেছিলেন তখনও ব্রাহ্মণের বেশেই আসেন। মার বুদ্ধের আর একজন শত্রু, সেও ছলনা ও পরীক্ষা করে বুদ্ধকে; যেমন পরে বাইবেলের শয়তান যীশুকে পরীক্ষা করতে আসে ও হেরে যায় বুদ্ধ তাঁর চরিত্রের বলে মারকে হারিয়ে দেন। মনে হয়, মানুষের মনের মধ্যে যত মন্দ প্রবৃত্তি আছে, যাকে শাস্ত্রে ষড়্‌রিপু বলে, মার হল প্রতিমূর্তি।

সমাজ

বৌদ্ধ সাহিত্যের একটা বৈশিষ্ট হল এতে সমাজের ছবি অনেক বেশি ফুটে উঠেছে। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের—অন্তত ঐ সময়কার চেয়ে বৌদ্ধ সাহিত্যে সাধারণ মানুষ ও তার জীবনযাত্রার ছবি অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। দেখতে পাই সমাজে বৈশ্য ও প্রধানত বণিকের প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠীরাই সমাজের কর্তা। রাজারা ক্ষত্রিয়, কিন্তু সমাজের সত্যিকার ক্ষমতা এখারকার মতই ধনী বণিকের হাতে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রারও কিছু ছবি আছে, আর আছে বহু বিভিন্ন পেশার কথা, যারা হাতে কাজ করে তাদের কথা। শহর গ্রামের চারপাশেই তখন জঙ্গল ছিল, সেখানে সন্ন্যাসীদের আশ্রম ছিল আর ছিল বহু পশুপাখীর আবাস। সব মিলে একটি পূর্ণ চিত্র, সমাজের ধর্মপিপাসা আর কর্মজীবন পাশাপাশি জায়গা পেয়েছে জাতকমালায়।

বৌদ্ধ সাহিত্যে ধর্মের একটি সজ্ঞা পাই—'বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়, মহতো জনকায়স্যার্থায়' অর্থাৎ বহুজনের সুখের জন্য, মহৎ জনসমষ্টির স্বার্থে। জাতকমালায় বুদ্ধ নানা ভূমিকায় এই ধর্মকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যা সাধারণ মানুষের মঙ্গল এবং সুখের চেষ্টা করবে, যা সাধারণ মানুষের স্বার্থের জন্যেই প্রতিষ্ঠিত।

সুকুমারী ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

বোকা বণিক জাতক —১
বুদ্ধিমান যুবক জাতক —৭
কাঠুরে মহারাজ জাতক —১২
হরিণ জাতক —১৪
অশ্ব জাতক —১৮
কুকুর জাতক —২১
মহিলামুখ জাতক —২৩
কৃষ্ণ জাতক —২৬
কপোত জাতক —২৮
বেদভব জাতক —৩১
মহাশীল জাতক —৩৪
মশক জাতক —৩৮
বক জাতক —৩৯
শীলবান জাতক —৪১
ইল্লীস জাতক —৪৪
ভীমসেন জাতক —৪৯
শীল মীমাংসা জাতক —৫১
কুহক জাতক —৫৩
তৈলপাত্র জাতক —৫৫
কটাহক জাতক —৫৮
বিড়াল জাতক —৬১
অসম্প্রদান জাতক —৬২
সুবর্ণ হংস জাতক —৬৫
কাক জাতক —৬৭
অনুশাসক জাতক —৬৮
বভ্রু জাতক —৬৯
আম জাতক —৭১
একপর্ণ জাতক —৭২
অশাতরূপ জাতক —৭৫
ত্রিপর্যন্ত জাতক —৭৬
অভীক্ষ্ণ জাতক —৭৮
নন্দিবিলাস জাতক —৭৯
দুর্মেধা জাতক —৮২
ফল জাতক —৮৪
পঞ্চায়ুধ জাতক —৮৬
রাজাববাদ জাতক —৮৯
খদিরাঙ্গার জাতক —৯২
অশীন চিত্ত জাতক —৯৫
ময়ূর জাতক —১০০
শূকর জাতক —১০৩

গুণ জাতক —১০৭
সুসীম জাতক —১১১
উপাসাঢ জাতক ১১৪
শকুনগ্ঘী জাতক ১১৬
তিন্দুক জাতক ১১৮
কচ্ছপ জাতক ১২৩
অসদৃশ জাতক ১২৬
দহিবাহন জাতক ১৩১
শীলানিশংস জাতক ১৩৭
বালাহাস্ব জাতক ১৩৯
কুবঙ্গমৃগ জাতক ১৪২
অশ্বক জাতক ১৪৫
শিশুমাব জাতক ১৪৮
সোমদত্ত জাতক ১৫০
কুটবানিজ জাতক ১৫২
ধর্মধ্বজ জাতক ১৫৫
তিলমুষ্টি জাতক ১৬০
সৈন্ধব জাতক ১৬৪
মাতৃতু জাতক ১৬৭
দূত জাতক ১৭০
মৃদুপানি জাতক ১৭৩
কুকধর্ম জাতক ১৭৭
শ্রেষো জাতক ১৮৬
বধকি শূকব জাতক ১৮৭
শালূক জাতক ১৯০
মৎসদান জাতক ১৯২
খুল্লকলিঙ্গ জাতক ১৯৫
মহাগ্গাবোহ জাতক ১৯৯
শীলমীমাংসা জাতক ২০২
শবক জাতক ২০৪
ক্ষান্তিবাদী জাতক ২০৬
মাংস জাতক ২০৯
শশ জাতক ২১১
দদ্দভ জাতক ২১৪
বাজাববাদ জাতক ২১৬
তুষ জাতক ২১৮
বাবেক জাতক ২২১
সন্ধিভেদ জাতক ২২৩
কাকবতী জাতক ২২৫
অননুশোচীয জাতক ২২৭

কাবন্তিক জাতক ২৩০
লট্টকা জাতক ২৩২
সুবর্ণমৃগ জাতক ২৩৫
অহিতুণ্ডিক জাতক ২৩৭
শবিক জাতক ২৩৯
শ্বেতকেতু জাতক ২৪০
দবীমুখ জাতক ২৪৩
ধর্মধ্বজ জাতক ২৪৬
খরপুত্র জাতক ২৪৮
সুতনু জাতক ২৫৩
মনোজ জাতক ২৫৭
সূচী জাতক ২৫৯
আশঙ্কা জাতক ২৬১
শ্রীকালকর্ণি জাতক ২৬৪
সুবর্ণকর্কট জাতক ২৬৬
শক্তুভস্ত্রা জাতক ২৬৮
কপি জাতক ২২৫
মহাকপি জাতক ২৭২
কুম্ভবগব জাতক ২৭৮
উট জাতক ২৮৩
গাছ জাতক ২৮৫
ধোঁয়া জাতক ২৮৭
যব জাতক ২৮৯
অষ্টশব্দ জাতক ২৯১
সুলসা জাতক ২৯৩
সুমঙ্গল জাতক ২৯৬
গঙ্গমাল জাতক ২৯৮
বেদি জাতক ৩০১
পদকুশলমানব জাতক ৩০৪
মিত্রবন্দিক জাতক ৩১১
কৃষ্ণ জাতক ৩১৫
শঙ্খ জাতক ৩১৭
ন্যগ্রোধ জাতক ৩১৯
মহাধর্মপাল জাতক ৩২২
ঘট জাতক ৩২৪
মাতৃপোষক জাতক ৩৩৬
পানীয় জাতক ৩৩৯
যুবঞ্জয় জাতক ৩৪২
দশরথ জাতক ৩৪৪

সুপারগ জাতক ৩৫১
ভদ্রশাল জাতক ৩৫৫
সমুদ্র বানিজ জাতক ৩৫৮
লালসা জাতক ৩৬০
মহাকৃষ্ণ জাতক ৩৬৫
মহাপদ্ম জাতক ৩৬৬
আম্র জাতক ৩৬৯
স্পন্দন জাতক ৩৭৩
জবন হংস জাতক ৩৭৫
কালিঙ্গবোধি জাতক ৩৭৯
অকীর্তি জাতক ৩৮১
রুরু জাতক ৩৮৪
শম্বভমৃগ জাতক ৩৮৭
শালিকেদার জাতক ৩৯১
মহোৎক্রোশ জাতক ৩৯৪
বিস জাতক ৩৯৮
চিত্র সম্ভূত জাতক ৪০১
শিবি জাতক ৪০৩
শক্তিগুল্ম জাতক ৪০৫
সৌম নস্য জাতক ৪০৬
চাম্পেয় জাতক ৪১০
কুম্ভ জাতক ৪১২
মহাকপি জাতক ৪১৮
সম্ভব জাতক ৪২১
ষড়দন্ত জাতক ৪২৬
গণ্ডাতিন্দু জাতক ৪৩৯
ত্রিশকুন জাতক ৪৪৬
শরভঙ্গ জাতক ৪৫০
শরভঙ্গ জাতক (দ্বিতীয়) ৪৫৪
খুল্লসুতসোম জাতক ৪৫৭
কিংছন্দো জাতক ৪৬১
শোনন্দ জাতক ৪৬৫
শোনক জাতক ৪৭২
সম্বুলা জাতক ৪৭৭
মহাহংস জাতক ৪৮১
জয়দ্দিষ জাতক ৪৮৮
কুশ জাতক ৪৯২
মহাসুতসোম জাতক ৪৯৫
মূকপঙ্গু জাতক ৫০২
মহাজনক জাতক ৫০৮
শ্যাম জাতক ৫১২
ভূরিদত্ত জাতক ৫১৫

বোকা বণিক জাতক

বাবাণসীতে তখন বাজত্ব কবছেন ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্তেব আমলে বোধিসত্ত্ব জন্ম নেন এক বণিক পবিবাবে। বড হওযাব সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য শিখলেন। বাণিজ্যে বোধিসত্ত্বেব বুদ্ধি বেশ ধাবাল হযে উঠতে লাগল। এক এক কবে পাঁচশটি গোরুব গাডি কবেছেন। আজ এদেশ, কাল ওদেশে যাচ্ছেন ব্যবসা কবতে।

বোধিসত্ত্বেব সমযে বাবাণসীতে আব একজন বণিক থাকতেন। তবে তাঁব মগজ তত সাফ নয। শ পাঁচেক গোরুব গাডি অবশ্য তাঁবও ছিল।

একদিন বোধিসত্ত্ব ঠিক কবলেন সমস্ত গোরুব গাডি নানাবকম মালে বোঝাই কবে দূব দেশে বেচতে যাবেন। হঠাৎ খবব পেলেন, সেই দ্বিতীয বণিকও ঠিক কবেছে সেখানে ব্যবসা কবতে যাবে।

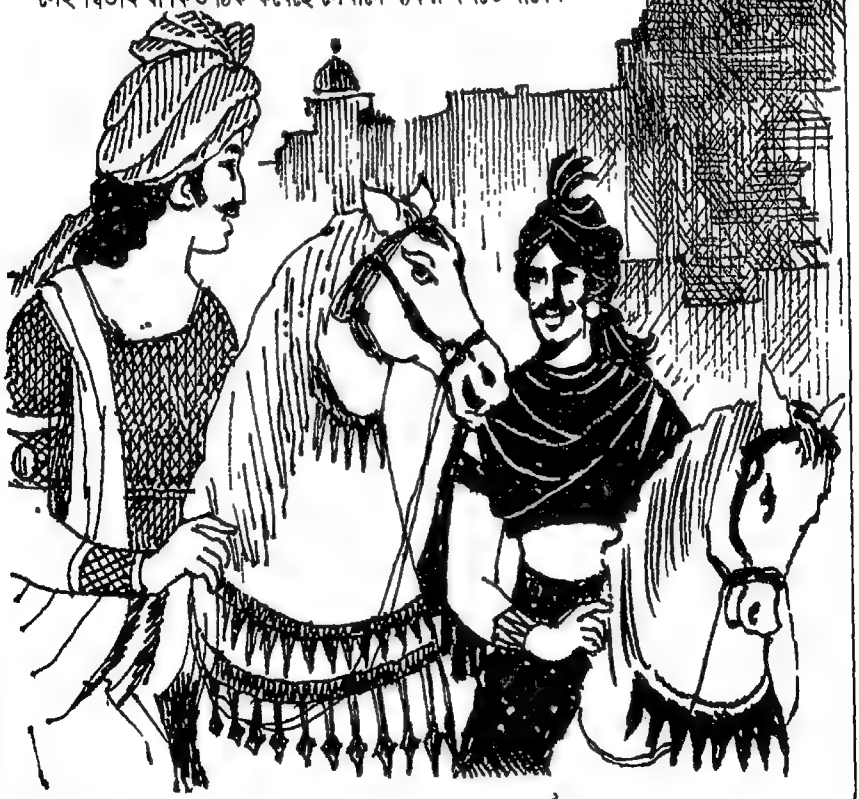

বোধিসত্ত্ব ভাবলেন দুজনের একসঙ্গে যাওয়াটা ঠিক হবে না। এক হাজার গোরুর গাড়ি, এত লোকলস্কর এক সঙ্গে গেলে বেশ অসুবিধে হবে। একে তো এত লোকের খাবারদাবার জল জোটানো বেশ কঠিন হবে। তারপর অতগুলো গোরুর খাবারও সব জায়গায় না পাওয়া যেতে পারে। ভালো হয় একজন আগে এবং একজন পরে গেলে। আর দুজনের যাওয়ার মাঝখানে মাসখানেক, মাস দেড়েক ফারাক থাকাই ভালো। তা যাই হোক, বোধিসত্ত্ব সেই বণিককে ডেকে সব কথা বুঝিয়ে বললেন। সব শুনে বণিকটি বলল সে আগে যেতে চায়। বোধিসত্ত্ব তাতে কোনই আপত্তি করলেন না।

ঐ বণিকটি ভেবেছিল আগে গেলে খাবারদাবার জোগাড় করতে সুবিধে হবে। তাছাড়া, বাণিজ্য করতেও অসুবিধে হবে না। সে আগে যাবে, তখন কোন প্রতিযোগী থাকবে না। ফলে মালপত্তর চড়া দামে বেচা যাবে।

আর বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, ওর পাঁচশ গোরুর গাড়ির চাকায় অসমান রাস্তা সমান হয়ে যাবে। সুতরাং পরে যখন বোধিসত্ত্ব যাবেন তাঁর কোন অসুবিধে হবে না। রাস্তায় যেতে যেতে জলের জন্য ওদের কুঁয়ো খুঁড়তেই হবে। বোধিসত্ত্ব ও তাঁর লোকজনকে জলের জন্যে পরে হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না। বণিকের গোরুগুলো রাস্তায় দুপাশে ঘাস খেতে খেতে যাবে। বোধিসত্ত্বের দলটি যখন ঐসব জায়গায় পৌঁছবে, ততদিনে সেখানে কচি ঘাস জন্মাবে। বোধিসত্ত্বের গোরুগুলো তরতাজা ঘাস খেয়ে চাঙ্গা হতে পারবে। এ ছাড়াও এক মস্ত সুবিধে হল বণিক আগে যাওয়াতে মালপত্তরের দর-দাম বাঁধা হয়ে যাবে। বোধিসত্ত্বের বেচাকেনা খুব সহজ হয়ে যাবে এতে।

দ্বিতীয় বণিক শুভ দিন দেখে যাত্রা শুরু করল। কয়েকদিন পরে তারা এক গহীন বনের কাছে এসে পড়ল। ঐ বনে যক্ষদের বাস। তারা মায়া যাদু জানে। ইচ্ছে করলেই মানুষ বা জীবজন্তুর রূপ ধারণ করতে পারে। বিপদ আরো আছে, ঐ বনের ত্রিসীমানার মধ্যে এক ফোঁটা জল নেই।

বণিক তাব দলবল সমেত বনেব কাছাকাছি আসা মাত্র যক্ষদেব বাজা এক ফন্দি কবল। সে ভাবল বণিককে যদি বোঝান যায যে বনেব মধ্যে বিস্তর জল আছে, তাহলে বণিক জলেব জালা-গুলো ফেলে দেবে। আব তাহলেই কেল্লা ফতে। কেননা জলেব অভাবে তাবা খিদেতেষ্টায় কাতব হযে পডবে। তখন ওদেব ঘাযেল কবতে বেগ পেতে হবে না।

যক্ষদেব বাজা তখন মাযাবলে ধবধবে সাদা দুটো গোরু তৈবি কবল। সুন্দব একটা গোরুব গাডি বানাল। নিজে চমৎকাব পোশাকে সেজে গাডি ছুটিযে দিল। যক্ষ বাজাব দশ-বাবো জন অনুচব ছুটল গাডিব আগু-পিছু। অনুচবদেব গলায় ঝুলছে নীল ও শ্বেত পদ্মেব মালা। হাতে পদ্মেব ডাঁটা। পাযে কাদা।

বণিকেব কাছে এসে যক্ষবাজ বলল, 'মহাশযেব কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

'আমবা তো আসছি বাবাণসী থেকে। কিন্তু আপনাব গাড়িব চাকায কাদা এল কোত্থেকে? লোকজনেব পাযেই বা কাদা কেন? পদ্মফুল, পদ্মেব ডাঁটা এসব পেলেন কোথায?'

'পদ্মদিঘী থেকে ওবা তুলে নিযেছে, আব ওদিকে তো তুমুল বৃষ্টিও হচ্ছে।'

'কোথায়?'

'ঐ যে দেখছেন না দূরের গাছগুলো, ওখানে নীল ও শ্বেতপদ্মে ভরা কত সরোবর, কাজলকালো জল সেখানে, তার ওপর টানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে।'

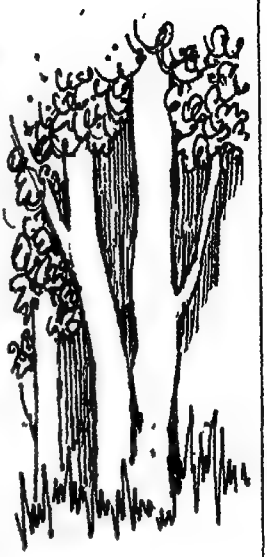

যক্ষরাজের সঙ্গীরা বণিকের লোকজনকে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ মশাই, আপনাদের পেছনের দিকের গাড়িগুলো এত ভারি কেন?'

বণিকের সঙ্গীরা বলল, 'ওগুলোতে জলের জালা আছে।'

শুনে যক্ষরাজ বলল, 'খামোকা আর কেন ওগুলো বয়ে নিয়ে যাবেন, সামনে জলের কোন অভাব নেই। তাছাড়া গাড়ি হাল্কা করলে তাড়াতাড়ি যেতে পারবেন।'

যক্ষরাজ তো তারপর গাড়ি চালিয়ে যক্ষপুরীতে ফিরে গেল। এদিকে বোকা বণিক ভাবল, সত্যিই তো, খামোকা আর জালাগুলো বয়ে নিয়ে যাই কেন। দলের লোকেদের হুকুম করল জল ফেলে দিতে।

জল ফেলে দিয়ে তারা চলেছে তো চলেছে। কোথায় সরোবর। কোথায় বৃষ্টি। ক্লান্ত হয়ে রাতে গাড়ি থামানো হল। কিন্তু রান্না হবে কি করে। এক ফোঁটা জল নেই যে। এই অবস্থায় তারা যখন ধুঁকছে তখন যক্ষেরা হামলে পড়ল। বণিক, বণিকদের লোকজন ও গোরুগুলো সব যক্ষদের পেটে গেল। অক্ষত থেকে গেল গোরুর গাড়িগুলো। আর বিজন বনে পড়ে রইল ওদের হাড়গোড়।

দেড় মাস পরে বোধিসত্ত্ব তাঁর লোকজন সমেত এসে পড়লেন সেই ভয়ঙ্কর বনের কাছে। তিনি জানতেন এই বনের মধ্যে কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। তাই আগেই জালা জালা জল ভরে রেখেছেন। বনে ঢোকার আগে সঙ্গীদের সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে, 'আমাকে না জানিয়ে এ বনের কোন ফল খেও না, এখানে অনেক বিষাক্ত গাছ আছে।'

বোধিসত্ত্ব বনের মধ্যে একটু এগোতেই যক্ষরাজা আগের মতই চাতুরি করতে এল। বোধিসত্ত্ব দেখলেন যক্ষরাজের চোখ রক্তের মত লাল। মাটিতে তার ছায়া পড়ছে না। বুঝলেন, এ মানুষ নয়, অপদেবতা। যক্ষরাজ বলল, 'বনের মধ্যে প্রচুর জল, কেন খামোকা জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে।'

শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'যা ভাগ্ এখান থেকে। পাপী কোথাকার! আমি বণিক, বুঝলি। যা কবব নিজেব বুদ্ধিতেই কবব। নিজের চোখে সরোবর দেখলে তখন ভাবতাম। তোব কথায জল ফেলে তেষ্টায মরতে বাজি নই, বুঝলি।'

যক্ষরাজ হাড়ে হাড়ে বুঝল এ পাত্র টলবে না। সুতবাং সে ফন্দি-ফিকির ছেড়ে ফিরে গেল।

বোধিসত্ত্বেব দলের লোকজন কিন্তু এতে একটু বিগড়েই গেল। তারা ভাবল, সত্যি জল ফেলে দিলে বেশ তাড়াতাড়ি যাওযা যেত। অভিযোগেব বহব দেখে বোধিসত্ত্ব সবাইকে ডাকলেন।

'এ বনে জল আছে এমন কথা কেউ আগে শুনেছে কি?'

তাবা বলল, 'না।'

'ঐ দূবেব বনে যদি সত্যি সত্যি বৃষ্টি হত তাহলে এখানে বৃষ্টিতে ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস বইত নিশ্চযই?'

সকলে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'যে মেঘে বৃষ্টি হয সেই মেঘ দূব থেকে দেখা যায কিনা?'

সকলে বলল, 'হ্যাঁ যায়।'

'তোমবা কি সে বকম মেঘ দেখতে পাচ্ছ?'

তাবা বলল, 'না।'

'মেঘেব গর্জন দূব থেকে শোনা যায কিনা?'

তারা স্বীকাব কবল, 'হ্যাঁ, শোনা যায।'

'তোমবা কি সেবকম কোন আওযাজ শুনতে পেযেছ?'

সকলে একবাক্যে বলে উঠল, 'না।'

বোধিসত্ত্ব এরপর ব্যাখ্যা করে বললেন, 'দেখ, প্রমাণ না পেলে কোন কিছু বিশ্বাস করা ঠিক নয়। আসলে যে লোকটা এত কথা বলে গেল সে মানুষ নয়, যক্ষ। ওর কথা শুনে আমরা জল ফেলে দিলে পরে জলের অভাবে বিপদে পড়তাম। খিদে-তেষ্টায় কাহিল হয়ে পড়লে তখন যক্ষের দল আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষ করে দিত। মনে হচ্ছে সামনের দিকে এগালে আমরা দেখতে পাব ওরা আগের বণিকের দফা গয়া করেছে এইভাবে।'

আর কিছু দূর এগোনোর পর দেখলও তাই। গোরুর গাড়িগুলো পড়ে আছে, কিন্তু গোরুর পাত্তা নেই। লোকজন নেই। একটু তফাতে পড়ে আছে বণিক ও তার দলের লোকদের হাড়গোড়।

বোধিসত্ত্বর কয়েকটা গাড়ি রাস্তার ধকল সামলাতে না পেরে একটু-আধটু ভেঙেছিল। তিনি বণিকের গাড়ি থেকে কয়েকখানা

ভাল গাড়ি বেছে নিলেন। কম দামী মাল ফেলে বণিকের কিছু দামী মাল গাড়িতে তুলে নিলেন।

শেষকালে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে কেনাবেচা শুরু করলেন। বোধিসত্ত্বের কোন প্রতিযোগী না থাকায় চড়া দাম পেলেন। সব কিছুই শুভ হল।

এর গোপন মন্ত্র একটাই : বিবেচনা করে কাজ করা।

বুদ্ধিমান যুবক

ব্রহ্মদত্তের আমলে একবার বোধিসত্ত্ব এক বণিক বংশে জন্ম নেন।

নিজের বুদ্ধি ও পরিশ্রমে তাঁর বেশ নামযশ হয়। কালে কালে বারাণসীর শেঠ হলেন। 'চুল্ল শ্রেষ্ঠী' খেতাব পেলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র তাঁর খুঁটিয়ে পড়া ছিল। গ্রহ নক্ষত্র বিচার করে যাকে যা বলতেন অক্ষরে অক্ষরে ফলে যেত।

বোধিসত্ত্ব একদিন বাজদরবারে যাবেন। রাস্তায় দেখেন একটা মরা ইঁদুর পড়ে আছে। সেই সময়কার নক্ষত্র বিচার করে তিনি দেখলেন ইঁদুরটি তুচ্ছ করার মত নয়। কারণ ভাল বংশের কোন সৎ লোক যদি এটাকে তুলে নিয়ে যায়, তাহলে তার কপাল ফিরে যাবে। ব্যবসা করে কোটিপতি হয়ে যাবে।

এখন হয়েছে কি, ঠিক সেই সময় ঐ রাস্তা দিয়ে সৎ বংশের এক সৎ যুবক কোথাও একটা কাজে যাচ্ছিল। সে বেচারা বেশ গরীব। বেকার। বোধিসত্ত্ব তাকে ডাকলেন, 'শুনছ, ও ভাই।'

'কিছু বলছেন?'

'হ্যাঁ। এই যে মরা ইঁদুরটা দেখছ না…'

'হ্যাঁ।'

'ভক্তি করে এটা তুলে নিয়ে গিয়ে যদি ব্যবসা শুরু কর তোমার দুঃখ থাকবে না। রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাবে।'

যুবকটি বোধিসত্ত্বের কথামত ইঁদুরটা তুলে নিয়ে হাঁটা শুরু করল। কিছুদূর যেতেই এক দোকানদার তাকে ডাকল। দোকান-দারের একটা পোষা বিড়াল আছে। এক পয়সা দিয়ে সে বিড়ালের

জন্য ইঁদুরটা কিনে নিল। যুবকটি ঐ এক পয়সা দিয়ে খানিকটা গুড় কিনল। তারপর এক জালা জল নিয়ে, থালার ওপর গুড় রেখে, এক বনের ধারে গিয়ে বসল।

মালিরা ঐ বনে রোজ জল তুলতে যায়। তারা জল তুলে ক্লান্ত হয়ে বন থেকে বেরিয়ে আসতেই যুবককে দেখতে পেল। তেষ্টায় তখন তাদের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। সবাই লাইন দিয়ে তার কাছে জল আর গুড় খেল। কলজে জুড়িয়ে গেল। তখন তারা সবাই যুবককে এক মুঠো করে ফুল দিয়ে গেল।

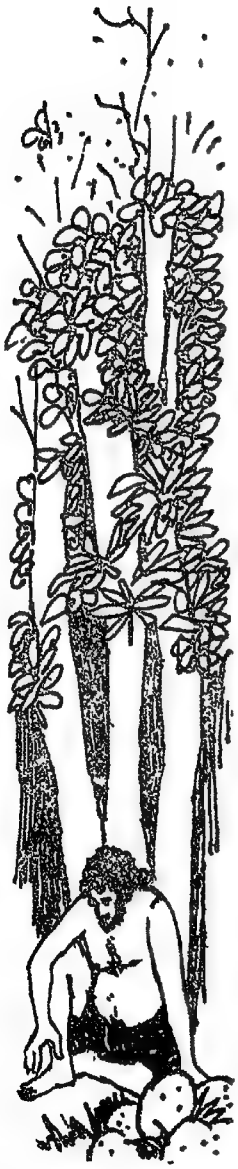

ফুল বেচে সে দু-চার পয়সা বেশি পেল। তখন সব পয়সা দিয়ে আবার গুড় কিনল। পরের দিনও তাকে দেখা গেল বনের ধারে জল আর গুড় নিয়ে বসে আছে। দ্বিতীয় দিন মালিরা জলের বদলে তাকে একটা করে ফুটন্ত ফুলের গাছ দিয়ে গেল। এবার ওগুলো বিক্রি করে সে আরো বেশি পয়সা পেয়েছে। এভাবে দু-চার দিনের মধ্যে ব্যবসা করার মত কিছু টাকা হল।

একদিন ভয়ঙ্কর ঝড় হল। রাজার বাগানে তুলকালাম কাণ্ড। কত গাছ যে উপড়ে গেল, কত যে ডাল ভেঙ্গে পড়ল তার কোন হিসেব নেই। অত সুন্দর, সাজানো বাগান তছনছ হয়ে গেল।

মালি কপালে হাত দিয়ে বসে পড়েছে। কি করে ডালপালা সাফ করবে ভেবে পাচ্ছে না। যুবক খবর পেয়ে মালির কাছে গেল। বলল, বিনা পয়সায় যদি তাকে ডালগুলো নিতে দেয় তাহলে সে বাগান সাফ করে দেবে। মালি তো হাতে স্বর্গ পেল। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।

যুবক তখন পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের ডাকল। ডেকে গুড় খেতে দিল। তারা বেজায় খুশি। তখন সে সবাইকে বলল, 'আমার সঙ্গে চল সবাই, রাজার বাগান সাফ করবি চল।' তারা হৈ হৈ করে রওনা দিল।

বাগান পরিষ্কার করে সব ডালপালা এনে রাস্তায় গাদা করে রাখল। বিশাল এক ঢিবি তৈরি হল।

এখন হয়েছে কি, রাজার কুমোরের সেদিন সব কাঠ ফুরিয়ে গেছে, আগুন জ্বালতে পারছে না। মাটির হাঁড়ি, কলসী পোড়ানো যাচ্ছে না। খবর পেয়ে সে যুবকের সঙ্গে দেখা করল। নগদ কিছু

টাকা আর মাটির হাঁড়ি-কলসী দিয়ে সে সব কাঠ কিনে নিল।

বারাণসীতে তখন পাঁচশ ঘেস্নুড়ে ছিল। তাদের কাজ শুধু ঘাস কাটা। যে রাস্তা দিয়ে তারা ঘাস কেটে ফিরে আসে যুবক একদিন সেখানে জালা ভর্তি জল আর গুড় নিয়ে বসে গেল। ঘাস কেটে ফেরার পথে ক্লান্ত ঘেস্নুড়ের দল প্রাণ ভরে জল খেল। তৃপ্ত হয়ে তারা তাকে বলল, 'ভাই তুমি এত উপকার করলে, কি করে তোমার ঋণ শোধ করি বল দেখি।'

যুবক বলল, 'এ আর এমন কি।'

'না ভাই, তা হয় না, ঋণী করে রেখ না,' ঘেস্নুড়েরা বলল।

'বেশ, সময় হলে আমি নিজেই বলব', যুবক জবাব দিল।

এর কিছুদিন পরেই শহরে এল এক ঘোড়ার ব্যাপারী। সঙ্গে পাঁচশো ঘোড়া। তাকে দেখেই যুবকের মাথায় একটা ফন্দি এল। ঘোড়ার জন্য ঘাস লাগবেই। যুবক ঘেস্নুড়েদের কাছে গেল। তারা তাকে দেখে বেজায় খুশি। সে তাদের বলল, 'কাল তোমরা আমার একটা উপকার করবে।' তারা বলল, 'নিশ্চয়ই, বল কি করতে হবে।'

'কাল তোমরা আমাকে এক আঁটি করে ঘাস দেবে।'

'ঠিক আছে দেব।'

'আর আমার ঘাস যতক্ষণ না বিক্রি হচ্ছে ততক্ষণ তোমরা তোমাদের ঘাস বেচতে যাবে না।'

'ঠিক আছে।'

এদিকে সেই ঘোড়ার ব্যাপারী পড়ে গেল মহা বিপদে। যুবক তার কাছে চড়া দাম হাঁকল। সে আর কি করে, বাধ্য হল বেশি দামে ঘাস কিনতে। এভাবে যুবকের পুঁজি গেল বেড়ে।

কয়েকদিন পরে যুবক খবর পেল বন্দরে মালবোঝাই একটা জাহাজ এসেছে। সাত তাড়াতাড়ি সে জাহাজেব মালিকের সঙ্গে দেখা কবতে ছুটল। মালপত্তর দেখে শুনে দরদাম করে, একটা সোনার আংটি দিয়ে জাহাজেব পুবো মালটাই সে বায়না করে ফেলল। আংটিব ওপর তাব নাম লেখা ছিল। আংটিটা দিয়ে সে কাছাকাছি এক জায়গায় তাঁবু ফেলল। লোকলস্কব ভাড়া করে আনল। তারা তাঁবুব বাইরে পাহারা দিতে লাগল।

বারাণসীব প্রায় শ খানেক ব্যবসায়ী এসেছে জাহাজের খোঁজ পেয়ে। কিন্তু মাল কিনতে গিয়ে শুনল, এক মহাজন সব মাল বায়না কবে রেখেছে। খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। মহাজনকে

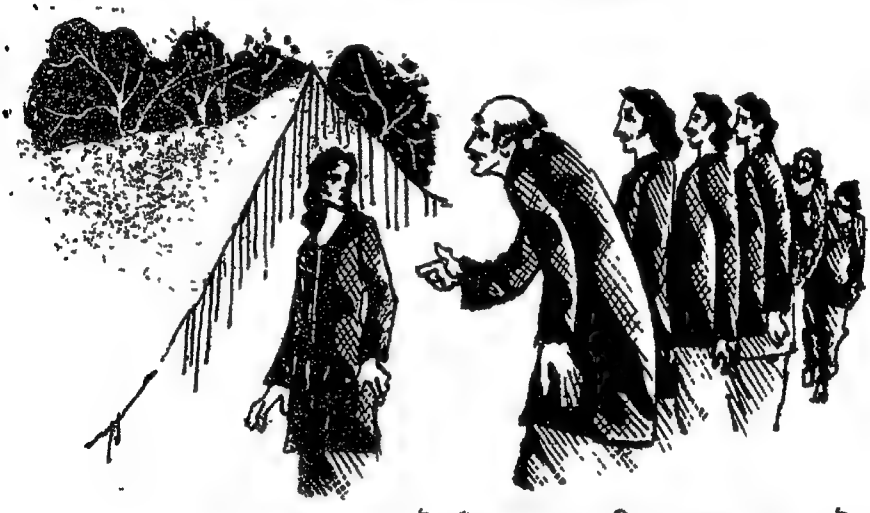

পাওযা গেল সেই তাঁবুর ভেতব। কিন্তু ঢোকাব হুকুম নেই। দারোয়ান একজন একজন কবে তাদেব নিয়ে গেল তাঁবুব মধ্যে। ব্যবসাযীবা ভাবল মহাজন নিশ্চযই বিবাট বড়লোক।

ব্যবসাযী এক এক কবে এক এক হাজাব টাকা আগাম দিয়ে এল মহাজনকে। তা দিযে মোট মালেব সামান্য এক এক ভাগ পাওয়া যাবে। এব পবেও যুবকের নিজেব ভাগে থেকে গেল বেশ বড় একটা ভাগ। সেখান থেকেও কিছুটা কেনাব জন্য ব্যবসাযী-দেব মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। এভাবে সমস্ত মাল বেচে যুবক ছ লাখ টাকা লাভ কবল।

একদিনের নিঃস্ব যুবক আজ ধনী হয়েছে। কিন্তু সে বোধিসত্ত্বকে ভুলতে পারে নি। তার কপাল ফেরার মূলে আছেন বোধিসত্ত্ব। যুবক বোধিসত্ত্বের কাছে গেল। তাঁকে প্রণাম করে সে অর্ঘ্য হিসাবে এক লক্ষ টাকা পাশে রেখে দিল।

বোধিসত্ত্ব অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এত টাকা কোথায় পেলে?'

যুবক তখন গোড়া থেকে সব কিছু খুলে বলল। বোধিসত্ত্ব খুব খুশি। মনে মনে ভাবলেন নিঃস্ব অবস্থা থেকে বুদ্ধি ও পরিশ্রমের জোরে যে এত টাকা করেছে তার ভালোমন্দ দেখা উচিত। যাতে সে বিপথে না যায়, সেজন্য এই যুবকের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার।

বোধিসত্ত্ব নিজেও ধনী। অঢেল তাঁর বিষয়-আশয়। তবে একমাত্র কন্যা ছাড়া তাঁর আত্মীয় বলতে আর কেউ নেই। কন্যাটি এখন বিবাহযোগ্যা। বিস্তর চিন্তাভাবনা করে বোধিসত্ত্ব তাঁর মেয়ের সঙ্গে যুবকটির বিয়ে দিলেন।

বোধিসত্ত্বের মেয়েকে বিয়ে করায় যুবকটি এখন আরও ধনশালী। কালক্রমে বোধিসত্ত্ব দেহ রাখলেন। বোধিসত্ত্বের মৃত্যুর পর বারাণসীর শ্রেষ্ঠীপদও লাভ করল সেই বুদ্ধিমান যুবক।

জাতকের এই গল্পটির মূল শিক্ষা হল: স্ফুলিঙ্গ থেকে যেমন দাবানল সৃষ্টি করা যায়, তেমনি অতি সামান্য মূলধন থেকেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশাল ধনসম্পত্তি গড়ে তুলতে পারে।

কাঠুরে মহারাজ

বোধিসত্ত্ব একবার রাজা ব্রহ্মদত্তের ছেলে হয়ে জন্মান। অবশ্য তাঁর এই জন্মগ্রহণের ঘটনাটা ছিল বেশ নাটকীয়।

রাজা ব্রহ্মদত্ত একবার বাগানে বেড়াতে গিয়েছেন। পরে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসছেন, এমন সময় হঠাৎ দেখলেন ঐ বনের মধ্যে এক যুবতী গান গাইতে গাইতে কাঠ কুড়োচ্ছে। ব্রহ্মদত্ত যুবতীর রূপে মুগ্ধ হলেন। তাকে গান্ধর্বমতে বিয়ে করলেন।

কিছুদিন পরে মেয়েটি গর্ভবতী হল। বোধিসত্ত্ব তার গর্ভে তখন চাঁদের কলার মত বৃদ্ধি পাচ্ছেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত যখন শুনলেন মেয়েটি গর্ভবতী হয়েছে, তখন তিনি তাকে নিজের নাম লেখা একটি আংটি দিলেন। বললেন, 'যদি তোমার মেয়ে হয় তাহলে এই আংটি বিক্রি করে সেই টাকায় তাকে বড় করবে। আর যদি ছেলে হয় তাহলে এই আংটিসমেত তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

যথাসময়ে বোধিসত্ত্ব জন্ম নিলেন। একদিন মায়েব কোল থেকে নেমে খেলতেও শুরু করলেন। একটু বড় হতে, পাড়াব ছেলেরা তাকে 'বাবাব ঠিক নেই' বলে রাগাত। এতে বোধিসত্ত্ব খুবই দুঃখ পেলেন। একদিন তিনি মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, আমাব বাবা কে?'

মা বলল, 'বাবা, তুমি রাজার ছেলে।'

'তার প্রমাণ কি মা?'

'দেখ বাবা, বাজা যখন আমাদেব ছেড়ে চলে যান, তিনি এই আংটিটা দিয়ে গিয়েছিলেন। আংটিতে তাঁব নাম লেখা আছে। তিনি বলেছিলেন মেযে হলে ঐ আংটি বেচে তার ভরণপোষণ করতে। আব ছেলে হলে তাকে যেন তাঁব কাছে আংটিসমেত নিযে যাই।'

'তাহলে তুমি আমাকে বাজাব কাছে নিয়ে যাচ্ছ না কেন?'

বোধিসত্ত্বের মা দেখল ছেলে তার বাবাকে দেখাব জন্য খুবই আকুল হয়ে উঠেছে। তাই আর দেবি না কবে ছেলেকে সঙ্গে নিযে সে রওনা দিল। বাজার বাড়িতে পৌঁছে বাজাকে খবব পাঠাল। বাজাব অনুমতি পাওয়া মাত্র সে সিংহাসনেব কাছে গিযে প্রণাম কবে বলল, 'মহাবাজ, এই আপনার ছেলে।'

রাজসভায় সকলেব মধ্যে লজ্জায় পড়ে যাবেন ভেবে মহাবাজ সব কিছু জেনেও না জানার ভান করলেন, 'সে কি কথা? এ আমাব ছেলে হতে যাবে কেন?' বোধিসত্ত্বের মা তখন বলল, 'মহাবাজ, তাহলে এই দেখুন আপনাব নাম লেখা আংটি।' বাজা এতে আবও অবাক হওযাব ভান কবে বললেন, 'এই আংটি তো আমাব নয।'

বোধিসত্ত্বের মা তখন নিরুপায়। সে বলল, 'এমন দেখছি ধর্ম ছাড়া আমার আব কোন সাক্ষী নেই। তাই ধর্মেব দোহাই দিযে বলছি যদি এই ছেলে আপনার হয় তাহলে সে যেন শূন্যে স্থিব থাকে, নাহলে মাটিতে আছড়ে পড়ে সে মাবা যাক।' এই বলে সে বোধিসত্ত্বেব পা-দুটি ধবে তাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিল।

শূন্যে উঠে বোধিসত্ত্ব স্থির বইলেন। সেখানে বীবাসনে বসে তিনি মধুর স্ববে ধর্ম কথা বলতে বলতে মহারাজকে বললেন:

'রাজা, আমি তোমারই ছেলে। আমার মা তোমার ধর্মপত্নী।'

শুনে রাজা বললেন, 'আমার কোলে আয়, বাছা।' রাজার দেখা-দেখি অনেকেই বোধিসত্ত্বকে কোলে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব নেমে এলেন রাজার কোলেই। বোধিসত্ত্বকে রাজা যুবরাজ করলেন। তাঁর মা-কে করলেন রাজরাণী।

একদিন ব্রহ্মদত্ত দেহ রাখলেন। বোধিসত্ত্ব তখন রাজ সিংহাসনে বসলেন। তাঁর নাম হল কাঠুরে মহারাজ।

জাতকের এই গল্পটির সঙ্গে মহাভারতের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা উপাখ্যানের বেশ মিল আছে।

হরিণ জাতক

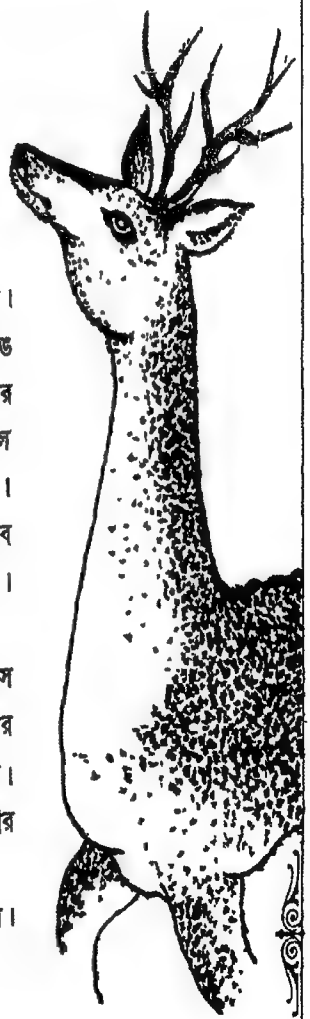

রাজা ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার হরিণকুলে জন্ম নেন। সাধারণ হরিণের সঙ্গে তাঁর চেহারার বিস্তর অমিল। গায়ের রঙ কাঁচা সোনা। শিং দুটি রূপোর মত চকচকে। চোখের রঙ রক্ত কজ্জলের মত। লেজটি ছিল ছিল চমরী গাভীর মত। আর শরীরটি দেখতে ছিল তেজী ঘোড়ার ছানার মত। বোধিসত্ত্ব 'ন্যগ্রোধ মৃগরাজ' নাম নেন। পাঁচশ হরিণ-হরিণীর দলপতি হয়ে বনে ঘুরে বেড়াতেন। একটু দূরে এরকমই আরেকটি হরিণ বিচরণ করত। তার নাম 'শাখা মৃগ'। তার দলেও ছিল পাঁচশ হরিণ-হরিণী।

ব্রহ্মদত্ত হরিণের মাংস খেতে খুব ভালবাসেন। হরিণের মাংস না থাকলে তাঁর খাওয়াই হয় না। রোজ বনে যেতেন শিকার করতে। রাজার সঙ্গে কর্মচারীদেরও ছুটতে হয় হরিণ শিকারে। ঘরদোর ফেলে, অন্য সব কাজ ফেলে রোজ শিকার করতে যাওয়ার ঝামেলা খুব কম নয়।

অনেক ভাবনা চিন্তা করে তারা একটা ফন্দি বের করল।

রাজার বাগানেই যদি অনেক হরিণ মজুত করে রাখা যায় তাহলে সমস্যা মেটে। এভাবে তারা দল বেঁধে বনে গেল। হরিণ তাড়িয়ে নিয়ে এল রাজার বাগানে। তাড়া খেয়ে হরিণের দল রাজার বনের মধ্যে ঢুকে পড়লে ফটক বন্ধ করে দিল। তারপর তারা রাজার কাছে গেল। বলল, 'মহারাজ, রোজ হরিণ শিকারে গেলে আমাদের ঘর-গেরস্থের কাজে বিস্তর অসুবিধে হবে। সেজন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করেছি। আপনার বাগানে বনের হরিণ এনে আটক করে রেখেছি। ফলে আপনার খুশিমত রোজ একটা হরিণ জবাই করতে কোন অসুবিধে হবে না।'

রাজা ব্রহ্মদত্ত বাগানে গেলেন। দেখে খুশি হলেন। একসঙ্গে এত হরিণ। 'ন্যগ্রোধ মৃগরাজ' আর 'শাখা-মৃগ'কে দেখে তিনি মুগ্ধ। ওদের দুজনকে ডেকে বললেন, 'তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। তোমাদের কোনদিন কোন ক্ষতি হবে না।'

এরপর থেকে রাজার লোকজন হরিণ মারতে বাগানে ঢুকত। রাজার লোক তীরধনুক নিয়ে ঢুকলে ভয়ে সমস্ত হরিণ ছুটোছুটি শুরু করে দিত, এর ফলে অযথা অনেকে তীর বিদ্ধ হয়ে মারা যেত।

'ন্যগ্রোধ মৃগরাজ' ও 'শাখা মৃগ' তখন সব হরিণদের ডেকে আলোচনা শুরু করল। কেননা এভাবে চলতে থাকলে হরিণকুল দুদিনেই শেষ হয়ে যাবে। অনেক আলোচনার পর ঠিক হল, এবার থেকে পালা করে একেকজন নিজের ইচ্ছেয় হাঁড়িকাঠে মাথা দেবে।

ব্যবস্থাটি দু দলের সকলেরই পছন্দ হল। পরে রাজাকে জানান হল। তারপর থেকে এই নিয়মেই কাজ হতে থাকল। কোন্ হরিণ কোন্ দিন আত্মবলিদান করবে সেটা দল ঠিক করে দিত।

একদিন শাখা মৃগের দলের এক হরিণীর পালা এল। তখন ঐ হরিণীটি পূর্ণগর্ভা। সে শাখামৃগকে অনুরোধ করল, 'দলপতি, আমি এই অবস্থায় মারা গেলে বাচ্চাটাও মারা যাবে। তাতে দলেরই ক্ষতি। আজ যদি অন্য কেউ প্রাণ দেয় তাহলে খুব ভাল হয়।'

শাখামৃগ বলল, 'তা হয় না। আজ তোমার পালা। আমি আর কাউকে তোমার বদলে প্রাণ দিতে বলতে পারি না।'

হরিণী তখন বোধিসত্ত্বের কাছে গেল। সব কিছু শোনার পর বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ভয় পেও না, কথা দিচ্ছি তোমাকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমার।'

হরিণী চলে গেলে বোধিসত্ত্ব নিজে হাঁড়িকাঠে মাথাটি গলিয়ে দিলেন।

রাজার লোকজন এসে ন্যগ্রোধ মৃগকে দেখে অবাক হল। সঙ্গে সঙ্গে তারা রাজাকে খবর দিল। রাজা এসে ন্যগ্রোধ মৃগকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'মৃগরাজ, আমি তোমাকে কথা দিয়েছি তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তাহলে তুমি কেন হাঁড়িকাঠে মাথা দিলে?'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, নিয়ম অনুসারে আজ এক হরিণীর পালা। সে গর্ভবতী। তাছাড়া সে আমার কাছে সাহায্য চেয়েছিল। আমি তার বদলে অন্য কাউকে মরতে বলতে পারি না। তাই নিজের প্রাণ দিয়ে তাকে বাঁচাব ঠিক করি।'

'ওঠ মৃগরাজ, তোমাকে আর সেই হরিণীকে অভয় দিচ্ছি।'

বাগানের আর সব হরিণের কি হবে মহারাজ?'

'তাদেরও অভয় দিলাম।'

'বনে যে সব হরিণ আছে তাদের কি হবে?'

'তাদেরও অভয় দিচ্ছি।'

'বনের অন্য প্রাণীদের কি হবে মহারাজ?'

'তাদেরও অভয় দিচ্ছি।'

মাছ বা জলচর প্রাণীদের কি হবে?'
'তারাও নিরাপদে থাকবে।'
'আকাশচারী পাখিদের কি হবে রাজা?'
'তাদেরও অভয় দিচ্ছি।'

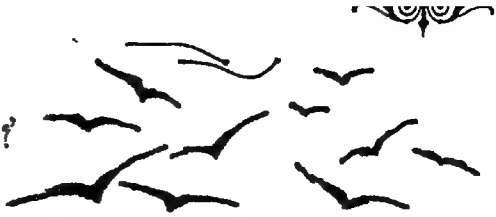

এভাবে সমগ্র প্রাণিজগৎ রক্ষা পাওয়ার পর বোধিসত্ত্ব হাঁড়িকাঠ থেকে মাথা বের করে নিলেন।

তখন রাজা বললেন, 'মৃগরাজ, জীবজগতের প্রাণ বাঁচাতে আজ তুমি যা করলে তার কোন তুলনা নেই। মানুষের মধ্যেও এর নজির নেই। আমি আমার রাজ্যে আজ থেকে জীবহত্যা নিষিদ্ধ করে দিলাম।'

তারপর হরিণরা দল বেঁধে বনে ফিরে গেল। যাবার আগে বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্মকথা শোনালেন, 'মহারাজ, হিংসা ত্যাগ করুন। সকলকে ভালবাসুন। মৃত্যুর পরে আপনার স্বর্গ বাস হবে।'

বোধিসত্ত্বের দয়ায় জীবন ফিরে পাওয়ার কিছুদিন পরে সেই গর্ভিণী হরিণী এক শাবক প্রসব করল। নবজাত সেই হরিণটি শাখা মৃগকে খুব পছন্দ করত। তার সঙ্গে খেলে বেড়াত। তা দেখে হরিণীটি একদিন তাকে বলল, 'বাছা, তুমি শাখামৃগের সঙ্গে মেশা ছেড়ে দাও। ন্যগ্রোধ মৃগের সঙ্গে থাক। এতে তোমার মঙ্গল হবে। তাতে যদি কখনও তোমার জীবন যায় তবু জানবে সেটাই ভালো। আর শাখামৃগের সঙ্গে থেকে যদি অমর হও তবে জানবে তাতেও কোন সুখ নেই।'

ওদিকে রাজার কাছ থেকে অভয় পেয়ে হরিণরা দুরন্ত হয়ে উঠল। লোকালয়ে গিয়ে শস্য ক্ষেত নষ্ট করতে শুরু করল। রাজার নিষেধ থাকায় কেউ তাদের মারতে পারছে না। সমস্ত প্রজা একজোট হয়ে একদিন রাজার কাছে দরবার করল, 'মহারাজ, হরিণের দাপটে আমরা মরতে বসেছি।'

রাজা ব্রহ্মদত্ত সব শুনে বললেন, 'ন্যগ্রোধ মৃগকে আমি যে বর দিয়েছি তা ফিরিয়ে নিতে পারি না। রাজ্য রসাতলে গেলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারি না।'

বোধিসত্ত্ব রাজার বিচার শুনে দলেব হবিণদেব ডাকলেন। বললেন, 'আজ থেকে তোমরা লোকেব ক্ষেতের শস্য নষ্ট আর করবে না।' তারপর কৃষকদের কাছে খবর পাঠালেন, 'তোমবা ক্ষেতের চারপাশে বেড়া দিও না। ক্ষেতগুলো আলাদা করার জন্য পাতা দিয়ে ঘিরে বাখলেই হবে।'

লোকে বলে, পাতার মালা দিয়ে ক্ষেত ঘেরাব প্রথা তখন থেকেই চালু হয। হবিণরা তাবপর থেকে কখনো পাতার মালা ডিঙিযে ক্ষেতে ঢোকে নি।

এই জাতকেব মর্মকথা : অহিংসা।

অশ্ব জাতক

বাবাণসীতে তখন বাজত্ব কবছেন ব্রহ্মদত্ত। সেই সময বোধিসত্ত্ব একবাব ঘোড়া হযে জন্মান। ভাল জাতের এবং যথেষ্ট সুলক্ষণযুক্ত ছিলেন বলে বাজা তাকে মঙ্গলাশ্ব কবে নেন।

বোধিসত্ত্বকে আব পাঁচটি ঘোড়াব সঙ্গে সাধাবণ ঘোডাশালে না বেখে সুন্দব ঘব দেওযা হযেছিল। লাখ টাকা দামেব সোনার থালায তাকে দামী পুবনো চালের ভাত খেতে দেওয়া হত। তাছাড়া ঘবটি সুগন্ধে ভবিযে বাখা হত। মাথাব ওপব সোনাব তাবা আঁকা চাঁদোযা। গন্ধ তেলেব প্রদীপ জ্বলত।

বাবাণসীব আশপাশেব বাজাদের অনেক দিনের লোভ বারাণসী দখল কবা। একবাব সাত বাজা একজোট হযে ব্রহ্মদত্তের কাছে একটি চিঠি পাঠাল। তাতে লেখা ছিল, 'আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কবে যদি নিজেব রাজ্য বাখতে পাব তো ভাল, নাহলে বাজ্য ছেড়ে দাও। আত্মসমর্পণ কর।'

ব্রহ্মদত্ত বাজসভা ডাকলেন। মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি সবাই এল। চিঠিটা সবাইকে দেখিযে বাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি কবা উচিত বলুন।' শলা-পরামর্শ কবে সবাই একযোগে বলল,

'মহারাজ, প্রথমেই আপনি নিজে যুদ্ধে যাবেন না। বরং আপনি আমাদের বীর অশ্বারোহীকে যুদ্ধে পাঠান। সে যদি না পারে তখন দেখা যাবে কি করা যায়।'

ব্রহ্মদত্ত সেই ঘোড়সওয়ারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখ বাছা, তুমি কি সাত রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে?' ঘোড়সওয়ার বলল, 'মহারাজ, যদি মঙ্গলাশ্বে চড়ে যুদ্ধ করি তাহলে জম্বু দ্বীপের সব রাজা একজোট হয়ে লড়লেও আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।' রাজা বললেন, 'তোমার পছন্দমত যে কোন ঘোড়া বেছে নিয়ে যুদ্ধে যেতে পার। ঘোড়সওয়ার তখন নিচু হয়ে রাজাকে প্রণাম করে বলল, 'আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য।'

তারপর সে বোধিসত্ত্বকে তার ঘরের বাইরে নিয়ে এল। তাকে বর্ম পরিয়ে দিল। নিজেও সব রকম অস্ত্র গুছিয়ে নিয়ে বোধিসত্ত্বের পিঠে চড়ে বসল। তলোয়ার খুলে ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সে বেরিয়ে গেল। বোধিসত্ত্ব বিদ্যুৎ গতিতে এক রাজার সৈন্য ডিঙ্গিয়ে তার মুখোমুখি হলেন। ঘোড়সওয়ার সেই রাজাকে বন্দী করে এক পলকে বারাণসীতে ফিরে এল।

এভাবে পরপর পাঁচ রাজা বন্দী হল, কিন্তু ছ নম্বর রাজাকে বন্দী করার সময় বোধিসত্ত্ব আঘাত পেলেন। যদিও তিনি সেই রক্তাক্ত অবস্থায়ই ছ নম্বর রাজাকে ঘায়েল করে বারাণসীতে ফিরে এলেন। কিন্তু ফিরে আসার পর মাটিতে পড়ে গেলেন।

ঘোড়সওয়ার তখন বোধিসত্ত্বের সাজ ও বর্ম খুলে আরেকটি ঘোড়াকে সাজাল। বোধিসত্ত্ব চোখ খুলে এই দৃশ্যে দেখে ভাবলেন, 'ঘোড়সওয়ার আবার ঘোড়া সাজাচ্ছে। কিন্তু সাত নম্বর রাজাকে ঘায়েল করে ধরে আনা তার সাধ্যে কুলোবে না।'

তখন তিনি শুয়ে শুয়েই ঘোড়সওয়ারকে ডেকে বললেন, 'ওহে বীর শোন, আমি ছাড়া আর কেউ শত্রুর শিবিরে ঢুকে সাত নম্বর রাজাকে বন্দী করে আনতে পারবে না। এত কষ্ট করে আমি যে কাজটা প্রায় সেরে এনেছি তা নষ্ট হতে দেব না। তুমি এক কাজ কর, আমাকে কোনরকমে তুলে দাঁড় করিয়ে দাও। তারপর আমাকে আবার যুদ্ধসাজে সাজিয়ে দাও।'

একথা শুনে ঘোড়সওয়ার বোধিসত্ত্বের চোটজখমের জায়গাগুলো বেঁধে দিল। তাঁকে আবার সাজিয়ে দিল। আর, এবারও বোধিসত্ত্ব সাত নম্বর রাজাকে ধরে নিয়ে এলেন বারাণসীতে।

আহত বোধিসত্ত্বকে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, এই সাত রাজাকে হত্যা করবেন না। এঁদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিন যাতে আর কখনও হিংসার করলে না পড়ে। আমি আর এই ঘোড়সওয়ার যে কাজ করলাম তার পুরস্কার এই বীর যোদ্ধাকেই দেবেন। আপনি নিজে দান-ধ্যান করবেন। শান্তির পথে থাকবেন। সুবিচার করবেন।'

বোধিসত্ত্ব তখন মরণাপন্ন। রাজার লোকজন একে একে তাঁর

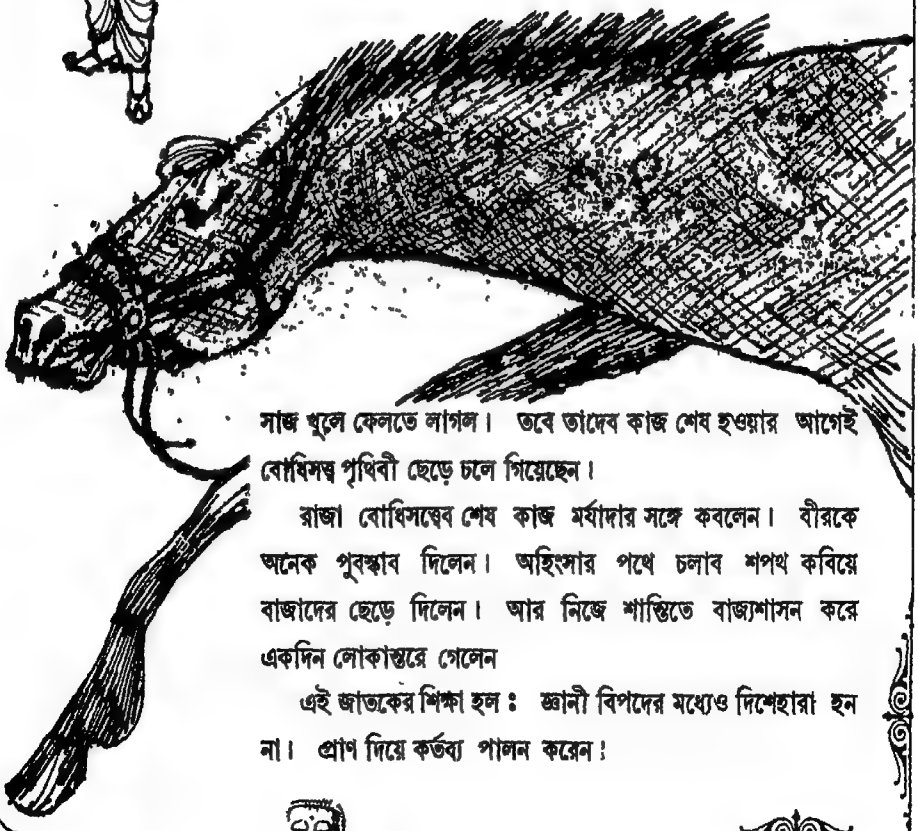

সাজ খুলে ফেলতে লাগল। তবে তাদের কাজ শেষ হওয়ার আগেই বোধিসত্ত্ব পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

রাজা বোধিসত্ত্বের শেষ কাজ মর্যাদার সঙ্গে করলেন। বীরকে অনেক পুরস্কার দিলেন। অহিংসার পথে চলার শপথ করিয়ে রাজাদের ছেড়ে দিলেন। আর নিজে শান্তিতে রাজ্যশাসন করে একদিন লোকান্তরে গেলেন

এই জাতকের শিক্ষা হল : জ্ঞানী বিপদের মধ্যেও দিশেহারা হন না। প্রাণ দিয়ে কর্তব্য পালন করেন।

কুকুর জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার কুকুরকুলে জন্ম নেন। স্থান : সেই বারাণসী এবং রাজত্ব করেছেন ব্রহ্মদত্ত। বোধিসত্ত্ব তখন শ-শ কুকুরের সঙ্গে মহাশ্মশানে থাকতেন।

সাজন-গোছান রথে চড়ে বাগানে বেরিয়ে রাজা ব্রহ্মদত্ত এক সন্ধ্যায় ফিরে এলেন। চামড়া দিয়ে সাজান রথের সাজগুলো সে রাতে আর খুলে রাখা হল না। সাজসমেত রথটি উঠানেই পড়ে রইল।

রাতে জোর বৃষ্টি হল। তাতে চামড়ার সাজ ভিজে জবজবে হয়ে গেল। তখন রাজার পোষা কুকুরের দঙ্গল দোতলা থেকে নেমে এসে সেগুলো খেয়ে ফেলল।

পরের দিন রাজার চাকরেরা রাজাকে বলল, 'মহারাজ, নর্দমার মুখ দিয়ে বাইরের কুকুর ঢুকে রথের সাজ খেয়ে ফেলেছে।' শুনে রাজা খুব রেগে গেলেন। হুকুম হল : 'যেখানে যত কুকুর আছে সব মেরে ফেল।' সারা শহরে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল কুকুর হত্যা যজ্ঞ। প্রাণের ভয়ে একদল কুকুর বোধিসত্ত্বের কাছে ছুটে এল। অত কুকুরকে একসঙ্গে দেখে বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা সবাই মিলে হঠাৎ শ্মশানে এলে কেন?'

তারা বলল, 'আমাদের বাঁচান। রাজার রথের সাজ কুকুরে খেয়ে ফেলেছে। রাজা হুকুম দিয়েছেন, কুকুর দেখলেই বধ করা হবে।'

বোধিসত্ত্ব ভেবে দেখলেন, রাজবাড়িতে ঢুকে বাইরের কুকুরের

পক্ষে এ কাজ করা সহজ নয়। রাজার পোষা কুকুররাই এর হোতা। মজা হল, দোষ করেও তারা নিরাপদে আছে। আর যারা কোন দোষ করেনি তারা মারা যাচ্ছে। আমার উচিত রাজাকে দেখিয়ে দেওয়া কে দোষী। এতে আমার জাতভাইদের প্রাণ বাঁচবে।

তখন আর সব কুকুরকে ডেকে তিনি বললেন, 'তোমাদের ভয় নেই। আমি তোমাদের বাঁচাবার রাস্তা খুঁজে বের করব। তবে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজার সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসছি ততক্ষণ তোমরা এখানে অপেক্ষা করবে।'

তারপর বোধিসত্ত্ব ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ নিলেন। মনে মনে এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, 'রাস্তায় কেউ যেন আমাকে লাঠি বা ঢিল দিয়ে না মারে।' ফলে তাঁকে দেখে কারো মনে রাগ দেখা দিল না।

রাজা তখন বিচারালয়ে। বোধিসত্ত্ব সেখানে ঢুকেই এক লাফে রাজার আসনের তলায় লুকিয়ে পড়লেন। রাজার চাকররা তাঁকে তাড়া করল। কিন্তু রাজা তাদের বাধা দিলেন। ভরসা পেয়ে বোধিসত্ত্ব রাজার আসনের তলা থেকে বেরিয়ে এলেন। রাজাকে নমস্কার করে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, আপনি কি কুকুর মেরে ফেলার আদেশ দিয়েছেন?'

হ্যাঁ।

কুকুররা কি অপরাধ করেছে রাজা?

তারা আমার রথের চামড়ার সাজ খেয়ে ফেলেছে।

কোন্ কুকুর খেয়েছে জানেন কি?

না, তা জানি না।

সত্যিকারের অপরাধীকে না চিনে সব কুকুর মারার এই আদেশ দেওয়া কি ঠিক হয়েছে?

কুকুর রথের চামড়া খেয়েছে, তাই সব কুকুরকেই মারা হবে।

আপনার লোক কি সব কুকুরকে মারছে, না কি কোন কোন কুকুরকে মারা হচ্ছে না?

রাজবাড়িতে ভালো বংশের যেসব কুকুর আছে তাদের মারা হচ্ছে না।

তাহলে তো সব কুকুরকে মারা হচ্ছে না। রাজবাড়ির কুকুররা রেহাই পাচ্ছে। এটা কি সুবিচারের নমুনা হল? বিচার হবে দাঁড়িপাল্লার মত সমান সমান।

বেশ তো, কুকুর দলপতি, আপনিই বলুন না কে রথের চামড়া খেয়েছে?

রাজবাড়ির কুকুর মহারাজ।

প্রমাণ কি?

আপনি রাজবাড়ির কুকুরদের এখানে আনান। আমাকে একটু ঘোল আর কুশ দিন।

এর পর বোধিসত্ত্ব ঘোলের সঙ্গে কুশ মিশিয়ে রাজবাড়ির কুকুরদের খাওয়ালেন। তখন তারা বমি করে ফেলল। আর বমির সঙ্গে চামড়ার টুকরো উঠে এল।

সব দেখে শুনে রাজা খুবই প্রীত হলেন। তিনি বললেন, 'বাহ্, এ বেশ ভালো ব্যবস্থা।' তারপর নিজের শ্বেতছত্র দিয়ে বোধিসত্ত্বের পুজো করলেন। বোধিসত্ত্বও রাজাকে অনেক ধর্মকথা শোনালেন।

এই জাতকের মূল কথা: স্বজাতির মঙ্গল সাধনই জীবের ধর্ম।

মহিলামুখ জাতক

বোধিসত্ত্ব এক সময় রাজা ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী ছিলেন। তখন রাজার হাতিশালে সুলক্ষণযুক্ত একটি হাতি ছিল। তার নাম মহিলামুখ। হাতিটি এত শান্ত ও ভব্য ছিল যে রাজা তাকে মঙ্গলহস্তী করেন।

এক রাতে হাতিশালার পাশে কয়েকটি চোর এসে আলাপ করতে বসে। চুরি-চামারির ব্যাপারে তারা শলা পরামর্শ শুরু করল। তারা এইসব কথা বলাবলি করতে লাগল:

'সিঁদ কাটতে হবে ঠিক এখানটায়। পাঁচিলের এই জায়গায় ফোকর বানিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে। চুরির মাল নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার আগে ফোকরটা আরো বড় করে নিতে হবে। চুরি করার

সময় যদি দরকার হয় তাহলে খুন পর্যন্ত করতে হবে। তাহলে আব কাবো সাধ্যি হবে না বাধা দেওয়াব। চোরের অত ভদ্র শান্ত হলে চলে না। তাকে হতে হবে দয়ামাযাহীন।'

এইসব পবামর্শ কবে সে বাতের মত তারা চলে গেল। তাবপর আবাব পরেব বাতে এল। কথাবার্তা সেই এক। ভোব হওযার আগে আবাব চলে গেল। এভাবে বাতের পব রাত চলতে লাগল।

বোজ রাতে এইসব পবামর্শ শুনে মহিলামুখ হাতির মাথাটা গেল বিগড়ে। সে ভাবল, 'এবা আমাকেই উপদেশ দিচ্ছে। আমাকে এবাব দয়ামাযা ছাড়তে হবে। খুনটুন কবতে হবে।' পবেব দিন

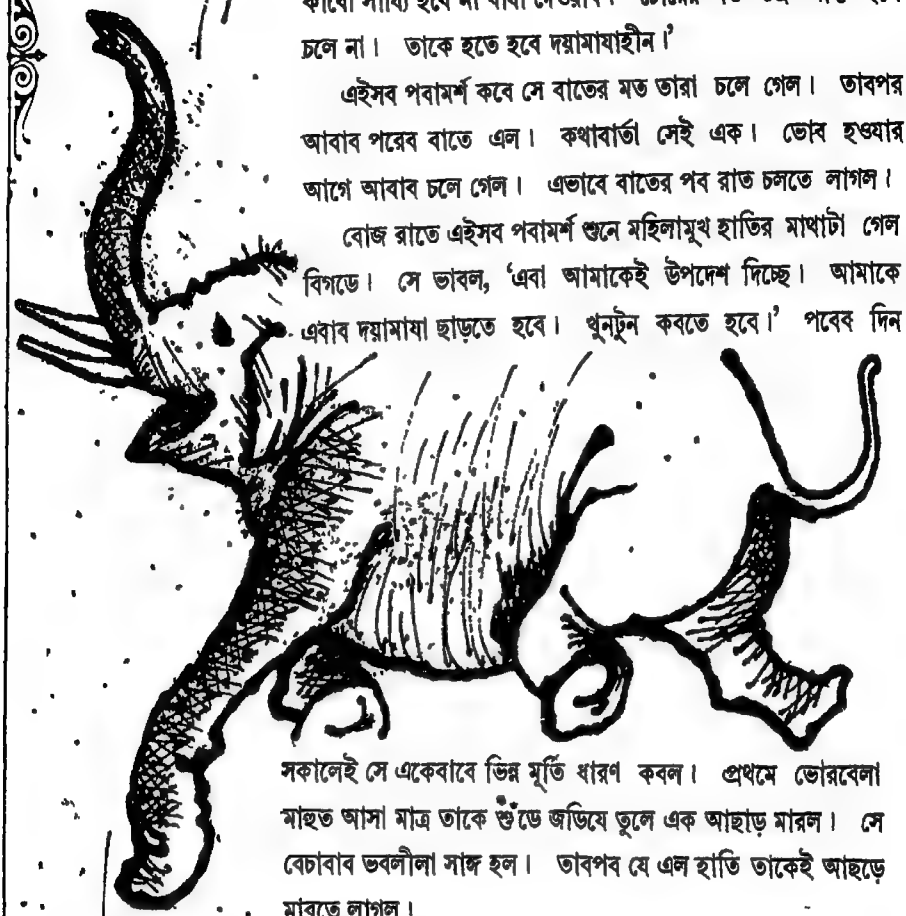

সকালেই সে একেবাবে ভিন্ন মূর্তি ধারণ কবল। প্রথমে ভোরবেলা মাহুত আসা মাত্র তাকে শুঁড়ে জড়িযে তুলে এক আছাড় মারল। সে বেচাবাব ভবলীলা সাঙ্গ হল। তাবপব যে এল হাতি তাকেই আছড়ে মাবতে লাগল।

মহিলামুখ পাগল হযে গেছে শুনে ব্রহ্মদত্ত খুব দুশ্চিন্তায পড়ে গেলেন। মন্ত্রী বোধিসত্ত্বকে বললেন, 'আপনি একবাব দেখে আসুন না হাতিটাব কি হল, হঠাৎ কেন মাথাটা বিগড়ে গেল।'

বোধিসত্ত্ব নানাভাবে মহিলামুখকে খুঁটিযে দেখলেন। শবীবে বোগেব কোন চিহ্ন পেলেন না। তখন ভাবতে লাগলেন হঠাৎ এমন কি হল যে, শান্ত সুন্দব মহিলামুখ এমন দুর্দান্ত হয়ে উঠল। বোধিসত্ত্ব জানতেন হাতি খুব অনুকরণপ্রিয জীব। ফলে তাঁব মনে হল, নিশ্চয়ই বদমাযেশ লোকজন এব ধাবেকাছে বসে খারাপ কথা আলোচনা কবেছে। হাতি ভেবেছে তাকেই ঐসব করতে বলা হচ্ছে।

হাতিশালের লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইদানিং হাতিশালের কাছে কোন বদমায়েশ লোকজনকে ঘুরঘুর করতে দেখেছ কি?'

সে বলল, 'হ্যাঁ কর্তা, কদিন ধরেই কয়েকটা চোর এসে কিসব ফিসফিস করত।'

বোধিসত্ত্ব তখন রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, হাতির শরীরে কোন রোগ নেই। চোরের কথা শুনে তার মাথা বিগড়েছে।'

শুনে রাজা বললেন, 'এখন উপায় কি ভাই বলুন।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'জ্ঞানী ব্রাহ্মণদের ডাকিয়ে আনুন, তাঁরা কয়েকদিন হাতিশালের পাশে ভালো ভালো কথা আলোচনা করলেই মহিলামুখ আবার শান্ত হয়ে যাবে।'

ব্রহ্মদত্ত বললেন, 'আপনিই তার বন্দোবস্ত করুন।'

বোধিসত্ত্ব সেরকম ব্যবস্থা করলেন। ব্রাহ্মণরা আলোচনায় বসে বলতে লাগলেন, 'কাউকে মারধোর করা খুব খারাপ। সবাইকে ভালোবাসতে হবে। ক্ষমা করতে হবে। তবেই না স্বর্গে যাওয়া যাবে।'

এইসব উপদেশ শুনে মহিলামুখ আগের মতই ভাবল, 'এরা আমাকেই উপদেশ দিচ্ছে। এখন থেকে আমি শান্ত সভ্য হয়ে চলব।' আর সত্যি মহিলামুখ আবার আগেকার মতই ভালো হয়ে গেল।

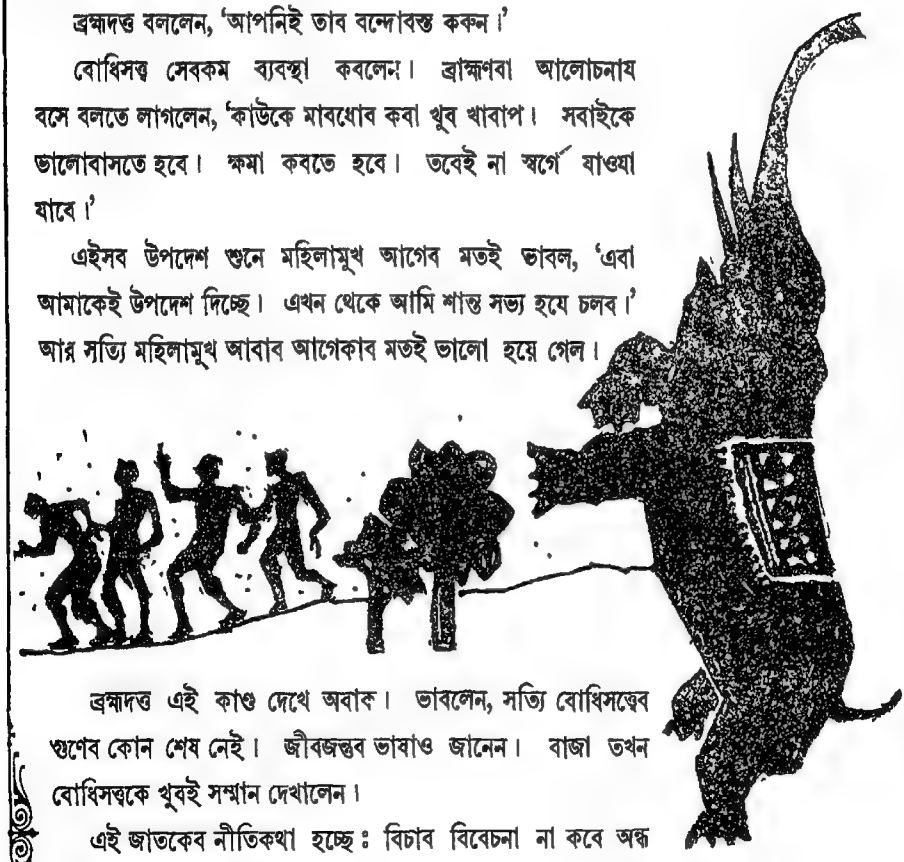

ব্রহ্মদত্ত এই কাণ্ড দেখে অবাক। ভাবলেন, সত্যি বোধিসত্ত্বের গুণের কোন শেষ নেই। জীবজন্তুর ভাষাও জানেন। রাজা তখন বোধিসত্ত্বকে খুবই সম্মান দেখালেন।

এই জাতকের নীতিকথা হচ্ছে: বিচার বিবেচনা না করে অন্ধ অনুকরণ উচিত নয়।

কৃষ্ণ জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার গোরু হয়ে জন্মান। যে গেরস্থের গোয়ালে তাঁর জন্ম হয় তাদের অবস্থা ভাল ছিল না। তাঁরা এক বৃদ্ধার বাড়িতে ভাড়া থাকত। পরে ভাড়া দিতে না পারায় ভাড়ার বদলে বৃদ্ধার হাতে বোধিসত্ত্বকে তুলে দেয়। বৃদ্ধা তাঁকে ছেলের মত ভালোবাসত। ভাত, ফ্যান ছাড়াও ভালো ভালো জিনিস খেতে দিত।

বোধিসত্ত্ব একটু ডাগর হতেই গায়ের রঙ হল কাজল কালো। গাঁয়ের গোরুদের সঙ্গে বোধিসত্ত্বও মাঠে চরতে যেতেন। তাঁর মেজাজ ছিল খুব ঠাণ্ডা। বাচ্চারা তার শিং ধরে টানত, কান ধরে টানত গলা ধরে ঝুলে পড়ত। কিন্তু তিনি কখনো তাদের গুঁতোতেন না।

বোধিসত্ত্বের সঙ্গে ঐ বৃদ্ধার সম্পর্কটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল মা-ছেলের। একদিন বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'আমার মা কত কষ্ট করে। আমি ছেলে হয়ে কিছুই করতে পারছি না। যদি টাকা রোজগার করতে পারি, মার দুঃখ একটু কমে।' এই ভেবে তিনি কাজের খোঁজ করতে লাগলেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব দেখলেন নদীর ধারে পাঁচশ গোরুর গাড়ি নিয়ে একজন লোক হিমসিম খাচ্ছে। বোধিসত্ত্ব তখন মাঠে চরছিলেন। নদী পর্যন্ত এসে গাড়িগুলো আর নড়ছে না। হাজার গোরু একসঙ্গে যুতেও কোন লাভ হচ্ছে না। সবাই মিলে টেনেও একখানা গাড়ি অবধি নড়াতে পারছে না। আশপাশে যেসব গোরু চরে বেড়াচ্ছিল লোকটা তাদের খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সে গোরু চিনত। এক নজর দেখেই বুঝতে পারত কোন্ গোরুটা ভাল জাতের, কোন্‌টা খারাপ জাতের।

বোধিসত্ত্বকে দেখেই বুঝতে পারল. 'এ বেশ ভাল জাতের গোরু। গায়ে জোর আছে। একে দিয়েই আমার কাজ হবে।' তখন সে রাখালকে জিজ্ঞেস করল: 'এই গোরুটা কার? একে গাড়িতে যুতে গাড়ি পার করতে পারলে ভাল মজুরি দেব।'

বাখাল বলল, 'গোরুব মালিক এখানে নেই। আপনি ইচ্ছে করলেই একে গাড়িতে যুতে নিতে পাবেন।'

কিন্তু লোকটা যখন বোধিসত্ত্বেব নাকে দড়ি লাগিযে তাঁকে টানতে গেল, সে এক পা-ও নড়ল না। বোধিসত্ত্ব মনে মনে ঠিক কবেছিলেন, 'মজুবি ঠিক না হলে নড়ছি না।' লোকটি তাঁব মনেব ভাব বুঝে বলল, 'আপনি এই পাঁচশ গাড়ি পাব কবে দিলে গাড়ি পিছু দু টাকা কবে দেব। মানে সবশুদ্ধ হাজাব টাকা দেব।' বোধিসত্ত্ব তখন নিজে থেকেই গাড়িগুলোব দিকে এগিযে গেলেন। তাঁকে একেকবাব একেকটা গাড়িব সঙ্গে যুতে দেওযা হতে লাগল আব তিনি টেনে টেনে সেগুলো পাব কবে দিতে লাগলেন। এভাবে পাঁচশ গাড়িই পাব কবা হযে গেল।

লোকটি বণিক। সে ভাবল দু টাকাব বদলে এক টাকা কবে দিলে পাঁচশ টাকা বাঁচে। তাই সে পাঁচশ টাকা একটা ছোট থলেয পুবে বোধিসত্ত্বেব গলায ঝুলিযে দিল। তখন বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'লোকটা দেখছি এক নম্ববেব ঠগ, চুক্তিমত মজুবি দিচ্ছে না। তাহলে আমিও একে যেতে দেব না।' যেমন ভাবা তেমনি কাজ। বোধিসত্ত্ব গাড়িগুলো আগলে দাঁড়ালেন। তাঁকে এক চুলও নড়ান গেল না।

বণিক বুঝতে পাবল, 'আমি যে চুক্তিমত টাকা দিই নি সেটা বোধ হয গোরুটি টেব পেযেছে।' তখন সে বোধিসত্ত্বেব থলেটিতে আবো পাঁচশ টাকা দিযে বলল, 'এই নিন, আপনাব মজুবিব পুবো টাকা দিযে দিলাম।'

বোধিসত্ত্ব হাজাব টাকা তাব মাকে দিলেন। বৃদ্ধা টাকা পেযে অবাক। 'কোথায পেলি বাবা' বলে সে বোধিসত্ত্বেব দিকে তাকাল। অত কষ্ট কবে বোধিসত্ত্ব তখন বেশ কাহিল। বাখালেব মুখে সব শুনে বৃদ্ধা বলল, 'আহাবে বাছা, তোব বোজগাবে খাব। আমি কোন দিন তো তোকে কিছু বলিনি, কেন তুই অত খাটতে গেলি।' তাবপব সে বোধিসত্ত্বেব শবীবে হাত বোলাতে লাগল। গবম জলে তাঁকে স্নান কবাল। খেতে দিল।

এই গল্পেব নীতিকথা হল: মাযেব সেবা কবা প্রকৃত সন্তানেব কাজ।

কপোত জাতক

বারাণসীর রাজা তখন ব্রহ্মদত্ত। বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্তের আমলে পায়রা হয়ে জন্মান। বারাণসীর নাগরিকদের মধ্যে তখন পায়রা ও

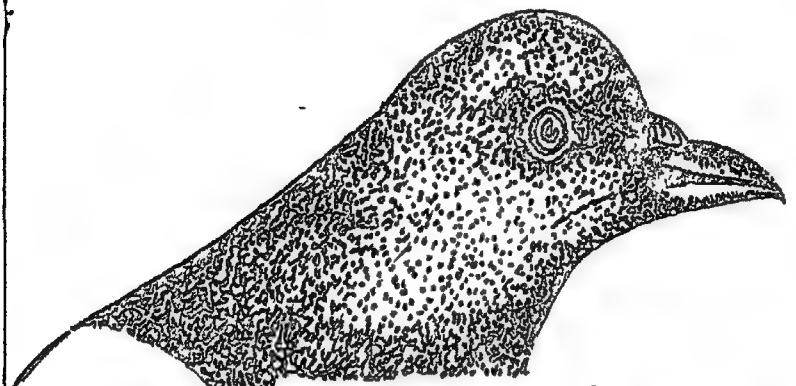

নানা রকম পাখির প্রতি প্রবল প্রীতি ছিল। তারা মনে করত পাখিদের যত্নআত্তি করলে নিজেদের মঙ্গল হবে। পাখিদের থাকার সুবিধের জন্য তারা খড় দিয়ে ঝুড়ি বানিয়ে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখত। বারাণসীর প্রধান বণিকের বাঁধুনিও রান্নাঘরে এরকম একটা ঝুড়ি ঝুলিয়ে রেখেছিল। বোধিসত্ত্ব সেই ঝুড়িটিতে থাকতেন। রোজ সকালে তিনি খাবারের খোঁজে বেরিয়ে যেতেন। ফিরতেন সন্ধ্যাবেলা।

একটি কাক একদিন সেই রান্নাঘরের চালের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। উড়ে যাওয়ার সময় রান্না মাংসের সুগন্ধ পেয়ে তার খুব লোভ হল। কি করে মাংস খাওয়া যায় ভাবতে লাগল। পাশের একটা গাছে বসে রইল। আর ভেবে চলল। সন্ধ্যা হলে বোধিসত্ত্ব ফিরে এলেন। বোধিসত্ত্ব রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। তা দেখে কাক ভাবল এই পায়রাটাই আমার ভরসা। ওর ওপর ভর করলেই আমার মনের আশ মিটবে।

পরের দিন ভোরে রান্নাঘরের কাছে কাকটা অপেক্ষা করছিল। বোধিসত্ত্ব খাবারের খোঁজে উড়তে শুরু করলে সে-ও পিছু পিছু উড়ে চলল। বোধিসত্ত্ব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমার সঙ্গে আসছ কেন ভাই?'

কাক বলল, 'আপনাকে আমাব খুব মনে ধবেছে, এখন থেকে আপনাব চেলা হযে থাকতে চাই।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'সে কি কথা। তুমি এক জিনিস খাও, আমি আরেক জিনিস খাই। আমাব চেলা হলে তোমাব অনেক কষ্ট হবে।'

কাকেব মনে তো দুষ্টু বুদ্ধি। সে বলল, 'খাবাবেব ব্যাপাবটা সত্যিই আলাদা। যখন আপনি আপনাব খাবাবেব খোঁজে থাকবেন সেই ফাঁকে আমি খাবাবটা জুটিযে নেব। শুধু আপনাব সঙ্গে থাকাব অনুমতি দিন।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'বেশ তাই হোক। তবে তোমাকে সাবধানে চলাফেবা কবতে হবে।'

কাককে সাবধান কবে দিযে বোধিসত্ত্ব ঘাসেব বীজ খুঁটে খেতে লাগলেন। কাকও তখন পোকামাকড ধবে খেতে লাগল। নিজেব পেটটি ভবাব পব সে বোধিসত্ত্বেব কাছে এসে বলল, 'প্রভু, আপনি অনেকক্ষণ ধবে খেযে যাচ্ছেন। বেশি খাওযা ভালো নয।' যাই হোক এবপব সন্ধ্যাবেলা বোধিসত্ত্ব বাসায ফিবছেন। সঙ্গে সেই অনুগত কাকটিও আছে।

তাবা বান্নাঘবে ঢুকলে বাঁধুনি ভাবল, 'পাযবাটা দেখছি একটা সঙ্গী জুটিযেছে। তাহলে এব জন্যও একটা ঝুডি ঝুলিযে দিই।' এই ভেবে সে আবেকটি ঝুডি ঝুলিযে দিল। তাবপব থেকে দুজনে ওখানেই বযে গেল।

একদিন বণিকেব বাডিতে মস্ত ভোজেব আযোজন কবা হযেছে। বাঁধুনি বান্নাঘবেব নানা জাযগায প্রচুব মাংস ঝুলিযে বেখেছিল। দেখে কাকেব দারুণ লোভ হল। 'যেভাবে হোক এই মাংস খেতেই হবে,' মনে মনে সে ঠিক কবল।

তারপর সে সারা রাত অসুখের ভান করে কাতরাতে লাগল। ভোরবেলা বোধিসত্ত্ব বললেন, 'চল ভাই, এবার চরতে যাই।' শুনে কাক বলল, 'আজ আপনি একাই যান, আমার কাঁধে বড় ব্যথা হয়েছে।' শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ভাই, কাকের যে কাঁধে ব্যথা হয় কোনদিন শুনিনি। মনে হচ্ছে রান্নাঘরের মাংসের লোভেই তুমি এসব বলছ। এসব বাদ দাও, মানুষের খাবার তোমার খাবার হতে পারে না। আমার সঙ্গে চল, নিজের খাবার খুঁটে খাবে।'

কাক বলল, 'না প্রভু, আমার সত্যি চলার শক্তি নেই।' তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার কাজেই পরিচয় পাওয়া যাবে। তবে লোভে পড়ে কিছু করতে যেও না।'

বোধিসত্ত্ব চলে গেলেন। রাঁধুনি মাংস রান্না করতে লাগল। ভাপ বের করে দেওয়ার জন্য কড়াইয়ের ডালাটা একটু ফাঁক করে দিল। তারপর কড়াইতে ঝাঁঝরি বসিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে একটু বাইরে গেল। কাকও তখন ঝুড়ি থেকে মাথা বের করে দেখল রাঁধুনি বাইরে গিয়েছে।

কাক ভাবল, মাংস খাওয়ার এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ। বেশ বড় দেখে একটা মাংসের টুকরো খাওয়াই ভাল। এই ভেবে সে ঝাঁঝরির কাছে বসতে যেতেই ঝাঁঝরিতে ঝনঝন শব্দ হল। রাঁধুনিও ছুটে এল সঙ্গে সঙ্গে।

কাকের কাণ্ড দেখে সে রেজায় রেগে গেল। রান্নাঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে কাককে ধরে ফেলল। কাকের সমস্ত পালক ছাড়িয়ে নিল সে। তারপর নুন-লঙ্কা বাটা তার সারা শরীরে মাখিয়ে ঝুড়ির ভেতর ফেলে দিল।

বোধিসত্ত্ব ফিরে এসে দেখলেন কাক ছটফট করছে। কাছে গিয়ে তার হাল দেখে বুঝলেন, 'অতি লোভেই কাকের এই অবস্থা।' তারপর ভাবলেন, 'আমারও আর এখানে থাকা উচিত নয়।'

বোধিসত্ত্ব চলে গেলেন। রাঁধুনি কাককে ঝুড়িসমেত ময়লার গাদায় ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এই জাতকের মর্মকথা হল: বেশি লোভ করলে তার ফল পেতেই হবে।

বেদব্ভ জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বারাণসীতে এক ব্রাহ্মণ বাস করত। ব্রাহ্মণ 'বেদব্ভ' মন্ত্রে সিদ্ধ ছিল । এই মন্ত্রের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। তিথি নক্ষত্র দেখে একটি বিশেষ যোগে এই মন্ত্র পাঠ করে আকাশের দিকে তাকালে সাত রকম রত্নের বৃষ্টি হত। বোধিসত্ত্ব লেখাপড়া শেখার জন্য এই ব্রাহ্মণের শিষ্য হন।

একবার বিশেষ দরকারে ব্রাহ্মণকে চেতিয় রাজ্যে যেতে হবে। বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে নিয়ে সে রওনা হল। পথে আছে এক গভীর বন। যেতে হলে সেই বনের মধ্য দিয়েই যেতে হবে। অথচ বনটি মোটেই নিরাপদ নয়। সেখানে 'প্রেষণক' নামে একদল ডাকাত থাকে। ডাকাতরা দলেও ভারি, পাঁচশ। তাদের হামলায় পথিককুলের বিপদের অন্ত ছিল না।

এই ডাকাতদের 'প্রেষণক' বলা হত, কারণ তারা দুজন পথিককে ধরলে একজনকে ছেড়ে দিত বাড়ি থেকে মুক্তিপণের টাকা নিয়ে আসতে। বাবা আর ছেলেকে ধরলে তারা মুক্তিপণ আদায়ের জন্য বাবাকে পাঠাত। মা আর মেয়েকে ধরলে পাঠাত মাকে। দু ভাইকে ধরলে মুক্তিপণ আনার ভার পড়ত বড় ভাইয়ের ওপর। গুরু-শিষ্যকে ধরলে শিষ্যকে পাঠাত।

ডাকাতের দল ব্রাহ্মণ আর বোধিসত্ত্বকে ধরে ফেলল। নিয়ম অনুসারে তারা বোধিসত্ত্বকে ছেড়ে দিল টাকা আনার জন্য। বোধিসত্ত্ব গুরুকে প্রণাম করে বললেন, 'দু-একদিনের মধ্যেই আমি ফিরে আসব। আমি যা বলছি আপনি যদি সেভাবে এই দুদিন থাকেন তাহলে কোন ভয় নেই। আজ রত্ন বর্ষণের যোগ আছে। কিন্তু সাবধান, ভুলেও এ কাজ করতে যাবেন না। যদি করেন তাহলে আপনি তো মরবেনই,

এই পাঁচশ ডাকাতও মারা যাবে।' গুরুকে সাবধান করে দিয়ে বোধিসত্ত্ব মুক্তিপণ আনতে রওনা দিলেন।

এদিকে সন্ধ্যা হল। ডাকাতরা ব্রাহ্মণকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছে। বনের মাথায় তখন পূর্ণিমার চাঁদ। ব্রাহ্মণ নক্ষত্র দেখে বুঝতে পারল 'মহাযোগ' এসে গিয়েছে। সে তখন মনে মনে ভাবল, 'খামোকা এত কষ্ট করছি কেন? ডাকাতরা রত্ন পেলেই আমাকে ছেড়ে দেবে। মন্ত্র পড়লেই রত্ন পাওয়া যাবে। ডাকাতদের মুক্তিপণ চুকিয়ে দিলে যেখানে খুশি যেতে পারব।' এই ভেবে সে ডাকাতদের ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা আমাকে বেঁধে রেখেছ কেন?'

'টাকার জন্য।'

'যদি টাকাই পেতে চাও তাহলে এক্ষুনি বাঁধন খুলে দাও। আমাকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরাও। চন্দন আর মালায় আমাকে সাজিয়ে দাও। তারপর কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও।'

ডাকাতরা ব্রাহ্মণের কথা শুনল। ব্রাহ্মণ যা-যা বলল তারা ঠিক সেভাবে সব কাজই করল। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়ে আকাশের দিকে তাকাতেই রত্নবৃষ্টি শুরু হল। ডাকাতরা পুঁটলিতে রত্ন বেঁধে নিয়ে রওনা দিল। ব্রাহ্মণও তাদের সঙ্গ নিল।

অবশ্য তাদের বেশি দূর যেতে হল না। আরেক দল ডাকাত, সংখ্যায় তারাও পাঁচশ, এসে প্রেষণকদের ঘিরে ফেলল। প্রথম ডাকাত দল দ্বিতীয় ডাকাত দলকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা আমাদের বন্দী করছ কেন?'

তারা জবাব দিল, 'টাকার জন্য।'

তখন প্রথম ডাকাত দল বলল, 'তাহলে এই ব্রাহ্মণকে ধর, উনি আকাশের দিকে তাকালেই রত্ন বৃষ্টি হয়। আমাদের সঙ্গে যেসব রত্ন দেখছ সব উনিই দিয়েছেন।'

দ্বিতীয় ডাকাত দল তখন ব্রাহ্মণকে ধরল, 'আমাদের এক্ষুনি রত্ন দাও।'

ব্রাহ্মণ বলল, 'দেখ ভাই, রত্ন বৃষ্টি সব সময় হয় না, তার জন্য বিশেষ যোগ আছে। যে যোগে রত্ন বর্ষণ হয় তা ফিরে আসতে আবার এক বছর লাগবে। তোমাদের রত্ন দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে।'

শুনে ডাকাতদল বেজায় রেগে গিয়ে বলল, 'চালাকি করছ। এক্ষুনি তুমি প্রেষণকদের রত্ন দিলে, আর আমাদের বেলায় এক বছর অপেক্ষা করতে বলছ?' সঙ্গে সঙ্গে তারা ব্রাহ্মণকে দু টুকরো করে ফেলল। তারপর আক্রমণ করল প্রেষণকদের। প্রেষণকরা মারা গেলে রত্ন নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ লাগল। মারামারি কাটাকাটি করে দুজন ছাড়া সবাই মারা গেল।

ঐ দুজন ডাকাত তখন গ্রামের কাছাকাছি এক জঙ্গলে রত্নগুলো লুকিয়ে রাখল। দুজনেরই খুব খিদে পেয়েছে। এক ডাকাত রত্ন পাহারা দিতে লাগল। আরেক ডাকাত চাল কিনে এনে রান্না চাপাল। রত্ন পাহারা দিচ্ছিল যে সে ভাবল আরেকজনকে শেষ করলে সে অনেক টাকার মালিক হবে। তাই তরোয়াল হাতে নিয়ে তৈরি থাকল, দ্বিতীয় জন ভাত রান্না করে আসা মাত্র তাকে মেরে ফেলবে। দ্বিতীয় ডাকাতও একই কথা ভাবছিল। তাই সে নিজের খাওয়া শেষ করে অপর জনের ভাতে বিষ মিশিয়ে নিয়ে এল। ফল যা হবার তাই হল। দুজনই মরে পড়ে রইল।

বোধিসত্ত্ব ফিরে এসে সব কিছু দেখলেন। গুরুকে দাহ করলেন। আর মনে মনে ভাবলেন, 'নিজের স্বার্থে যা খুশি তাই করলে এ রকমটাই হয়।'

মহাশীল জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার রাজমহিষীর গর্ভে জন্ম নেন। তাঁর নাম রাখা হয় 'শীলবান কুমার।' ষোল বছর বয়সের মধ্যে তিনি সর্ব বিদ্যায় শিক্ষিত হন। তারপর বাবার মৃত্যুর পর রাজা হলেন। রাজ্য পরিচালনায় ধর্ম বুদ্ধির জন্য লোকে তাঁকে মহাশীলবান রাজা বলত।

রাজা মহাশীলবানের এক মন্ত্রী অন্তঃপুরের এক যুবতীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। সেই ঘটনা পাঁচ কান হয়ে রাজার কানেও এল। শীলবান রাজা তখন তাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

সেই মন্ত্রী তখন কাশী ছেড়ে কোশল রাজ্যে গেল। সেখানকার রাজার বেশ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। একদিন সে কোশলরাজকে বলল, 'মহারাজ, কাশী হল এমন এক রাজ্য যার তুলনা করা চলে মৌমাছি-হীন মৌচাকের সঙ্গে। ওখানকার রাজা খুব ভীতু, সামান্য সৈন্য নিয়েও কাশী দখল করা সহজ।'

শুনে কোশলবাজ ভাবল, 'লোকটা নিশ্চয়ই শত্রুর চর। নইলে কাশী অত বড় রাজ্য, আর এ বলে কিনা সামান্য সৈন্য নিয়ে কাশী দখল করা সম্ভব।' তখন কোশলবাজ তাকে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে তুমি কাশীরাজের গুপ্তচর।'

'না, মহারাজ। আমার কথা যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনি সীমান্তের গ্রামে অত্যাচারের জন্য দু-চার জন লোক পাঠান। দেখবেন তারা অত্যাচার করা সত্ত্বেও কাশীরাজ তাদের কোন শাস্তি দেবেন না।'

তার কথা শুনে কোশলরাজের মনে হল হয়ত ও ঠিকই বলছে। পরীক্ষা করার জন্য সে প্রথমে কাশীরাজের সীমান্তের গ্রামে হামলা করার জন্য জনকয়েক লোককে পাঠাল। হামলাকারীরা ধরা পড়ল। কাশীরাজের কাছে তাদের নিয়ে গেলে তিনি বললেন, 'তোমরা অহেতুক গ্রামের লোকগুলোকে মারতে গেলে কেন?'

তারা বলল, 'মহারাজ, আমরা পেটের জন্য ডাকাতি করি।'

তখন কাশীরাজ বললেন, 'অযথা প্রাণীবধ না করে আমার কাছে এলেই পারতে। যাক গে, যা হবার হয়েছে। এই নাও টাকা, এবার থেকে সৎভাবে বাঁচতে চেষ্টা কোরো।'

সেই লোকগুলি ফিরে এসে কোশলরাজকে ঘটনার বিবরণ দিল। কিন্তু কোশলরাজের সন্দেহ দূর হল না। সে আবার এক দল লোক পাঠাল রাজপথে ডাকাতি করতে। এবারও সেই এক ঘটনা ঘটল। কোশলরাজ এবার নিশ্চিত হয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে কাশী আক্রমণ করল।

কাশীরাজের এক হাজার বীর যোদ্ধা ছিল যাদের সঙ্গে লড়াই করে জেতা প্রায় অসম্ভব। মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়লেও তারা পালিয়ে আসার পাত্র ছিল না। শীলবান রাজা আদেশ দিলে চোখের নিমেষে তারা কোশলরাজাকে বন্দী করে আনতে পারত কিন্তু কাশীরাজ প্রাণহানি চান না। তিনি বললেন, 'যুদ্ধে দরকার নেই। আমার জন্য প্রাণহানি হোক আমি চাই না। যার রাজ্য-লোভ আছে সে রাজ্য দখল করুক।'

বিনা বাধায় কোশলরাজ রাজসভায় ঢুকে পড়ল। রাজা আর তাঁর মন্ত্রীদের বন্দী করে আদেশ দিল, 'শ্মশানে গর্ত খুঁড়ে এদের পুঁতে ফেল। শুধু এদের মাথাটা যেন বাইরে থাকে। রাতে শিয়ালকুকুরে এদের খাবে।'

কাশীবাজেব মনে এতেও বাগ দেখা দিল না। মন্ত্রীবাও শীলবান বাজাব অনুগত। তাবা কেউ কোন কথা বলল না। যাই হোক, কাশীবাজ ও তাঁব মন্ত্রীদের তো পুঁতে বেখে গেল কোশলবাজেব চাকববা। এদিকে রাত হয়েছে। শিযালেব দল এল। তখন বাজা আব মন্ত্রীবা চিৎকার কবে তাদেব তাডিযে দিলেন। পব পব তিনবাব তাডানোব পব শিযালদেব ভয় ভেঙ্গে গেল। তাবা বুঝতে পাবল চিৎকার কবা ছাডা এদেব আব কোন ক্ষমতা নেই। তখন একটা শিযাল কাশীবাজকে খেতে এল। কাশীবাজ শিযালেব গলা কামডে ধবলেন। শিযাল ছাডাবাব চেষ্টা কবতে লাগল। তাব নখেব খোঁচায মাটি আলগা হতে লাগল। এক সময কাশীবাজ গর্ত থেকে উঠে এলেন। মন্ত্রীদেবও উদ্ধাব কবলেন।

তখন ঐ শ্মশানে দুটি যক্ষ মবাব ভাগ নিযে ঝগডা করছিল। তাবা কাশীবাজেব কাছে বিচাব চাইল। বাজা বললেন, 'আমি সমান ভাগ কবে দেব ঠিকই, তবে অশুচি হযে আছি, আগে আমাকে স্নান কবাও।' কোশলবাজেব সুগন্ধি জল যক্ষবাই এনে দিল। রাজা

তাতে স্নান করলেন। তারপর রাজাকে তারা কোশলরাজের সুন্দর কাপড়-চোপড়, সুগন্ধি আর ফুল এনে সাজিয়ে দিল। কোশলরাজের খাবার এনে রাজাকে খেতে দিল। কেননা রাজা খিদেয় কাতর ছিলেন। এবার যক্ষরা বলল, 'আর কি করতে হবে বলুন।' রাজা তখন প্রাসাদ থেকে মঙ্গল খড়্গ আনতে বললেন। যক্ষরা তা আনা মাত্র মরাটিকে এক কোপে সমান দু টুকরো করে দিলেন। যক্ষরা মাংস খেয়ে খুশি হল। রাজাকে বলল, 'আদেশ করুন মহারাজ, কি করতে হবে।'

রাজা তখন বললেন, 'কোশলরাজের শোওয়ার ঘরে আমাকে নিয়ে চল।' কোশলরাজ তখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। কাশীরাজ তার পেটে মঙ্গল খড়্গের উল্টো দিক দিয়ে খোঁচা মারলেন। ভয়ে কোশল-রাজ জেগে উঠল। অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'মহারাজ, চারদিকে সৈন্য, দরজা বন্ধ। একটা পিঁপড়েও গলতে পারবে না। এখানে আপনি এই সুন্দর পোশাকে খড়্গ হাতে এলেন কি করে?'

কাশীরাজ তখন শিয়াল ও যক্ষের ঘটনা বললেন। বললেন, কিভাবে এখানে এসেছেন।

সব শুনে কোশলরাজের খুব অনুতাপ হল। সে কাশীরাজকে

বলল, 'নিষ্ঠুর রাক্ষসরা পর্যন্ত আপনার বশ। আপনার গুণ বুঝতে পারে। আর আমি মানুষ হয়েও কিছুই বুঝতে পারলাম না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।' তারপর সে খড়্গ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করল, আর এ রকম খারাপ কাজ করবে না। কাশীরাজের কাছে ক্ষমা চাইল। তারপর কাশীরাজকে রাজশয্যায় শুইয়ে নিজে মাটিতে শুল।

পরের দিন কোশলরাজ রাজসভায় এসে কাশীরাজের কাছে আবার ক্ষমা চাইল। বলল, 'মহারাজ, এবার থেকে আপনিই প্রজাপালন করবেন, শুধু রাজ্য রক্ষার ভার আমি নিলাম।' কোশলরাজ সেই কুচক্রী লোকটাকে শাস্তি দিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে গেল।

কাশীরাজ সিংহাসনে বসে মনে মনে ভাবলেন, 'সত্যি উৎসাহ বজায় রাখতে পেরেছিলাম বলেই না আবার সব ফিরে পাওয়া গেল। আশায় বুক বেঁধে উৎসাহ রাখাই মানুষের কর্তব্য।'

মশক জাতক ৩১

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব ছিলেন বণিক। ব্যবসা করে তিনি রোজগার করতেন।

তখন কাশীর সীমান্তের একটি গ্রামে অনেক ছুতোর থাকত। এক বৃদ্ধ ছুতোর আর তার ছেলে ছুতোরের কাজ করত। বুড়ো ছুতোরের মাথার সব চুলগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিল। চামড়া কুঁচকে গিয়েছিল বয়সের ভারে।

বুড়ো ছুতোর একদিন একটা কাঠ ফালা করে তারপর কাঠটাকে সমান করছিল। এমন সময় একটা মশা এসে তার তামার মত চকচকে টাকে বসল। শুঁড়টো ছুঁচের মত ঢুকিয়ে দিল সেই টাকে। ছুতোরের ছেলে সামনেই বসে ছিল। বুড়ো ছেলেকে ডেকে বলল, 'মাথার ওপর একটা মশা বসে হুল ফোটাচ্ছে। তাড়িয়ে দে না বাবা।' ছেলে বলল, 'বাবা, আপনি একদম নড়বেন না, এক আঘাতে আমি মশার দফা শেষ করছি।'

ঠিক তখন বোধিসত্ত্ব মালপত্র বিক্রি করতে ঐ গ্রামে এসেছেন। ছুতোরের বাড়ির উঠোনে বসলেন। ছুতোর তার ছেলেকে আবার বলল, 'দে না বাবা মশাটা তাড়িয়ে।' ছুতোরের ছেলে তখন 'তাড়াচ্ছি' বলে কুঠার তুলল।

তারপর এক আঘাতে বাবার মাথা দু টুকরো করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ছুতোর মারা গেল।

কাণ্ড দেখে বোধিসত্ত্ব থ। মনে মনে ভাবলেন, 'মূর্খ বন্ধুর থেকে বুদ্ধিমান শত্রু ভালো। আর কিছু না হোক অন্তত সে ফাঁসির ভয়ে মানুষ খুন করবে না।'

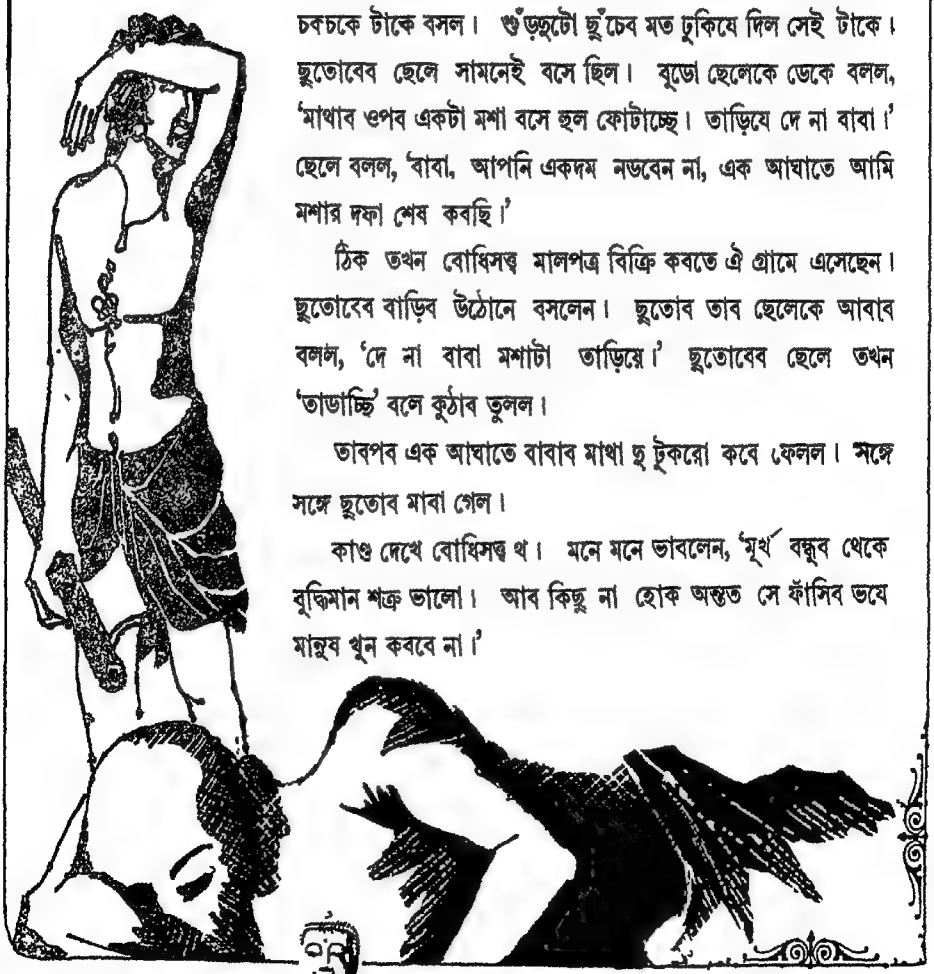

বক জাতক

একবাব বনেব মাঝখানে এক পদ্মসবোববেব পাশে বৃক্ষদেবতা হযে জন্মেছিলেন বোধিসত্ত্ব। পাশে একটি ছোট পুকুব ছিল। গবম-কালে সেই পুকুবেব জল শুকিযে যেত। সেই পুকুবেব মাছদেব দিকে তাকিযে থাকতে থাকতে একদিন এক বক ভাবল, 'কি কবে এদেব ঠকিযে খাওযা যায।' তাবপব খুব দুঃখী দুঃখী ভাব কবে সে পুকুবেব ধাবে বসে বইল।

মাছবা তাকে ঐ বকমভাবে বসে থাকতে দেখে একটু অবাক হল। মাছেবা তাকে জিজ্ঞেস কবল, 'আপনি এবকম মুখ শুকনো কবে বসে আছেন কেন?'

'চিন্তা কবছি ভাই।'

'কিসেব চিন্তা?'

'তোমাদেব কথা ভাবছি।'

'আমাদেব জন্য কিসেব চিন্তা?'

'পুকুবেব জল তো ফুবিযে এল, এখন তোমাদেব কি হবে।'

'কি কবা উচিত বলুন তো?'

'আমাব কথা যদি বিশ্বাস কব, তাহলে বলি বাস্তা একটা আছে। দূবে এক পদ্মসবোবব আছে, সেখানে প্রচুব জল। যদি বাজি থাক তাহলে তোমাদেব সবাইকে এক এক কবে আমি সেখানে বেখে আসতে পাবি।'

'অদ্ভুত কথা শোনালেন আজ। মাছেব দুর্গতি নিযে বক চিন্তিত, এমনটি কিন্তু আগে কখনো দেখা যায নি।'

'তোমবা যদি বিশ্বাস না কব তাহলে যে কোন একজন আমাব সঙ্গে চল। সে ফিবে এসে যদি বলে যে সত্যি এ বকম সবোবব আছে তখন বিশ্বাস কোবো।'

মাছেবা ভাবল এ পবামর্শটা খাবাপ নয। তখন তাবা একটা বুড়ো কানা মাছকে বলল দেখে আসতে। বক তাকে ঠোঁটে কবে

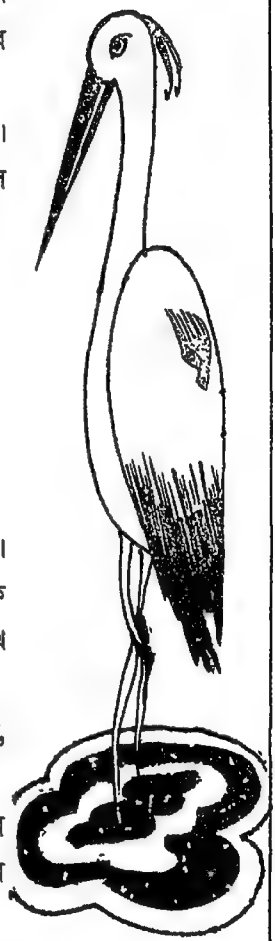

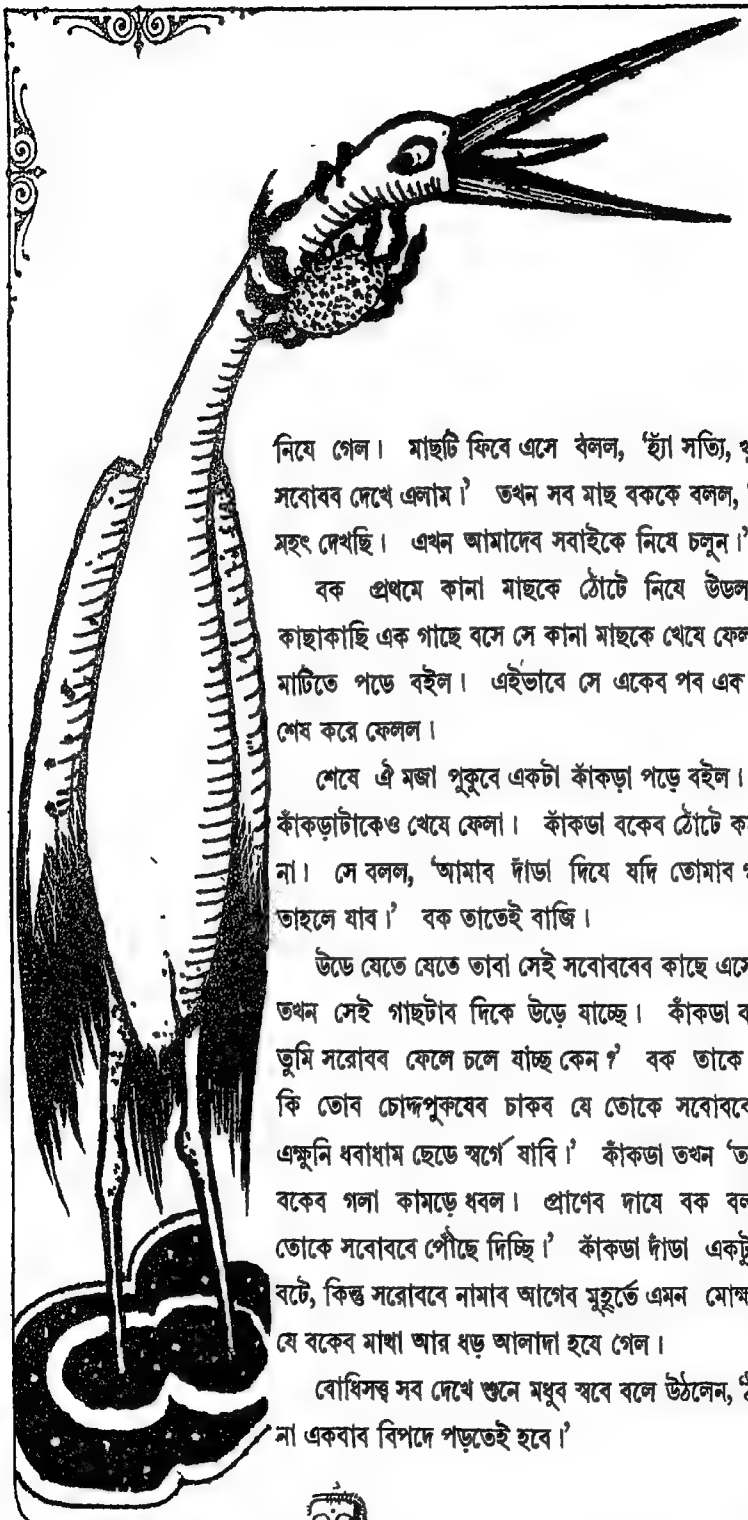

নিয়ে গেল। মাছটি ফিরে এসে বলল, 'হ্যাঁ সত্যি, খুব সুন্দর এক সরোবর দেখে এলাম।' তখন সব মাছ বককে বলল, 'আপনি খুবই মহৎ দেখছি। এখন আমাদের সবাইকে নিয়ে চলুন।'

বক প্রথমে কানা মাছকে ঠোঁটে নিয়ে উড়ল। সরোবরের কাছাকাছি এক গাছে বসে সে কানা মাছকে খেয়ে ফেলল। কাঁটাগুলো মাটিতে পড়ে রইল। এইভাবে সে একের পর এক সব মাছ খেয়ে শেষ করে ফেলল।

শেষে ঐ মজা পুকুরে একটা কাঁকড়া পড়ে রইল। বকের ইচ্ছে, কাঁকড়াটাকেও খেয়ে ফেলা। কাঁকড়া বকের ঠোঁটে করে যেতে চাইল না। সে বলল, 'আমার দাঁড়া দিয়ে যদি তোমার গলা ধরতে দাও তাহলে যাব।' বক তাতেই রাজি।

উড়ে যেতে যেতে তারা সেই সরোবরের কাছে এসে পড়ল। বক তখন সেই গাছটার দিকে উড়ে যাচ্ছে। কাঁকড়া বলল, 'কি ভাই, তুমি সরোবর ফেলে চলে যাচ্ছ কেন?' বক তাকে বলল, 'আমি কি তোর চোদ্দপুরুষের চাকর যে তোকে সরোবরে পৌঁছে দেব? এক্ষুনি ধরাধাম ছেড়ে স্বর্গে যাবি।' কাঁকড়া তখন 'তবে রে।' বলে বকের গলা কামড়ে ধরল। প্রাণের দায়ে বক বলল, 'ছাড় ছাড়, তোকে সরোবরে পৌঁছে দিচ্ছি।' কাঁকড়া দাঁড়া একটু শিথিল করল বটে, কিন্তু সরোবরে নামার আগের মুহূর্তে এমন মোক্ষম কামড় দিল যে বকের মাথা আর ধড় আলাদা হয়ে গেল।

বোধিসত্ত্ব সব দেখে শুনে মধুর স্বরে বলে উঠলেন, 'ঠগীদের একবার না একবার বিপদে পড়তেই হবে।'

শীলবান জাতক

বোধিসত্ত্ব একবাব হিমবন্ত প্রদেশে হাতি জন্ম নেন। রূপোব মত সাদা শবীব। মুখটি বক্ত কম্বলেব মত লাল। এছাডা তাব পা দেখলে মনে হত যেন লাক্ষা দিযে পা বাঙানো হযেছে। বড হলে হিমালয অঞ্চলেব সব হাতি তাঁকে দলপতি কবল। ষাট হাজাব হাতিব তিনি নেতা হলেন। তবু যখন দেখলেন দলের মধ্যে পাপ ঢুকেছে তখন দল ছেডে বনেব মধ্যে একা থাকতে লাগলেন।

একবাব বাবাণসীব এক কাঠুবে বনে কাঠ কাটতে এসে বাস্তা হাবিযে ফেলে। শেষে হতাশ হযে দু হাত ওপবে তুলে কাঁদতে শুরু

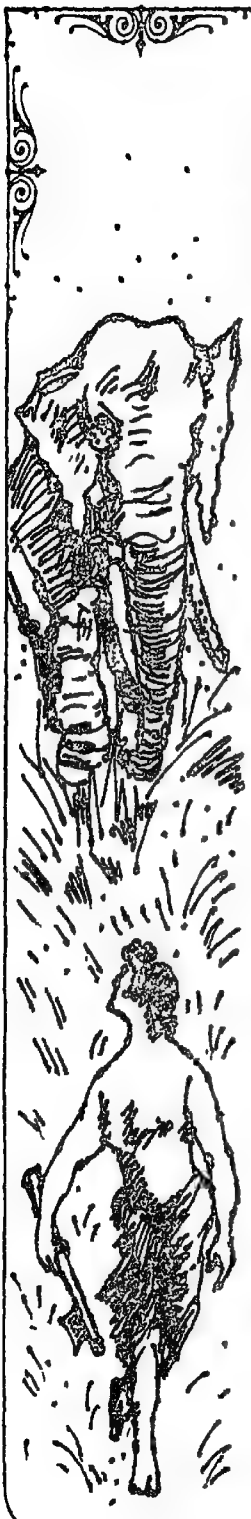

করে। তার কান্না শুনে বোধিসত্ত্ব তার কাছে এলেন। কিন্তু কাঠুরে তাঁকে দেখে পালাতে শুরু করল। বোধিসত্ত্ব তখন থমকে দাঁড়ালেন। কাঠুরে খানিক দূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন বোধিসত্ত্ব আবার তার দিকে এগোতে লাগলেন। তা দেখে কাঠুরে আবার দৌড়তে শুরু করল।

বারকয়েক এরকম হওয়ার পর কাঠুরে বুঝল, এই হাতিটি তাকে আক্রমণ করতে চাইছে না। হয়ত উপকারই করতে চায়। তখন সে সাহস করে দাঁড়িয়ে থাকল। বোধিসত্ত্ব তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন।

'তুমি কাঁদছিলে কেন?'

'প্রভু, আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, প্রাণের ভয়ে কাঁদছিলাম।'

বোধিসত্ত্ব তখন তাকে নিজের ডেরায় নিয়ে গেলেন। নানারকম ফল খেতে দিলেন তাকে। তারপর বললেন, 'ভয় নেই, আমি তোমাকে বনের বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসব।' বোধিসত্ত্ব যখন তাকে পিঠে করে লোকালয়ের দিকে যাচ্ছেন কাঠুরে তখন রাস্তাঘাট খুঁটিয়ে দেখে নিতে লাগল। বন শেষ হলে বোধিসত্ত্ব তাকে বললেন, 'এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যাও, সামনেই গ্রাম আছে, তবে কাউকে আমার ডেরার কথা বোলো না।' বিদায় নিয়ে বোধিসত্ত্ব ফিরে গেলেন।

সেই কাঠুরে একদিন হাড়ের কারিগরদের পাড়ায় ঢুকে পড়ে। সে যখন দেখল মরা হাতির দাঁত থেকে তারা নানারকম জিনিস বানাচ্ছে, তখন একটু অবাক হল।

'আচ্ছা, জ্যান্ত হাতি কেনো তোমরা?'

'কিনি বৈকি, মরা হাতির চেয়ে জ্যান্ত হাতির দাঁতের দামও বেশি।'

'ঠিক আছে, আমি জ্যান্ত হাতির দাঁত এনে দেব।'

এই বলে সে একটা করাত আর খানিকটা খাবার নিয়ে জঙ্গলের দিকে রওনা হল। খুঁজে খুঁজে ঠিক বোধিসত্ত্বের কাছে এসে উপস্থিত।

বোধিসত্ত্ব তাকে দেখে বললেন, 'ফিরে এলে কেন ভাই?'

সে বলল, 'প্রভু, আমি খুব গরীব, আপনার কাছে আপনার দাঁতের খানিকটা টুকরো ভিক্ষে চাইছি। যদি তা বেচে খাওয়া-পরার একটা ব্যবস্থা করতে পারি।'

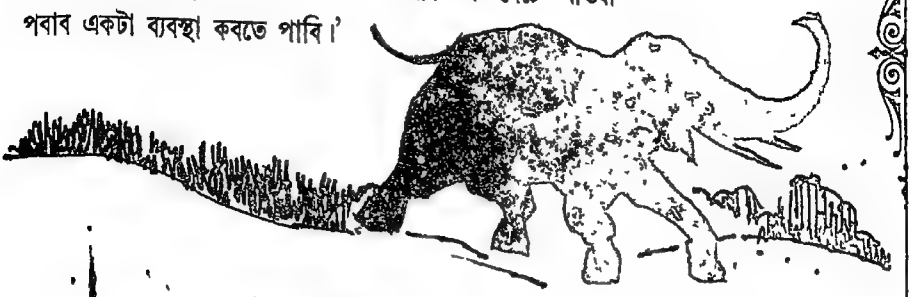

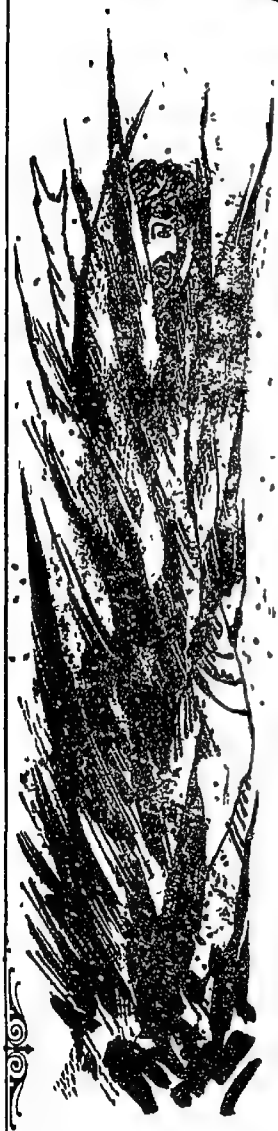

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তোমার কাছে করাত আছে?'

কাঠুরে বলল, 'হ্যাঁ প্রভু।'

বোধিসত্ত্ব তখন পা মুড়ে মাটিতে বসে বললেন, 'বেশ, তাহলে দুটো দাঁত থেকেই কেটে নিয়ে যাও।'

কাটা শেষ হলে বোধিসত্ত্ব শুঁড় দিয়ে টুকরো দুটো তুলে নিয়ে একটু দেখলেন। তারপর বললেন, 'দেখ ভাই, দাঁত দুটোর ওপর আমার কোন মমতা নেই ভের না। তবে সর্বজ্ঞতার জন্য আমি এটুকু ছাড়তে রাজি।'

কাঠুরে তা নিয়ে চলে গেল। বিক্রি করে সে টাকাকড়ি ভালোই পেল। একদিন সে টাকাও ফুরিয়ে গেল। তখন সে আবার বোধিসত্ত্বের কাছে গেল। কান্নাকাটি করে আবার দাঁতের খানিকটা চাইল। বোধিসত্ত্ব এবারও তাকে ফিরিয়ে দিলেন না। এখন তাঁর দাঁত বলতে রইল স্রেফ গোড়াটুকু। দিনকতক পরে সে আবার ফিরে এল। এবার সে ঐ গোড়াটুকুও কেটে নিতে চাইল। বোধিসত্ত্ব বললেন, 'বেশ, নাও।' এবার কেটে নেওয়ার কাজটা একটু কষ্টকর। লোভী কাঠুরে বোধিসত্ত্বের মুখের ভেতর এক পা রেখে, মাংসের টুকরোসমেত হাড়টুকু ছিঁড়ে নিল।

ফিরতি পথে এক মহা দুর্যোগ দেখা দিল। বোধিসত্ত্ব দেখতে পেলেন কাঠুরের পাপে পৃথিবী দু টুকরো হল। সেই ফাটল থেকে আগুন উঠে আসছিল। লাল কম্বলের মত সেই আগুন কাঠুরেকে পেঁচিয়ে নিয়ে তলিয়ে গেল।

এই জাতকের শিক্ষা হল: অকৃতজ্ঞ লোভী লোককে কিছুতেই সন্তুষ্ট করা যায় না।

ইল্লীস জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে ইল্লীস নামে এক বণিক ছিল। এক কথায়, সে ছিল কুবেরের মত ধনী। মণিমাণিক্যে তার ভাণ্ডার পূর্ণ। সম্পদে সে যেমন পরিপূর্ণ ছিল তেমনি মানুষের যত রকম দোষ হতে পারে, সে সবেও সে পরিপূর্ণ ছিল। এ তো গেল চরিত্রের দিক। দেহের দিক থেকে ইল্লীস হল খোঁড়া, কুব্জ, ট্যারা। ধর্মে অশ্রদ্ধা ছিল তার। আর সন্তুষ্টি কাকে বলে সে জানত না। ইল্লীস ছিল হাড়কিপ্টে। কাউকে তো এক পয়সা দিতই না, এমন কি নিজেও এক পয়সা ভোগ করত না। যদিও তার আগের সাত পুরুষ ছিল এর উল্টো। তারা দান-ধ্যান করেছে বিস্তর। ইল্লীসের হুকুমে তাদের দানশালা পুড়িয়ে ফেলা হয়। সে শুধুই জমিয়ে যেত।

ইল্লীস একদিন রাজার সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসছে। এমন সময় দেখল একজন রাস্তার ধারে বসে স্ফূর্তিতে মদ খাচ্ছে। দেখে ইল্লীসেরও খুব মদ খেতে ইচ্ছে হল। কিন্তু ভাবল, 'আমি মদ খেলে আমার বাড়ির লোকেরাও খাবে। তাহলে অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে।' ফলে ইচ্ছেটা সে চেপে গেল।

বাড়িতে ফিবে এসেও কিন্তু ঐ ইচ্ছেটাব কথা ভুলতে পাবল না। তাকে কেমন শুকনো দেখাচ্ছিল। তাব বৌ তাকে জিজ্ঞেস কবল, 'তোমাব কি হযেছে? কেমন শুকনো দেখাচ্ছে।' ইল্লীস তাকে সব কথা খুলে বলল। বৌ বলল, 'তুমি একা আব কতটুকু খাবে, আমি ঘবেই বানিযে দিতে পাবি।' ইল্লীস বলল, 'না, এখানে বানালে অনেকে দেখতে পাবে, এমন কি বাইবে থেকে কিনে এনে এখানে খেলেও ঝামেলা হবে।' শেষে চাকবকে পাঠাল এক ভাঁড মদ কিনে আনতে। তাবপব বাডি থেকে দূবে, একটা ঝোপেব ভেতব বসে মদ খেতে লাগল।

ইল্লীসেব বাবা নিজে প্রচুব দান-ধ্যান কবেছিল। সে দেবলোকে শক্র হযে জন্মায ঐ পুণ্যফলে। ইল্লীস যখন ঝোপেব ভেতব বসে মদ খাচ্ছে তখন শক্রব হঠাৎ ছেলেব কথা মনে হল। সে ভাবল, 'আমি বেঁচে থাকতে যে দান-ধ্যান কবতাম সেসব এখনো চালু আছে কিনা একবাব দেখি।'

ঐশ্ববিক ক্ষমতাব জোবে শক্র টেব পেল ইল্লীস সেসব পাঠ তুলে দিযেছে। ছেলে কুলধর্ম ছেডেছে। দানশালা পুডিযে দিযেছে। শুধু তাই নয, আব কাউকে মদেব ভাগ দেবে না বলে ঝোপেব মধ্যে লুকিযে এখন একা একা মদ খাচ্ছে। শক্র মনে বড কষ্ট পেল। তখন সে ঠিক কবল, 'আমি এক্ষুনি মর্তে যাব। ছেলেকে এমন শিক্ষা দেব যাতে সে নিজেব দোষ বুঝতে পাবে। সৎ কাজে মন দেয। দান-ধ্যান কবে দেবত্ব পেতে পাবে।'

শক্র পৃথিবীতে এল। নিজেব শবীব এমনভাবে সৃষ্টি কবল যে তাকে অবিকল ইল্লীসেব মত দেখাতে লাগল। খোঁডা, কুঁজো,

ট্যাবা—সবই এক রকম। তাবপর সে বাজার কাছে গেল। বাজা তাকে দেখে বললেন, 'বণিক, এই অসময়ে কেন এলে?'

'মহারাজ, আপনার কাছে একটা আর্জি আছে।'

'বল, কি তোমার আর্জি।'

'আপনি জানেন আমাব অনেক সম্পত্তি আছে।'

'হ্যাঁ।'

'দযা কবে এই সম্পত্তি আপনাব ভাণ্ডাবে নিযে নিন।'

'আমাব ভাণ্ডাবে ধনেব অভাব নেই, কেন আমি তোমার সম্পত্তি নিতে যাব।'

'তাহলে অনুমতি দিন আমি ইচ্ছেমত দান-ধ্যান কবি।'

'নিশ্চযই কববে।'

এবপব শক্র ইল্লীসের বাড়িতে গেল। তাকে দেখেই চাকব বাকবেবা ছুটে এল। শক্র তখন তাদেব বলল, 'আমাব মত দেখতে আব কেউ এ বাড়িতে ঢুকতে এলে তাকে পিটিযে ছাতু কববি, বুঝলি।' তাবপব সে প্রাসাদে ঢুকে শোওযাব ঘবে গেল। ইল্লীসেব বৌকে ডাকিযে এনে বলল, 'শোন, এখন থেকে আমবা দান-ধ্যান কবব।'

ইল্লীসের বৌ ভাবল, নিশ্চয়ই মদ খেযে মনটা দবাজ হযেছে। সে বলল, 'স্বামী, তোমার সম্পত্তি তুমি দান কববে, এতে বলাব কি কি আছে।' শক্র তখন বলল, 'তাহলে এক্ষুনি ঢাক পিটিয়ে নগবে জানিযে দাও সোনা-রূপো-মণি-মুক্তো পেতে চাইলে সবাই যেন এক্ষুনি ইল্লীসের বাড়িতে আসে।'

ইল্লীসেব বাড়িতে ধনবত্নেব জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। একজন কবল কি, ইল্লীসেরই একটি বথ টেনে নিল। তাবপব সেই রথে প্রচুব মণি-মাণিক্য তুলে নিয়ে বওনা দিল। সে রথ ছুটিযে যাওযার সময় চিৎকার কবে বলতে লাগল, 'প্রভু ইল্লীসেব একশ বছর আযু হোক। তিনি যা সোনাদানা আমাকে দিলেন তাতে সুখে আমার জীবন কেটে যাবে।'

ঝোপেব ভেতব থেকে ইল্লীসেব কানে গেল কথাটা। সে সঙ্গে সঙ্গে বেরিযে এসে বথ চেপে ধবল, 'এই চোট্টা, আমাব বথ নিযে কোথায পালাচ্ছিস বে।' সে-ও ছাডবাব পাত্র নয। ইল্লীসকে ঘা কতক দিযে বথ নিযে চলে গেল।

মার খেযে ইল্লীসেব নেশা ভেঙ্গে গেছে। তাডাতাড়ি সে বাড়িব দিকে বওনা হল। সেখানে তখন ভিড ফেটে পডছে। ইল্লীস তো দেখে থ। তাব বাডি থেকে কাতাবে কাতাবে লোক সোনাদানা নিযে বেবিযে আসছে। ইল্লীস বাডিতে ঢোকাব চেষ্টা কবতেই চাকববা তাকে ধবে আচ্ছা কবে পিটিযে দিল। ইল্লীস ভাবল হযত বাজাই ধন লুটের আদেশ দিযেছে।

নিরুপায হযে ইল্লীস বাজাব কাছে গেল, 'মহাবাজ, আমি কি দোষ কবেছি। কেন আমাব ভাণ্ডাব লুট কবাব আদেশ দিযেছেন।'

বাজা বললেন, 'সে কি ইল্লীস। কিছুক্ষণ আগে তুমি নিজেই তো এসে দান-ধ্যানেব আদেশ চাইলে, তাবপব ঢাক পিটিযে লোক ডাকালে।'

ইল্লীস বলল, 'মহাবাজ, আপনি কি জানেন না আমি কি বকম কিপ্টে। যে এই দানধ্যান কবছে আপনি দযা কবে তাকে এখানে আনান। বিচাব করুন।'

বাজা তখন দ্বিতীয ইল্লীসকে ডাকিযে আনলেন। দুই ইল্লীসে এমন মিল যে আসল নকল বিচাব কবা অসম্ভব। বাজা বললেন, 'তোমাদেব মধ্যে কে আসল আমি বুঝে উঠতে পাবছি না, এখন কি কবা যায?' আসল ইল্লীস বলল, 'মহাবাজ, আমাব বৌকে ডাকুন।' কিন্তু তাব বৌশত্রুকেই নিজেব স্বামী বলল। শেষ অস্ত্র হিসাবে ইল্লীস তখন নাপিতকে ডাকতে বলল। কাবণ ইল্লীসেব মাথায একটা আঁচিল আছে। একমাত্র নাপিতই তা জানত।

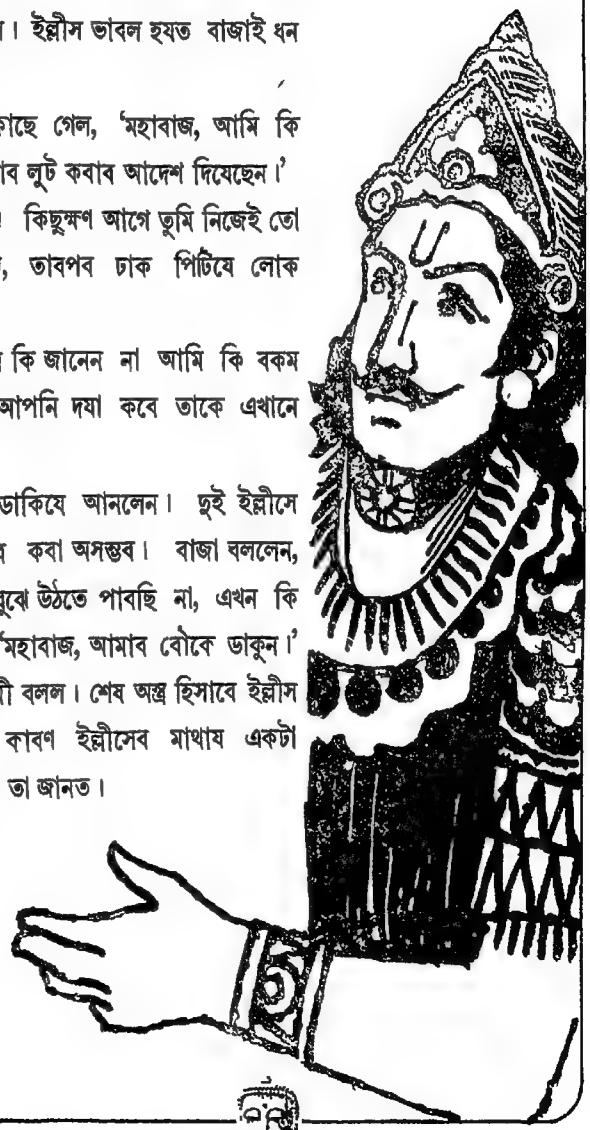

বোধিসত্ত্বই তখন ইল্লীসের নাপিত। রাজা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এদের দুজনের মধ্যে কে আসল ইল্লীস বলতে পারবে?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মাথা দেখে বলতে পারব।' কিন্তু শক্র সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাথায় একটা আঁচিল বানিয়ে ফেলল। ফলে বোধিসত্ত্ব দুজনের মাথা দেখে বললেন, 'না মহারাজ, পারব না, দুজনের মাথাতেই দেখছি আঁচিল আছে।'

বোধিসত্ত্ব এই কথা বলা মাত্র ইল্লীস অজ্ঞান হয়ে গেল। আর শক্র নিজের ঐশ্বরিক শক্তিতে আকাশে উঠে গিয়ে শূন্য থেকে বলল, 'মহারাজ, আমি ইল্লীস নই।'

আস্তে আস্তে ইল্লীসের জ্ঞান ফিরে এলে শক্র তাকে বলল, 'শোন ইল্লীস, তুমি যে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছ তা ছিল

আমার। আমি তোমার বাবা। বেঁচে থাকতে আমি দান-ধ্যান করতাম। তুমি সেসব বন্ধ করেছ। তোমাকে শাস্তি দিতেই আমি এসেছিলাম। যদি কথা দাও দান-ধ্যান করবে তাহলেই তোমার ধনসম্পদ থাকবে। না হলে এক্ষুনি সব হাওয়া হয়ে যাবে। তোমার মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়বে।'

ইল্লীস প্রতিজ্ঞা করল সে দান-ধ্যান করবে। আর তারপর থেকে সত্যি তার চরিত্র বদলে যায়।

এই জাতকের শিক্ষা হল : পৃথিবীতে দানের চেয়ে ধর্ম আর নেই।

ভীমসেন জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেন। বড় হয়ে তক্ষশিলায় এক পণ্ডিতের কাছে বেদ শেখেন। শুধু তাই নয়, ধনুর্বিদ্যায়ও সুপণ্ডিত হন। যেজন্য লোকে তাঁকে বলত 'চুল্ল ধনুর্গ্রহ পণ্ডিত।'

এই জন্মে বোধিসত্ত্ব বেশ বেঁটে আর কুঁজো ছিলেন। শিক্ষা শেষ করার পর রোজগারের রাস্তা দেখতে হবে। নিজের চেহারা নিয়ে বোধিসত্ত্ব তখন একটু ফাঁপরে পড়ে গেলেন। ভাবলেন, 'রাজার কাছে কাজ চাইতে গেলে রাজা আমাকে দূর করে দেবেন।' রাজা হয়ত বলবেন, 'তোমার মত বামন কখনও বীর তীরন্দাজ হতে পারে?'

এইসব সাত-পাঁচ ভেবে, বোধিসত্ত্ব লম্বা চওড়া একটা লোকের খোঁজ করতে লাগলেন। তাঁতীপাড়ায় ঐ রকম একজনের খোঁজ পেলেন। বোধিসত্ত্ব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই, তোমার নাম কি?'

সে বলল, 'আমার নাম ভীমসেন।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'এত সুপুরুষ হয়ে কেন তুমি তাঁতী হয়ে আছ?'

সে বলল, 'কি করব দাদা, উপায় নেই।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'উপায় আছে, তোমাকে আর তাঁতীর কাজ করতে হবে না।'

তারপর বোধিসত্ত্ব তাকে বোঝালেন যে দুজনে মিলে রাজার কাছে যাবেন। ভীমসেন রাজাকে বলবে যে তার মত তীরন্দাজ জম্বুদ্বীপে নেই। রাজা তখন তাকে কাজে বহাল করবেন। বোধিসত্ত্ব ভীমসেনের বালক চাকর হিসেবে থাকবে। যখন সত্যিকারের কাজ আসবে বোধিসত্ত্ব সে কাজ উদ্ধার করবেন।

বোধিসত্ত্ব যেমন যেমন বললেন ভীমসেন ঠিক সেইভাবে চলল। রাজা তাকে দু হাজার টাকা মাস মাইনেয় চাকরি দিলেন। যখন যেমন কাজ পড়ে বোধিসত্ত্ব তা করে দেন।

কিছুদিন পরে বনের একটা বাঘ মানুষখেকো হয়ে উঠল। তার অত্যাচারে সবাই অস্থির। রাজা ভীমসেনকে বাঘ মারতে বললেন। ভীমসেন বোধিসত্ত্বকে বলল। বোধিসত্ত্ব তাকে বুদ্ধি দিলেন, 'দেখ, আমি যাব না। কিন্তু একটা ফন্দি বলে দিচ্ছি। দু হাজার তীরন্দাজকে তুমি বাঘের গুহার সামনে পাঠাও। নিজে গভীর বনে ঢুকবে না। পাশে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকবে। বাঘটা বেরোলে লোকে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে। তুমি তখন ঝোপের ভেতর থেকে একটা লতা নিয়ে বেরিয়ে এসে বলবে, 'কে মারল রে! আমি ভেবেছি লতা দিয়ে বেঁধে বাঘটাকে গোরুর মত টানতে টানতে নিয়ে যাব, আর তোরা কিনা বাঘটাকে মেরে ফেললি। বল কে মেরেছিস।' তখন সবাই ভয় পেয়ে যাবে। তোমাকে বলবে, 'প্রভু, দয়া করে এ কথা রাজাকে বলবেন না।' এদিকে রাজা জানবে তুমিই বাঘ মেরেছ।'

বোধিসত্ত্বের পরামর্শে ভালো ফল হল। ভীমসেন বিস্তর টাকাকড়িও পেল। কিছুদিন পরে বুনো মোষ মারার পালা এল। সে যাত্রাও ভীমসেন বোধিসত্ত্বের বুদ্ধিতে সফল হল। কিন্তু টাকাকড়ি আর মান সম্মান পেয়ে ভীমসেনের মাথা বিগড়ে গেল। সে বোধিসত্ত্বকে অবহেলা করতে লাগল। তাকে খারাপ খারাপ কথা বলল।

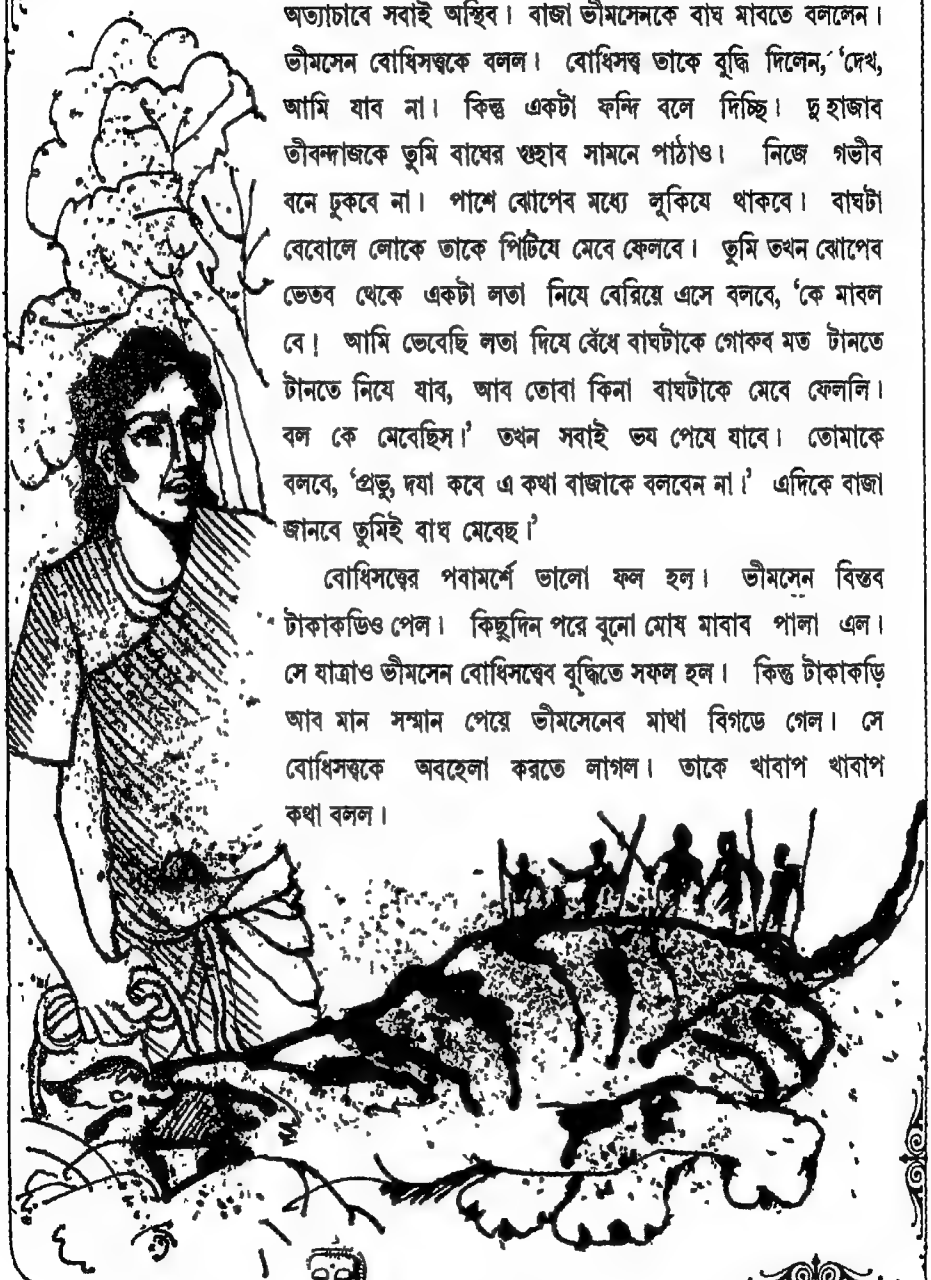

কিছুদিন পরে বারাণসী আক্রমণ করল এক শত্রু রাজা। ব্রহ্মদত্ত আবার ভীমসেনকে তলব করলেন। ভীমসেন ভাবল, 'আমি নিজেই শত্রু শেষ করব।' কিন্তু বোধিসত্ত্ব টের পেলেন ভীমসেন একা গেলে মারা পড়বে। কাজও হাসিল হবে না। তখন বোধিসত্ত্বও রথের পিছনে উঠলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে ঢুকে ভীমসেনের বীরত্ব কর্পূরের মত উড়ে গেল। ভয়ে সে যায় যায়। বোধিসত্ত্ব তখন তাকে হাতির পিঠ থেকে নামিয়ে বাড়িতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। আর বীর বিক্রমে শত্রুরাজকে আক্রমণ করলেন। শেষে তাকে বন্দী করে নিয়ে এলেন। এবার সকলে বোধিসত্ত্বের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। রাজাও জানলেন প্রকৃত বীর কে।

এই জাতকের মর্মকথা হল : নিজের গরিমা মূর্খে প্রচার করে।

শীল মীমাংসা জাতক

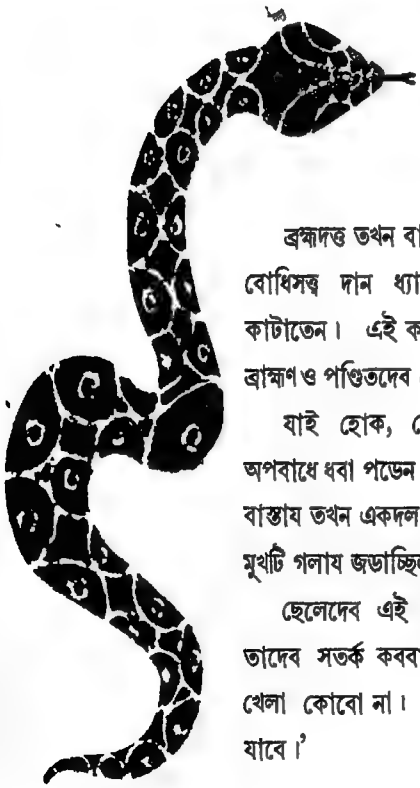

ব্রহ্মদত্ত তখন বারাণসীর রাজা। আর বোধিসত্ত্ব তাঁর পুরোহিত। বোধিসত্ত্ব দান ধ্যান করতেন, নানারকম সৎ কাজে তিনি দিন কাটাতেন। এই কারণে ব্রহ্মদত্ত তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। অন্য সব ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের থেকে বোধিসত্ত্বকে একটু বেশিই খাতির করতেন।

যাই হোক, বোধিসত্ত্ব একবার রাজভাণ্ডার থেকে টাকা চুরির অপরাধে ধরা পড়েন। রাজার সেপাইরা তাঁকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় তখন একদল ছেলে বিষধর সাপ নিয়ে খেলা করছিল। সাপের মুখটি গলায় জড়াচ্ছিল। সাপের লেজ ধরে খেলছিল।

ছেলেদের এই বিপজ্জনক খেলা দেখে বোধিসত্ত্ব ভয় পেলেন। তাদের সতর্ক করবার জন্যে বললেন, 'দেখ বাবা, এভাবে সাপ নিয়ে খেলা কোরো না। সাপ খুব ভয়ঙ্কর। কামড়ালে সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে।'

তারা এ কথা শুনে মোটেই ভয় পেল না। বরং হাসতে হাসতে বলল, 'ঠাকুর, আমাদের এই সাপটা খুব সভ্য। পোষা সাপ। খারাপ কাজ ভুলেও করে না। তুমি রাজার পুরুত হয়ে রাজার টাকা চুরি করেছ বলে সেপাইরা তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের এই সাপটা তোমার চেয়ে অনেক ভালো।'

বোধিসত্ত্ব এ কথা শুনে ভাবলেন, 'সাপকেও লোকে ভদ্র শান্ত বলে যদি সে না কামড়ায়। মানুষের তো কথাই নেই। মানুষ হয়ে জন্মেও আমি সেই গুণ হারিয়েছি। পৃথিবীতে দেখছি শীলতাই শ্রেষ্ঠ গুণ।'

বোধিসত্ত্বকে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হলে রাজা সেপাইদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কাকে ধরে এনেছ?' সিপাইরা বলল, 'মহারাজ, এই ব্রাহ্মণ রাজভাণ্ডার থেকে টাকা চুরি করেছে।' রাজা বললেন, 'তাহলে একে নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত শাস্তি দাও।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমি দেখতে চেয়েছিলাম আমি যে সম্মান পেয়ে আসছি তার কারণ কি। সে কি আমার বংশ গৌরবের জন্য, না কি নিজেরই কোন গুণের জন্য। আজ বুঝলাম শীলতার জন্যই আমি

সম্মান পেয়েছি।'

এরপর বোধিসত্ত্ব রাজাকে জানালেন যে তিনি আর রাজ্যে থাকতে চান না। বিষয়-বাসনার বাইরে থাকতে চান। তারপর বোধিসত্ত্ব প্রব্রজ্যা নিলেন।

এই জাতকের মর্মকথা হল : শীলতাই শ্রেষ্ঠ গুণ।

কুহক জাতক

এক গ্রামে এক ধূর্ত সাধু থাকত। এ ঘটনাও ব্রহ্মদত্তের আমলের বারাণসীর। ঐ গ্রামের জমিদার সাধুর ভড়ং দেখে ভুলে যায়। সে সাধুর জন্য একটি কুটির বানিয়ে দেয়। সাধু যাতে রোজ পেট ভরে ভালোমন্দ খেতে পারে জমিদার তার পাকা ব্যবস্থা করে রেখেছিল। জমিদারের বাড়ি থেকে সাধুর জন্য রোজ খাবার-দাবার পাঠান হত।

সাধুর ওপর জমিদারের ছিল অগাধ বিশ্বাস। আশপাশের গ্রামে একবার খুব দস্যুর উৎপাত শুরু হল। জমিদার তখন একশ সোনার মোহর এনে সাধুর কুটিরের মধ্যে গর্ত করে পুঁতে রাখল।

সাধুকে বলল, 'প্রভু, আপনি একটু নজর রাখবেন।' শুনে সাধু বলল, 'দেখ বাছা, আমরা তপস্বী, আমাদের এসব কথা বলতে হয় না। পরের জিনিসে আমাদের কক্ষনো লোভ হয় না।' জমিদার সাধুর কথায় আরও ভরসা পেল। সাধুকে ভূয়সী প্রশংসা করে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে গেল।

ধূর্ত সাধু তখন মনে মনে হিসেব কষে দেখল, 'এই মোহরগুলো দিয়ে একজনের সারাটা জীবন আরামে আয়েসে কাটতে পারে।' দিনকতক মনে মনে ভেবে একদিন সে গর্ত খুঁড়ে মোহরগুলো তুলে নিল। পরে রাস্তার ধারে এক জায়গায় আবার মোহরগুলো পুঁতে রাখল। কয়েকদিন চুপচাপ সেই কুটিরেই থেকে গেল।

কয়েকদিন পরে জমিদারের বাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারল। তারপর জমিদারকে বলল, 'বাছা, অনেকদিন ধরে তোমার অন্ন ধ্বংস করছি। এক জায়গায় অনেকদিন থাকলে তপস্বীদের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। অথচ তপস্বীদের পক্ষে তা করা ঠিক নয়। ঠিক করেছি এবার অন্য জায়গায় চলে যাব।' জমিদার তাকে বহু অনুরোধ করল। কিন্তু সাধু তার সঙ্কল্পে অটল। তখন জমিদার বলল, 'আপনি যদি একান্তই থাকতে না চান, তাহলে আর

কি-ইবা বলব। বেশ, যেখানে যেতে চাইছেন যান।' এই বলে জমিদার তাকে গ্রামের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল।

কিছুদূর যাওয়ার পর সাধু ভাবল, 'এই জমিদারটাকে একটু ঠকানো যাক।' তখন সে জটার মধ্যে এক টুকরো খড় গুঁজে নিয়ে আবার জমিদারের কাছে ফিরে এল। জমিদার তাকে দেখে বলল, 'এ কি বাবা, আপনি ফিরে এলেন যে!' তখন সাধু বলল, 'দেখ বাবা, তপস্বীরা যা দান হিসেবে পায়নি তা তারা নিয়ে যেতে পারে না। তাই এই খড়গাছা তোমাকে ফেরৎ দিতে এসেছি।' জমিদার বলল, 'আপনি খড়গাছা ফেলে দিন।' আর ভাবল, 'সত্যি কি মহাপুরুষ! পরের কুটোটি পর্যন্ত নিতে চান না!' সাধুর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রণাম করল। ভক্তি গদগদভাবে বিদায় দিল।

বোধিসত্ত্ব তখন বাণিজ্য করতে করতে ঐ গ্রামে এসে উঠেছেন। তাঁর কানে এই মহত্ত্বের বিবরণ এল। তখন তাঁর কেমন সন্দেহ হল। তিনি জমিদারের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা মশাই, আপনি ঐ সাধুর কাছে কখনও কিছু গচ্ছিত রেখেছিলেন কি?'

'হ্যাঁ। আমি ওঁর কাছে একশ সোনার মোহর রেখেছিলাম।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি গচ্ছিত ধন নিয়ে আসুন।'

জমিদার কুটিরে ছুটে গেল। শত খোঁড়াখুঁড়ি করে সে একটিও মোহর পেল না। ফিরে এসে বোধিসত্ত্বকে বলল, 'না মশাই, পেলাম না।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আপনার মোহর ঐ সাধুই নিয়ে পালিয়েছে। চলুন তাকে ধরি।'

সাধু বেশিদূর যেতে পারে নি। তল্লাসি করতেই মোহর বেরিয়ে পড়ল। ভণ্ড সাধু বেধড়ক মার খেল।

এই জাতকের মর্মকথা হল: ভণ্ড দেখিয়ে চিরকাল কাউকে বোকা বানানো যায় না।

তৈলপাত্র জাতক

বোধিসত্ত্ব একবাব বাবাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তেব ছেলে হয়ে জন্মান। অবশ্য বাজাব ছেলে ছিল একশটি। বোধিসত্ত্ব সকলেব ছোট। আস্তে আস্তে তিনি বড হলেন। তাঁব বিচাববুদ্ধিও খুব প্রখব হল।

বোধিসত্ত্ব একদিন মনে মনে ভাবলেন, 'আমাব এত ভাই, ফলে এদেশে আমাব বাজা হবাব বোধ হয কোন সম্ভাবনাই নেই। তবু

একবাব ভিক্ষুদেব জিজ্ঞেস কবে দেখি।' পবেব দিন ভিক্ষুবা বাজ-বাডিতে এলেন। হাত-পা ধুযে খেতে বসলেন তাঁবা। খাওয়াব পব যখন তাঁরা বিশ্রাম কবছেন বোধিসত্ত্ব তখন তাঁদেব কাছে গেলেন। পাশে বসে কথাটা জিজ্ঞেস কবলেন।

ভিক্ষুবা বললেন, 'দেখ বাজকুমাব, সত্যি কথা বলতে কি এখানে তুমি কোনদিনই বাজা হতে পাববে না। তবে এখান থেকে দু হাজাব যোজন দূবে তক্ষশিলা। তুমি যদি সাত দিনেব মধ্যে ওখানে যেতে পাব তাহলে সাত দিনের মাথায তুমি সেখানকাব বাজা হবে।'

ভিক্ষুবা তাবপব বোধিসত্ত্বকে সতর্ক কবাব জন্য আবো খুলে বললেন: 'বাস্তায এক ঘোব বন আছে। সে বন বড মাবাত্মক। তবে ঘুবপথেও যাওযা যায়, কিন্তু তাতে বেশি সময লাগবে। ঐ বনে যক্ষদেব আড্ডা। যক্ষিনীবা বাস্তাব ধাবে মাযাবলে গ্রাম বানিযে বেখেছে। পথিকদেব মিষ্টি কথায ভুলিযে তাদের খুন কবে বক্ত খেযে ফেলে। তাদেব হাত এডিযে যাওযা খুবই কঠিন। মানুষ যা যা ভালোবাসে, মাযা দিযে তাবা সে সবই তৈরি কবতে পাবে। যাই হোক যদি তাদেব দিকে না তাকাও তাহলেই বাঁচতে পাববে।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'নিশ্চয় পাবব। তবু আপনারা এমন কিছু মন্ত্র পড়া আমাকে দিন যাতে মনের জোর ধরে রাখতে পারি।' ভিক্ষুরা তাঁকে মন্ত্রপূত বালি আর সুতো দিলেন। বোধিসত্ত্ব বাবা-মাকে প্রণাম করলেন। তারপর সঙ্গী আর অনুচরদের বললেন, 'রাজ্য পাওয়ার জন্য আমি এখন তক্ষশিলায় যাচ্ছি। তোমরা এখানেই থাক।' সে কথা শুনে তাঁর পাঁচজন অনুচর বলল, 'রাজকুমার, আমরাও যাব।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তোমরা পারবে না।'

অনুচররা জবাব দিল, 'কেন প্রভু?'

বোধিসত্ত্ব যক্ষিনীদের ব্যাপারটা তাদের বুঝিয়ে বললেন। কিন্তু তাতেও তাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল না। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'বেশ চল, তবে ভুল করলেই মারা যাবে মনে থাকে যেন।'

রাস্তায় যক্ষিনীদের সেই মায়া গ্রাম। তারা বোধিসত্ত্বের সঙ্গীদের একে একে লোভের ফাঁদে ফেলল। বোধিসত্ত্ব এখন একা। সঙ্গীরা যক্ষিনীদের মোহে প্রাণ হারিয়েছে। এক যক্ষিনী কিন্তু বোধিসত্ত্বকে ছাড়ল না। সে তাঁর পিছু পিছু যেতে লাগল। একদল কাঠুরে সুন্দরী যক্ষিনীকে জিজ্ঞেস করল, 'ঐ লোকটা তোমার কে?' যক্ষিনী বলল, 'উনি আমার স্বামী।' কাঠুরেরা তখন বোধিসত্ত্বকে ডেকে বলল, 'তুমি কেমন লোক হে, পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে ফেলে ঘোড়ার মত ছুটছ!' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'এ মোটেই আমার স্ত্রী নয়, ঐ রাক্ষুসী, আমার পাঁচ বন্ধুকে খেয়েছে, এখন আমাকে খেতে চায়।' শুনে তারা বলল 'সত্যি, পুরুষ মানুষের রাগ বড় সাংঘাতিক না হলে নিজের বৌকে রাক্ষুসী বলে!'

যেতে যেতে যক্ষিনী মায়াবলে মা হল। কোলে কচি শিশু নিয়ে সে বোধিসত্ত্বের পিছু পিছু চলল। রাস্তায় আরও কয়েকজন লোক বোধিসত্ত্বকে একই প্রশ্ন করল। আর তিনি সেই এক জবাবই দিলেন। এভাবে তক্ষশিলায় পৌঁছে বোধিসত্ত্ব এক পান্থশালায় উঠলেন। বোধিসত্ত্বের শক্তিকে অমান্য করতে না পারায় যক্ষিনী ভেতরে ঢুকতে পারল না। সে ছেলে কোলে করে বাইরে বসে রইল।

তক্ষশিলার রাজা তখন বাগান বিহারে যাচ্ছিলেন। যক্ষিনীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিলেন তার স্বামী আছে কিনা। যক্ষিনী বলল, 'ঐ যে আমার স্বামী।' কিন্তু বোধিসত্ত্ব বললেন, 'এ যক্ষিনী, আমার পাঁচ সঙ্গীকে খেয়েছে।' যক্ষিনী তখন বলল, 'হায়, রাগের মাথায় পুরুষ কি না বলে।' রাজা লোক মারফৎ সব শুনে বললেন, 'তাহলে ওকে নিয়ে এস।'

যক্ষিনী রাজার পাটরাণী হল। আর রাতে যক্ষপুরে গিয়ে সমস্ত যক্ষদের ডেকে আনল। পরের দিন সকাল কেটে যাওয়ার পরও রাজপ্রাসাদের দরজা খোলে না। প্রজারা তখন দরজা ভেঙ্গে ফেলল। ভেতরে ঢুকে শুধু হাড়ের স্তূপ দেখতে পেল। তখন তাদের বোধিসত্ত্বের কথা মনে পড়ল। 'তাহলে তো সে ঠিকই বলেছিল। রাজা রূপের মোহে রাক্ষুসীকে এনে সব শেষ করল, নিজেও শেষ হল।'

সবাই মিলে তারপর আলোচনা করে ঠিক করল, ঐ নির্লোভ মানুষটিই আমাদের রাজা হওয়ার উপযুক্ত। পান্থশালায় গিয়ে তারা বলল, 'প্রভু, আপনিই আমাদের রাজ্যের রাজা হোন।'

কটাহক জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার বণিক জন্ম নেন। যথেষ্ট বিত্ত এবং প্রভাব ছিল তাঁর। সেই সময় বোধিসত্ত্বের একটি ছেলে জন্মায়। একই দিনে তাঁর চাকরেরও একটি ছেলে হয়।

দুটি শিশু একসঙ্গে বড় হতে থাকে। বোধিসত্ত্বের ছেলে যখন পড়তে যেত, চাকরের ছেলেও তার সঙ্গে যেত। দুজনে একসঙ্গে খেলাধুলো করত। এভাবে চাকরের ছেলে নেহাৎ মূর্খ না হয়ে বেশ কিছুটা লেখাপড়া শিখল। কালে কালে সে বেশ বলিয়ে কইয়ে হল। দেখতেও মন্দ নয়। তাকে কটাহক নামে ডাকা হত। বণিকের ভাঁড়ার দেখার কাজে তাকে লাগান হল।

কটাহকের মনে খুবই চিন্তা। সে কেবল ভাবে, জীবনটা ভাঁড়ার সামলাতেই কেটে যাবে। সারাটা জীবন তাকে চাকর হয়ে থাকতে হবে। ব্যাপারটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। সে তখন এক ফন্দি বের করল। সীমান্তে বোধিসত্ত্বের এক বন্ধু থাকে। সে-ও বড় বণিক। তার একটি মেয়েও আছে। কটাহক ভাবল, 'প্রভুর সই জাল করে একটা চিঠি তৈরি করতে হবে।'

সে করলও তাই। নিজেই একটা চিঠি লিখল: 'আমার ছেলে অমুক তোমার কাছে যাচ্ছে। তোমার-আমার পরিবারকে এক সুতোয় বাঁধতে চাই। দুই পরিবারের মধ্যে পারিবারিক সম্বন্ধ হলেই তা সম্ভব। আমার ইচ্ছে, আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও। তারপর তারা তোমার কাছে থাকুক। সময় সুযোগ বুঝে আমি যাব।'

কটাহক চিঠিটায় শীলমোহর নকল করে ছাপ দিল। বোধিসত্ত্বের সই জাল করল। তারপর ভাঁড়ার থেকে যত খুশি জিনিসপত্র নিয়ে একদিন রওনা দিল।

সীমান্তের গ্রামে গিয়ে কটাহক সেখানকার বণিককে প্রণাম করল। বণিক জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথা থেকে আসছ বাছা।'

'বারাণসী থেকে।'

'তুমি কার ছেলে?'

'বারাণসীর বণিকের।'

'কি জন্যে এসেছ বাছা?'

'এই চিঠিটা পড়লেই সব জানতে পারবেন।'

বণিক চিঠি পড়ে মহা খুশি। সে কটাহকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিল। কটাহকের নিজের মূর্তি কিন্তু গোপন রইল না। সে যা খায়, যা পরে সব কিছুকেই বলে খারাপ। সব সময় সব কিছুরই খুঁত ধরত সে।

ওদিকে অনেকদিন কটাহককে দেখতে না পেয়ে বোধিসত্ত্বের দুশ্চিন্তা হল। তিনি চারদিকে কটাহকের খোঁজে লোক পাঠালেন। একজন সীমান্ত অঞ্চলে গিয়েছিল। সে ফিরে এসে বোধিসত্ত্বকে কটাহকের কুকীর্তি জানাল।

সব শুনে বোধিসত্ত্ব গেলেন রেগে। কটাহককে শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি সীমান্তের দিকে চললেন। বোধিসত্ত্বের সীমান্ত যাত্রার কথা পাঁচ কান হয়ে কটাহকের কানে এল। সে তখন বেশ ঘাবড়ে গেল।

মনে মনে সে আরেক ফন্দি আঁটল। প্রথমে দিনকতক সে শুধু বলে বেড়াতে লাগল, আজকালকার ছেলেরা বাপ-মাকে দেখে না। তাদের যত্ন-আত্তি করে না। হাত-মুখ ধোয়ার জল এগিয়ে দেয় না। খেতে দিয়ে বাতাস করে না। পা টিপে দেয় না ইত্যাদি, ইত্যাদি। চাকররা যেসব কাজ করে সে সেগুলোর কথাই বেশি করে বলত।

একদিন সে শুনল বোধিসত্ত্ব কাছাকাছি এসে গিয়েছেন। তখন সে বণিকের অনুমতি নিয়ে নিজেই এগিয়ে গেল বোধিসত্ত্বকে সম্বর্ধনা জানিয়ে নিয়ে আসতে। আসার পথে চাকর হিসেবে তাঁর খুব খিদমত করল। আর প্রার্থনা করল, 'প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। এখানে আমার যেটুকু মান সম্মান হয়েছে দেখবেন তা যেন থাকে।' বোধিসত্ত্ব তখন তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।'

বন্ধুর বাড়িতে বোধিসত্ত্ব যে কদিন ছিলেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করলেন না যে, কটাহক তাঁর ছেলে নয়। ফিরে যাওয়ার সময় বোধিসত্ত্ব বন্ধুর মেয়েকে ডেকে গোপনে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ছেলে তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে তো?' এর জবাবে মেয়েটি বলে, 'ওর সবই ভালো, কিন্তু খাবার-দাবার নিয়ে বড় বায়নাক্কা, সব কিছুই খারাপ বলে।' বোধিসত্ত্ব তখন তাকে একটি ছড়া শিখিয়ে দিলেন।

বোধিসত্ত্ব চলে যাওয়ার পর কটাহকের গুমোর গেল আরো বেড়ে। এখন তার আর কোন ভয় নেই। একদিন বণিকের মেয়ে তাকে খেতে দিলে সে আবার বলতে শুরু করল, 'কি ছিরি রান্নার, এ জিনিস মুখে দেওয়া যায়?' বণিকের মেয়ে তখন বিড়বিড় করে সেই ছড়াটি বলে গেল :

বিদেশী, গুমোর কত বোঝা যাবে
মনিব যদি আসে আবার দেখা যাবে।
কটাহক, অত দেমাক কিসের তোমার,
যা দিচ্ছি চুপ করে খাও সোনা আমার।

কটাহক বুঝতে পারল বোধিসত্ত্ব তাকে সবই বলে দিয়েছেন। সেই থেকে সে আর টুঁ শব্দটি করত না।

বিড়াল জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার ইঁদুর হয়ে জন্মান। তবে সচরাচর ইঁদুররা যত ছোট হয় দেখতে বোধিসত্ত্ব মোটেই তা ছিলেন না। বরং তাঁর শরীর বেশ বড়সড় ছিল। সব সময় শ-শ ইঁদুর সঙ্গে নিয়ে তিনি বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন।

ইঁদুরের দল একবার এক লোভী শেয়ালের নজরে পড়ে গেল। শেয়াল মনে মনে ভাবল, 'যে করেই হোক এদের খেতে হবে।' শেয়াল ইঁদুরের গর্তের পাশে সূর্যের দিক মুখ করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে বাতাস গিলতে লাগল।

বোধিসত্ত্ব খাবারের খোঁজে বেরিয়ে শেয়ালকে দেখে ভাবলেন, 'মনে হচ্ছে এই শিয়াল বেশ সাত্ত্বিক।' তিনি শিয়ালকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মশাই, আপনার নাম কি?'

'ধার্মিক।'

'মাটিতে চার পা দিয়ে না এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

'আমি চার পা দিয়ে দাঁড়ালে পৃথিবী সেই ভার বইতে পারবে না।'

'মুখটা ফাঁক করে রেখেছেন কেন?'

'আমি ভাত খাই না, শুধু বাতাস খাই, সেজন্যে হাঁ করে আছি।'

'সূর্যের দিকে মুখ করে আছেন কেন?'

'সূর্যকে নমস্কার করার জন্য।'

বোধিসত্ত্বের আর কোন সন্দেহ রইল না। ইনি নিশ্চয়ই একজন মহান ধার্মিক। তারপর থেকে বোধিসত্ত্ব ইঁদুরদের নিয়ে রোজ শিয়ালকে প্রণাম করতে যেতেন। ইঁদুররা শিয়ালকে প্রণাম করে যখন ফিরত তখন শেষের ইঁদুরটাকে ধরে শিয়াল খেয়ে ফেলত।

এইভাবে চলতে লাগল। ইঁদুররা একদিন দেখল গর্তটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। তাদের সন্দেহ হল। আগে এই গর্তে তারা

গাদাগাদি করে থাকত। আর এখন এত ফাঁকা লাগছে কেন। তারা বোধিসত্ত্বকে ব্যাপারটা জানাল। বোধিসত্ত্বের তখন ঐ শিয়ালের ওপর সন্দেহ হল।

পরের দিন প্রণাম করতে যাওয়ার সময় বোধিসত্ত্ব সকলের শেষে রইলেন। তিনি সতর্ক ছিলেন। শিয়াল যেই তাঁকে ধরতে গেল তিনি এক লাফে শিয়ালের গলা কামড়ে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালের ভবলীলা শেষ হল।

অসম্প্রদান জাতক

একবার মগধের রাজগৃহ নগরে বোধিসত্ত্ব বণিককুলে জন্ম নেন। তিনি তখন মগধ রাজের শ্রেষ্ঠী ছিলেন। বোধিসত্ত্বের প্রচুর সোনা-রূপা ধনদৌলত ছিল বলে তাঁর নাম হয় 'শঙ্খ শ্রেষ্ঠী'। বারাণসীতে তখন বোধিসত্ত্বের মতই ধনবান আরেক বণিক ছিল। তার নাম পিলিয় শ্রেষ্ঠী। দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। একদিন পিলিয় তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বারাণসী থেকে পায়ে হেঁটে মগধে এল। হঠাৎ তার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পিলিয় মহা সমস্যায় পড়ে বন্ধুর কাছে এসেছে। শঙ্খ তাকে মহা সমাদরে রাখলেন। তারপর একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার এই হঠাৎ আসার কারণ কি বল।'

'আমি খুব বিপদে পড়েছি।'

'খুলে বল।'

'বাণিজ্যে এমন ক্ষতি হয়েছে যে আমি এখন সর্বস্বান্ত।'

'অত দুশ্চিন্তা কোরো না।'

'এখন তুমি সাহায্য না করলে আর দাঁড়াতে পারব না।'

'নিশ্চয়ই করব।'

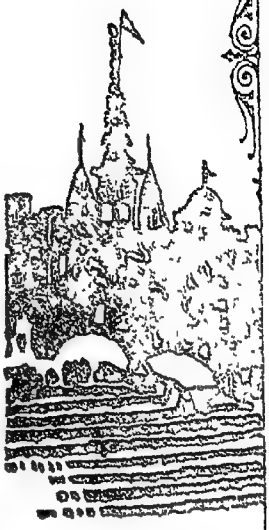

শঙ্খ তখন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দাস-দাসী সমান দু ভাগে ভাগ করে এক ভাগ পিলিয়কে দিলেন। পিলিয় সেই সম্পত্তি নিয়ে বারাণসীতে ফিরে গেল। সুখে দিন কাটাতে লাগল।

কিছুদিন পরে শঙ্খের খুব বিপদ দেখা দিল। হঠাৎ বাণিজ্যে এমন লোকসান হল যে, শঙ্খশ্রেষ্ঠীর পরনের কাপড়টুকু ছাড়া নিজের বলতে আর কিছুই রইল না। অনেক ভেবে তিনি ঠিক করলেন বন্ধুর কাছে যাবেন। বন্ধুর বিপদে তিনি তাকে দেখেছেন, বন্ধু কি আর তাঁকে দেখবে না।

স্ত্রী আর সঙ্গীদের নিয়ে শঙ্খ বারাণসীর দিকে রওনা হলেন। বারাণসীতে পৌঁছে ভাবলেন স্ত্রীকে এভাবে হাঁটিয়ে না নিয়ে গিয়ে পান্থশালায় রেখে যাই। তারপর বন্ধু পাল্কী পাঠিয়ে তাঁর স্ত্রীকে প্রাসাদে আনাবেন। এই ভেবে স্ত্রীকে এক পান্থশালায় রেখে লোকজন নিয়ে তিনি রওনা হলেন।

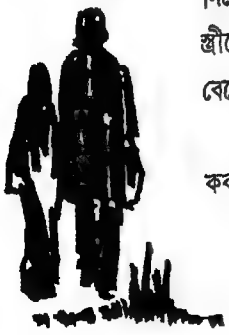

পিলিয় শঙ্খকে দেখে মোটেই খুশি হল না। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ কি মনে করে?'

'তোমাকে দেখতে এলাম।'

'উঠেছ কোথায়?'

'বাসা ঠিক হয়নি এখনও, স্ত্রীকে ধর্মশালায় রেখে এসেছি।'

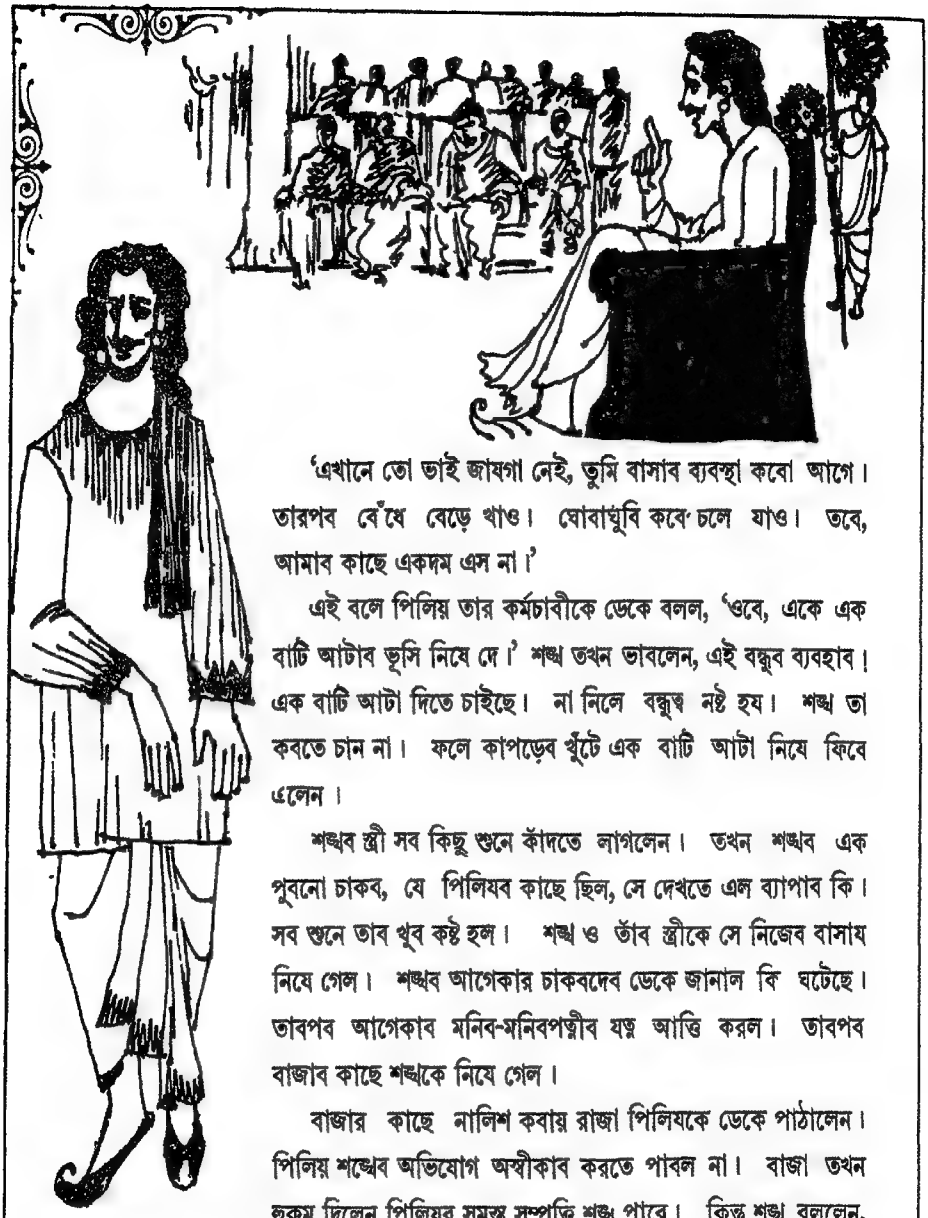

'এখানে তো ভাই জায়গা নেই, তুমি বাসার ব্যবস্থা করো আগে। তারপর বেঁধে বেড়ে খাও। ঘোরাঘুরি করে চলে যাও। তবে, আমার কাছে একদম এস না।'

এই বলে পিলিয় তার কর্মচারীকে ডেকে বলল, 'ওরে, একে এক বাটি আটার ভূসি নিয়ে দে।' শঙ্খ তখন ভাবলেন, এই বন্ধুর ব্যবহার! এক বাটি আটা দিতে চাইছে। না নিলে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়। শঙ্খ তা করতে চান না। ফলে কাপড়ের খুঁটে এক বাটি আটা নিয়ে ফিরে এলেন।

শঙ্খর স্ত্রী সব কিছু শুনে কাঁদতে লাগলেন। তখন শঙ্খর এক পুরনো চাকর, যে পিলিয়র কাছে ছিল, সে দেখতে এল ব্যাপার কি। সব শুনে তার খুব কষ্ট হল। শঙ্খ ও তাঁর স্ত্রীকে সে নিজের বাসায় নিয়ে গেল। শঙ্খর আগেকার চাকরদের ডেকে জানাল কি ঘটেছে। তারপর আগেকার মনিব-মনিবপত্নীর যত্ন আত্তি করল। তারপর রাজার কাছে শঙ্খকে নিয়ে গেল।

রাজার কাছে নালিশ করায় রাজা পিলিয়কে ডেকে পাঠালেন। পিলিয় শঙ্খের অভিযোগ অস্বীকার করতে পারল না। রাজা তখন হুকুম দিলেন পিলিয়র সমস্ত সম্পত্তি শঙ্খ পাবে। কিন্তু শঙ্খ বললেন, 'না মহারাজ, আমি আমার পাওনা টাকা পেলেই খুশি হব।'

রাজার আদেশে বোধিসত্ত্ব তাঁর আগেকার সম্পত্তি ফিরে পেলেন। মগধে গিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

এই জাতকের বাণী হল : বন্ধু চেনা যায় বিপদে।

সুবর্ন হংস জাতক

বোধিসত্ত্ব একবাব এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নেন। এক সময় তাঁব বিযেব বযস হল। বিযেব পব বোধিসত্ত্ব পব পব তিনটি মেযেব বাবা হলেন। নন্দা, নন্দবতী ও সুন্দবীনন্দা তাদেব নাম। বোধিসত্ত্বেব অকালে মৃত্যু হয। ফলে তাঁব তিন মেযে আব স্ত্রীকে পবেব বাড়িতে কাজ কবে খেতে হচ্ছিল।

ওদিকে মৃত্যুব পবে বোধিসত্ত্ব সোনাব হাঁস হযে জন্মালেন। তিনি জাতিস্মব বলে আগেব জন্মেব সব কথাই জানতে পাবলেন। তখন তিনি ভাববাব চেষ্টা কবলেন, 'এখন আমাব স্ত্রী আব মেযেবা কি কবে সংসাব চালাচ্ছে।' ভাববাব চেষ্টা কবতেই তিনি পবিষ্কাব দেখতে পেলেন, তাবা কত কষ্ট কবে বেঁচে আছে।

সোনাব হাঁসেব সমস্ত পালকগুলোই পেটা সোনাব। তাই তিনি ভাবলেন, 'আমি যদি ওদেব একটা কবে পালক দিই, তাহলে ওদেব সংসাবেব হাল ফিবে যাবে।' এই ভেবে তিনি তাদেব কুঁড়েব পাশে উড়ে গিযে বসলেন। বোধিসত্ত্বকে দেখে তাঁব মেযেবা জিজ্ঞেস কবল, 'প্রভু, আপনি কোথা থেকে আসছেন?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমি তোমাদেব বাবা, মৃত্যুব পব সোনাব হাঁস হযে জন্মেছি। বোজ আমি তোমাদেব একটা কবে সোনার পালক দেব। সেটা বিক্রি কবে তোমবা আবামে থাকতে পাববে। লোকেব বাড়িতে আব তোমাদেব কাজ কবতে যেতে হবে না।' এই বলে তিনি তাদেব একটা সোনাব পালক দিয়ে উড়ে চলে গেলেন।

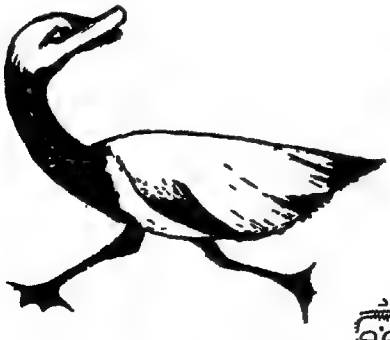

তারপর থেকে বোধিসত্ত্ব মাঝে মাঝে এসে ওদের একটা করে সোনার পালক দিয়ে যেতে লাগলেন। ফলে মা আর তিন মেয়ের অবস্থা ফিরে গেল। একদিন মা মেয়েদের ডেকে বলল, 'দেখ, তোদের বাবা তো এখন পশুপাখির নামান্তর। এদের স্বভাব বোঝা কঠিন। হয়ত আসাই বন্ধ করে দিল। তার চেয়ে এক কাজ কর, এবার এলে আমরা তার সমস্ত পালক ছিঁড়ে নেব।'

পরে বোধিসত্ত্ব এলে তাঁর বৌ তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমার কাছে আসুন।' বোধিসত্ত্ব যাওয়া মাত্র সে বোধিসত্ত্বের সব পালক ছিঁড়ে নিল। কিন্তু বোধিসত্ত্বের অনিচ্ছায় নেওয়া হল বলে পালকগুলো এক মুহূর্তে বকের পালকের মতই সাদা হয়ে গেল।

বোধিসত্ত্ব তখন উড়ে যাবার জন্য ডানা ছড়িয়ে দিলেন। কিন্তু

উড়তে পারলেন না। তাঁর আগের জন্মের স্ত্রী তখন তাঁকে একটা জালার মধ্যে রেখে দিল। রোজ সেখানে তাকে খাবার দাবারও দিত। কয়েকদিন পরে বোধিসত্ত্বের পালক গজাল। কিন্তু সব পালকই সাদা। একদিন তিনি উড়ে চলে গেলেন। আর কখনও তিনি তাঁর মেয়ে-বৌকে দেখতে আসেন নি।

এই জাতকের মর্মকথা হল: বেশি লোভ করলে সব হারাতে হয়।

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার সমুদ্র দেবতা হন। একদিন এক কাক আর তার বউ খাবার খুঁজতে খুঁজতে সমুদ্রের তীরে চলে আসে। তখন অনেকে সমুদ্র পুজো করছিল। ক্ষীর, পায়েস, মাছ, মাংস আর মদ সমুদ্রের তীরে ঢেলে দিচ্ছিল। কাক আর কাকের বউ পুজোর মাছ-মণ্ডা-মিঠাই আশ মিটিয়ে খেল। এমন কি অনেকটা মদও খেয়ে ফেলল।

কাক তখন তার বউকে বলল, 'চল, সমুদ্রে স্নান করি।'

বউ বলল, 'হ্যাঁ, চল। খুব মজা হবে তাহলে।'

নেশার ফূর্তিতে তারা জলে নেমে খুব খেলতে লাগল। ডুব দিয়ে স্নান করতে লাগল। হঠাৎ এক মস্ত ঢেউ এসে কাকের বউকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তখন বড় একটা মাছ খপ করে তাকে ধরে ফেলল। কাকের বউ গেল মাছের পেটে।

কাক জাতক

বেচারা কাক বউকে খুঁজে না পেয়ে সুর করে কাঁদতে শুরু করল। কাকের কান্না শুনে যেখানে যত কাক ছিল ছুটে এল। তারা কাককে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে ভাই?'

কাক বলল, 'পাজি সমুদ্র আমার বউকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।'

শুনে তারা বলল, 'ঠিক আছে, আমরা সবাই মিলে সমুদ্র সেঁচে ফেলব।' সত্যি সত্যি তারা কাজে লেগে পড়ল। ঠোঁটে করে একেকজন জল এনে তীরে ফেলতে লাগল। নুনে মুখ পুড়ে যাচ্ছিল, চোখ লাল হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে তারা একটু জিরিয়ে নেয়, আবার জল সেঁচে ফেলে। এভাবে অনেকক্ষণ কাজ করে গেল। কিন্তু জল এক বিন্দুও কমে না। শেষে তারা হতাশ হয়ে বলল, 'নুন জলে মুখ পোড়ালে কি হবে, জল কমার নাম নেই। এভাবে কিছু হবে না ভাই।'

তখন তারা কাকের বউয়ের কথা বলে বিলাপ করতে লাগল। তার লেজ কত সুন্দর ছিল, সে কি মিষ্টি সুরে ডাকত—এইসব বলে কাঁদতে লাগল। তারপর তারা সমুদ্রকে গালমন্দ করতে লাগল। সমুদ্রদেবতা তখন ভীষণ রূপ ধারণ করে কাকদের সামনে এলেন। ঐ রূপ দেখে কাকরা ভয়ে পালিয়ে গেল। আর ঠিক তখনি এক বিশাল ঢেউ সেখানে আছড়ে পড়ল। ভাগ্যিস কাকরা পালিয়েছিল, নইলে একটা কাকও প্রাণে বাঁচত না।

এই জাতকের শিক্ষা হল : খুব বড়র সঙ্গে লড়াই করা যায় না।

অনুশাসক জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার পাখি হয়ে জন্মান। বড় হয়ে তিনি পাখিদের রাজা হলেন। হাজার হাজার পাখি তাঁকে সব সময় ঘিরে থাকত। একবার তিনি কয়েক হাজার পাখিকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয় পর্বত এলাকায় ঘুরতে যান।

তখন একটি মেয়ে পাখি খাবারের লোভে রাজপথে চরতে শুরু করেছিল। রাস্তায় গাড়ি থেকে ধান, মুগ পড়ে যেত। পাখিটি সেসব দানা খুঁটে খেত। সে মনে মনে ভাবল, 'রাস্তায় খাবার পাওয়া ঢের সোজা। কিন্তু আর সব পাখি এসে পড়লে আমার খাবার কমে যাবে। তাই এমন একটা ফন্দি বের করতে হবে যাতে আর কেউ এখানে চরতে না আসে।'

এইসব সাত-পাঁচ ভেবে সে পাখিদের সাবধান করে দিল, 'খবর্দার, রাজপথে কখনও চরতে যেও না। দিন রাত ষাঁড়গুলো গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যখন-তখন উড়ে গিয়ে বাঁচাও সহজ নয়। যে কোন সময় চাকার তলায় চাপা পড়ে প্রাণ খোয়াতে হবে। তার চেয়ে না যাওয়াই ভালো।'

রোজই সে এভাবে সাবধান করত বলে পাখিরা তার নাম দিয়েছিল অনুশাসিকা। একদিন সে রাজপথে চরছিল এমন সময় শব্দ শুনে বুঝল ঝড়ের বেগে একটা গাড়ি আসছে। সে ভাবল, 'গাড়ি এসে পড়ার আগেই আমি উড়ে যাব। ততক্ষণ খাওয়া যাক।'

এদিকে গাড়িটা নিমেষের মধ্যে এসে পড়ল। সে আর উড়ে যাওয়ার সুযোগ পেল না। গাড়িটা তাকে দু টুকরো করে রেখে গেল। এরপর বোধিসত্ত্ব দেখলেন, সব পাখি ফিরে এসেছে, কিন্তু

অনুশাসিকার দেখা নেই। পাখিরা তখন তার খোঁজে উড়ে গেল। একটু পরেই খবর পাওয়া গেল সে মারা গিয়েছে।

সব শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'সত্যি খুব আফশোষের কথা, যে সবাইকে সাবধান করত, সে নিজেই ঐ বিপদের মধ্যে গিয়ে মারা গেল।'

এই জাতকের শিক্ষা: নিজে সাবধান না হয়ে অন্যকে সাবধান করা কোন কাজের কথা নয়।

বভ্রু জাতক

এককালে কাশীতে এক বিরাট ধনী বণিক ছিল। তার সিন্দুকে ছিল গাদা গাদা সোনা। কালে ঐ বণিকের বংশ একে একে শেষ হয়ে গেল। বণিকের বউয়ের টাকাকড়ির ব্যাপারে খুবই দুর্বলতা ছিল। সে ইঁদুর হয়ে জন্মাল। সে সেই সোনার গাদার ওপর থাকত। ঐ গ্রামে তখন আর কেউ বেঁচে নেই।

সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব ঐ গ্রামে পাথর কাটতেন। সোনার গাদার পাহারাদার ইঁদুর বারবার বোধিসত্ত্বকে দেখে তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ে। ইঁদুর একদিন ভাবল, 'আমার তো এত সোনাদানা, এই লোকটার সঙ্গে ভাগ করে সম্পত্তি ভোগ করলে মন্দ হয় না।' এই ভেবে সে একদিন এক টুকরো সোনা মুখে করে নিয়ে বোধিসত্ত্বের কাছে গেল।

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি সোনা নিয়ে এলে কেন?'

'এটা দিয়ে তুমি নিজের খাবার কিনে আন, আমার জন্যও একটু মাংস এনো।'

তারপর থেকে বোধিসত্ত্ব তাই করতে লাগলেন। রোজই তিনি খাবার কিনে আনেন। ইঁদুরের জন্য মাংস কেনেন। একদিন হল কি, এক বিড়াল ইঁদুরকে চেপে ধরল। ইঁদুর খুব মিনতি করে বলল, 'প্রভু, আমাকে মেরো না।' বিড়াল বলল, 'কেন মারব না, খিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে। মাংস খেতে ইচ্ছে করছে।' ইঁদুর তখন বলল, 'তোমার কি একদিন মাংস খেলেই চলবে, না কি রোজই মাংস খেতে চাও?' বিড়াল বলল, 'রোজ পেলে তবে তো?' ইঁদুর তখন বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিলে রোজ তোমাকে মাংস দেব।' বিড়াল বলল, 'ঠিক তো?' ইঁদুর বলল, 'হ্যাঁ, তুমি দেখতেই পাবে।' এরপর থেকে ইঁদুর তাকে নিজের মাংসের আধখানা দিয়ে দিত।

ইঁদুরের কপালে সুখ নেই। কদিন পরে তাকে আরেক বিড়াল ধরল। ইঁদুর তার সঙ্গেও একই রকম বন্দোবস্ত করল। নিজের খাবার এখন তাকে তিন ভাগ করতে হচ্ছে। এতেও রেহাই নেই। আরও দুটো বিড়াল তাকে ধরল। ফলে মাংস পাঁচ ভাগ করে সে নিজে মোটে এক ভাগ খেতে লাগল।

কম খেয়ে ইঁদুর শুকিয়ে যেতে লাগল। বোধিসত্ত্ব দেখলেন, ইঁদুর বেচারার শরীর অর্ধেক হয়ে গেছে। তিনি এখন তাকে জিজ্ঞেস করে সব কিছু জানতে পারলেন। ইঁদুরকে বললেন, 'এর জন্য তুমি মরতে বসেছ? দেখ, একদিনে সব কটা বিড়ালকে জব্দ করব।'

বোধিসত্ত্ব তখন কাঁচের মত স্বচ্ছ পথ দিয়ে একটা গুহা বানিয়ে দিলেন। ইঁদুরকে বললেন, 'তুমি এর মধ্যে ঢুকে বসে থাক, বিড়ালরা এলে ওদের গালাগালি করবে।' ইঁদুর গুহার ভেতর ঢুকে বসে রইল। প্রথম বিড়াল আসতেই ইঁদুর বলল, 'আজ থেকে মাংস বন্ধ, খেতে হলে নিজের মাংস খা।' রাগে গরগর করে বিড়াল ইঁদুরকে ধরার জন্য লাফ দিল। সঙ্গে সঙ্গে স্ফটিক পাথরে ধাক্কা খেয়ে বিড়ালের মাথা ভাঙল। বিড়ালটা মরে গেল। এইভাবে চারটে বিড়ালই শেষ হল। বিড়ালের দল শেষ হলে ইঁদুর আর বোধিসত্ত্ব সেই সোনা খরচ করে আরামে দিন কাটাতে লাগলেন।

এই জাতকের শিক্ষা হল: সবাইকে সন্তুষ্ট করা যায় না।

আম জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একবার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেন। বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। পরে পাঁচশ শিষ্য নিয়ে তিনি হিমালয় অঞ্চলে তপস্যা করতে যান।

একবার হল কি, হিমালয় অঞ্চলে ভয়ঙ্কর জলের অভাব দেখা দিল। ভয়ানক অনাবৃষ্টি হওয়াতেই ঐ অবস্থা। পশুপাখি জলের তেষ্টায় মর মর। দেখে শুনে এক তপস্বী মনে মনে খুব কষ্ট পেলেন। তখন তিনি একটি গাছ কেটে কাঠের মগ বানালেন। তারপর তাতে জল ভরে পশুপাখিকে পান করতে দিলেন। জল পেয়ে তারা বেঁচে গেল।

তখন আশপাশ ও দূরদূরান্ত থেকে দলে দলে পশুপাখি ছুটে আসতে লাগল। তপস্বীও ক্রমাগত তাদের জল যুগিয়ে যেতে লাগলেন। ফলে তপস্বীর নাওয়া-খাওয়ারও সময় রইল না। তবু

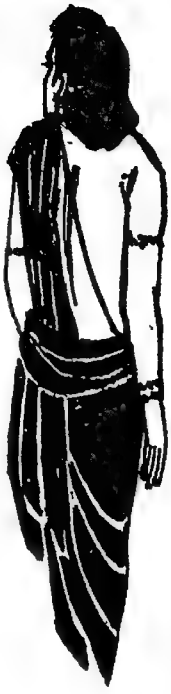

তিনি নিজে না খেয়ে থেকেও পশুপাখির জীবন বাঁচাতে জলদান করে চললেন।

পশুপাখির দলও সমস্যাটা বুঝতে পারল। তারা ভাবল 'কি করে প্রভুর জীবন বাঁচাই।' ভেবে ভেবে ঠিক করল, এবার থেকে জল খেতে আসার সময় তারা তপস্বীর জন্য ফল নিয়ে আসবে। তারপর ফল আনা শুরু হল। এত ফল আসতে লাগল যে আশ্রমের পাঁচশ তপস্বী খেয়েও তা ফুরোতে পারল না।

দেখেশুনে বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'সৎ কাজের ফল সত্যি অদ্ভুত। এক তপস্বীর সৎ কাজের ফলে পাঁচশ তপস্বী আশ্রমে থেকেই খাবার পাচ্ছে।'

একপর্ণ জাতক

একবার বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেন। বয়স হলে তিনি শাস্ত্র পাঠ নিতে তক্ষশিলায় যান। সেখান থেকে বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র শিখে বাড়ি ফিরে আসেন। কিছুদিন বাবা-মার সেবা করলেন। তারপর তাঁদের মৃত্যু হলে তপস্বী হয়ে হিমালয়ে চলে গেলেন। সেখানে ধ্যান করে তিনি সিদ্ধি লাভ করলেন।

মাঝে একবার টক আর নুনের খুব দরকার হল। নিজের কাছে যা ছিল সবই ফুরিয়ে গিয়েছিল। ফলে তাঁকে লোকালয়ে আসতে হয়। তখন তিনি বারাণসীতে এসে রাজার বাগানে থাকতে শুরু করলেন। বারাণসীতে আসার পরের দিন বোধিসত্ত্ব তাপস বেশে নগরে ঢুকলেন। ঘুরতে ঘুরতে চলে এলেন রাজার বাড়ির কাছে।

জানলা দিয়ে রাজা হঠাৎ তাঁকে আসতে দেখলেন। বোধিসত্ত্বের হাঁটা চলার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যে রাজা চোখ ফেরাতে পারলেন না। রাজা মনে মনে ভাবলেন, 'এই তপস্বী খুব ধীর স্থির, সামনের দিকে তাকিয়ে সাবধানে কি সুন্দর হাঁটছেন। দেখে মনে হচ্ছে ধর্ম এঁর হৃদয়ে বিরাজ করছে।' এইসব ভেবে রাজা মন্ত্রীকে বললেন, 'ঐ তপস্বীকে এখানে নিয়ে এস।' মন্ত্রী বোধিসত্ত্বকে ভেতরে আসার অনুরোধ করলে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'দেখুন, আমি হিমালয়ে থাকি, রাজভবনে যাই না।'

মন্ত্রী ফিরে এসে রাজাকে বলল, 'উনি ভেতরে আসবেন না।' শুনে রাজা বললেন, 'আমাদের তো কোন ধর্মগুরু নেই, বল, আমরা

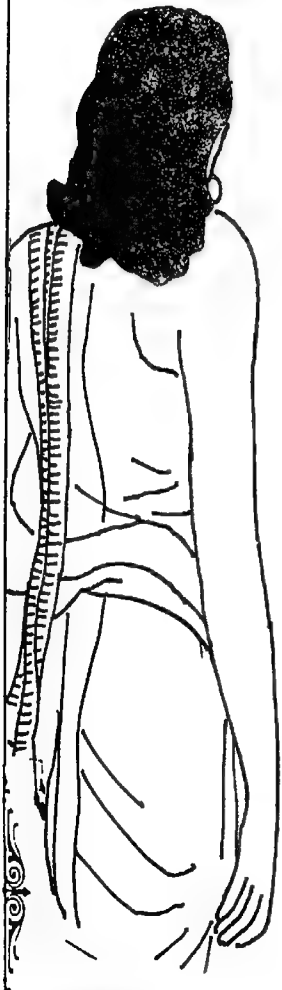

তাঁকে ধর্মগুরু করতে চাই।' মন্ত্রী ফিরে বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করল। তারপর আর্জি পেশ করল, 'প্রভু, আপনি আমাদের ধর্মগুরু হোন।'

এরপর বোধিসত্ত্ব রাজভবনে এলেন। রাজা তাঁকে সোনার সিংহাসনে বসতে দিলেন। নিজের খাবার তাঁর সঙ্গে ভাগ করে খেলেন। খাওয়া দাওয়ার পর বোধিসত্ত্ব জিরোচ্ছিলেন, রাজা তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রভু, আপনার আশ্রম কোথায়?'

'হিমালয়ে।'

'এখন কোথায় যাবেন?'

'আমি এখন বর্ষাকালটা কোথায় কাটাব ভাবছি।'

'দয়া করে আমার বাগানেই থাকুন না।'

'বেশ, তাই হবে।'

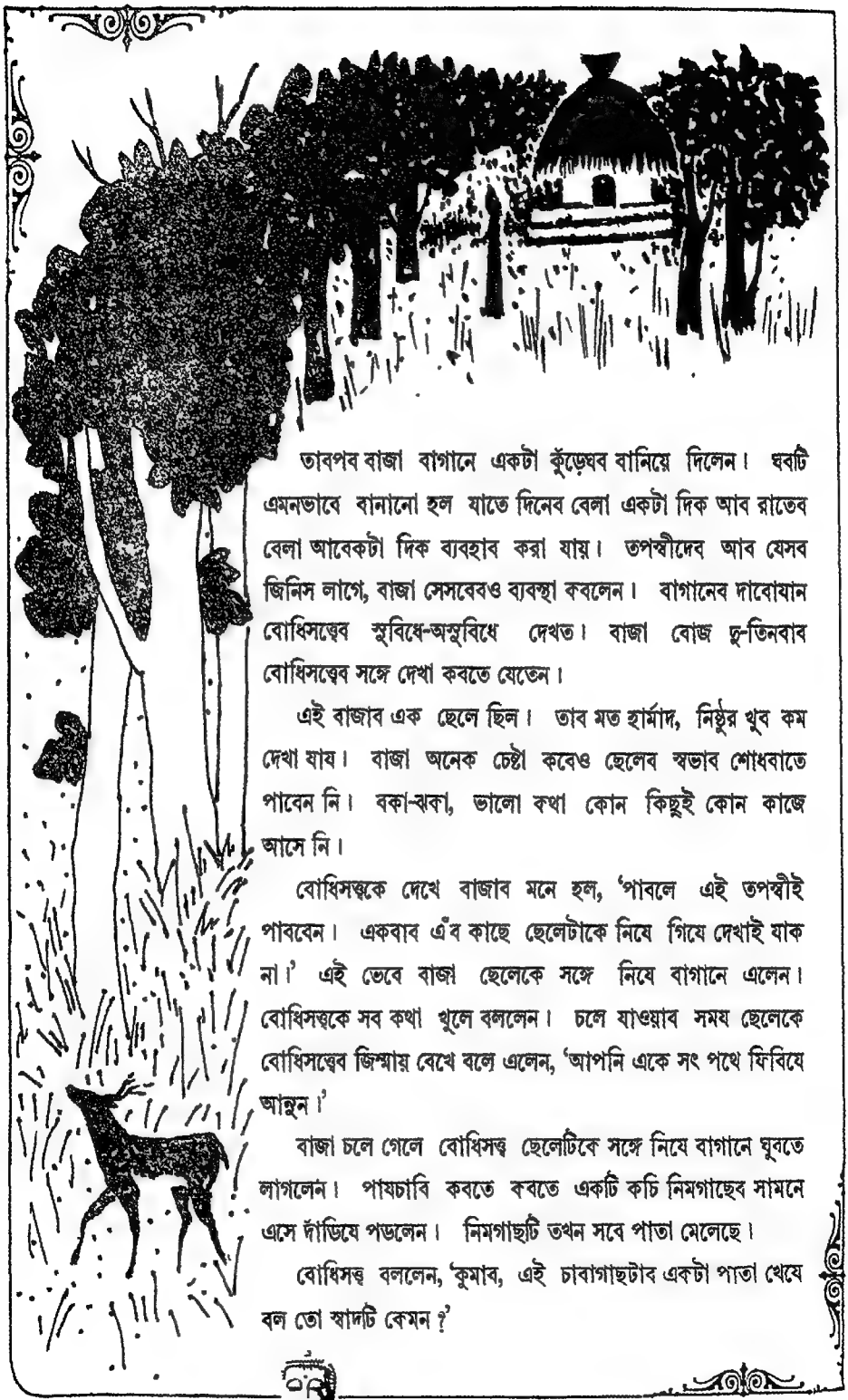

তারপর রাজা বাগানে একটা কুঁড়েঘর বানিয়ে দিলেন। ঘরটি এমনভাবে বানানো হল যাতে দিনের বেলা একটা দিক আর রাতের বেলা আরেকটা দিক ব্যবহার করা যায়। তপস্বীদের আর যেসব জিনিস লাগে, রাজা সেসবেরও ব্যবস্থা করলেন। বাগানের দারোয়ান বোধিসত্ত্বের সুবিধে-অসুবিধে দেখত। রাজা রোজ দু-তিনবার বোধিসত্ত্বের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন।

এই রাজার এক ছেলে ছিল। তার মত হার্মাদ, নিষ্ঠুর খুব কম দেখা যায়। রাজা অনেক চেষ্টা করেও ছেলের স্বভাব শোধরাতে পারেন নি। বকা-ঝকা, ভালো কথা কোন কিছুই কোন কাজে আসে নি।

বোধিসত্ত্বকে দেখে রাজার মনে হল, 'পারলে এই তপস্বীই পারবেন। একবার এঁর কাছে ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে দেখাই যাক না।' এই ভেবে রাজা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে এলেন। বোধিসত্ত্বকে সব কথা খুলে বললেন। চলে যাওয়ার সময় ছেলেকে বোধিসত্ত্বের জিম্মায় রেখে বলে এলেন, 'আপনি একে সৎ পথে ফিরিয়ে আনুন।'

রাজা চলে গেলে বোধিসত্ত্ব ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে ঘুরতে লাগলেন। পায়চারি করতে করতে একটি কচি নিমগাছের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নিমগাছটি তখন সবে পাতা মেলেছে।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'কুমার, এই চারাগাছটার একটা পাতা খেয়ে বল তো স্বাদটি কেমন?'

কুমাব পাতা একটা চিবিযেই বলে ওঠে 'থুঃ থুঃ।'

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস কবলেন, 'কি হল ?'

কুমাব বলল, 'বিষেব ঝাড়। এইটুকু গাছ যদি এত তেতো হয বড হলে এ খেযে তো লোক মাবা যাবে।'

এই বলে সে গাছটি তুলে ফেলে দিল। বোধিসত্ত্ব তখন তাকে বললেন, 'দেখ কুমাব, এই নিমগাছটা তেতো বলে তুমি উপডে ফেললে। বড হলে এখানকাব প্রজাবাও তোমাকে এভাবেই উপডে ফেলবে। তাবা ভাববে ছেলেবেলাতেই যে এত নিষ্ঠুব বড হলে তো সে পাষণ্ড হবে। সে বাজা হলে বাজ্যে শান্তি থাকবে না। কুমাব, তুমি এখন থেকে সাবধান হও।'

এতদিনে যা হয নি বোধিসত্ত্বেব মধুব কথায তাই হল। কুমাবেব মতি ফিবল।

কালে কালে সে শান্ত, ধীব স্থিব হল। বাবাব মৃত্যুব পব সে বাজাও হল। তাবপব দান-ধ্যান আব পুজো-আচ্চা কবে একদিন ইহলোক ত্যাগ কবল।

অশাতরূপ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবাব ব্রহ্মদত্তেব প্রথম বাণীব সন্তান হযে জন্মান। তিনি লেখাপডা থেকে যুদ্ধবিদ্যা সব কিছুতেই বেশ পটু হযে উঠলেন। বাবা মাবা গেলে নিজে বাজা হলেন। প্রজাপালনে মন দিলেন।

একদিন কোশলবাজ বহু সৈন্য নিযে বাবাণসী আক্রমণ কবল। যুদ্ধে বোধিসত্ত্ব এঁটে উঠতে পাবলেন না। কোশলবাজ তাঁকে হত্যা কবল। আব তাঁব স্ত্রীকে জোব কবে ধবে নিযে গেল। বাবাণসীব পতন হল।

বোধিসত্ত্বকে কোশলবাজ যখন হত্যা কবছে তখন বোধিসত্ত্বেব ছেলে নর্দমা দিযে পালিযে যায। কিছুদিন পবে সেই ছেলে সৈন্য যোগাড কবে বারাণসী আক্রমণ কবল। বাবাণসীকে ঘিবে ফেলে সে

কোশলরাজকে চিঠি পাঠাল, 'হয় রাজ্য ছেড়ে দাও, নাহলে যুদ্ধ কর।' রাজা জবাব পাঠালেন, 'যুদ্ধ করব।'

বোধিসত্ত্বের স্ত্রী সে কথা শুনে ছেলেকে গোপনে একটি চিঠি পাঠাল। তাতে লিখল, 'যুদ্ধ করার কোন দরকার নেই। বারাণসীতে ঢোকার সব রাস্তা বন্ধ করে দাও। তাহলে খাবার-দাবার আর জলের অভাব দেখা দেবে। প্রজারা তখন ক্ষেপে উঠবে। তুমি সহজেই বারাণসী দখল করতে পারবে।'

ছেলে মায়ের কথামত সব রাস্তায় কড়া পাহারা বসিয়ে দিল। বারাণসী থেকে কেউ বেরোতে পারছে না, বারাণসীতে কেউ ঢুকতেও পারছে না। প্রজারা এক সময় সত্যি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সৈন্যবাহিনীও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। তারা কোশলরাজের মাথা কেটে বোধিসত্ত্বের কাছে পাঠাল। কুমার তখন নগরে ঢুকে রাজ্যের দায়িত্ব নিলেন।

এই জাতকের শিক্ষা হল: বুদ্ধি দিয়ে নানা অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।

ত্রিপর্যন্ত জাতক

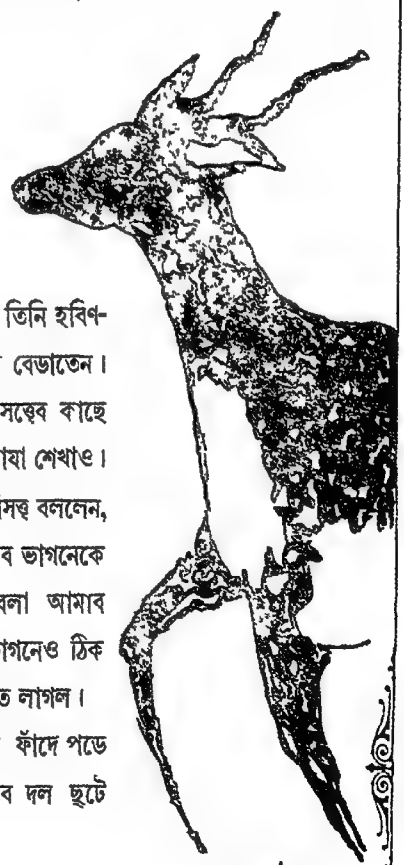

বোধিসত্ত্ব একবার হরিণকুলে জন্মান। বুদ্ধির জোরে তিনি হরিণদের নেতা হলেন। একদল হরিণ নিয়ে অবাধে বনে ঘুরে বেড়াতেন।

একদিন তাঁর বোন নিজের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বোধিসত্ত্বের কাছে এল। বোধিসত্ত্বকে বলল, 'দাদা, তোমার ভাগনেকে মৃগমায়া শেখাও। দেখো, ও যেন সব মায়াগুলোই শিখতে পারে।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তোর কোন চিন্তা নেই। ওকে সব শিখিয়ে দেব।' তারপর ভাগনেকে বললেন, 'যা বাবা, এখন খেলতে যা, সকাল-সন্ধ্যে দু বেলা আমার কাছে আসবি, তোকে ফাঁদ কাটা শিখিয়ে দেব।' ভাগনেও ঠিক মামার কথামত এসে একে একে মৃগমায়াগুলো শিখে নিতে লাগল।

হঠাৎ একদিন বনে বিচরণ করার সময় সেই হরিণটি ফাঁদে পড়ে চিৎকার করতে লাগল। তার চিৎকার শুনে সঙ্গী হরিণের দল ছুটে

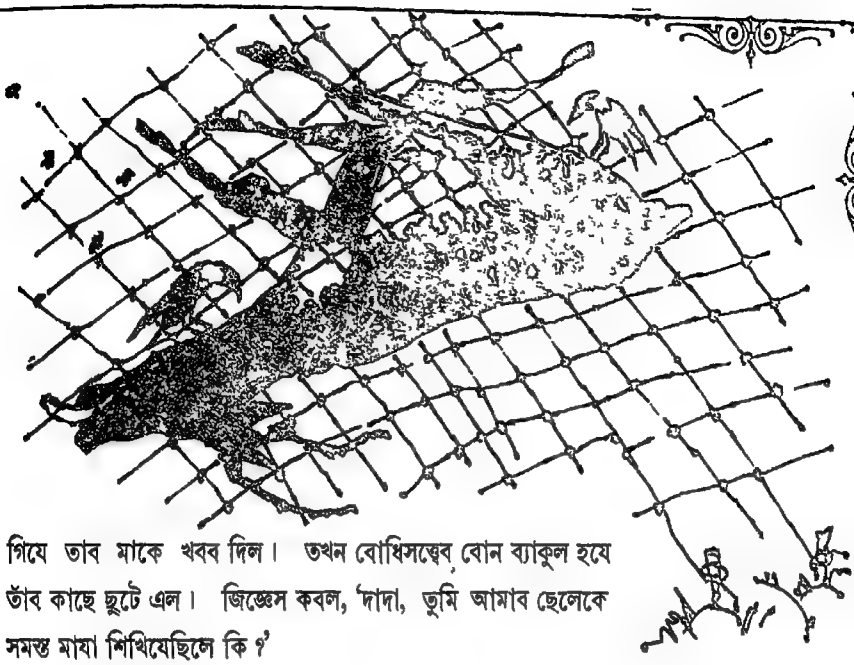

গিয়ে তার মাকে খবর দিল। তখন বোধিসত্ত্বের বোন ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে ছুটে এল। জিজ্ঞেস করল, 'দাদা, তুমি আমার ছেলেকে সমস্ত মায়া শিখিয়েছিলে কি?'

'একদম চিন্তা করিস না।'

'ও কি সব ভালোভাবে শিখেছে?'

'খুব ভালভাবে সমস্ত মায়া সে শিখেছে। তুই নিশ্চিন্ত থাক, ও ঠিক ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসবে।'

বোধিসত্ত্ব যখন বোনকে আশ্বস্ত করছেন ভাগনে তখন ফাঁদ কাটার চেষ্টা করছে। সে প্রথমে এক কাত হয়ে শরীরটা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। পাগুলো ছড়িয়ে দিল। বমি করল। মাথাটা এমন কাত করে রাখল যেন ঘাড় ভেঙ্গে গিয়েছে। জিভ বের করে লালা আর ফেনায় মুখ ভরিয়ে ফেলল। চোখ উল্টে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইল। নীল মাছিরা অবধি তাকে মড়া ভেবে গায়ে এসে বসল। কাক বসল পিঠে।

ব্যাধ ফিরে এসে হরিণকে ঐ অবস্থায় দেখে ভাবল, নির্ঘাৎ অনেক আগে সে ফাঁদে পড়েছে, হয়ত মাংসও পচতে আরম্ভ করেছে। সে তখন হরিণের বাঁধন খুলে দিল। তারপর শুকনো কাঠ আর শুকনো পাতার খোঁজ করতে লাগল। হরিণ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সঙ্গে সঙ্গে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। বাতাসের তাড়নায় মেঘ যেভাবে ছোটে সেইভাবে ছুটে সে মায়ের কোলে ফিরে এল।

অভীক্ষ্ণ জাতক

বোধিসত্ত্ব তখন বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী। রাজার একটি প্রিয় হাতি ছিল। রাজা সেই সুলক্ষণা হাতিকে মঙ্গলহস্তী করেছিলেন।

মঙ্গলহস্তী খুবই আদর যত্নে থাকে। ভালো-মন্দ খাবার আসে তার জন্য। খাবারের লোভে একটা কুকুর রোজ হাতিশালে আসত। মঙ্গলহস্তীর ফেলে দেওয়া খাবার খেত। রোজ দেখাসাক্ষাৎ হতে হতে দুজনের মধ্যে খুব ভাব হল। একজন আরেকজনকে না দেখে থাকতে পারে না।

গ্রামের এক চাষা হাতিশালের মাহুতকে টাকা দিয়ে একদিন কুকুরটাকে কিনে নিয়ে চলে গেল। এদিকে কুকুরকে না দেখে মঙ্গলহস্তীর খুব কষ্ট হল। মনের দুঃখে সে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল।

কথাটা রাজার কানে যেতে রাজা খুবই বিচলিত হলেন। বোধিসত্ত্বকে ডেকে বললেন, 'আপনি একবার হাতিটাকে দেখে আসুন।' বোধিসত্ত্ব দেখলেন হাতির চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বেচারা মনমরা হয়ে আছে। তখন তাঁর মনে হল নিশ্চয়ই হাতিটা কোন প্রিয়জনকে হারিয়েছে। বোধিসত্ত্ব তখন মাহুতকে ডাকলেন।

'হাতির সঙ্গে এখানে আর কোন জন্তু থাকত কি?'

'হ্যাঁ প্রভু, একটা কুকুর থাকত।'

'কুকুরটা কোথায়?'

'এক চাষা নিয়ে গেছে।'

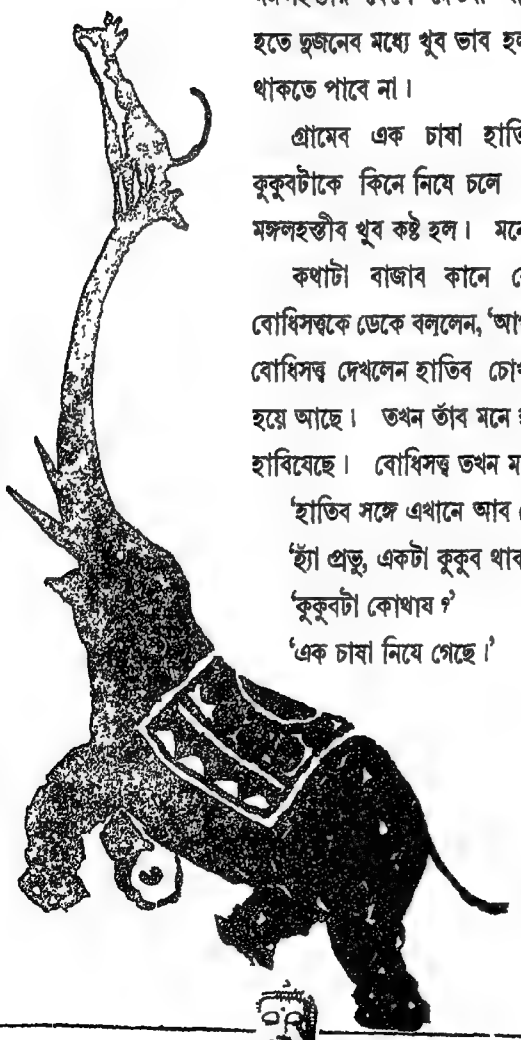

'তাব বাড়ি চেন ?'

'না প্রভু।'

বোধিসত্ত্ব বাজাকে সব খুলে বললেন। তখন বাজা বললেন, 'কিন্তু কুকুবটাকে পাই কি কবে।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ভেবী বাজিযে ঘোষণা কবা হোক, আমাদেব মঙ্গলহস্তীব বন্ধু একটি কুকুবকে কে বা কাবা নিযে গেছে। যাব বাড়িতে সেই কুকুব পাওযা যাবে তাব জেল হবে।'

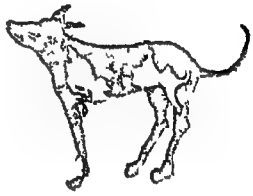

ভেরী বাজিযে বাজাব ঘোষণা চাউব কবা হল। যে কুকুবটাকে নিযে গিযেছিল সে সঙ্গে সঙ্গে কুকুবটাকে ছেড়ে দিল। কুকুবটাও ছাড়া পেযে এক ছুটে হাতিব কাছে চলে গেল। হাতি আনন্দে তাকে শুঁড় দিযে জড়িযে নিজেব মাথাব ওপব বসিযে দিল। দুজনে খেলতে লাগল। বাজা এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ। ভাবলেন, 'বোধিসত্ত্ব জন্তু-জানোযাবেব মনেব কথাও টেব পান।'

নন্দিবিলাস জাতক

তক্ষশিলায তখন বাজত্ব কবছেন গান্ধাব বাজাবা। সেই সময বোধিসত্ত্ব গোরু হযে জন্মান। বোধিসত্ত্ব যখন খুব ছোট, তখন এক ব্রাহ্মণ দান হিসাবে তাঁকে পান। ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বেব নাম বাখলেন 'নন্দীবিলাস।'

বোধিসত্ত্ব ঐ ব্রাহ্মণেব কাছে বেশ যত্নে ছিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁকে ছেলেব মত ভালোবাসত। বোধিসত্ত্ব বড হযে ভাবলেন, 'ব্রাহ্মণ আমাকে কত কষ্ট কবে খাওযায। ছেলেব মত ভালোবাসে। সাবা জম্বুদ্বীপে আমাব মত শক্তিশালী গোরু নেই। আমাব মত ভাব টানতে কেউ পাবে না। আমাব এই শক্তি কাজে লাগিযে ঠাকুবেব কিছু উপকাব কবা যাক।' এই ভেবে একদিন তিনি ব্রাহ্মণেব কাছে গিযে বললেন, 'ঠাকুব, যে বণিকেব অনেক গোরু আছে এমন কাবো কাছে গিযে বলুন, আমাব গোরু একশ মাল বোঝাই গাড়ি একা টানতে পাবে। এই বলে এক হাজাব টাকা বাজি ধরুন।'

ব্রাহ্মণ এক বণিককে গিয়ে বলল, 'এখানে সব থেকে শক্তিশালী গোরু কার আছে বলুন তো?' বণিক বলল, 'অনেকেরই আছে, তবে কারো গোরুই আমার গোরুর চেয়ে বেশি শক্তিশালী নয়।'

ব্রাহ্মণ তর্ক জুড়ে দিল।

'বলেন কি।'

'ঠিকই বলছি।'

'আপনার কোন্ গোরু একা একশ মাল-বোঝাই গাড়ি টানতে পারবে? এ রকম গোরু পৃথিবীতে নেই।'

'আমার আছে।'

'বেশ, তাহলে বাজি ফেলুন।'

'এক হাজার টাকা বাজি।'

তারপর ব্রাহ্মণ একশ গাড়িতে মাল তুলল। গাড়িগুলো পরপর সাজিয়ে বোধিসত্ত্বকে জোয়ালে জুতে দিল। নিজে গাড়ির মাথায় বসে, মিছিমিছি দিপটি নাড়িয়ে বলতে লাগল, 'হেই, হ্যাট, টান বদমাশ, জোরে টান, বদমাশ কোথাকার।'

তখন বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'আমি বদমাশ নয়, ঠাকুর খামোকা আমাকে গাল দিচ্ছে, আমি এক পা-ও নড়ব না।' বোধিসত্ত্বের চার পা অমনি চারটি স্তম্ভের মত অনড় রয়ে গেল।

এক হাজার টাকা হেরে ব্রাহ্মণ মুষড়ে পড়ল। নন্দীবিলাসের বাঁধন খুলে দিয়ে একা একা বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়ল। নন্দীবিলাস চরে এসে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করল, 'ঠাকুর কি ঘুমোচ্ছেন?'

'যার হাজার টাকা খোওয়া যায় তার কি ঘুম থাকে?'

'আচ্ছা ঠাকুর, আমি কি আগে কখন আপনার কোন ক্ষতি করেছি?'

'না।'

'কোন জিনিস নষ্ট করেছি?'

'না।'

'তাহলে আপনি আমাকে বদমাশ বলছিলেন কেন? নিজের দোষেই আপনার ক্ষতি হয়েছে। যাই হোক, আবার বণিকের কাছে যান, এবার দু হাজার টাকা বাজি ধরুন। আর আমাকে গালমন্দ করবেন না।'

ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের কথামত সব কিছু করল। এবার অতি সহজে দু হাজার টাকা জিতে ফিরে এল। যারা ঐ দৃশ্য দেখতে এসেছিল তারা বোধিসত্ত্বের শক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। নিজের থেকে তারা অনেক উপহার দিল। সব টাকাই ব্রাহ্মণ পেল।

দুর্মেধা জাতক

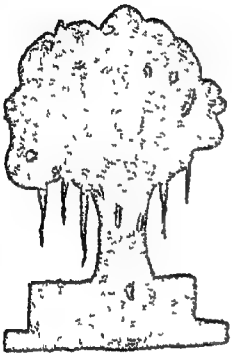

বোধিসত্ত্ব একবার ব্রহ্মদত্তের ছেলে হয়ে জন্মান। তাঁর নাম রাখা হল ব্রহ্মদত্ত কুমার। মাত্র ষোল বছর বয়সের মধ্যেই ব্রহ্মদত্ত কুমার নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত হলেন। ব্রহ্মদত্ত তখন তাকে যুবরাজ পদে বসালেন।

বারাণসীবাসীরা তখন খুব ঘটা করে ঠাকুর দেবতার পুজো করত। তখন শয়ে-শয়ে ছাগল-মোষ-কুকুর-শুয়োর বলি হত। নিহত পশুর রক্তমাংস দিয়ে দেবতার অর্চনা করত তারা। এইসব দেখে শুনে বোধিসত্ত্বের খুব দুশ্চিন্তা হল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'আজকাল পুজোপার্বণের নামে লোকেরা অধর্ম করছে, প্রাণীহত্যা করছে। বাবার পরে আমি রাজা হলে এই নিষ্ঠুর প্রথা তুলে দেব।'

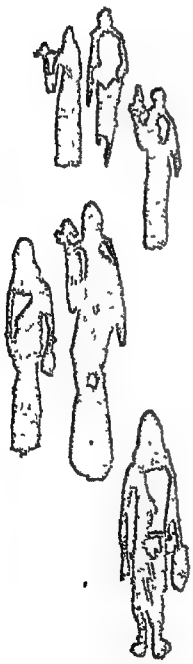

একদিন বোধিসত্ত্ব রথে চেপে নগর ঘুরতে বেরিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন অনেক লোক একটা গাছের কাছে জড়ো হয়েছে। ব্যাপার কি দেখার জন্য বোধিসত্ত্বও নামলেন। লোকের মুখে শুনলেন যে ঐ গাছে ভগবান আছেন। বৃক্ষ দেবতা। সবাই তাঁর কাছে মানত করতে এসেছে। বোধিসত্ত্ব নিজেও ফুল, চন্দন দিয়ে গাছটিকে পুজো করলেন। গাছের গোড়ায় জল ঢাললেন। তারপর থেকে তিনি মাঝে মাঝেই গাছটিকে পুজো করে আসতেন।

ব্রহ্মদত্তের মৃত্যুর পর বোধিসত্ত্ব সিংহাসনে বসলেন। যথাভাবে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করে চললেন। কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর বোধিসত্ত্ব মনে মনে ভাবলেন, 'রাজা হয়েছি,মনের একটা ইচ্ছে পূর্ণ হল, আমার দ্বিতীয় ইচ্ছেটি এখনও অপূর্ণ।' তখন তিনি মন্ত্রী, সম্মানীয় কয়েকজন নগরবাসী ও ব্রাহ্মণকে ডাকলেন।

'আমি কেন রাজপদ পেলাম আপনারা জানেন কি?'

'না, মহারাজ, আমরা জানি না।'

'আমি একটি গাছকে পুজো করতাম জানেন কি?'

'হ্যাঁ মহারাজ, জানি।'

'তখন আমি বৃক্ষ দেবতার কাছে প্রার্থনা করতাম আমি যদি কোন দিন রাজা হই তবে তাঁর পুজো করব।'

'তাহলে তো এক্ষুনি পুজো দিতে হয় মহারাজ।'

'হ্যাঁ, সেইমত আয়োজন করুন।'

'কি আয়োজন করতে হবে মহারাজ?'

'আমি দেবতার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম প্রাণী হত্যার মত খারাপ কাজ যারা করে তাদের হৃৎপিণ্ড, মাংস আর রক্ত দিয়েই বৃক্ষ দেবতার পুজো করব।'

রাজার চররা সারা দেশে ভেরী পিটিয়ে এই কথা ঘোষণা করল।

এই ঘোষণা শুনে নিজের প্রাণ বাঁচাতে সবাই ঐ নিষ্ঠুর কাজে ক্ষান্তি দিল। দেশ থেকে পশুবলি উঠে গেল। এভাবে বোধিসত্ত্ব কাউকে কোন রকম শাস্তি না দিয়েই দেশের লোককে সৎ পথে ফিরিয়ে আনলেন।

ফল জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার বণিককুলে জন্ম নেন। বড় হয়ে যথারীতি ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেন। একবার পঞ্চাশ গাড়ি মালপত্তর ও অনেক লোকজন দিয়ে বাণিজ্য করতে বেরিয়েছেন। যেতে যেতে তাঁরা এক গভীর বনের কাছে এসে পড়লেন। ঐ বনের ভেতর দিয়েই তাঁদের যেতে হবে। তিনি তখন সঙ্গের লোকজনকে ডাকলেন। সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করে বললেন, 'শুনেছি এই বনে বিষ ফলের গাছ আছে। তাকে কিম্ফল বলে। কিন্তু ঐ গাছের ফল যে কি রকম তা কেউ জানে না। যাই হোক, এই বনের কোন গাছের ফল, ফুল বা পাতা আমাকে জিজ্ঞেস না করে কেউ খেতে যেও না।'

সকলেই সে কথা মেনে নিল। তারা বনের মধ্যে ঢুকল। বনের শুরুতেই ছিল একটি গ্রাম। আর গ্রামের সামনেই রয়েছে একটি কিম্ফল গাছ। সেই গাছের ডাল, গোড়া, পাতা আর ফল সব কিছুই অবিকল আম গাছের মত। শুধু দেখতেই নয়, কিম্ফলের স্বাদ আর গন্ধও হুবহু আমের মত। কিন্তু একবার পেটে গেলে আর রক্ষা নেই। হলাহল বিষের মতই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হবে।

দলের আগে আগে যারা চলেছিল তাদের লোভ বেশি। কিম্ফলকে আম ভেবে পটাপট ছিঁড়ে দু-চারজন খেয়ে ফেলল। বাকি লোকেরা ভাবল, 'বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস না করে খাওয়াটা ঠিক হবে না।' তারা কয়েকটা কিম্ফল পেড়ে হাতে নিয়ে বসে রইল। বোধিসত্ত্ব আসার পর তারা জিজ্ঞেস করল, 'আর্য, আমরা এই আমগুলো খাব?'

'এগুলো আম নয় ভাই।'

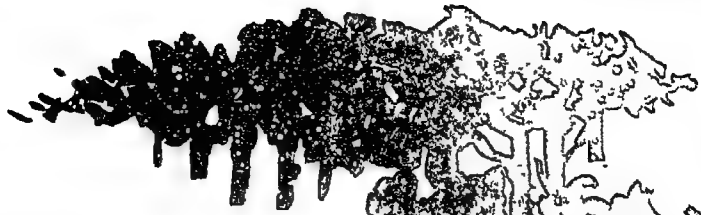

'তাহলে কি ?'

'এগুলোই কিম্ফল, বিষফল।'

'কি সর্বনাশ, ওরা যে এগুলো খেয়েছে।'

বোধিসত্ত্ব তখন যারা ফল খেয়েছিল তাদের গলায় আঙুল দিয়ে বমি করালেন। তারপর তাদের ওষুধ খেতে দিলেন। এভাবে তাদের প্রাণ রক্ষা পেল।

রাস্তায় যখনই বণিকের দল যেত, কিম্ফল খেয়ে তাদের ঐ মৃত্যু ছিল অবধারিত। পাশের গ্রামের লোকেরা পরের দিন সকালে এসে বণিকদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যেত। বোধিসত্ত্বের দলকে আগের দিন বনে ঢুকতে দেখে তারা ঠিক পরের দিন সকালে লুট করার আশায় কিম্ফল গাছের দিকে চলল।

কেউ বলল, 'আমি শুধু গোরুগুলো নেব।' কেউ বলল, 'আমি নেব গাড়ির মালপত্তর।' কেউ বা বলল, 'আমি গাড়িগুলো নেব।' এই সব কথাবলি করতে করতে তারা গাছতলায় হাজির হয়ে দেখে সবাই দিব্যি বেঁচে আছে। তখন তারা তাদের জিজ্ঞেস করল, 'ভাই, তোমরা কিভাবে বুঝলে যে এটা বিষ ফলের গাছ ?' বোধিসত্ত্বের দলের লোকেরা বলল, 'আমরা তো বুঝিনি, আমাদের বণিক বুঝতে পেরেছিলেন।'

গ্রামের লোকেরা তখন বোধিসত্ত্বের কাছে গেল। তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ মশাই, আপনি কি করে বুঝলেন এগুলো বিষ ফলের গাছ ?'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'খুব সোজা। গ্রামের কাছে একটা গাছ ফলে নুয়ে পড়েছে, অথচ গ্রামবাসীরা সেই ফল ছিঁড়ে নিচ্ছে না দেখেই আমার সন্দেহ হল।'

তারপর বোধিসত্ত্ব গ্রামবাসীদের ধর্মকথা শোনালেন।

পঞ্চায়ুধ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার ব্রহ্মদত্তের ছেলে হয়ে জন্মান। ছেলের যেদিন নাম ঠিক করা হবে, বোধিসত্ত্বের মা সেদিন আটশ পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে নেমন্তন্ন করলেন। ছেলের ভাগ্য কেমন হবে তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন। পণ্ডিতরা বোধিসত্ত্বের সমস্ত লক্ষণ বিচার করে বললেন, 'এই কুমার মহারাজের মৃত্যুর পর রাজা হবে। নানা গুণে এর চরিত্র

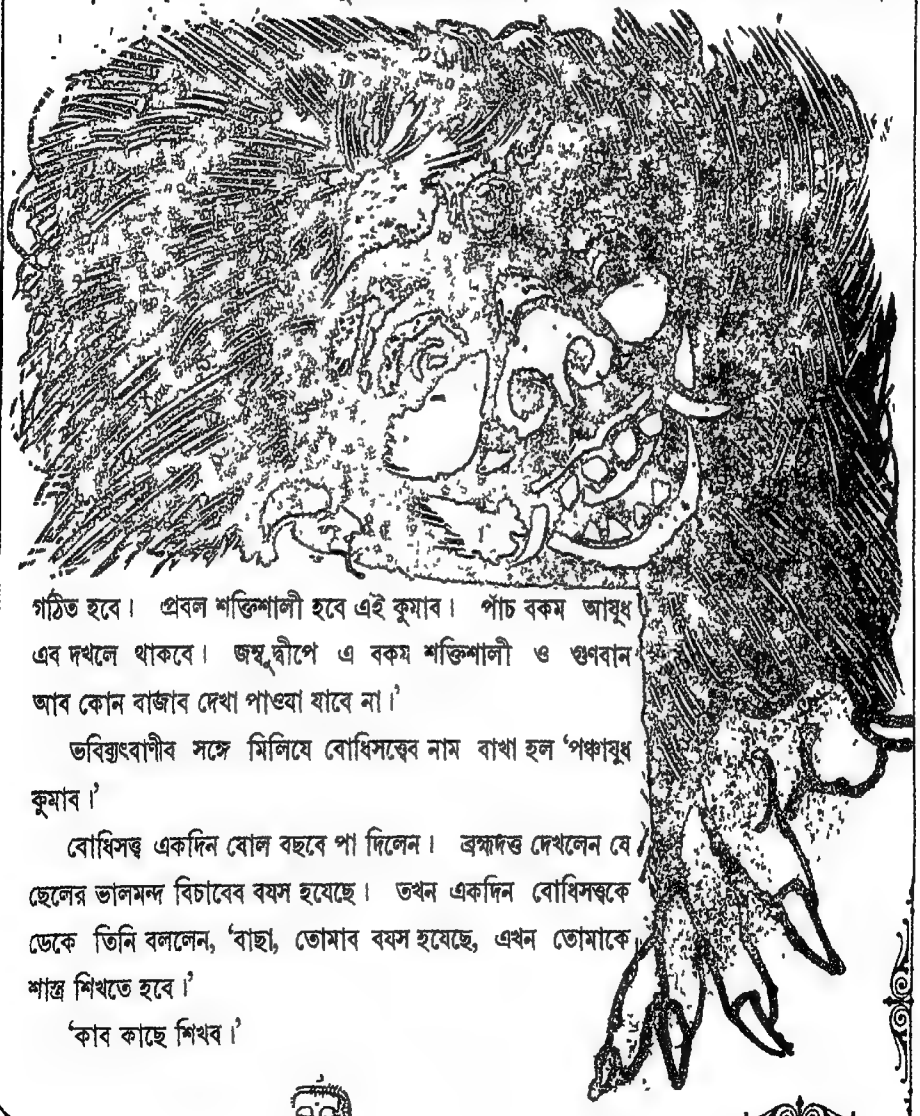

গঠিত হবে। প্রবল শক্তিশালী হবে এই কুমার। পাঁচ রকম আয়ুধ এর দখলে থাকবে। জম্বুদ্বীপে এ রকম শক্তিশালী ও গুণবান আর কোন রাজার দেখা পাওয়া যাবে না।'

ভবিষ্যৎবাণীর সঙ্গে মিলিয়ে বোধিসত্ত্বের নাম রাখা হল 'পঞ্চায়ুধ কুমার।'

বোধিসত্ত্ব একদিন ষোল বছরে পা দিলেন। ব্রহ্মদত্ত দেখলেন যে ছেলের ভালমন্দ বিচারের বয়স হয়েছে। তখন একদিন বোধিসত্ত্বকে ডেকে তিনি বললেন, 'বাছা, তোমার বয়স হয়েছে, এখন তোমাকে শাস্ত্র শিখতে হবে।'

'কার কাছে শিখব।'

'তক্ষশিলাব বিখ্যাত আচার্যেব কাছে। তোমাকে এই এক হাজাব টাকা দিচ্ছি। এটা দিযে গুরুকে প্রণাম কববে।'

তাবপব বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায গেলেন। অনেকদিন ধবে গুরুব কাছে নানা বিদ্যা শিখলেন। তাঁব ঘবে ফেবাব সময হল। গুরু তখন তাঁকে কাছে ডেকে পাঁচ বকম অস্ত্র দিলেন।

বোধিসত্ত্ব তো পঞ্চাযুধ নিযে বাবাণসীতে ফিবে চলেছেন। বাস্তায পড়ল এক গহীন বন। সেই বনে বাস কবত এক যক্ষ। তাব নাম শ্লেষলোম। বোধিসত্ত্ব সেই বনেব কাছাকাছি এলে আশপাশেব গ্রামবাসীবা তাকে জিজ্ঞেস কবল, 'ঠাকুব, কোথায যাবেন?'

'এ বন পেবিযে বাবাণসী যাব।'

'খবর্দাব ঠাকুব, বনে ঢুকবেন না।'

'কেন?'

'এই বনে শ্লেষলোম নামে এক যক্ষ থাকে। সে খুব সাংঘাতিক বাক্ষস। আপনাকে খেযে ফেলবে।'

বোধিসত্ত্ব জানতেন তাঁব নিজেব শক্তি কতখানি। আত্মবলে বলীযান হযে তিনি বনে ঢুকলেন। যখন বনেব মাঝামাঝি এসেছেন যক্ষ তাঁকে আক্রমণ কবল। তালগাছেব মত যক্ষেব চেহাবা। মাথাটা যেন চিলে কোঠাব মত। চোখ তো নয, যেন দুটো গামলা। দাঁত গুলো মূলোব মত। বাজপাখিব মত মুখ। পেটটা বিশাল আব নানা বঙে ছোপান। হাত আব পা নীল বঙেব।

তুমুল লড়াই শুরু হল। বোধিসত্ত্ব বিষ মাখানো তীব ছুঁড়লেন। কিন্তু তীবগুলো যক্ষেব লোমে আটকে বইল। তাবপব সে তীবগুলো

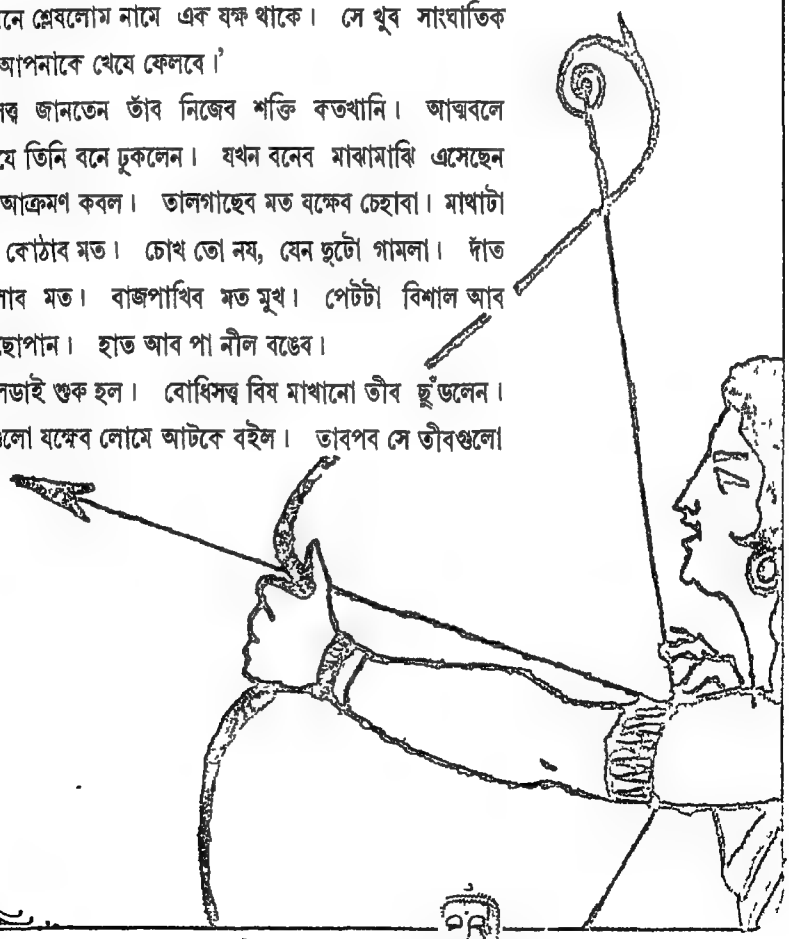

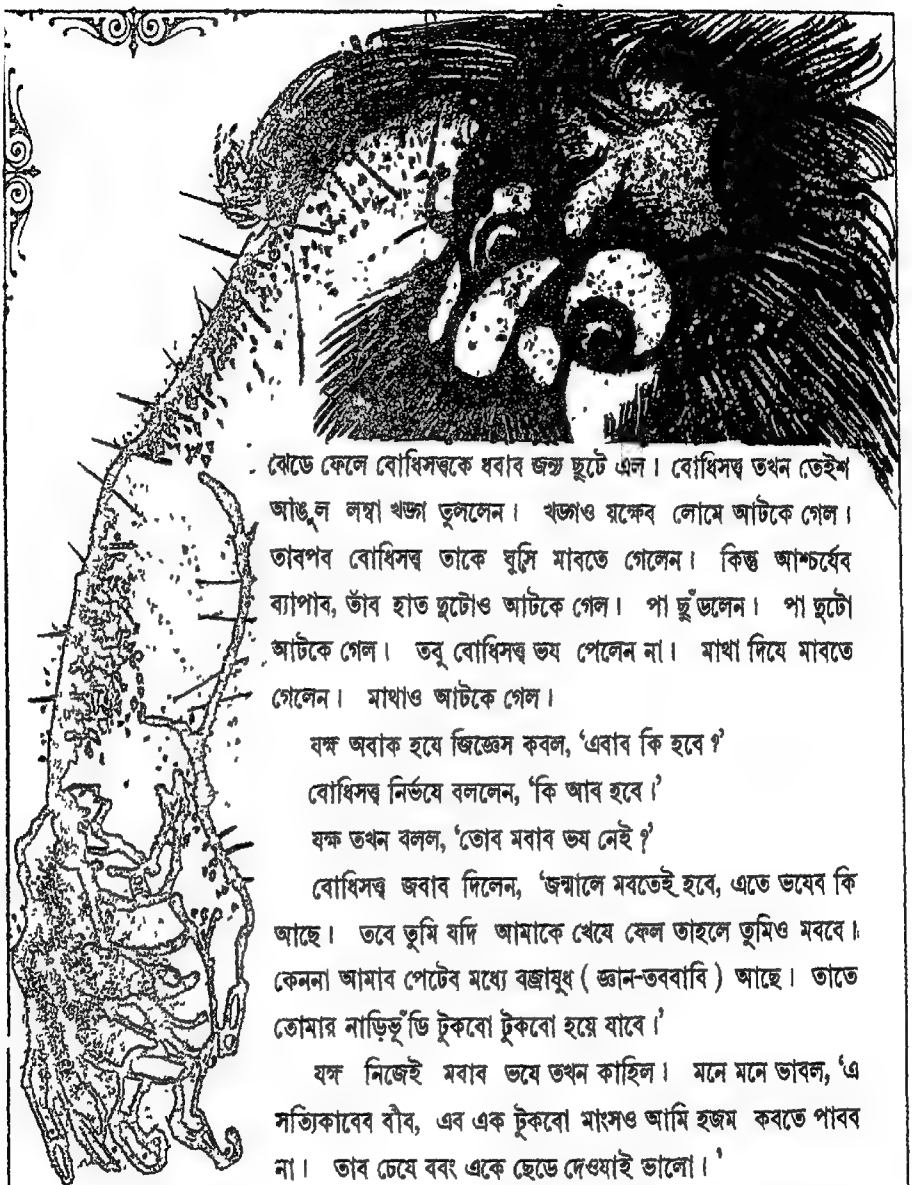

ঝেড়ে ফেলে বোধিসত্ত্বকে ধরার জন্য ছুটে এল। বোধিসত্ত্ব তখন তেইশ আঙুল লম্বা খড়্গ তুললেন। খড়্গও যক্ষের লোমে আটকে গেল। তারপর বোধিসত্ত্ব তাকে ঘুসি মারতে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁর হাত দুটোও আটকে গেল। পা ছুঁড়লেন। পা দুটো আটকে গেল। তবু বোধিসত্ত্ব ভয় পেলেন না। মাথা দিয়ে মারতে গেলেন। মাথাও আটকে গেল।

যক্ষ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এবার কি হবে?'

বোধিসত্ত্ব নির্ভয়ে বললেন, 'কি আর হবে।'

যক্ষ তখন বলল, 'তোর মরার ভয় নেই?'

বোধিসত্ত্ব জবাব দিলেন, 'জন্মালে মরতেই হবে, এতে ভয়ের কি আছে। তবে তুমি যদি আমাকে খেয়ে ফেল তাহলে তুমিও মরবে। কেননা আমার পেটের মধ্যে বজ্রায়ুধ (জ্ঞান-তরবারি) আছে। তাতে তোমার নাড়িভুঁড়ি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।'

যক্ষ নিজেই মরার ভয়ে তখন কাহিল। মনে মনে ভাবল, 'এ সত্যিকারের বীর, এর এক টুকরো মাংসও আমি হজম করতে পারব না। তার চেয়ে বরং একে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।'

যক্ষের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমি তো না হয় ছাড়া পেলাম। কিন্তু তোমার কি হবে। এই যে এত পাপ করছ, তোমার তো কোনদিনই মুক্তি হবে না।' ইত্যাদি বলে তিনি যক্ষকে অনেক ধর্মকথা শোনালেন। সৎ শিক্ষা দিলেন। যক্ষের মনও বদলে গেল। বোধিসত্ত্ব তখন তাকে বনের দেবতা করে নিজের ঘরে ফিরে চললেন।

রাজাবরবাদ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের প্রথম রাণীর গর্ভে জন্ম নেন। বোধিসত্ত্বের নাম রাখা হল 'ব্রহ্মদত্তকুমার।' যথাবয়সে বোধিসত্ত্ব শাস্ত্রপাঠ ও অন্যান্য শিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় গেলেন। বেশ কিছুদিন সেখানে থেকে মন দিয়ে শাস্ত্র, পুরাণ ও বেদ পড়লেন। তারপর সব রকম শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন।

কিছুদিন পরে মহারাজ ব্রহ্মদত্ত দেহ রাখলেন। রাজ্যভার এখন বোধিসত্ত্বের হাতে। রাজা হিসেবে অচিরেই তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। এমন নিরপেক্ষ, নির্লোভ রাজা সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর বিচার খুবই সূক্ষ্ম। কখনো তা ন্যায়ের পথ থেকে সরে যেত না।

রাজা ধর্ম মেনে শাসন করেন। ফলে মন্ত্রী এবং অমাত্যরাও ধর্ম অনুসারে চলে। বিচার সূক্ষ্ম হত বলে বদ লোকরাও মিথ্যে মামলা হাজির করত না। দেশবাসীও অন্যায়ের রাস্তায় যেত না। সেজন্য বিচারপ্রার্থীর সংখ্যা কমতে লাগল। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে রাজ্যে একজনও লোক রইল না যার সুবিচার দরকার। রাজ-সভার লোকজন বিচার করার জন্য বসে থেকে থেকে রোজ সন্ধ্যায় একজনও বিচারপ্রার্থী না পেয়ে ফিরে যেত। ফলে বিচারালয় জনশূন্য হল।

এভাবে কিছুদিন চলার পর বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'রাজ্যে সুবিচার আছে, আমি ধর্ম মেনে চলি। তাই সবাই খুশি। কিন্তু সবাই শুধু আমার গুণগান করে। আমার দোষের কথা কেউ বলে না। আমার দোষগুলো জানতে পারলে তা কাটাবার চেষ্টা করা যেত।'

তারপর থেকে তিনি সব সময় দোষ ধরার লোক খুঁজতে লাগলেন। অনেক খোঁজ করেও কিন্তু রাজভবনে এ রকম একজনও খুঁজে পেলেন না। তিনি রাজভবনের বাইরেও লোক খুঁজতে লাগলেন। কেননা তাঁর মনে হল, 'রাজভবনের লোকরা হয়ত ভয়ে মুখ খুলছে না।' কিন্তু প্রাসাদের বাইরেও এ রকম কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না। নগরবাসীদের জিজ্ঞাসা করা হলে তারাও কেবল তাঁর গুণের কথাই বলতে লাগল।

তখন তিনি ঠিক করলেন, ছদ্মবেশে প্রজাদের মধ্যে খোঁজ করতে যাবেন। মন্ত্রীদের হাতে কিছুদিনের জন্য রাজ্যভার দিয়ে তিনি রথ সাজাতে বললেন। শুধু সারথিকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলেন।

ওদিকে কোশলরাজ মল্লিকও ঠিক একই উদ্দেশে মন্ত্রীদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। রাস্তায় যেতে যেতে দুটি রথ মুখোমুখি হল। দুটি রথ যাওয়ার মত চওড়া রাস্তা নয়। ফলে যে কোন একজনকে আগে যেতে হবে। দুই সারথির মধ্যে বচসা শুরু হল কে আগে যাবে তা নিয়ে। এ বলে 'আমি আগে যাব', ও বলে 'আমি আগে যাব।'

বারাণসীরাজের সারথি তখন বলল, 'তোমার রথ ঘুরিয়ে নাও, আমার রথে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত আছেন।'

তখন কোশলরাজের সারথি বলল, 'আমার রথে আছেন স্বয়ং কোশলরাজ।'

তারপর দুই সারথি কোশলরাজ ও বারাণসীরাজের বয়স তুলনা করে দেখল। বয়সে যিনি বড় হবেন তাঁর রথই আগে যাবে। কিন্তু দেখা গেল দুজনেই সমবয়স্ক। তারপর দুজনের রাজ্যের আয়তন, সেনাবল, সম্পদ, যশ, বংশ মর্যাদা—সব কিছুর তুলনা করা হল। আশ্চর্যের ব্যাপার, দেখা গেল সব ব্যাপারেই তাঁরা পরস্পরের সমান। তখন সারথিরা ঠিক করল, 'এবার দুজনের চরিত্রগুণের তুলনা করা যাক।'

কোশলরাজের সারথি তার রাজার চরিত্র বর্ণনা করল এভাবে: 'কঠোরের সঙ্গে তাঁর আচরণ কঠোর। কিন্তু কোমলের প্রতি তিনি খুবই কোমল। সাধু লোকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার সাধুজনোচিত। সংক্ষেপে এই তাঁর নীতি।'

বারাণসীরাজের সারথি এই গুণ বর্ণনা শুনে ভাবল 'এই যদি গুণ হয় তাহলে দোষ কাকে বলে।' তারপর সে বারাণসীরাজের চরিত্র বর্ণনা করল: 'কঠোরকে তিনি জয় করেন কোমলতা দিয়ে। সাধু আচরণে অসাধুকে জয় করেন। সত্য দিয়ে মিথ্যাকে দমন করেন। এখন বুঝলে তো শ্রেষ্ঠ কে. এবার তোমার রথ ফেরাও।'

সব শুনে কোশলরাজ নিজেই রথ থেকে নেমে এলেন। বারাণসী-রাজকে রাস্তা ছেড়ে দিলেন। বারাণসীরাজ কোশলরাজকে তখন ধর্মকথা শোনালেন। তারপর নগরে ফিরে গেলেন।

খদিরাঙ্গার জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার বণিককুলে জন্মান। রাজার ছেলের মত আদর-যত্নে তিনি বড় হতে থাকেন। যখন তাঁর সবে ষোল বছর বয়স তখনই তিনি নানা বিষয়ে পণ্ডিত হন। বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

বাবার মৃত্যু হলে বোধিসত্ত্ব রাজ্যের শ্রেষ্ঠীপদ পেলেন। তখন তিনি নগরে ছটি দানশালা তৈরি করালেন। এই ছটি দানশালার মধ্যে একটি ছিল তাঁর প্রাসাদের গায়ে। রোজ এইসব দানশালা থেকে তিনি বিস্তর দান-ধ্যান করতেন। তারপর শাস্ত্র আলোচনা করে ফিরে যেতেন।

এদিকে এক ভিক্ষু এক সপ্তাহ সমাধি পালন করে দেখলেন ভিক্ষার উপযুক্ত সময় হয়েছে। তখন তিনি ভাবলেন, 'আজ বারাণসীর শ্রেষ্ঠীর কাছে ভিক্ষা নেব।' হিমালয়ের বিশেষ হ্রদে (অনবতপ্তদ্রহে) হাত-মুখ ধুয়ে তিনি শুদ্ধ কাপড় পরলেন। যোগবলে আহরণ করলেন মাটির পাত্র। এদিকে বোধিসত্ত্ব তখন সবে সকালের ভালো মন্দ জল-খাবার খেতে যাচ্ছেন। ঠিক তখন আকাশপথে উড়ে এসে ভিক্ষু বোধিসত্ত্বের প্রাসাদ-লাগোয়া দানশালার কাছে দাঁড়ালেন।

বোধিসত্ত্ব ভিক্ষুকে দেখেই উঠে পড়লেন। নিজের অনুচরকে বললেন, 'আর্যের হাত থেকে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে এস।'

ঠিক তখন পাপী মার খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ভিক্ষু সাতদিন খান নি, আজও যদি না খেতে পাবেন, তাহলে তাঁর নির্ঘাৎ মৃত্যু হবে। তাহলে বোধিসত্ত্বের পুণ্য কাজেও বাধা দেওয়া হবে। এইসব ভেবে মার ভিক্ষুর সামনে এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড তৈরি করল। বোধিসত্ত্বের অনুচর ঐ আগুনের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ফিরে গেল। বোধিসত্ত্ব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে, তুমি ফিরে এলে কেন?' অনুচর বলল, 'প্রভু, রাস্তায় আগুনে-কুয়ো জ্বলছে।' আরো কয়েক জনকে পাঠানো হল। কিন্তু কেউই সেই আগুন পেরিয়ে যেতে পারল না।

বোধিসত্ত্ব চিন্তা করে বুঝতে পারলেন, 'এ সবই মারের চক্রান্ত, আজ দেখা যাবে মার আমার দানের বাধা কি করে হয়।' তারপর ভিক্ষুর জন্য খাবার নিয়ে সেই আগুনের সামনে গেলেন। ওপর দিকে তাকাতেই আকাশে মারকে দেখতে পেলেন।

'কে রে তুই?'

'আমি মার।'

'এই আগুন তুই জ্বেলেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'তোমাকে বাধা দেওয়ার জন্য আর ভিক্ষুকে মারার জন্য।'

'তোর কোন উদ্দেশ্যই সফল হবে না, এই দেখ ।'

বলে তিনি সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে পা বাড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে

আগুনের ভেতর থেকে আশ্চর্য এক মহাপদ্ম উঠে এল। বোধিসত্ত্ব তার ওপর দাঁড়িয়ে ভিক্ষুকে খাবার ঢেলে দিলেন। ভিক্ষু খাবার নিয়ে বোধিসত্ত্বকে মধুর কথা বললেন তারপর সেই পাত্রটি আকাশে উড়িয়ে দিয়ে সকলের চোখের সামনে নিজেও আকাশপথে হিমালয়ের দিকে উড়ে গেলেন। তাঁর চলে যাওয়ার রাস্তাটি নানা আকারের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ বলে মনে হল।

বোধিসত্ত্ব তখন ঐ মহাপদ্মের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে ধর্ম-কথা শোনালেন।

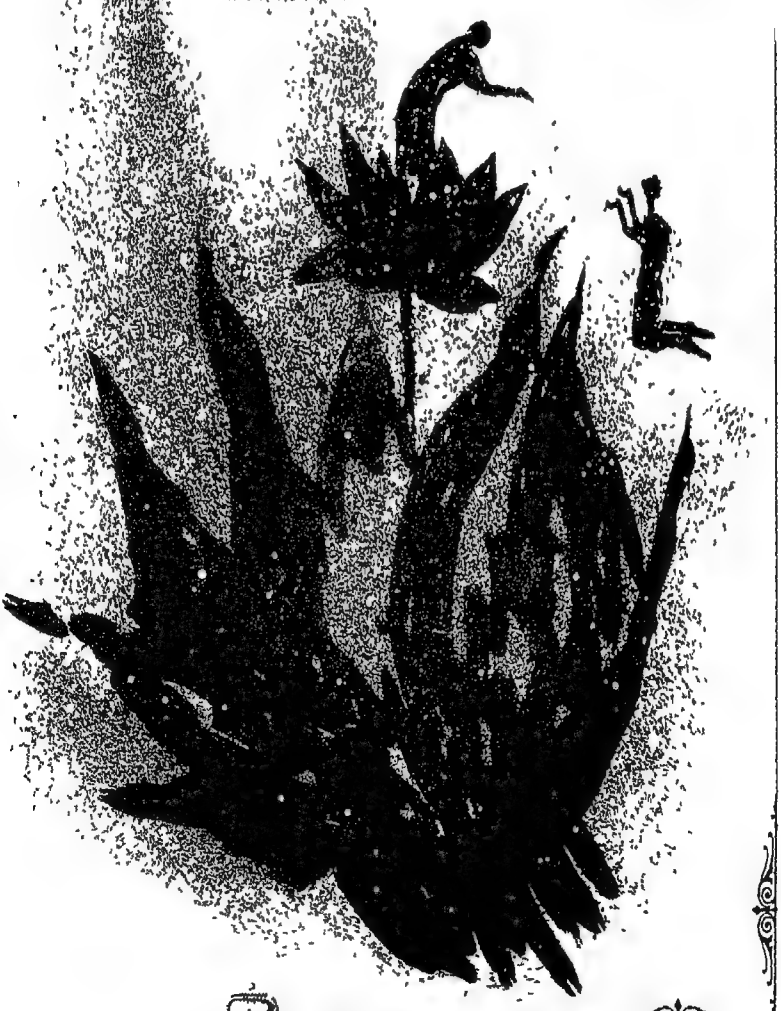

অশীন চিত্ত জাতক

ব্রহ্মদত্ত তখন বারাণসীর রাজা। নগর থেকে একটু দূরে তখন ছুতোরদের একটি গ্রাম ছিল। গ্রামটির নামও ছিল ছুতোরপাড়া। সেখানে পাঁচশ ছুতোর থাকত। নৌকায় চেপে নদী উজিয়ে তারা দল বেঁধে বনে যেত। সেখানে গিয়ে কাঠ কাটত। তারপর বনের মধ্যেই বাড়ি তৈরি করার জন্য দরকারি আড়া, তক্তা, খুঁটি তৈরি করে নিত। এভাবে একতলা, দোতলা, তিনতলা বাড়ির কাঠামো তৈরি করে তাতে নম্বর দিয়ে রাখত। তারপর নদীর তীরে এনে সব জড়ো করত। নৌকায় তক্তা বোঝাই করে নগরে ফিরে আসত। তারপর যার যেমন দরকার, সেই রকম ঘর বানিয়ে দিয়ে ন্যায্য দাম নিত। এরপর আবার বনে ফিরে যেত। এই ছিল তাদের রুটি-রুজির রাস্তা।

এখন একবার হল কি, ছুতোররা বনের মধ্যে কাঠ কাটছিল। তখন কিছু দূরে, বনের মধ্যে এক হাতির পায়ে খয়ের কাঠের কুচো ফুটল। খয়ের কাঠ সাংঘাতিক। হাতির পা ফুলে ঢোল হল। পূঁজ জমল। বেচারা ব্যথায় কাহিল। বনের মধ্যে কাঠ কাটার শব্দ পেয়ে সে ভাবল, 'এদের কাছে গেলে হয়ত কুচোটা বের করে দিতে পারবে।' তখন সে তিন পায়ে কোনরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুতোরদের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ছুতোররা তার ফোলা পা দেখে কাছে এল। চিমটে দিয়ে খয়ের কাঠের কুচো টেনে বের করল। তারপর গরম জলে ঘা ধুইয়ে দিল। পূঁজ বের করে দিল। এভাবে দিন কয়েক সেবার পর হাতির পা একেবারে সেরে গেল।

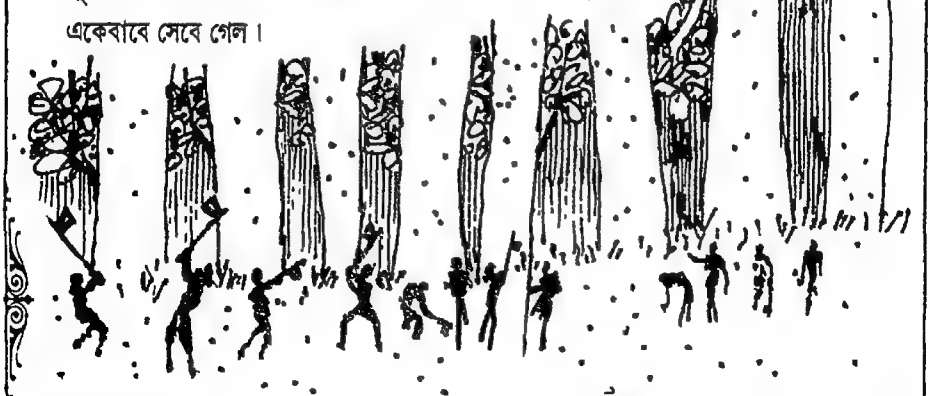

রোগ সারার পর হাতি ভাবল, 'ছুতোরদের জন্যই প্রাণে বেঁচেছি, আমারও উচিত ওদের জন্য কিছু করা।' এ কথা ভেবে সে ছুতোর-দের সঙ্গেই থেকে গেল। ছুতোররা যখন কাঠ কাটে, সে কাঠ বয়ে নিয়ে যায়। শুঁড়ে জড়িয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে আসে। কাঠের গুঁড়ো উল্টেপাল্টে দেয় ছিলার কাজের সময়। ছুতোররাও খাবার সময় প্রত্যেকে এক মুঠো করে ভাত দিত তাকে। ফলে সে পাঁচশ গ্রাস ভাত পেত।

এই হাতির একটা ছেলে ছিল। তার সারা শরীর সাদা। সব রকম মঙ্গলচিহ্ন ছিল তার শরীরে। আবার সে সেরা বংশেও জন্মেছে (আজানেয়)। হাতি ভাবল, 'আমি বুড়ো হয়েছি। এখন ছেলেকে এ কাজে লাগানো দরকার। তাহলে নিজে একটু ঘুরেফিরে বেড়াতে পারি।' এই ভেবে ছুতোরদের কিছু না জানিয়ে সে গভীর বনে চলে গেল। ফিরে এল ছেলেকে সঙ্গে করে। তারপর ছুতোর-দের বলল, 'আপনারা চিকিৎসা করে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। এ আমার ছেলে। চিকিৎসার দাম হিসাবে আমি আমার ছেলেকে আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি।'

তারপর থেকে সেই আজানেয় হাতিটি ছুতোরদের সঙ্গে থাকে। তাদের কাজে সাহায্য করে। ছুতোরদের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করে। জলকেলি করে।

একদিন দারুণ বৃষ্টিতে সব ভেসে গেল। ফলে ডাঙ্গা থেকে হাতির মল নদীতে ভেসে গেল। সেখান থেকে ভাসতে ভাসতে গেল বারাণসীর ঘাট। তখন রাজার হাতিদের স্নান করানোর জন্য ঘাটে আনা হয়েছিল। কিন্তু আজানেয় হাতির মলের গন্ধ পেয়ে কোন হাতিই জলে নামতে চায় না। সবাই পালাতে লাগল। মাহুতরা তখন হাতি বিশেষজ্ঞের (গজাচার্য) কাছে গেল। সব শুনে সে বলল, 'জলে নির্ঘাৎ কোন দোষ আছে। জল শোধন কর।' জল শোধন করতে গিয়ে তারা আজানেয় হাতির মল পেল। তখন তারা আসল ব্যাপার বুঝতে পারল। এক কলসী জলে আজানেয় হাতির মল ফেলে সেই জল হাতিদের গায়ে ছেটানো হল। এতে হাতিদের শরীর থেকে সুগন্ধ উঠে আসতে লাগল। গজাচার্য মহারাজকে এই বৃত্তান্ত জানিয়ে বলল, 'মহারাজ, এই দুর্লভ আজানেয় হাতিকে আনিয়ে আপনার হাতিশালে রাখলে মঙ্গল হবে।'

পরামর্শটি মহারাজের মনে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে লোক-লস্কর নিয়ে নৌকো সাজিয়ে ব্রহ্মদত্ত রওনা হলেন। আজানেয় হাতি তখন জলকেলি করছিল। ভেরীর শব্দ শুনে সে ছুতোরদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ছুতোররা ব্রহ্মদত্তকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করল, 'মহারাজ, আপনার কাঠের দরকার হলে তো লোক পাঠালেই চলত। নিজে কেন কষ্ট করতে গেলেন?' ব্রহ্মদত্ত বললেন, 'কাঠের জন্য আসি নি, আমি এই হাতিটির জন্য এসেছি।'

'এ তো আপনারই হাতি মহারাজ, যখন খুশি নিয়ে যান।'

ছুতোররা রাজাকে হাতি দিতে চাইলেও হাতি এক পা-ও নড়তে রাজি নয়। রাজা তখন হাতিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে হস্তীবর, তুমি কি চাও বল?' হাতি বলল, 'মহারাজ, এই ছুতোররা আমাকে খাওয়াতে গিয়ে এতদিন যা খরচ করেছে সেই টাকাটা দিয়ে দিন।' রাজা তাদের এক লক্ষ টাকা দিলেন। হাতি তবুও নড়ে না। রাজা তখন ছুতোর-ছুতোরের বউ, তাদের ছেলেমেয়ে সবাইকে নতুন কাপড় দিলেন। ছুতোরের বাচ্চাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। আজানেয় হাতি এবার যেতে রাজি হল।

রাজার হাতিশালে এসে সে মঙ্গলহস্তী হল। আরামে যত্নে তার দিন কাটে। সে রাজার বাহন। রাজাকে সে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতে শুরু করল।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। অকালে রাজা দেহ রাখলেন। বোধিসত্ত্ব তখন রাজমহিষীর গর্ভে। আজানেয় হাতিকে রাজার মৃত্যুর খবর জানানো হল না, কারণ তাহলে হাতি শোকে মারা যেতে পারে। এদিকে বোধিসত্ত্বের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় আসন্ন হয়ে এল। ঠিক তখন কোশলরাজ ব্রহ্মদত্তহীন বারাণসী দখল করার জন্য রাজ্য আক্রমণ করলেন। নগরবাসীরা নগরের মূল ফটক বন্ধ করে রেখে কোশল-রাজকে খবর পাঠাল, 'আমাদের রাজমহিষীর এক সপ্তাহের মধ্যে সন্তান হবে। এখন যুদ্ধ স্থগিত রাখুন। সন্তান কন্যা হলে আমরা স্বেচ্ছায় আপনাকে রাজ্য ছেড়ে দেব। পুত্র হলে যুদ্ধ করব।' কোশলরাজ ঠিক করলেন সাতদিন অপেক্ষা করবেন।

সাত দিন পরে বোধিসত্ত্ব জন্মালেন। ঘোর যুদ্ধ শুরু হল। সৈন্য বেশি থাকা সত্ত্বেও বারাণসীর সৈন্যবাহিনী দক্ষ সেনাপতির অভাবে হারতে লাগল। মন্ত্রীরা তখন রাজমহিষীকে গিয়ে বলল, 'অবস্থা খারাপ। আমরা হেরে যেতে পারি। আপনি ভেবে দেখুন, রাজার মঙ্গলহস্তী কোন বিপদের কথাই জানে না। রাজার মৃত্যু, কুমারের

জন্ম ও শত্রুর আক্রমণের কথা এখন তাকে জানানো দরকার কিনা।'

রাজমহিষী বললেন, 'হ্যাঁ, জানানো দরকার!' তারপর কুমারকে সাজিয়ে নিয়ে নিজেই মঙ্গলহস্তীর কাছে শুইয়ে দিয়ে বললেন, 'প্রভু আপনার বন্ধু আর ইহলোকে নেই। এই শিশু তাঁর পুত্র। কোশলরাজ নগর ঘিরে ফেলেছে, সে আপনার এই শিশুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছে। এখন আপনি হয় এই শিশুটিকে মেরে ফেলুন, নইলে শত্রু নিধন করুন।'

মঙ্গলহস্তী কুমারকে শুঁড় দিয়ে আদর করল। বন্ধুর শোকে চোখের জল ফেলল। তারপর দারুণ শব্দ করে যুদ্ধের জন্য তৈরি হল। মন্ত্রী ও অনুচররা তাকে যুদ্ধসাজে সাজিয়ে দিল নগরের ফাটক খুলে মঙ্গলহস্তীর সঙ্গে সঙ্গে বারাণসীর বীররাও যুদ্ধ করতে ছুটল। কিছুক্ষণের মধ্যে শত্রুর শিবির ভেঙে মঙ্গলহস্তী কোশল-রাজকে এনে বোধিসত্ত্বের পায়ের কাছে ফেলে দিল।

তখন অনেকেই কোশলরাজকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র তুলেছিল। মঙ্গলহস্তী তাদের ঠেকাল। আর কোশলরাজকে বলল, 'আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি মহারাজ। তবে সাবধান, কাশীরাজকুমার শিশু বলেই যে রাজ্য দখল করা সহজ এ কথা কখনও ভাববেন না।'

ময়ূর জাতক

সে অনেক দিন আগেকার কথা। বারাণসীতে তখন রাজত্ব করেছেন ব্রহ্মদত্ত। বোধিসত্ত্ব সেই সময় ময়ূর হয়ে জন্মান। তাঁকে দেখতে এত সুন্দর ছিল যে, একবার চোখে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। গায়ের রঙ ছিল সোনার মত উজ্জ্বল। ডানাদুটির নিচে লাল একটি দাগ ছিল।

বোধিসত্ত্ব সকাল-সন্ধ্যা সূর্যস্তব পাঠ করতেন। সমস্ত দিন চড়ে বিকেলে পাহাড়-চূড়ায় ফিরে আসতেন। সেখানে এসে বুদ্ধের গুণাবলী স্মরণ করতেন।

বারাণসীর এক ব্যাধ ঘুরতে ঘুরতে হিমবন্ত প্রদেশে চলে যায়। সেখানে দণ্ডক হিরণ্য পাহাড়ের চূড়ায় বোধিসত্ত্বকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখতে পায়। ফিরে এসে ঐ ব্যাধ তার ছেলেকে এই অপূর্ব ময়ূর সম্পর্কে অনেক কিছু বলল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে বারাণসী

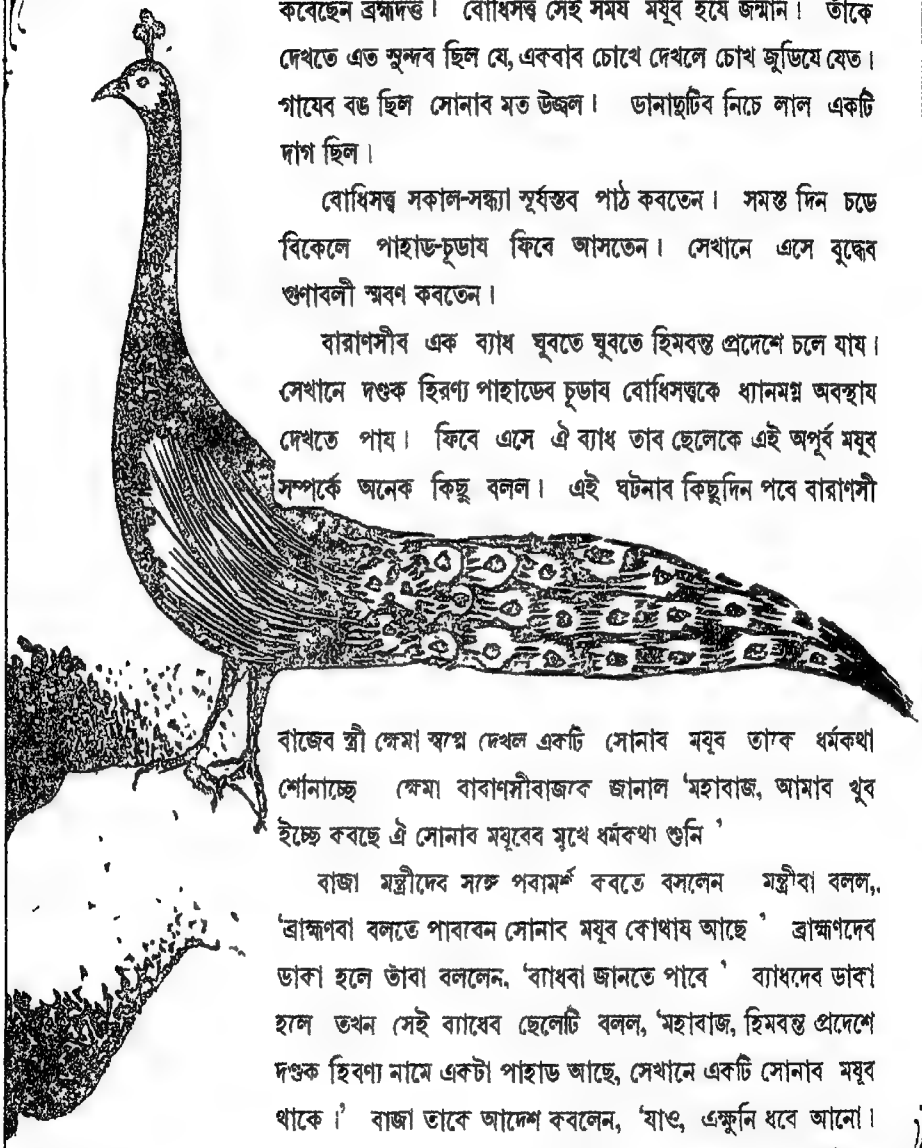

রাজের স্ত্রী ক্ষেমা স্বপ্নে দেখল একটি সোনার ময়ূর তাকে ধর্মকথা শোনাচ্ছে। ক্ষেমা বারাণসীরাজকে জানাল 'মহারাজ, আমার খুব ইচ্ছে করছে ঐ সোনার ময়ূরের মুখে ধর্মকথা শুনি।'

রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। মন্ত্রীরা বলল, 'ব্রাহ্মণরা বলতে পারবেন সোনার ময়ূর কোথায় আছে।' ব্রাহ্মণদের ডাকা হলে তাঁরা বললেন, 'ব্যাধরা জানতে পারে।' ব্যাধদের ডাকা হলে তখন সেই ব্যাধের ছেলেটি বলল, 'মহারাজ, হিমবন্ত প্রদেশে দণ্ডক হিরণ্য নামে একটা পাহাড় আছে, সেখানে একটি সোনার ময়ূর থাকে।' রাজা তাকে আদেশ করলেন, 'যাও, এক্ষুনি ধরে আনো। তবে দেখো তার গায়ে যেন আঘাত না লাগে। সুস্থ জীবন্ত অবস্থায় ধরে আনবে।'

ব্যাধের ছেলে গিয়ে ফাঁদ পাতল। আশ্চর্যের ব্যাপার, বোধিসত্ত্ব সেই ফাঁদ পা দিয়েও আটকা পড়লেন না। ব্যাধের ছেলে সাতবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। তারপর ব্যাধ হিমালয় অঞ্চলেই মারা গেল। রাণী ক্ষেমারও আশা পূর্ণ হল না। কিছুদিন পরে ক্ষেমাও মারা গেলেন।

সামান্য একটা ময়ূরের জন্য রাণী মারা যাওয়ায় রাজা খুব রেগে গেলেন। তিনি তখন রাজ্যময় একটি বাণী খোদাই করে দিলেন, 'হিমবন্তের কাছে দণ্ডক হিরণ্য পাহাড়ে এক সোনার ময়ূর থাকে। যে তার মাংস খাবে, সে-ই অজর-অমর হবে।' এর কিছুদিন পরে রাজারও মৃত্যু হল।

রাজার মৃত্যুর পর যিনি রাজা হলেন তিনি ঐ ঘোষণা পড়ে অজর, অমর হতে চাইলেন অমর হওয়ার আশায় তিনি-ও এক ব্যাধকে হিমালয়ে পাঠালেন এই দ্বিতীয় ব্যাধও ব্যর্থ হল। সে বছরের পর বছর চেষ্টা চালিয়ে গেল। শেষে সে-ও প্রথম ব্যাধের মতই একদিন মারা গেল। এরপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ—ছ জন রাজার রাজত্বকাল শেষ হল।

সপ্তম রাজা সিংহাসনে বসার পর আবার এক ব্যাধ সোনার ময়ূর ধরতে গেল। এই ব্যাধ বোধিসত্ত্বের দুর্বলতার সুযোগে তাঁকে ধরে ফেলল। রাজার কাছে নিয়ে এলে রাজা তো তাঁকে দেখে মুগ্ধ। তারপর সোনার ময়ূরের সঙ্গে রাজার এই রকম কথাবার্তা হল।

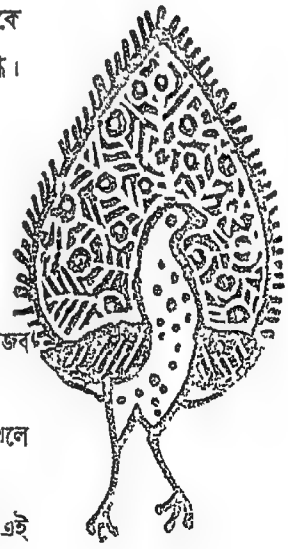

'মহারাজ, আমাকে ধরে এনেছেন কেন?'

'শুনেছি তোমার মাংস খেলে অজর অমর হওয়া যায়।'

'কিন্তু আমি তো মারা যাব।'

'তা যাবে।

'আমি যদি মরি তাহলে আমার মাংস খেয়ে লোকে কি করে অজর অমর হবে?'

'তোমার রঙ সোনার মত, তাই নাকি তোমার মাংস খেলে অজর অমর হওয়া যায়।'

'দেখুন, আমার সোনার রঙ এমনি হয় নি। এক কালে আমি এই নগরেরই রাজচক্রবর্তী ছিলাম। তখন খুব দান-ধ্যান করেছি তাই।'

'এর কোন সাক্ষী আছে?'

'আছে, মহারাজ।'

'কে সেই সাক্ষী?'

'যখন আমি রাজচক্রবর্তী ছিলাম তখন রক্তের তৈরি রথে আকাশে ঘুরে বেড়াতাম। সেই রথ মঙ্গল পুকুরের তলায় আছে, খুঁজে দেখুন।'

তারপর রাজা মঙ্গলপুকুরে খুঁজে সত্যি সেই রথ পেলেন। আর বোধিসত্ত্ব রাজাকে শিক্ষা দিলেন, 'মহারাজ, মহানির্বাণ ছাড়া এ জগতে সবই অসার।'

শূকর জাতক

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব একবার সিংহ জন্ম নেন। হিমালয় পাহাড়ের এক গুহায় থাকতেন তিনি। কাছেই ছিল একটি সরোবর। সেখানে এক পাশে এক পাল শূয়োর থাকত। আর এক দিকে ছিল তপস্বীদের কুটির।

সিংহরূপী বোধিসত্ত্ব একদিন একটা বুনো মেষ শিকার করে পেট ভরে খেলেন। তারপর সরোবরে গেলেন তেষ্টা মেটাতে। তখন বেশ মোটাসোটা একটা শূয়োর চড়ছিল সেখানে। জল থেকে ওঠার সময় বোধিসত্ত্ব তাকে দেখতে পেলেন। ভাবলেন, 'এটাকে একদিন খেতে হবে।' শূয়োর যদি একবার তাঁকে দেখে ফেলে তাহলে ভয়ে আর কখনও এদিকে আসবে না। এই কথা ভেবে বোধিসত্ত্ব গা ঢাকা দিতে চাইলেন। শূয়োরের নজর এড়িয়ে পা টিপে টিপে চলে যেতে লাগলেন।

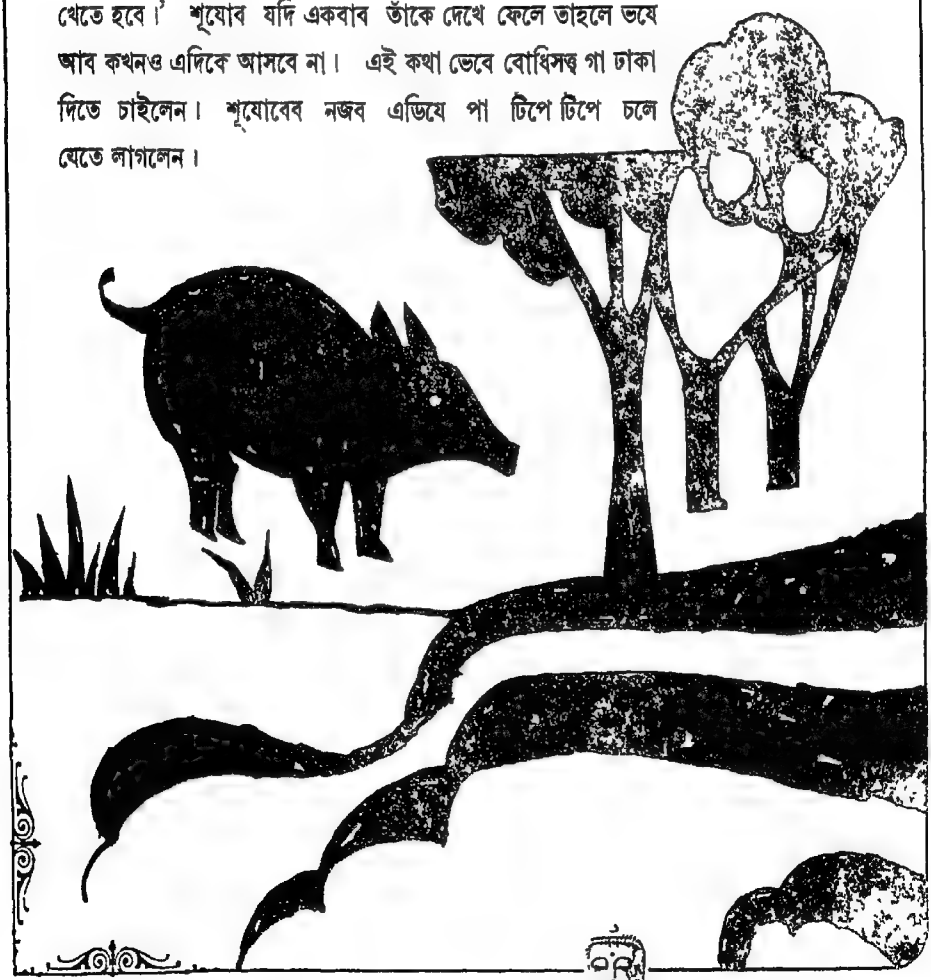

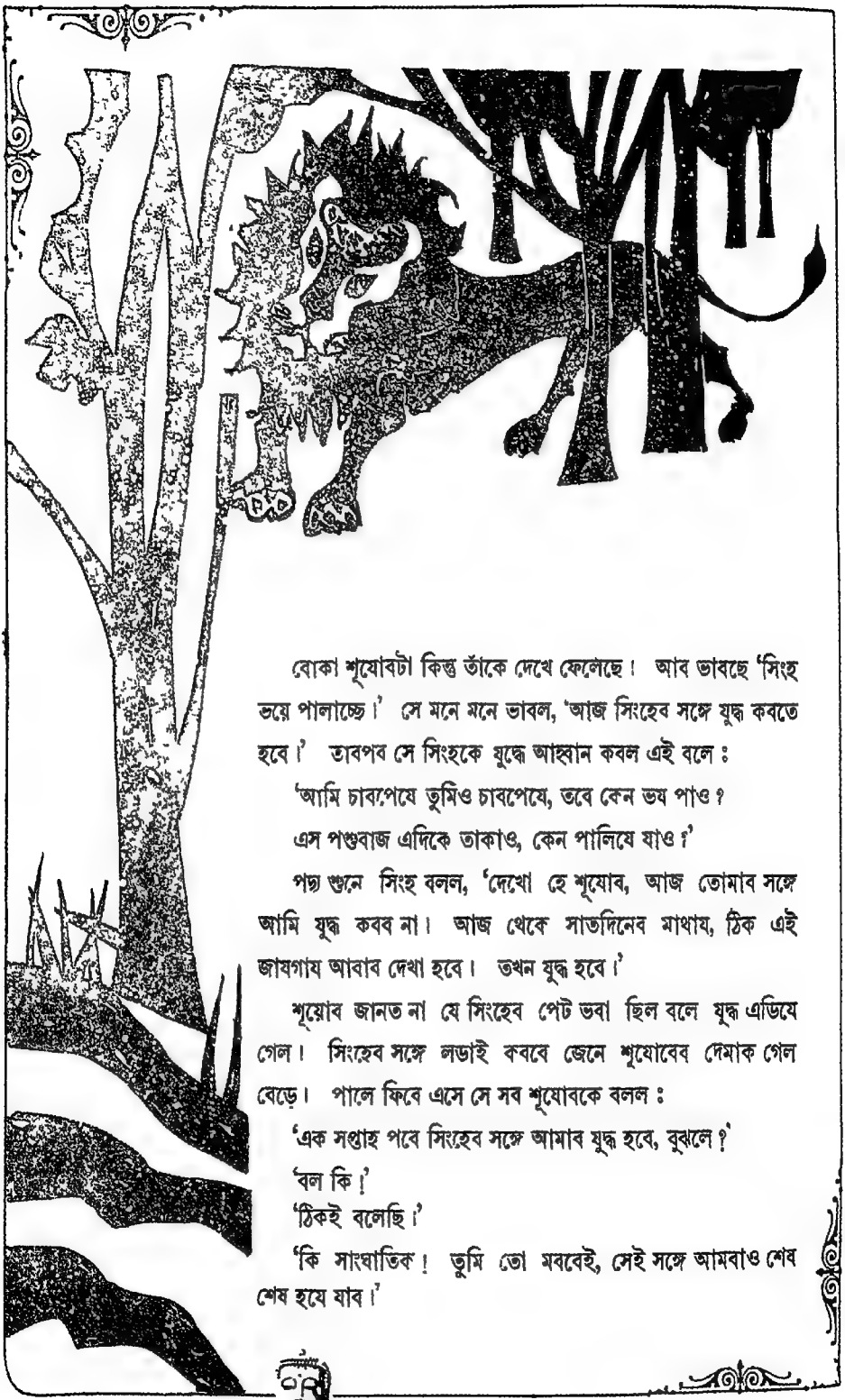

বোকা শূয়োরটা কিন্তু তাঁকে দেখে ফেলেছে। আর ভাবছে 'সিংহ ভয়ে পালাচ্ছে।' সে মনে মনে ভাবল, 'আজ সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।' তারপর সে সিংহকে যুদ্ধে আহ্বান করল এই বলে :

'আমি চারপেয়ে তুমিও চারপেয়ে, তবে কেন ভয় পাও ?
এস পশুরাজ এদিকে তাকাও, কেন পালিয়ে যাও ?'

পদ্য শুনে সিংহ বলল, 'দেখো হে শূয়োর, আজ তোমার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব না। আজ থেকে সাতদিনের মাথায়, ঠিক এই জায়গায় আবার দেখা হবে। তখন যুদ্ধ হবে।'

শূয়োর জানত না যে সিংহের পেট ভরা ছিল বলে যুদ্ধ এড়িয়ে গেল। সিংহের সঙ্গে লড়াই করবে জেনে শূয়োরের দেমাক গেল বেড়ে। পালে ফিরে এসে সে সব শূয়োরকে বলল :

'এক সপ্তাহ পরে সিংহের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হবে, বুঝলে ?'

'বল কি !'

'ঠিকই বলেছি।'

'কি সাংঘাতিক ! তুমি তো মরবেই, সেই সঙ্গে আমরাও শেষ শেষ হয়ে যাব।'

আত্মীয় বন্ধুর কথায় আস্তে আস্তে শূয়োরের চৈতন্য হল। তখন্ সে নিজেও ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। তাহলে এখন উপায়? শূয়োররা অনেক ভেবে চিন্তে বলল, 'তপস্বীরা যেখানে পায়খানা করে তুই সেখানে যা। এই সাতদিন শুধু সেখানে গড়াগড়ি দে। এক হপ্তা পরে সারা গায়ে দুর্গন্ধ নিয়ে সিংহ আসার আগেই লড়াইয়ের জায়গায় চলে যাবি। তারপর যেদিক থেকে বাতাস আসছে সেই দিকে দাঁড়াবি, যাতে সিংহ এলেই প্রথমে তার নাকে ঐ গন্ধটা যায়। সিংহরা খুব শুচিবায়ু হয়। ঐ গন্ধ একবার পেলে সে নিজেই হার স্বীকার করে নেবে।'

যেমন যেমন বলা হল শূয়োর ঠিক তাই করল। তারপর সাত দিনের মাথায় যুদ্ধক্ষেত্র হাজির হল। সিংহ বাতাসে কুট গন্ধ পেয়ে একবার নাক কুঁচকে শূয়োরকে বলল, 'ওহে বীর শূয়োর, তুমি জব্বর ফন্দি বের করেছ। সারা গায়ে যদি নোংরা না মাখতে তাহলে এক্ষুনি তোমাকে খুন করতাম। এখন তোমার নোংরা শরীরে আমি দাঁত বসাতে পারব না। এমন কি পা দিয়েও মারতে পারব না। বেশ কায়দা করে জিতে গেলে।'

সিংহ তারপর আহারের খোঁজে চলল। খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার সেই সরোবরে তেষ্টা মেটাতে এল। তারপর গুহায় ফিরে গেল। ওদিকে শূয়োর পালে ফিরে এসে খুব লাফাতে লাগল, 'সিংহকে আজ গো-হারা হারিয়েছি।' পালের অন্য শূয়োররা তার কথা কানে নিল না। সিংহের ভয়ে তারা সেই জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গেল।

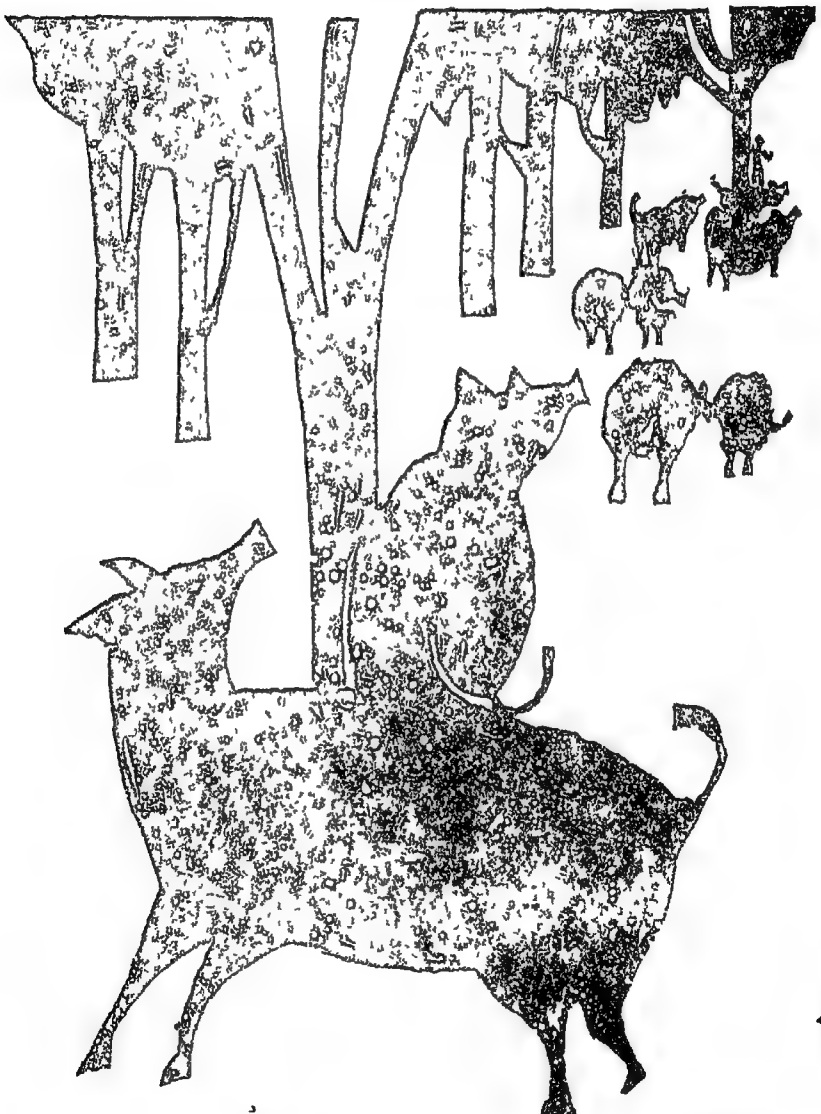

গুণ জাতক

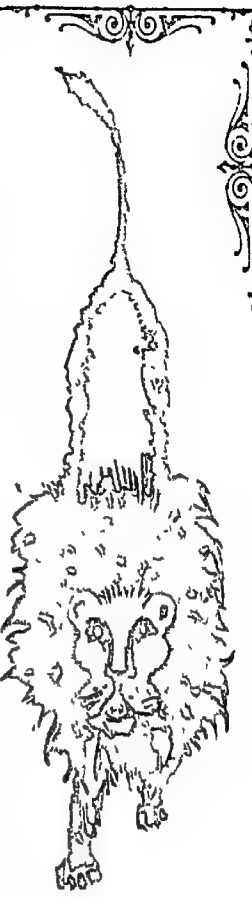

ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার সিংহ হয়ে জন্মান। তখন তাঁর আস্তানা ছিল পাহাড়ের এক গুহায়। একদিন গুহা থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের তলার দিকে তাকিয়েছিলেন। পাহাড়ের নিচের দিকে বিশাল এক সরোবর ছিল। তলায় জলকাদা থাকলেও সরোবরের কাছে তীরের খানিকটা জায়গার ওপরটা বেশ শক্ত হয়ে উঠেছিল। এমন কি সেখানে কচি ঘাসও গজিয়েছিল। বোধিসত্ত্ব দেখলেন সেখানে একটি হরিণ চরছে।

কোন রকম বিচার বিবেচনা না করে হরিণটাকে ধরার জন্য তিনি এক লাফ দিলেন। প্রাণের ভয়ে চিৎকার করতে করতে হরিণটা তো পালিয়ে গেল। ওদিকে বোধিসত্ত্ব পড়লেন মহা বিপদে। তাল সামলাতে না পেরে ওপরের শক্ত মাটি ভেঙে তিনি কাদায় পড়লেন। আস্তে আস্তে কাদায় ডুবে যেতে লাগলেন। বোধিসত্ত্বের বিপুল দেহ কাদায় ডুবে গেল। তাঁর চার পা চারটি স্তম্ভের মত অনড় হয়ে গেল।

এভাবে সাতদিন তিনি কাদায় বন্দী হয়ে রইলেন। সাতদিন কিছু খেতে পেলেন না। তখন এক শিয়াল খাবার খুঁজতে খুঁজতে তাঁর কাছাকাছি চলে আসে। বোধিসত্ত্বকে দেখামাত্র সে-ও প্রাণের ভয়ে দৌড় লাগাল। বোধিসত্ত্ব চিৎকার করে শিয়ালকে ডাকতে লাগলেন। শিয়াল তাঁর আর্ত চিৎকার শুনে কিছু দূর পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এল। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'শিয়ালভাই, তুমি পালিও না। আমি কাদায় আটকে গেছি, আমাকে বাঁচাও।' শুনে শিয়াল বলল, 'প্রভু, আমি হয়ত আপনাকে বাঁচাতে পারি, কিন্তু ভয় হচ্ছে।'

'কিসের ভয় ভাই?'

'আপনি ছাড়া পেলেই আমাকে মেরে ফেলবেন।'

'কোন ভয় নেই।

'অভয় দিচ্ছেন?'

'শুধু তাই নয়, ছাড়া পেলে আমি তোমার অনেক উপকার করব।'

তখন শিয়াল প্রথমে বোধিসত্ত্বের পাগুলোকে মুক্ত করল। গর্ত খুঁড়ে প্রায় কুয়ো করে ফেলল। মাটির তলা থেকে জল উঠে কাদা পাতলা হয়ে গেল। শিয়াল তারপর বোধিসত্ত্বের পেটের তলায় ঢুকে মাথা দিয়ে ঠেলতে লাগল, 'প্রভু, এবার ওঠার চেষ্টা করুন।' বিস্তর চেষ্টা করে বোধিসত্ত্ব কাদা থেকে মুক্ত হলেন। এক লাফে শুকনো ডাঙায় গিয়ে পড়লেন। তারপর স্নান করে কাদা ধুয়ে ফেললেন। পেটে তখন আগুন জ্বলছে। বোধিসত্ত্ব একটা বুনো মোষ মারলেন। তারপর ধারাল দাঁত দিয়ে খানিকটা মাংস খাবলে নিয়ে শিয়ালের সামনে রাখলেন, 'আগে তুমি খাও।' শিয়ালের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজে খাওয়া শুরু করলেন না।

দুজনের খাওয়া শেষ হলে শিয়াল এক টুকরো মাংস তুলে নিল। বোধিসত্ত্ব তখন শিয়ালকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই মাংসটা কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছ?' শিয়াল বলল, 'প্রভু, আপনার দাসীর জন্য।' তারপর বোধিসত্ত্বও সিংহীর জন্য মাংস নিলেন। শিয়ালকে বললেন, 'চল ভাই, প্রথমে আমার গুহায় যাই। সেখানে একটু জিরিয়ে তারপর তোমার বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাব।' তারপর প্রথমে নিজের গুহায় এলেন শিয়ালকে সঙ্গে নিয়ে। পরে শিয়ালের বাসায় গেলেন। শিয়ালের বউয়ের সঙ্গে গল্প করলেন। তারপর ঠিক করলেন, 'এরপর থেকে তোমরা আমার সঙ্গেই থাকবে। আমার গুহার পাশেই একটা গুহা ফাঁকা পড়ে আছে। সেখানে চল। তোমাদের রক্ষা করার ভার আজ থেকে আমি নিলাম।'

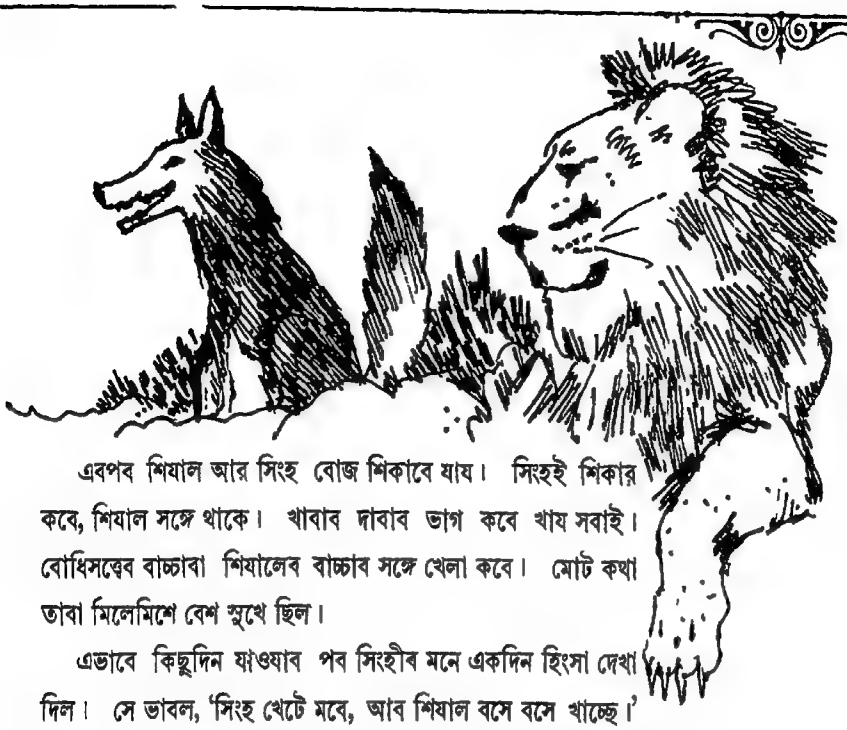

এরপর শিয়াল আর সিংহ রোজ শিকারে যায়। সিংহই শিকার করে, শিয়াল সঙ্গে থাকে। খাবার দাবার ভাগ করে খায় সবাই। বোধিসত্ত্বের বাচ্চারা শিয়ালের বাচ্চার সঙ্গে খেলা করে। মোট কথা তারা মিলেমিশে বেশ সুখে ছিল।

এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর সিংহীর মনে একদিন হিংসা দেখা দিল। সে ভাবল, 'সিংহ খেটে মরে, আর শিয়াল বসে বসে খাচ্ছে।' তার মনে হল সিংহ নিজের বাচ্চাদের চেয়ে শিয়ালের বাচ্চাদের বেশি ভালোবাসে একদিন সিংহ আর শিয়াল বেরিয়ে গেলে সে শিয়ালের বউকে অকথা-কুকথা বলল। বলল, 'দূর হয়ে যা, পরের ঘাড়ে বসে খাস লজ্জা করে না? বাচ্চাদের শিখিয়ে দিল শিয়ালের বাচ্চাগুলোকে জব্দ করতে।

শিয়াল ফিরলে তার বউ সব খুলে বলল। তখন শিয়াল বোধিসত্ত্বকে বলল, 'প্রভু, অনেকদিন আপনার গলগ্রহ হয়ে আছি, এবার ছুটি দিন। চলে যাই।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'কেন ভাই?'

শিয়াল তখন সিংহী যা যা বলেছে সব খুলে বলল। বোধিসত্ত্ব তখন সিংহীকে ডেকে বললেন. 'সেই যেবার আমি এক সপ্তাহ গুহায় ফিরিনি সেবার কি হয়েছিল জান?' সিংহী বলল, 'না।' বোধিসত্ত্ব তখন যা যা ঘটেছিল সব খুলে বললেন। তারপর বললেন, 'তবেই বুঝতে পারছ, শিয়াল যতই দুর্বল হোক, সে আমার কত বড় বন্ধু। সাবধান, এদের সঙ্গে কক্ষনো খারাপ ব্যবহার করবে না।'

তারপর থেকে ঐ দুই পরিবার মহা সুখে ছিল। বাচ্চারাও সবাই সবাইকে খুব ভালোবাসত। বাবা-মা মারা গেলে সিংহ আর শিয়ালের ছেলেমেয়েরা এই বন্ধুত্ব নষ্ট করে নি। শোনা যায়, সাত পুরুষ পর্যন্ত তাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল।

সুসীম জাতক

বারাণসীতে এক সময় সুসীম নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। বোধিসত্ত্ব সুসীমের পুরুত ঠাকুরের ছেলে হয়ে জন্মান। বোধিসত্ত্বের যখন ষোল বছর বয়স তখন তাঁর বাবা মারা যান। বোধিসত্ত্বের বাবা রাজার হস্তী মঙ্গলকারক ছিলেন। অর্থাৎ হাতির এক ধরনের উৎসব হতো হস্তীসূত্র বিশারদরা এই উৎসবের দেখাশোনা করত। এ বাবদ তারা প্রচুর উপহার ও টাকা পেত। হাতিকে সাজাবার জন্য যেসব বেশভূষা আনা হতো সেসবও হস্তী মঙ্গলকারক পেত।

যখনকার কথা বলা হচ্ছে সে সময় হস্তীমঙ্গলযোগ চলছিল। বোধিসত্ত্ব ছাড়া বারাণসীর সমস্ত ব্রাহ্মণ রাজার কাছে দল বেঁধে গেল। তারা রাজাকে বলল, 'মহারাজ, যোগ এসেছে। আপনি মঙ্গলোৎসব পালন করুন। আপনার পুরুতের ছেলে নিতান্তই বাচ্চা। সে তিন

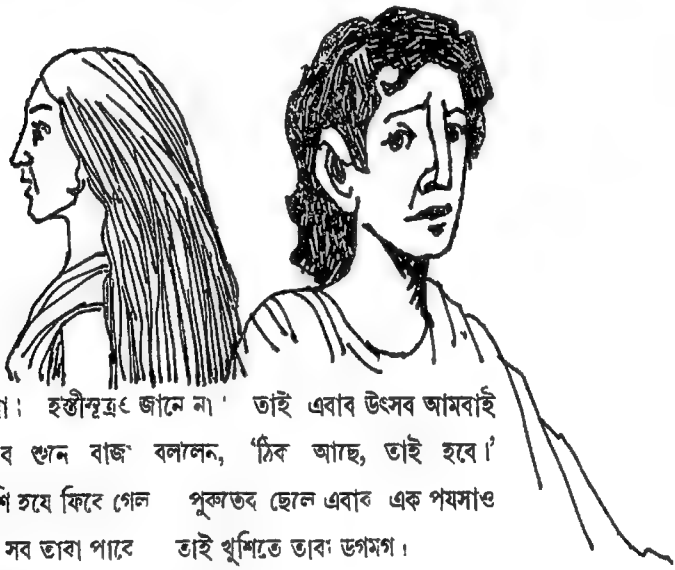

বেদ জানে না। হস্তীসূত্রও জানে না। তাই এবার উৎসব আমরাই দেখব।' সব শুনে রাজা বললেন, 'ঠিক আছে, তাই হবে।' ব্রাহ্মণরা খুশি হয়ে ফিরে গেল। পুরুতের ছেলে এবার এক পয়সাও পাবে না। সব তারা পাবে। তাই খুশিতে তারা ডগমগ।

বোধিসত্ত্বের মা খবর শুনে মুষড়ে পড়লেন। ভাবলেন, 'সাত পুরুষ ধরে এই আমাদের কুল ব্যবসা। এবার বোধহয় বংশ মর্যাদা গেল। টাকা পয়সাও যাবে কমে। আমাদের কি হবে?' বোধিসত্ত্ব মাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, তুমি কাঁদছ কেন?'

এই প্রথম আমাদের বংশের কেউ হস্তী মঙ্গলকারক হচ্ছে না।

'আমি হব।'

'বাবা, তুই তো আর তিন বেদ মুখস্থ করিস নি, হস্তীসূত্রও জানিস না।

'হস্তীমঙ্গলোৎসব কবে হবে মা?

'তিন দিন পরে।'

'তিন বেদ ও হস্তীসূত্রবিশারদ কে আছেন?'

'এখান থেকে দু হাজার মাইল দূরে তক্ষশিলায় এক আচার্য আছেন শুনেছি।'

'আমি সেখানে যাব।'

'কি করে যাবি বাছা?'

'যে ভাবেই হোক, বংশ গৌরব রাখতেই হবে।'

মাকে আশ্বস্ত করে বোধিসত্ত্ব রওনা হলেন। দু হাজার মাইল একদিনেই পেরিয়ে গেলেন তিনি। আচার্যের কাছে গিয়ে বললেন, 'প্রভু, আমি বারাণসী থেকে আসছি।'

'কেন?'

'তিন বেদ আর হস্তীসূত্র শিখতে।'

'বেশ, মুখস্থ কর।'

'কিন্তু প্রভু, আমার হাতে বেশি সময় নেই। আজ রাতের মধ্যে সব শিখতে হবে।'

'পারলে শিখে নাও।'

আচার্যের মত নিয়ে বোধিসত্ত্ব তখন হাত-পা ধুয়ে এলেন। দক্ষিণা হিসাবে আচার্যকে এক হাজার টাকা দিয়ে এক পাশে নম্রভাবে বসলেন। সারা রাত আচার্য তাঁকে শাস্ত্র শিক্ষা দিলেন। পরের দিন

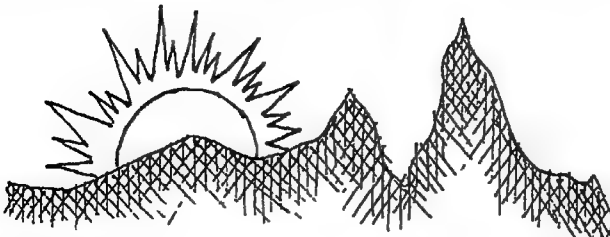

আকাশ তখনও লাল হয়ে ওঠেনি, বোধিসত্ত্ব আচার্যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গুরুদেব, আমার কি আর কিছু শেখার আছে?'

'না বাছা, তুমি তিন-বেদ আর হস্তীসূত্র, সবটাই শিখে ফেলেছ।'

আচার্যকে প্রণাম করে বোধিসত্ত্ব তখন বাড়িমুখো হলেন। একদিনের মধ্যে বারাণসীতে ফিরে এসে মাকে প্রণাম করলেন। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'বাছা,তোর ইচ্ছে পূরণ হয়েছে তো?' বোধিসত্ত্ব বললেন,'হ্যাঁ, বেদ আর হস্তীসূত্র আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।'

পরের দিন হস্তী মঙ্গলোৎসব। একশ হাতি সাজানো হয়েছে। সোনার পতাকা উড়ছে। ব্রাহ্মণরা নিশ্চিন্ত মনে ভাবছে 'আজ আমরাই মঙ্গলোৎসবের হোতা।' যথেষ্ট সেজেগুজে তারা এসেছে। বোধিসত্ত্বও যুবরাজের পোষাকে সেজে রাজার কাছে হাজির। তিনি মুখে মুখে পদ্য রচনা করে জানতে চাইলেন, 'মহারাজ, আপনি জানেন হস্তী মঙ্গলোৎসব পরিচালনা আমাদের বংশগত ব্যাপার। কিন্তু শুনছি এবার নাকি আমাকে তা করতে দেওয়া হবে না।'

রাজা সুসীম বললেন, 'আমি শুনেছি তুমি তিন বেদ আর হস্তীসূত্র জান না, তাই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

বোধিসত্ত্ব তখন গর্জন করে বললেন, 'এখানে দেখছি অনেক ব্রাহ্মণ উপস্থিত আছেন। ঠিক আছে, এঁদের মধ্যে যদি একজনও তিন বেদ আর হস্তীসূত্র আবৃত্তি করায় আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন তাহলে আপনি তাঁকে দিয়েই মঙ্গলোৎসব পরিচালনা করাবেন। ডাকুন, দেখি কে পারেন?'

ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজনও সাহস করে এগিয়ে এল না। তখন বোধিসত্ত্বই মঙ্গলোৎসব পরিচালনা করলেন। কুল মর্যাদা রক্ষা পেল। প্রচুর সম্পদ নিয়ে বোধিসত্ত্ব ঘরে ফিরলেন।

উপাসাঢ় জাতক

অনেককাল আগে রাজগৃহ নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ব্রাহ্মণ ও তার ছেলে এই ছিল ব্রাহ্মণের পরিবার। ঠিক সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব মগধে জন্মেছিলেন। তাঁরও জন্ম হয়েছিল এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। যথাসময়ে বেদ শাস্ত্র শিখে তিনি নানা বিষয়ে পারদর্শী হলেন। তারপর প্রব্রজ্যা নিলেন।

বোধিসত্ত্ব অনেক দিন হিমবন্ত প্রদেশে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। শেষে নুন আর টকের বড় অভাব দেখা দিল। তখন তিনি গৃধ্রকূটে পাতার ছাউনি দেওয়া এক কুঁড়েঘরে থাকতে লাগলেন।

ওদিকে রাজগৃহ নগরের সেই ব্রাহ্মণও তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গৃধ্রকূটে উপস্থিত। ঐ ব্রাহ্মণের বেশ বয়স হয়েছে। মৃত্যুর পর তাকে কোথায় দাহ করা হবে এ ব্যাপারে সে খুব চিন্তা করত। শ্মশানের ব্যাপারে তার খুঁতখুতে ভাব ছিল। একটি পবিত্র শ্মশানে মৃত্যুর পর তাকে দাহ করা হোক—এই তার ইচ্ছে। পবিত্র শ্মশান বলতে সে বুঝত সেটাকেই যেখানে আগে কাউকে দাহ করা হয় নি।

ব্রাহ্মণ তার ছেলেকে যখন এই শেষ ইচ্ছে জানাল তখন তার ছেলে খুব ফাঁপড়ে পড়ে গেল। অনেক ভেবে সে তখন বাবাকে বলল, 'তাহলে জায়গাটা আপনিই আমাকে দেখিয়ে রাখুন।' ঐ ব্রাহ্মণ গৃধ্রকূটে এসেছে সেই পবিত্র শ্মশানের খোঁজে। বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় চললেন ঠাকুর?'

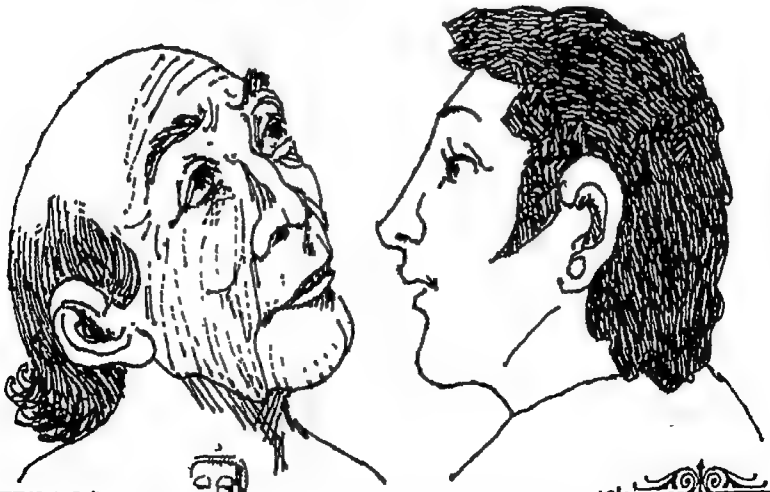

'পবিত্র শ্মশানের খোঁজে।'

'সেটা কোথায়?'

'ঐ পাহাড়ের চূড়ায়।'

'তাই নাকি? চলুন তো দেখে আসি।'

দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বোধিসত্ত্ব পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। ব্রাহ্মণ তিন পাহাড়ের মাঝে একটি সমতল জায়গার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ঐ যে ঐখানটা।'

বোধিসত্ত্ব তখন তাঁদের বললেন, 'এখানে যে কত শব দাহ করা হয়েছে তার কোন হিসেব নেই। তোমার পিতা, এই ব্রাহ্মণই তো একবার রাজগৃহ নগরের ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছিলেন উপসাচক নামে। সেবার তাঁকে এখানেই দাহ করা হয়েছিল। তবে এ-জায়গা সে-জায়গার কথা নয়, গোটা দুনিয়ায় এমন কোন জায়গা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় যেখানে কখনও শবদাহ করা হয় নি।'

তারপর তিনি তাদের এই ধর্মকথা শোনালেন: 'যেখানে সবাই মূল চারটি সত্য জানে, সব সময় ধর্মের পথে থাকে, সব সময়, সংযম ও অহিংসা আছে শুধু সেখানেই যমরাজের শমন ঢুকতে পারে না।'

শকুনঘ্নী জাতক

একবার বোধিসত্ত্ব চড়াই পাখি হয়ে জন্মান। খাবারের খোঁজে চষা ক্ষেতে ঘুরে বেড়াতেন। ক্ষেতে লাঙ্গল দেওয়ার ফলে বেশ কিছু পাথরের টুকরো ওপরে উঠে এসেছিল। পাথরের ঐ টুকরোগুলোর ফাঁকের মধ্যে তিনি খেলা করে বেড়াতেন। একদিন ঐ চষা ক্ষেত ছেড়ে তিনি খাবারের খোঁজে বনে গিয়েছিলেন। হঠাৎ এক শকুনের নজর পড়ল। শূন্য থেকে পাক খেয়ে নেমে এসে শকুন তাঁকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল।

শকুন যখন তাঁকে ধরে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে কাছাকাছি কোন গাছে বসে খাবে বলে, বোধিসত্ত্ব তখন কান্নার সুরে বলে চললেন: 'কি ভুল করলাম। আমার মাথায় যদি এক ফোঁটা বুদ্ধি থাকত। নিজের এলাকার বাইরে এলাম কেন? আজ যদি নিজের এলাকায় থাকতাম তবে শকুনের ক্ষমতায় কুলোত না আমাকে ধরা। এমন কি ও যদি হম্বিতম্বি করে আমার সঙ্গে লড়তে আসত তাহলেও এঁটে উঠতে পারত না।'

এ কথা শুনে শকুনের মেজাজ গেল বিগড়ে। সে বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁরে ব্যাটা চড়াই, কোনটা তোর এলাকা?'

'চষা ক্ষেত।'

'কোন্ দিকে?'

'ঐ দিকে।

'নে, তোকে ছেড়ে দিচ্ছি, দেখি সেখানে গিয়ে কেমন করে বাঁচিস।'

বোধিসত্ত্ব সঙ্গে সঙ্গে সেই চষা ক্ষেতে উড়ে গেলেন। বড় দেখে একটা পাথরের টুকরোর ওপর বসলেন। তারপর হম্বিতম্বি করে শকুনকে ডেকে বললেন, 'এবার এস, দেখি কেমন তোমার শক্তি।' শকুন ডানা ছড়িয়ে রাগে গরগর করতে করতে ঝড়ের বেগে ছুটে এল। শেষ মুহূর্তে বোধিসত্ত্ব পাথরের আড়ালে সরে গেলেন।

শকুন আর তখন বেগ সামলাতে পারল না। তার বুক পাথরে আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড ফেটে গেল। কোটর ঠেলে চোখদুটো বেরিয়ে এল। অতি দর্পে শকুনের ভবলীলা সাঙ্গ হল।

তিন্দুক জাতক

একবার বোধিসত্ত্ব বানর জন্ম নেন। তখন তিনি হাজার হাজার বানরের সঙ্গে হিমবন্ত প্রদেশে থাকতেন। বানরকুলের দলপতিও তিনিই। বানরদের এলাকার একটু দূরেই ছিল একটি গ্রাম। ঐ গ্রামে কখনও লোক থাকত, আবার কখনও গ্রামে একটিও লোক থাকত না। ঐ গ্রামের মাঝখানে ছিল একটি গাব গাছ। বানরের দল পাকা গাব ফল খুব ভালবাসে। বিশেষ করে এই গাছটিতে যেমন প্রচুর গাব ধরত, তেমনি ফলগুলোও হতো দারুণ মিষ্টি। গ্রামে লোক না থাকলে বানরের দল এসে মহানন্দে গাব খেয়ে যেত।

গাব গাছে একবার পাকা গাব হয়েছে প্রচুর। কিন্তু তখন গ্রামটিতে অনেক লোক আছে। তারা বাঁশ দিয়ে গাছটা ঘিরে ফেলল। কড়া পাহারা বসাল। গাছে তখন এত ফল যে ভার ভারে ডালগুলো পর্যন্ত নুয়ে পড়েছে।

গাব গাছে ফলের মরশুম আসায় বানররা তখন ভাবছে, 'আমরা তো ঐ গ্রামে গিয়ে গাব ফল খাই। একবার দেখে আসা দরকার কি রকম ফলন হয়েছে। গ্রামে লোকজন আছে কিনা।' এই ভেবে তারা এক বানরকে সরজমিনে দেখে আসার জন্যে পাঠাল। সে ফিরে এসে বলল, 'এবার ফল হয়েছে দেখার মত। তবে গ্রামে অনেক লোক ঘোরাফেরা করছে দেখলাম।'

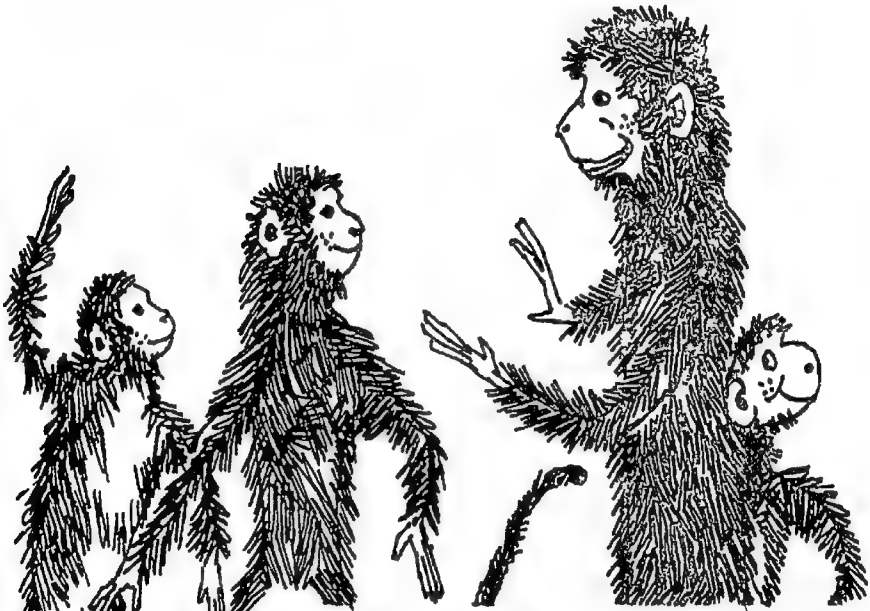

বানরের দল তখন মহানন্দে দলপতি বোধিসত্ত্বের কাছে গিয়ে বলল, 'প্রভু, আমরা ঐ মিষ্টি ফলগুলো খেতে যাব।'

তখন বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করলেন, 'গ্রামে লোকজন আছে?'

তারা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, অনেক লোক।'

বোধিসত্ত্ব উপদেশ দিলেন, 'তাহলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। মানুষরা হাজার রকমের কৌশল জানে।'

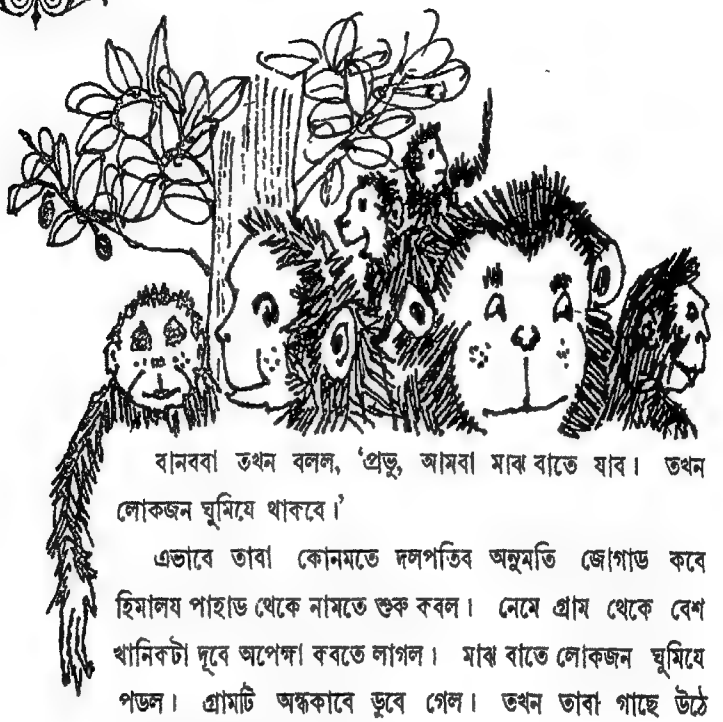

বানবরা তখন বলল, 'প্রভু, আমরা মাঝ রাতে যাব। তখন লোকজন ঘুমিয়ে থাকবে।'

এভাবে তারা কোনমতে দলপতির অনুমতি জোগাড় করে হিমালয় পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল। নেমে গ্রাম থেকে বেশ খানিকটা দূরে অপেক্ষা করতে লাগল। মাঝ রাতে লোকজন ঘুমিয়ে পড়ল। গ্রামটি অন্ধকারে ডুবে গেল। তখন তারা গাছে উঠে দিব্যি পাকা গাব খেতে লাগল।

ওদিকে মাঝ রাতে এক গ্রামবাসীর পায়খানা পেয়েছে। সে মাঠে যাওয়ার সময় বানরকুলকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে জাগিয়ে জানিয়ে দিল। তখন দলে দলে লোক তীর-ধনুক, লাঠি, টাঙি নিয়ে ছুটে গেল। গাছটাকে ঘিরে রেখে বলতে লাগল, 'সকাল হোক, তারপর এদের উচিত শিক্ষা দেব।'

বানবেব দল তাই দেখে ভযে কাঁপতে লাগল। তখন তাবা ভাবল, 'দলপতি বোধিসত্ত্ব ছাডা কেউ আমাদেব বাঁচাতে পাববে না।' বানবদেব মধ্যে একজন চলে গেল বোধিসত্ত্বকে খবব দিতে। সব শুনে তিনি বললেন, 'অত ভয পাওযাব কিছু নেই। মানুষেব কি একটা কাজ, তাদেব শত শত কাজ থাকে। আমবা এদেব জন্য এমন একটা কাজেব ব্যবস্থা কবব যে তাবা আব বানবদেব ব্যাপাবে মাথা ঘামানোব সময পাবে না।'

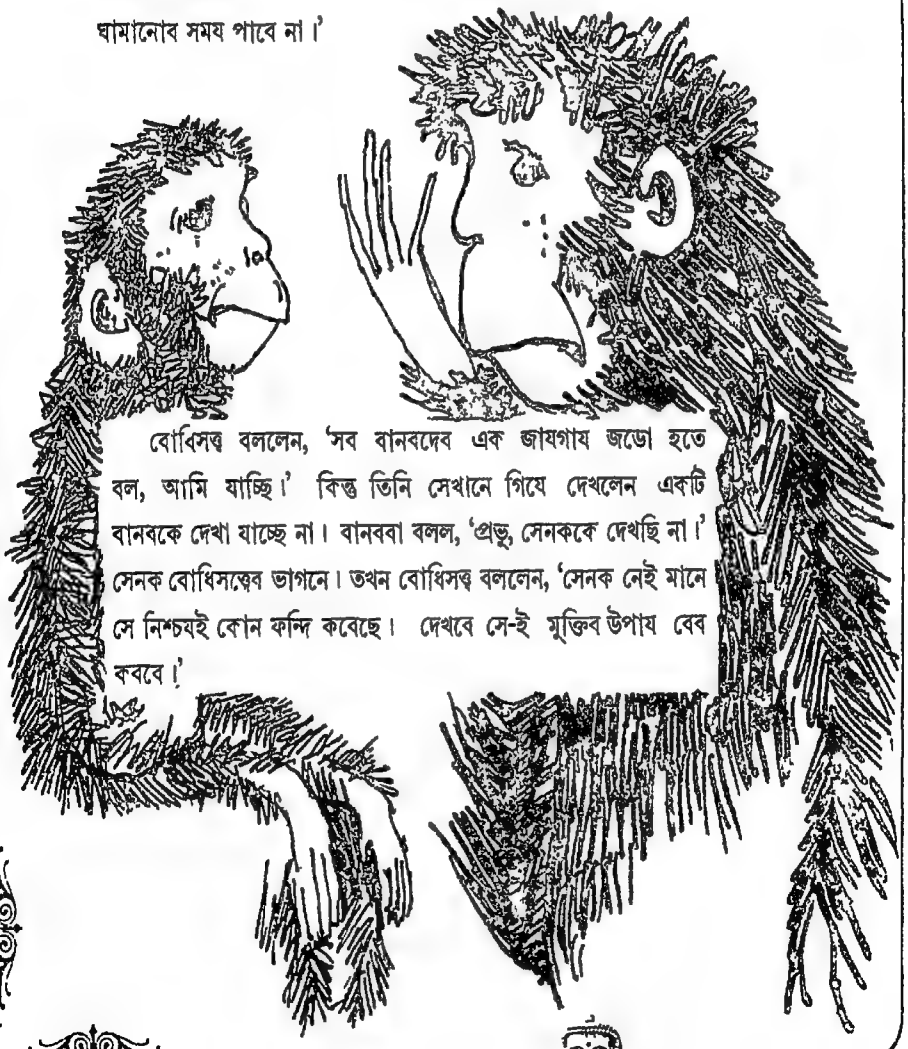

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'সব বানবদেব এক জাযগায জডো হতে বল, আমি যাচ্ছি।' কিন্তু তিনি সেখানে গিযে দেখলেন একটি বানবকে দেখা যাচ্ছে না। বানববা বলল, 'প্রভু, সেনককে দেখছি না।' সেনক বোধিসত্ত্বেব ভাগনে। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'সেনক নেই মানে সে নিশ্চযই কোন ফন্দি কবেছে। দেখবে সে-ই মুক্তিব উপায বেব কববে।'

ওদিকে হয়েছিল কি, বানরবা যখন ফল খেতে যাচ্ছিল তখন সেনকও দলে ছিল। অপেক্ষা করার সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙ্গার পরে যখন আবার যেতে শুরু করেছে তখন দেখে, লোকজন লাঠি সোটা নিয়ে বানরদের তাড়া করেছে। তার আর বুঝতে বাকি রইল না কি ঘটতে চলেছে। তখন সে হঠাৎ দেখতে পেল গ্রামে এক বুড়ি ঘরে আগুন জ্বেলে ঘুমোচ্ছে। সেনক তখন পা টিপে টিপে সেই জ্বলন্ত কাঠটি তুলে নিল। তারপর যেদিক থেকে বাতাস বইছিল, সেই দিকে গিয়ে কয়েকটি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল।

দেখতে দেখতে গ্রামটি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। লোকজন বানরদের কথা ভুলে সঙ্গে সঙ্গে আগুন নেভাতে ছুটে গেল। বানররা পালাবার সময় প্রত্যেকে সেনকের জন্য একটা করে পাকা ফল নিয়ে গেল।

কচ্ছপ জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার কুমোরকুলে জন্মান। মাটির হাঁড়ি কলসি বানিয়ে তিনি পেট চালাতেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ করতেন।

তখন বারাণসীর মহানদীর কাছে বিশাল এক বিল ছিল। বর্ষাকালে জল বেশি হলে এই বিল নদীর সঙ্গে মিশে যেত, আবার জল কমলে আলাদা হয়ে যেত।

মাছ আর কচ্ছপদের একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। তা দিয়ে তারা আগে থেকে বুঝতে পারে কোন বছর বৃষ্টি বেশি হবে, আর কোন বছর বৃষ্টি কম হবে। ঐ বিলের মাছ আর কচ্ছপরা একবার বুঝতে পারল, 'এ বছর বৃষ্টি হবে না, শুখা যাবে।' তাই যখন বিল আর নদী এক হয়ে গেল, তখন তারা বিল ছেড়ে নদীতে চলে গেল। সবাই চলে গেলেও এক কচ্ছপ কিন্তু নড়ে নি। তারা তাকে ডেকে বলল, 'এখানে থাকলে মরবে।'

সে বলল, 'বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে ছাড়তে পারব না। এখানে আমি জন্মেছি, এখানেই বড় হয়েছি। আমার বাবা, তার বাবা এখানেই জন্মেছে। আমি মরি তা ভালো, বিল ছেড়ে নড়ছি না।'

সূর্য এক সময় প্রখর হল। দারুণ গ্রীষ্মকাল এল। চরাচর যেন আগুনে পুড়ে যেতে লাগল। তখন ঐ বিলের জলও শুকোতে শুকোতে কাদায় ঠেকল, তারপর কাদা অবধি শুকোতে লাগল।

বোধিসত্ত্ব ঐ বিল থেকে মাটি কেটে নিয়ে যেতেন। তিনি ঠিক যে জায়গাটা থেকে মাটি কাটতেন সেখানটায় বেশ বড় একটা গর্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রাণের দায়ে বেচারা কচ্ছপ সেই গর্তে আশ্রয় নিল। পরের দিন মাটি কাটতে এসে বোধিসত্ত্ব কোদাল চালাতেই কচ্ছপের পিঠ ভেঙ্গে গেল। বোধিসত্ত্ব রোজ প্রথম কোপ মেরে পরে কোদাল দিয়ে মাটি তোলেন, সেই রকম ভাবে তুলতেই কোদালের মাথায় কচ্ছপ উঠে এল।

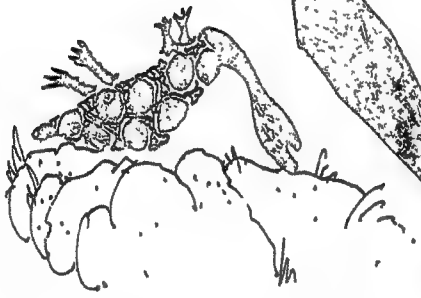

কচ্ছপ তখন মৃত্যুযন্ত্রণায় যায় যায়। মনে মনে ভাবছে, 'বাসস্থানের মায়ায় আটকে এখন মরতে বসেছি।' তারপর সে একটি পদ্যে বোধিসত্ত্বের কাছে নিজের দুর্ভাগ্য বর্ণনা করল।

কচ্ছপ মারা গেলে বোধিসত্ত্ব তাকে গ্রামের ভেতর আনলেন। তারপর গ্রামবাসীদের ডাকলেন। উপদেশ দেওয়ার জন্য বললেন,

'বিলেব জল শুকিযে যাবে জেনেও এই কচ্ছপটা বিল ছেডে যায নি। বাসস্থানের মাযায আটকা পডেছিল। তাই আজ এব এই হাল হযেছে। সাবধান, তোমবা কেউ এই কচ্ছপেব মত কোবো না।

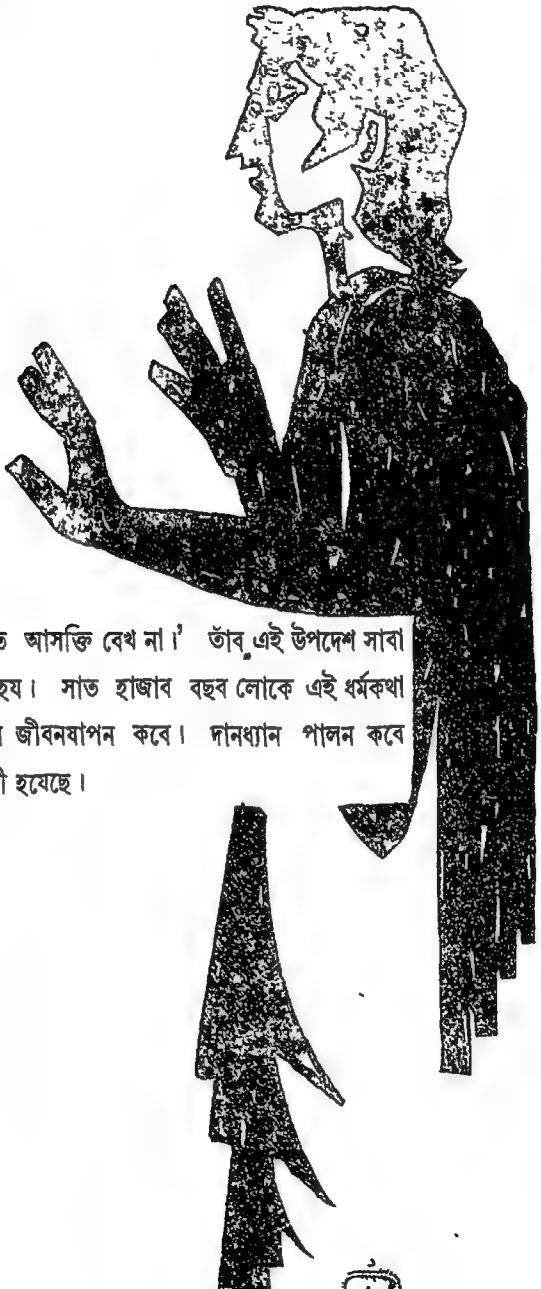

কোন কিছুব প্রতি এত আসক্তি বেখ না।' তাঁব এই উপদেশ সাবা ভাবতবর্ষে প্রচাবিত হয। সাত হাজাব বছব লোকে এই ধর্মকথা শোনে আব এইভাবে জীবনযাপন কবে। দানধ্যান পালন কবে তাবা সকলেই স্বর্গবাসী হযেছে।

অসদৃশ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার ব্রহ্মদত্তের ছেলে হয়ে জন্মান। জন্মানোর পর তাঁর নাম রাখা হল 'অসদৃশ কুমার।' বোধিসত্ত্বের সাত-আট বছর বয়স হলে তাঁর একটি ভাই হল। ব্রহ্মদত্তের দ্বিতীয় ছেলের নাম রাখা হল 'ব্রহ্মদত্ত কুমার।'

বোধিসত্ত্বের বয়স ষোল হতেই তিনি তক্ষশিলায় গেলেন লেখাপড়া শিখতে। সেখানে তিনি আচার্যের কাছে তিন বেদ আর আঠারোটি বিদ্যা শিখলেন। এ ছাড়া ধনুর্বিদ্যায় তাঁর পাণ্ডিত্য আর নৈপুণ্য হল অসাধারণ। এদিকে রাজা বয়সের ভারে ক্লান্ত, তাঁর মৃত্যুর সময় এগিয়ে আসছে। অসদৃশ কুমারকে যুবরাজের আসনে বসিয়ে রাজা দেহ রাখলেন।

রাজার মৃত্যুর পর অসদৃশ কুমার নিজে রাজা না হয়ে ভাইকে সিংহাসনে বসতে অনুরোধ করলেন। ছোট ভাই রাজত্ব করতে লাগল। দাদাও বেশ সুখেই দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু নতুন রাজার অনুচর আর বন্ধুরা তাকে বোঝাতে লাগল অসদৃশ কুমার গোপনে রাজা হওয়ার চেষ্টা করছেন। এদের কুপরামর্শে রাজা একদিন অসদৃশ কুমারকে গ্রেপ্তার করার জন্য সৈন্য পাঠাল। কিন্তু অসদৃশ কুমার তাঁর অনুচর মারফৎ আগেই তা জেনে রাজ্যত্যাগ করলেন। ভাইয়ের ওপর খুব বিরক্ত হয়ে অন্য এক রাজার রাজত্বে গেলেন।

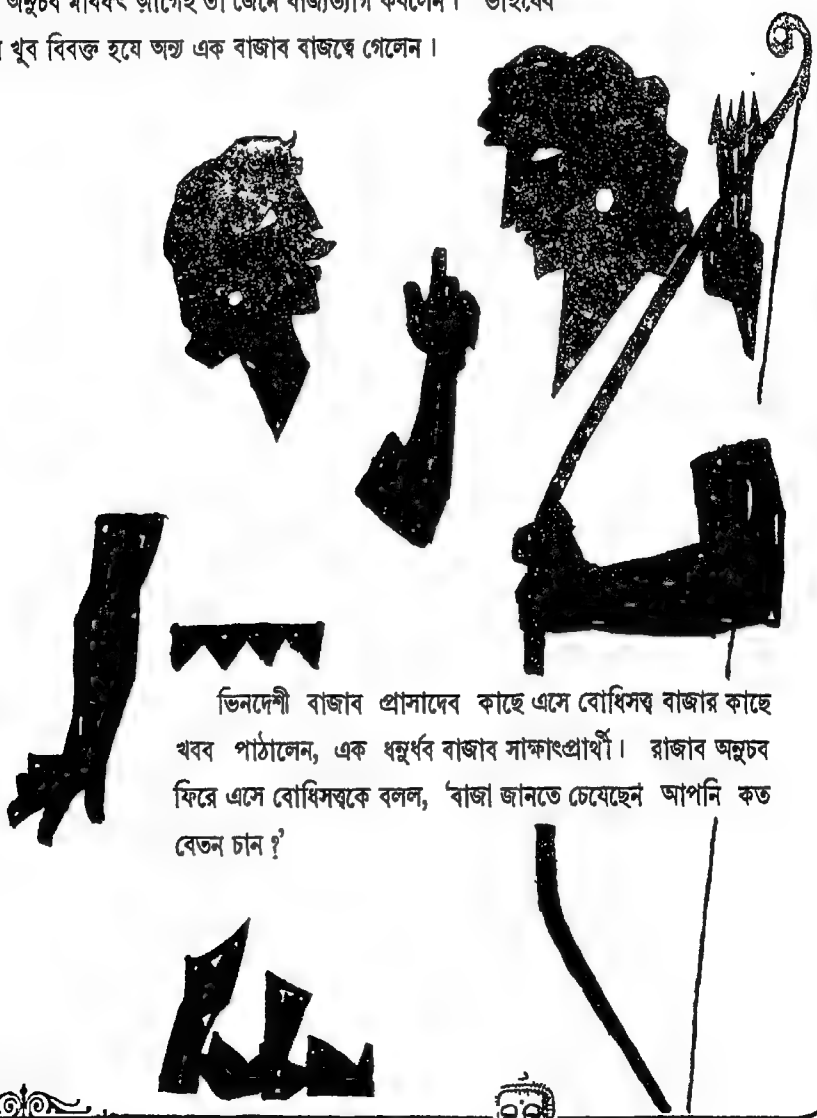

ভিনদেশী রাজার প্রাসাদের কাছে এসে বোধিসত্ত্ব রাজার কাছে খবর পাঠালেন, এক ধনুর্ধর রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী। রাজার অনুচর ফিরে এসে বোধিসত্ত্বকে বলল, 'রাজা জানতে চেয়েছেন আপনি কত বেতন চান?'

'বছরে এক লক্ষ টাকা।'

তখন রাজার আদেশ হল, 'ওকে ভেতরে আসতে বল।'

অসদৃশ কুমার রাজপ্রাসাদে ঢুকলেন। রাজা তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমিই কি সেই ধনুর্ধর?'

অসদৃশ কুমার জবাব দিলেন, 'আঁজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ।'

'ঠিক আছে, তুমি কাজে বহাল হলে।'

এদিকে রাজার আর সব ধনুর্ধররা এতে খুব চটে গেল। 'কোথা থেকে উড়ে এসে লোকটা আমাদের থেকে দ্বিগুণ টাকা পাচ্ছে' এই ছিল তাদের মনোভাব। যাই হোক, রাজা একদিন বাগান বিহারে বেরিয়েছেন। প্রাচীন এক আম গাছের তলায় রাজার জন্য জাজিম পাতা হয়েছে। রাজা সেখানে আধশোয়া হয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ এক থোকা পাকা আম তাঁর নজরে পড়ল। কিন্তু আমগুলো এত উঁচু আর সরু ডালে ঝুলছিল যে গাছে উঠে পেড়ে আনা সম্ভব নয়। রাজা তখন ধনুর্ধরদের ডেকে বললেন, 'তোমরা তীর দিয়ে ঐ আমের থোকা পাড়তে পারবে?'

ধনুর্ধররা বলল, 'দেখুন মহারাজ, কাজটা আমাদের কাছে মোটেই কঠিন নয়। আপনি তো এর আগে অনেকবারই আমাদের তীরন্দাজি দেখেছেন। কিন্তু নতুন যে ধনুর্ধর এসেছে সে তো আমাদের দ্বিগুণ বেতন পায়। একবার তার কাজের বহর দেখতে পেলে মন্দ হত না।'

রাজা তখন অসদৃশ কুমারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে ধনুর্ধর, তুমি কি ঐ আমের থোকাটা পাড়তে পারবে?' অসদৃশ কুমার বললেন, 'যদি দাঁড়াবার মত জায়গা পাই নিশ্চয়ই পারব।'

'কোথায় দাঁড়াতে চাও?'

'আপনার জাজিমের কাছে।'

রাজা অসদৃশ কুমারের জন্য জায়গা করে দিলেন। বোধিসত্ত্বের ধনুক তাঁর পোশাকের মধ্যে লুকোনো থাকত। তিনি মহারাজকে বললেন, 'এখানে আমার জন্য পর্দা খাটাতে আজ্ঞা দিন।' মহারাজ অনুচরদের সেইমত ব্যবস্থা করতে বললেন। পর্দা খাটানো হলে বোধিসত্ত্ব বেশবাস বদলে ধনুকে রশি লাগালেন। তীরে ফলা

লাগালেন। তারপর বেরিয়ে এলেন।

তীর ছোঁড়ার জায়গায় বীরবেশে দাঁড়িয়ে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, তীর যখন ওপর দিকে যাবে তখন আম কাটা যেতে পারে, আবার তীর যখন ফিরে আসবে তখনও আম কাটা যেতে পারে। এখন আপনি বলুন কিভাবে কাটা আপনার পছন্দ।'

রাজা বললেন, 'দেখ বাপু, তীর ওপরে ওঠার সময় আম কাটা হচ্ছে, ও আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু তীর ফিরে আসার সময় আম কাটা পড়েছে এরকম কখনও দেখিনি। তাই তুমি ঐ ভাবেই কাট।'

'মহারাজ, এই তীর অনেক ওপরে উঠবে, একেবারে দেবস্থান পর্যন্ত। তাই নামতে সময় লাগবে। একটু ধৈর্য রাখবেন। তাছাড়া তীর যাওয়ার সময় বৃন্তের মাঝখানে ফুটো করে চলে যাবে, নামার সময় ঐ ফুটো দিয়েই নামবে, তখন আমের থোকাটি সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। এখন দেখুন।'

তীরটি আমের বৃন্ত ফুটো করে চলে গেল। বোধিসত্ত্ব অপেক্ষা করতে লাগলেন। যখন বুঝলেন তীরটি স্বর্গের কাছে পৌঁছেছে তখন আরেকটি তীর ছুঁড়লেন প্রথম তীরকে ফিরিয়ে আনার জন্য। দ্বিতীয় তীর প্রথম তীরের লেজে ধাক্কা দিয়ে নিজে স্বর্গে উঠে গেল। দেবতারা সেই তীরটি ধরে রাখলেন।

প্রথম তীর পড়তে শুরু করেছে বিপুল গর্জনে। আশপাশের লোকজন ভয়ে কাঁপতে লাগল। বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ভয় নেই, যেখানকার তীর ঠিক সেখানেই ফিরবে।' আর সত্যি সেই ফুটো দিয়েই তীরটি নেমে এল, সঙ্গে এক থোকা আম। বোধিসত্ত্ব হাত দিয়ে লুফে নিলেন। মহারাজকে আমের থোকা দিলেন। লোকজন হৈ হৈ করে উঠল।

ওদিকে বোধিসত্ত্ব যখন ভিনদেশী রাজার আতিথ্যে দিব্যি আছেন তখন সাত রাজা তাঁর ভাইয়ের রাজ্য আক্রমণ করল। তাদের কাছে খবর ছিল অসদৃশ কুমার চলে গেছেন, তাই সহজেই রাজ্য জয় করা যাবে। বোধিসত্ত্বের ভাই তখন মহা বিপদে পড়ে দাদার কাছে লোক পাঠাল। তারা এসে বোধিসত্ত্বের পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

সব শুনে বোধিসত্ত্ব রাজার কাছে বিদায় নিয়ে বারাণসীতে ফিরে এলেন। তারপর একটি তীরের ফলায় লিখলেন, 'আমি অসদৃশ কুমার ফিরে এসেছি। এক তীরে তোমাদের সাতজনের প্রাণ নেব। যে-যে প্রাণ বাঁচাতে চাও, এক্ষুনি পালাও।' সাত রাজা তখন গোল হয়ে খেতে বসেছিল। তীরটা গিয়ে পড়ল তাদের খাবারের থালার মাঝখানে। তীরের ফলার লেখা পড়ে তারা পড়ি কি মরি করে

ছুটে পালাল।

এই সাত আক্রমণকারীকে হঠিয়ে দেওয়ার জন্য বোধিসত্ত্ব যে চমৎকার রাস্তা নেন তাতে রক্তপাত করতে হল না। এমন কি মশার পক্ষে যতটা রক্ত খাওয়া সম্ভব ততটুকু রক্তপাতও ঘটে নি। যাই হোক, এরপর তিনি তপস্যা করতে লোকালয় ছেড়ে চলে গেলেন।

দধিবাহন জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে কাশীতে চার ব্রাহ্মণ ছিল। তারা আবার চার ভাই। সংসারধর্ম করতে তাদের ভালো লাগল না। বেদ ও শাস্ত্র পাঠ সেরে তারা তপস্বী হল। হিমালয় অঞ্চলে কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকতে লাগল। সময় হলে বড় ভাই দেহ রাখল। সে দেবলোকে শক্র হয়ে জন্মাল। দেবলোকে থেকেও সে ভাইদের কথা ভুলতে পারে নি। সপ্তাহে একদিন তাদের খোঁজ নিতে আসত।

শক্র একদিন তার মেজ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এল। সুখ-দুঃখের গল্প করার পর শক্র তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ভাই, তোর কি দরকার বল, তোকে কিছু একটা দিতে ইচ্ছে করছে।' ঐ তপস্বী তখন ন্যারা রোগে ভুগছিল। শরীরে বল ছিল না। তাই বন থেকে কাঠ কেটে এনে আগুন জ্বালতে পারত না। সে তাই বলল, 'আমি আগুন চাই।' শক্র তখন তাকে একটি কুঠার দিয়ে বলল, 'তোমার কাঠের দরকার হলে এই কুঠারে চাপড় মেরে বলবে, 'কাঠ কেটে আগুন জ্বালো।' তাহলেই আগুন জ্বলে উঠবে।'

মেজ ভাইকে কুঠার দিয়ে শক্র সেজ ভাইয়ের কাছে গেল। তাকেও জিজ্ঞেস করল, 'ভাই, তোমার কি চাই বল।' এই তপস্বীর কুটিরের পাশ দিয়ে বুনো হাতি যাতায়াত করত। এই হাতিরা তার ওপর খুব অত্যাচার করত। সেজন্য সে বলল, 'দাদা, আপনি আমাকে হাতির হাত থেকে বাঁচান।' শক্র তখন তাকে একটি ভেরী দিল।

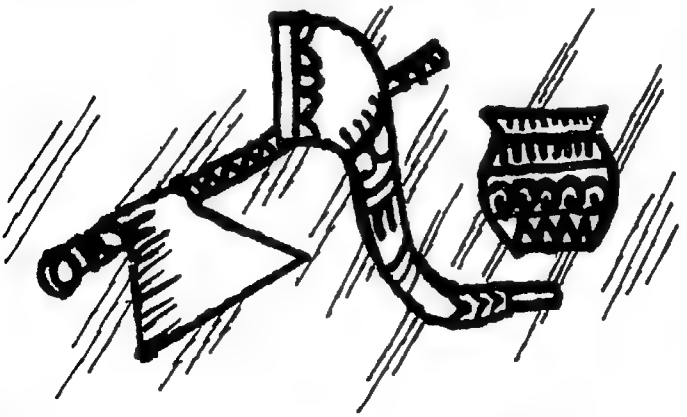

আর বলল, 'এই ভেরীর তলায় হাত দিলে তোমার শত্রুরা পালাবে। আর উল্টো দিকে হাত দিলে ঐ শত্রুরাই তোমার পরম বন্ধু হবে। তারা চতুরঙ্গ সেনা হয়ে তোমাকে ঘিরে দাঁড়াবে।'

সেজ ভাইকে ভেরীটি দিয়ে শক্র ছোট ভাইয়ের কাছে গেল। তাকেও জিজ্ঞেস করল, 'বল তোর কি চাই।' এই তপস্বীও ন্যারা রোগে ভুগছিল। সে বলল, 'দাদা, আমি দই খেতে চাই।' শক্র তখন ছোট ভাইকে একটা দইয়ের ভাঁড় দিল। তারপর তাকে বলল, 'দরকার হলে ভাঁড়টা উল্টো করে ধরবি। সঙ্গে সঙ্গে ভাঁড় থেকে দই উপচে পড়ে মহানদী বইতে শুরু করবে।' তারপর শক্র দেবলোকে চলে গেল।

তারপর থেকে বড় ভাই কুঠার দিয়ে আগুন জ্বালে, মেজ ভাই ভেরী বাজিয়ে হাতি তাড়ায়, আর ছোট ভাই দইয়ের ভাঁড় থেকে পেট পুরে দই খায়।

যখনকার কথা হচ্ছে, সেই সময় একটা শুয়োর এক বহু পুরনো গ্রামে খাবারের খোঁজ করছিল। হঠাৎ সে একটা আশ্চর্য মণি পেল। মণিটি মুখে তুলে নেওয়া মাত্র সে আকাশে উঠে গেল। আকাশে ওড়ার সময় সমুদ্রের মাঝখানে সে একটা দ্বীপ দেখতে পেল। দ্বীপের সবুজ ঘাস ও জলা জমি দেখে সে বেশ খুশি হয়ে গেল। ভাবল, 'এবার থেকে এই দ্বীপেই থাকব।' এই ইচ্ছে করা মাত্র সে মণির আশ্চর্য শক্তিতে ঐ দ্বীপে একটি গাছের তলায় নেমে এল।

ঠিক সেই সময়ে কাশীতে এক নিষ্কর্মা লোক ছিল। সংসারের কুটোটি পর্যন্ত সরাত না সে। এতে তার বাবা-মা বিরক্ত হয়ে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। সে বেচারা তখন ঘুরতে ঘুরতে এক বন্দরে হাজির হল। জাহাজে নাবিকদের চাকরের কাজ নিল। জাহাজ যখন মাঝ সমুদ্রে তখন তুমুল ঝড় উঠল। ঝড়ে জাহাজ গেল ডুবে। নিষ্কর্মা লোকটি তখন ভাসতে ভাসতে ঐ দ্বীপে গিয়ে হাজির।

ক্ষিধেয় কাতর হয়ে সে যখন দ্বীপের মধ্যে বুনো ফলের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন গাছের তলায় শুয়োরটাকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে তার নজরে পড়ল ঐ আশ্চর্য মণিটি। পা টিপে টিপে গিয়ে সে

মণিটা হাতে তুলে নিল। মণির আশ্চর্য গুণে সঙ্গে সঙ্গে সে আকাশে উঠতে লাগল। তখন সে মনে মনে ভাবল, 'আগে এই শুয়োরটাকে মেরে পেটের আগুন নিভিয়ে নেওয়া যাক।' এই কথা ভাবা মাত্র সে গাছের ওপরে আস্তে আস্তে নেমে এল। গাছে বসে একটা ডাল ভেঙ্গে শুয়োরের মাথায় ফেলল। এতে শুয়োরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে তাকাতেই শুয়োরটা যখন দেখল মণি নেই, তখন সে পাগলের মত ছোটাছুটি শুরু করল। তারপর গাছের মাথায় লোকটাকে দেখেই সে এক লাফ দিল। গাছে লেগে তার মাথা গেল ভেঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরটা মারা গেল। লোকটি তখন মহানন্দে আগুন জ্বেলে শুয়োরের মাংস পুড়িয়ে পেট ভরে খেল। তারপর মণি হাতে নিয়ে আকাশে উঠে গেল।

উড়তে উড়তে সে চলে এল হিমালয় পাহাড়ের কাছে। তখন সে ঐ তিন তপস্বীর কুটির দেখতে পেল। ভাবল, 'এখানে একটু নামা যাক।' সঙ্গে সঙ্গে সে বড় ভাইয়ের আশ্রমের কাছে নেমে এল। তপস্বীর কাছে দু-তিন দিন থাকল। তপস্বী অতিথির অনেক সেবাযত্ন করল। নিষ্কর্মা লোকটি যখন জানতে পারল এই তপস্বীর কাছে এক যাদু কুঠার আছে তখন সে ঐ তপস্বীকে বলল, 'প্রভু, আপনি আমার এই আশ্চর্য মণির বদলে ঐ কুঠারটা আমাকে দিন।' তপস্বী আকাশে ওড়ার লোভে তাকে কুঠারটি দিয়ে দিল। সে একটু দূরে গিয়েই কুঠারে চাপড় মেরে বলল, 'যা, তপস্বীর মাথা কেটে মণিটা নিয়ে আয়।' কথাটা বলতে যতটুকু সময় লেগেছে তার মধ্যেই কুঠার কাজ হাসিল করে ফিরে এল।

লোকটি এবার কুঠারটি এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে মেজ ভাইয়ের কুটিরে হানা দিল। দু দিনেই তার সঙ্গে ভাবসাব করে ফেলল। ভেরীর আশ্চর্য ক্ষমতা জেনে সে কুঠারের সাহায্যে দ্বিতীয় তপস্বীকেও মেরে ফেলল। এবার আশ্চর্য ভেরীটি তার হল। একই ভাবে দইয়ের ভাঁড়টিও বাগিয়ে নিল।

এর পর সে বারাণসীতে গেল। রাজার কাছে খবর পাঠাল, 'হয় যুদ্ধ কর, নইলে রাজ্য ছেড়ে দাও।' রাজা এই স্পর্ধা দেখে রেগে

আগুন। সৈন্যদের বলল, 'এক্ষুনি লোকটাকে বেঁধে নিয়ে আয়। ওর পাগলামি ঘুচিয়ে দিচ্ছি।' সৈন্যরা আসছে দেখেই ঐ নিষ্কর্মা ভেরীর দুদিক বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশে চতুরঙ্গ বাহিনী তৈরি হয়ে গেল। তারপর সে দইয়ের ভাঁড়টি উল্টে ধরল। দইয়ের মহাস্রোতে বারাণসীরাজের সৈন্যরা ডুবে ভেসে গেল। তখন সে কুঠারকে হুকুম করল, 'যা, রাজার মুণ্ডু কেটে আন।'

এভাবে সে বারাণসীর রাজা হল। তার নাম হল দধিবাহন। একদিন সে নদীতে স্নান করছে, এমন সময় একটি পাকা আম তার কাছে ভেসে এল। রাজা আমটি খেয়ে মুগ্ধ হল। তখন মালীকে আদেশ দিল, 'আঁটিটা পুঁতে দে।' আঁটি থেকে চারাগাছ হল। রাজা দধিবাহন নিজে ঐ গাছের গোড়ায় রোজ জল মেশান দুধ ঢালত।

একদিন গাছটি বিশাল হয়ে উঠল। প্রচুর ফলন হল।

আমগুলো যেমন মিষ্টি হল তেমনি খোশবাইও ছিল। দধিবাহন আশপাশের রাজাদের ঐ আম ভেট পাঠাত। তবে পাঠানোর আগে আমের আঁটির যেখান থেকে অঙ্কুর জন্মায় সেখানটা কাঁটা দিয়ে ফুটো করে দিত। ফলে আম খাওয়ার পর রাজারা আঁটিগুলো পুঁতলেও তা থেকে গাছ জন্মাত না। রাজারা তখন খোঁজখবর নিতে লাগল কেন আঁটি থেকে আমগাছ জন্মাচ্ছে না। তারপর যখন সব কিছু জানতে পারল তখন এক রাজা তার মালীকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'ওহে, দধিবাহনের আমগুলোকে তেতো করে দিতে পারবে?'

'হ্যাঁ মহারাজ, তা পারি।'

'তাহলে এই হাজার টাকা নিয়ে রওনা দাও।'

ঐ মালী বারাণসীতে গিয়ে রাজার কাছে খবর পাঠাল, 'একজন মালী এসেছে দেখা করতে।' দধিবাহন তাকে ডাকলে সে নিজের গুণপনা ব্যাখ্যা করে বলল। দধিবাহন তাকে বাগানের প্রধান মালীর সহকারী করল।

নতুন মালী এসে অকাল-ফল, অকাল-ফুল ফলিয়ে রাজার পেয়ারের লোক হয়ে গেল। প্রধান মালীর চাকরি গেল, নতুন মালীই

প্রধান মালী হল। প্রধান মালী হয়েই সে ঐ আম গাছের কাছে নিম আর গুলঞ্চ লতা লাগিয়ে দিল। নিমগাছ বড় হতে লাগল। আমগাছের শিকড়ের সঙ্গে নিমগাছের শিকড়, ডালের সঙ্গে ডাল জড়িয়ে গেল। গাছের আমের মধ্যে তেতো স্বাদ এল। নতুন মালী দেখল তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। সে তখন চুপি চুপি সরে পড়ল।

তারপর দধিবাহন বাগানে গিয়ে একদিন আম খেয়ে দেখল আম

তেতো হয়ে গেছে। মুখে দেওয়া যাচ্ছে না। বোধিসত্ত্ব তখন দধিবাহনের মন্ত্রী ছিলেন। দধিবাহন বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মন্ত্রী, বলুন তো আমার সাধের গাছের আম তেতো হল কি করে?' বোধিসত্ত্ব তখন নিম ও গুলঞ্চ লতার কথা বললেন। বললেন, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নরকবাস ঘটে।' দধিবাহন তখন সমস্ত নিমগাছ তুলে ফেলার হুকুম দিল। আগেকার মালীকে আবার ফিরিয়ে আনল।

শীলানিশংস জাতক

পুরাকালে কাশ্যপের আমলে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক নাপিত জাহাজে চড়ে যাত্রা করে। যাত্রার সময় নাপিতের বউ ঐ ব্রাহ্মণের হাতে স্বামীকে সঁপে দিয়ে বলল, 'প্রভু, সুখ-দুঃখ সব সময়েই আপনি আমার স্বামীর ভার নেবেন।'

যাত্রা করার সাত দিনের মাথায় জাহাজ গেল ডুবে। ভাঙ্গা জাহাজের পাটাতন ধরে ভাসতে ভাসতে তারা এক দ্বীপে এসে উঠল। নাপিত গোটাকয়েক পাখি শিকার করল। তারপর বেশ যত্ন করে মাংস রান্না করল। খেতে বসার আগে সে ব্রাহ্মণকে ডাকল, 'ঠাকুর, খাবেন আসুন।'

ব্রাহ্মণ বলল, 'আমি খাব না, তুমি খাও।'

মনে মনে তখন ব্রাহ্মণ ভাবছে, 'এখানে যে বিপদে পড়েছি তাতে ঠাকুরের নাম করা ছাড়া রাস্তা নেই।' তারপর শুধু ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করতে লাগল।

ব্রাহ্মণ যখন ভগবানের নাম করছিল তখন ঐ দ্বীপের নাগরাজ নিজের শরীর দিয়ে বিশাল এক নৌকো বানাল। সমুদ্রদেবতা হলেন

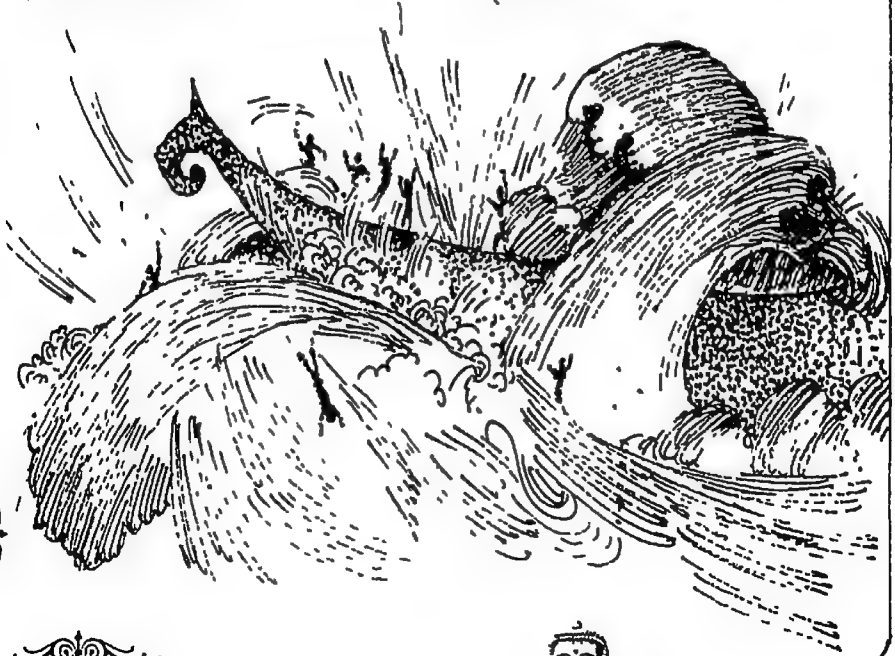

নৌকোর কাণ্ডারী। সোনা রূপো দিয়ে নৌকোর দাঁড়, ফলক, হাল তৈরি করা হল।

তারপর ঐ আশ্চর্য নৌকো নিয়ে সমুদ্র দেবতা দ্বীপের কাছে এসে চিৎকার করতে লাগলেন, 'তোমরা কেউ জম্বু দ্বীপে যাবে?'

ব্রাহ্মণ বলল, 'আমরা যাব।'

সমুদ্র দেবতা বললেন, 'এস, নৌকোয় ওঠ।'

ব্রাহ্মণ নিজে উঠে নাপিতকে ডাকলে দেবতা বললেন, 'ওকে নেব না।'

ব্রাহ্মণ বলল, 'কেন প্রভু?'

'কারণ, ও শীল অর্জন করে নি। এ নৌকো আমি তোমার জন্যে এনেছি, ওর জন্যে নয়।' তখন ব্রাহ্মণ বলল, 'তাহলে আমার দান-ধ্যান ও শীল রক্ষার ফল আমি ওকে দান করলাম।'

এরপর নাপিতকে নৌকোয় নিতে আর কোন বাধা রইল না। দুজনে বারাণসীতে পৌঁছল। সমুদ্র দেবতা দুজনকেই কিছু সম্পত্তি দান করলেন। সমুদ্র দেবতা চলে যাওয়ার সময় একটি পদ্য আবৃত্তি করলেন। তার সারমর্ম হল: সর্বদা পণ্ডিতের সংসর্গে থাকাই শ্রেয়।

বালাহাশ্ব জাতক

অনেককাল আগে তাম্রপর্ণী দ্বীপে শিবীষবস্তু নামে একটি নগর ছিল। সেখানে কোন মানুষ থাকত না। কেবল যক্ষিনীরা থাকত। উপকূলে জাহাজডুবি হলে তাদের মধ্যে উৎসব লেগে যেত। যক্ষিনীরা তখন সেজেগুজে তীরে আসত। তাদের সঙ্গে থাকত দাস-দাসী, ভালো মন্দ খাবার, আর কোলে থাকত শিশু।

ঐ অবস্থায় তারা বিপদগ্রস্ত বণিকদের সামনে হাজির হত। এদিকে মায়া দিয়ে ঐ প্রেত নগরে চাষ-বাস, আর গেরস্থালীর নানারকম চিহ্ন তৈরি করত। তারপর বণিকদের কাছে গিয়ে বলত, 'আপনারা খিদেয় কষ্ট পাচ্ছেন, এই নিন খাবার এনেছি।'

ক্লান্ত বণিকের দল তাদের হাতে খাবার খেয়ে বিশ্রাম করতে থাকলে তারা জিজ্ঞেস করত, 'কোথায় থাকেন? কোথা থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন? এখানে কি জন্য এসেছেন?' বণিকরা জবাব দিত, 'জাহাজডুবি হওয়ায় আমরা এখানে এসেছি।' তখন যক্ষিনীরা বলত, 'খুব ভালো কাজ করেছেন এখানে এসে। তিন বছর হল আমাদের স্বামীরা বাণিজ্য করতে জাহাজ ভাসিয়েছিলেন। আশঙ্কা হচ্ছে তাঁরা মারা গেছেন। আমরা অনাথা। এখন আপনাদেরই স্বামী পদে বরণ করতে চাই।'

আরও নানা ছলাকলা দেখিয়ে তারা বণিকদের যক্ষনগরে নিয়ে যেত। আগে যাদের বন্দী করেছিল তাদের মধ্যে কেউ বেঁচে থাকলে তাকে তখন মাটির নিচের কুঠরিতে বন্ধ করে রাখত। তারপর বণিকদের রক্ত চুষে খেত।

একদিন জাহাজডুবি ঘটায় পাঁচশ বণিক ঐ নগরের কাছে এসে পড়ে। যক্ষিনীরা ছলাকলায় ভুলিয়ে তাদের নগরের মধ্যে নিয়ে গেল। বয়সে বড় যে বণিক তাকে বিয়ে করল বয়স্কা যক্ষিনী আর ছোট বণিককে সব থেকে ছোট যক্ষিনী। এইভাবে পাঁচশ বণিক পাঁচশ যক্ষিনীকে বিয়ে করল। মাঝ রাতে বড় বণিকের যক্ষিনী বউ নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। মাটির তলার কুঠরিতে গিয়ে এক হতভাগ্যের রক্ত খেয়ে ফিরে এল। হঠাৎ ঘুমের ঘোরে বড় বণিকের হাত যক্ষিনীর গায়ে লাগল। বণিক দেখল তার শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা। বণিক বুঝল এ মানবী নয়, রাক্ষসী।

বণিক বুঝল এই পাঁচশ নারীর কেউই মানবী নয়। 'যে করে

হোক এখান থেকে পালাতে হবে' এই ভেবে পরের দিন সকালেই সে সঙ্গীদের সব খুলে বলল। সব শুনে আড়াইশ বণিক বলল, 'আমরা এদের বিয়ে করেছি। তাই এদের ছেড়ে পালাতে পারব না।' বাকি আড়াইশ বণিককে নিয়ে বড় বণিক পালাতে শুরু করল।

যে সময়কার কথা বোধিসত্ত্ব তখন ঘোড়া-জন্ম নিয়েছেন। তাঁর সারা শরীর সাদা। মাথাটি নিকষ কালো, আর অতি সুন্দর কেশরে ফুলে থাকত। বোধিসত্ত্ব আকাশ পথে যাতায়াত করতেন। হিমবন্ত অঞ্চল থেকে তিনি তাম্রপর্ণী দ্বীপে শালুক খেতে যেতেন। যাতায়াতের সময় তিনি রোজ তিনবার মানুষদের বলতেন, 'কেউ কি লোকালয়ে যেতে চাও?' বণিকরা ঐ ধ্বনি শুনতে পেয়ে বলল, 'প্রভু, আমরা যেতে চাই।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তাহলে আমার পিঠে ওঠ।' পিঠে জায়গায় কুলোল না বলে কেউ লেজ, কেউ কেশর, কেউ তাঁর পা ধরে ঝুলতে লাগল। তারপর বোধিসত্ত্ব প্রত্যেককে তাদের ঘরে পৌঁছে দিলেন।

বাকি বণিকদের কি হল? তারা অন্ধ মোহে প্রাণ হারাল। যক্ষিনীরা তাদের রক্ত খেয়ে খিদে মেটাল।

কুরঙ্গমৃগ জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার হরিণ জন্ম নেন। তিনি তখন সরোবরের তীরে বাস করতেন। ঐ সরোবরে এক কচ্ছপ থাকত। আর কাছাকাছি গাছে ছিল এক বক। বক আর কচ্ছপের সঙ্গে বোধিসত্ত্বের খুব ভাব। তিন বন্ধুর মধ্যে কখনও ছাড়াছাড়ি হতো না।

একবার এক ব্যাধ ঐ বনে বোধিসত্ত্বের পায়ের ছাপ দেখে ঠিক করল, 'হরিণটাকে বন্দী করতে হবে।' খুব শক্ত চামড়া দিয়ে সে একটা ফাঁস বানাল। তারপর ফাঁসটা সরোবরের তীরে বিছিয়ে রেখে গেল। বোধিসত্ত্ব চরতে এসে ফাঁদে পা দিলেন। তারপর হাজার চেষ্টা করেও মুক্ত হতে পারলেন না। তখন তিনি আর্তনাদ করতে লাগলেন। বোধিসত্ত্বের আর্ত চিৎকার শুনে কচ্ছপ আর বক এল।

কচ্ছপ ফাঁস কাটার দায়িত্ব নিল। আর বক উড়ে গেল ব্যাধের বাসায়। কেননা ঐ শক্ত চামড়া কাটতে ঢের সময় লাগবে। এর

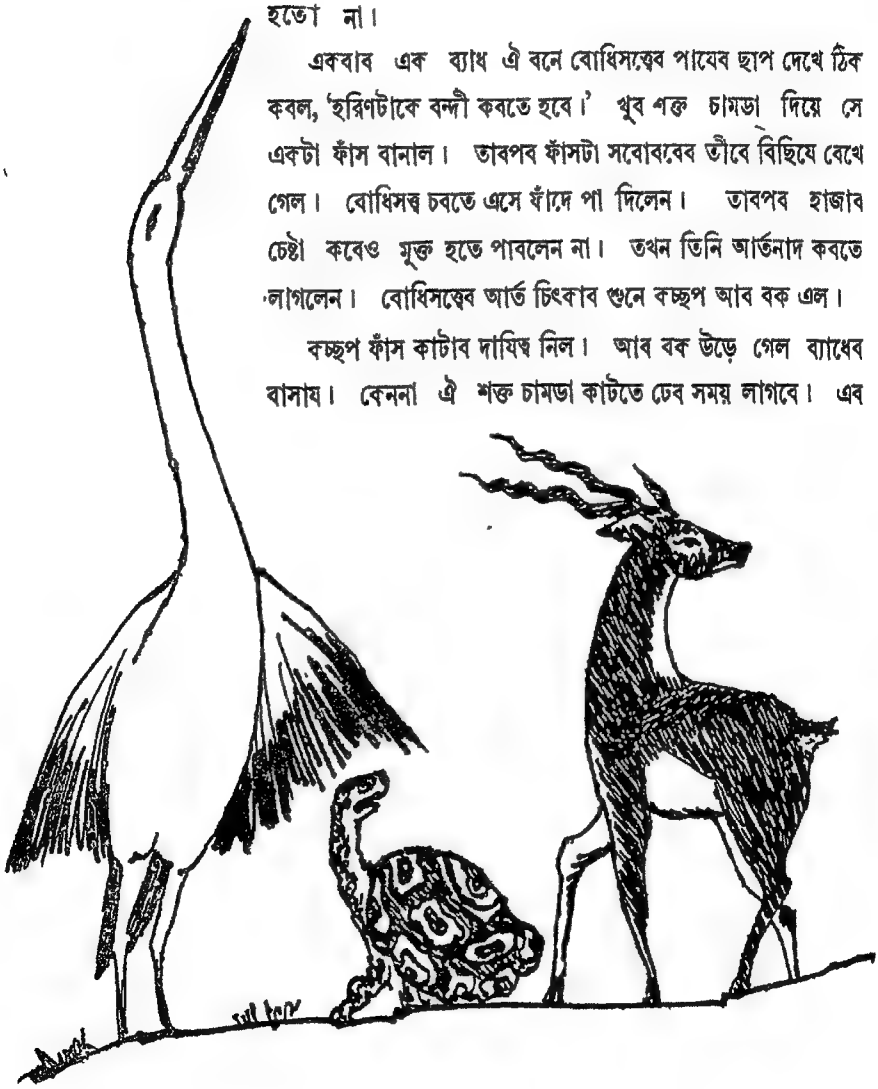

মধ্যে ব্যাধ এসে পড়লে রক্ষা থাকবে না। তাই ব্যাধকে আটকে রাখার দায়িত্ব পড়ল বকের ওপর।

ভোর হতেই ব্যাধ ধনুক আর অস্ত্র নিয়ে বেরোতে গেল। বক তখন হঠাৎ উড়ে গিয়ে তার মুখে ডানার ঝাপটা মারল। সাতসকালে এই বাধা অমঙ্গলের লক্ষণ। সেজন্য ব্যাধ ভাবল 'একটু বসে যাই।' তারপর সে সামনের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরোবে ঠিক করল। বকও বুঝতে পেরেছিল ব্যাধ এবার পেছনের দরজা দিয়ে বেরোবে। সেজন্যে সে পেছনের দরজার কাছে ঘাপটি

মেরে বসে রইল। ব্যাধ আবার বেরোনোর চেষ্টা করতেই সে আবারও তার মুখে ঝাপটা মারল। এভাবে সে ব্যাধকে অনেকক্ষণ আটকে রাখল। তবে শেষ পর্যন্ত পারল না।

বক তখন ফিরে এসে কচ্ছপকে বলল, ব্যাধ আসছে। কচ্ছপ ফাঁসটি প্রায় কেটে ফেলেছে তখন। ঐ শক্ত চামড়া কাটতে গিয়ে তার মুখ রক্তাক্ত হয়েছে। মুখ কেটে যাওয়ায় সে আর আগের মত জোর পাচ্ছিল না। বোধিসত্ত্ব নিজেই তখন মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলেন। শেষ বাঁধনও খুলে গেল। বোধিসত্ত্ব মুক্ত হলেন। বকও উড়ে গেল। কিন্তু কচ্ছপের আর চলার শক্তি ছিল না। ব্যাধ এসে তাকে ধরে থলের মধ্যে পুরে ফেলল। তারপর গাছে টাঙিয়ে রাখল থলেটা।

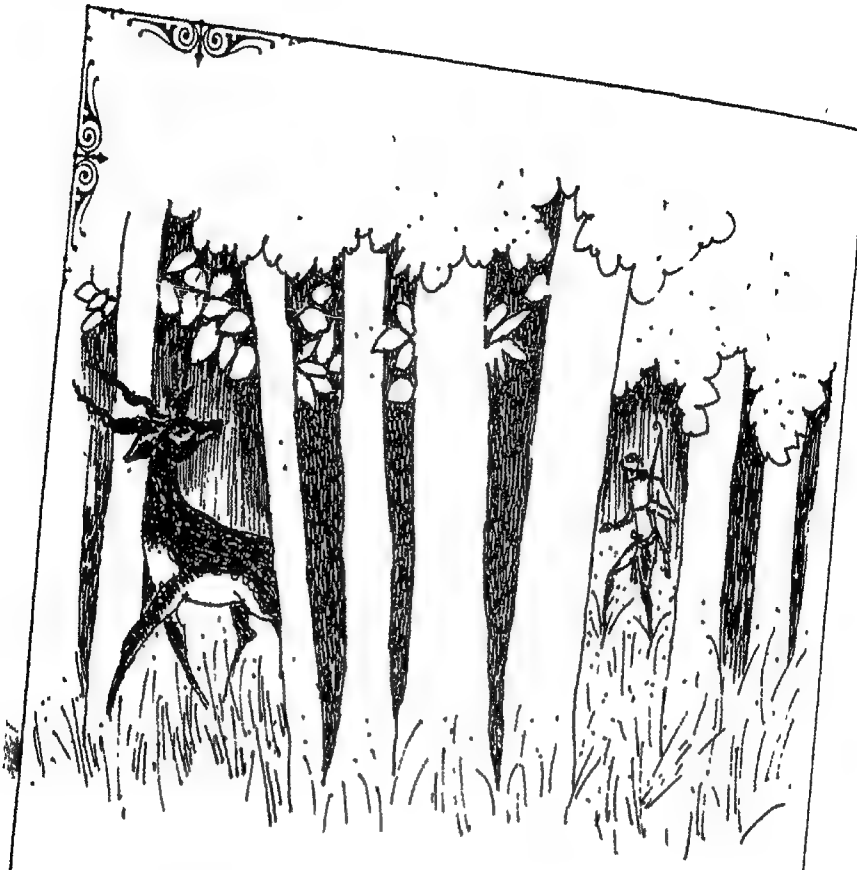

কিছুদূর গিয়ে বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারলেন কচ্ছপ ধরা পড়েছে। তখন তিনি ইচ্ছে করেই ব্যাধকে দেখা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধ তার পিছু নিল। ব্যাধকে বনের গভীরে এনে ফেলে বোধিসত্ত্ব মিলিয়ে গেলেন। ঘুরপথে কচ্ছপের কাছে এলেন। থলে থেকে কচ্ছপকে বের করলেন। তারপর বক আর কচ্ছপকে বললেন: 'ভাই, তোমাদের সাহায্যে আমি জীবন ফিরে পেয়েছি। এখন ব্যাধ আসছে তোমাদের ধরতে। ভাই বক, তুমি তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে পালাও। ভাই কচ্ছপ, তুমি তাড়াতাড়ি ডালে চলে যাও।'

ব্যাধ ফিরে এসে কাউকে পেল না। তখন থেকে এই তিন বন্ধু সারা জীবন একসঙ্গে আনন্দে থেকেছে। সময় হলে তাদের পশু জীবন শেষ হল। যে যেমন কাজ করেছে তার সেই রকম গতি হল।

অশ্বক জাতক ১৯

সে অনেক কাল আগেব কথা। কাশী বাজ্যেব পোতলি নগবে তখন অশ্বক নামে এক বাজা ছিলেন। বাজাব প্রধান বাণী ছিলেন উর্ববী। উর্ববী ছিলেন অসামান্যা সুন্দবী। বাজা অশ্বক তাঁকে প্রাণেব অধিক ভালবাসতেন।

কিছুদিন পবে হঠাৎ উর্ববীব মৃত্যু হল। এতে বাজা গভীব শোক পেলেন। দিন বাত কাঁদতে লাগলেন। কাজকর্ম, আহাব-বিহাব সমস্তই চুলোয গেল। বাজা উর্ববীব মৃতদেহে নানাবকম আবক মাখিযে একটা ডোঙাব মধ্যে বাখলেন। তাবপব সেই ডোঙা নিজেব খাটের তলায বেখে দিনবাত কান্নাকাটি কবতে লাগলেন। এভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল।

বোধিসত্ত্ব তখন হিমবন্ত প্রদেশে বাস কবেন। তপস্যা কবে সিদ্ধিলাভ কবেছেন। একদিন জ্ঞানচক্ষু মেলে গোটা জম্বুদ্বীপ লক্ষ্য কবছিলেন। তখন দেখতে পেলেন, বাজা অশ্বক শোকে মৃতপ্রায। বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'এব শোক দূব কবতে হবে।' এই ভেবে তিনি তপস্যাবলে আকাশে উঠলেন। তাবপব বাবাণসীব বাজাব বাগানে এসে সমাধিস্থ হলেন।

পোতলি নগরের এক ব্রাহ্মণ তখন রাজার বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে বোধিসত্ত্বকে দেখতে পেয়ে তাঁকে প্রণাম করে পাশে বসে পড়ল।

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা ভাই, তোমাদের রাজা ধার্মিক তো?'

'হ্যাঁ প্রভু। তবে তাঁর পত্নী মারা যাওয়ার পর তিনি শোকে মৃতপ্রায়। আপনি তাঁকে রক্ষা করুন।'

'দেখ বাপু, তোমাদের রাজার সঙ্গে তো আমার আলাপ নেই। তবে তিনি আমার কাছে এলে আমি তাঁকে বলে দিতে পারি তাঁর স্ত্রী এখন কোথায় জন্ম নিয়েছেন। এমন কি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলিয়ে দিতে পারি।'

'তাহলে প্রভু আমি রাজাকে আনতে চললাম। আমি না ফেরা পর্যন্ত দয়া করে আপনি এখান থেকে কোথাও যাবেন না।'

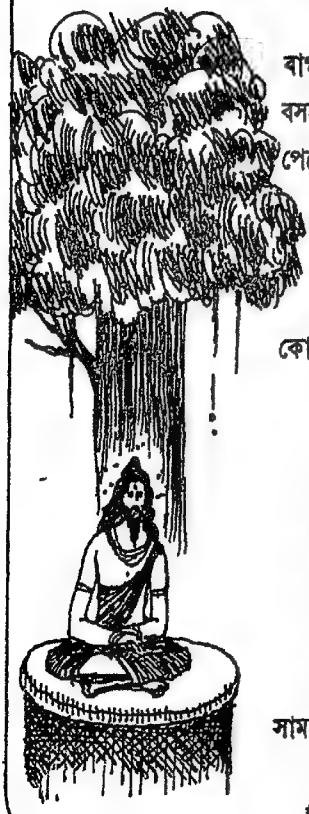

ব্রাহ্মণ রাজাকে গিয়ে সব কথা বলতে রাজা সঙ্গে সঙ্গে রথে উঠে বাগানের দিকে চললেন। বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে তাঁর এক পাশে বসলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রভু, আপনি কি সত্যি জানতে পেরেছেন সে এখন কোথায় জন্মেছে।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'হ্যাঁ মহারাজ, জানতে পেরেছি।'

'কোথায় তার পুনর্জন্ম হয়েছে?'

'আপনার স্ত্রীর খুব গুমোর ছিল। সে কর্তব্যে অবহেলা করেছিল। কোন রকম সৎ কাজও সে করে নি।'

'প্রভু, আপনি আমাকে শুধু বলুন সে এখন কোথায় জন্মেছে।'

'সে এই বাগানেই আছে।'

'কোথায় প্রভু?'

'গুবরে পোকা হয়েছে।'

'বিশ্বাস করি না।'

'এক্ষুনি বিশ্বাস হবে। সে কথা বললেই বিশ্বাস হবে।'

বোধিসত্ত্ব তখন বললেন, 'ওহে গুবরে পোকা, একবার রাজার সামনে এস দেখি।' বোধিসত্ত্বের তপস্যার শক্তিকে পোকারা এড়াতে

পারল না। দুটো গুবরে পোকা এগিয়ে এল। বোধিসত্ত্ব আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ যে দুটো পোকা আসছে, এর মধ্যে পেছনের পোকাটা হল আপনার স্ত্রী উর্ববী।' তবু রাজার বিশ্বাস হচ্ছে না দেখে বোধিসত্ত্ব পোকাটাকে কথা বলার ক্ষমতা দিলেন। তারপর ডাকলেন, 'উর্ববী!'

পোকা বলল, 'আজ্ঞা করুন প্রভু!'

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, 'আগের জন্মে তোমার নাম কি ছিল?'

পোকা জবাব দিল, 'উর্ববী।'

'এখন তুমি কাকে ভালোবাস, অশ্বকরাজকে না কি ঐ গুবরে পোকাটাকে?'

'প্রভু, সে তো পূর্বজন্মের কথা। এখন রাজা আমার কেউ নন। পারলে রাজার রক্ত দিয়ে আমার এ জন্মের স্বামী ঐ পোকার গা রাঙিয়ে দিতাম।'

সব দেখে শুনে রাজা শোকের নাগপাশ থেকে মুক্ত হলেন। আগে এত কষ্ট পেয়েছেন বলে তাঁর খুব অনুশোচনা হল। অনুচরদের আদেশ দিলেন খাটের তলা থেকে রাণীর মৃতদেহ বের করে দাহ করতে। নিজে ডুব দিয়ে স্নান করে এসে নতুন জীবন ফিরে পেলেন। অপ্রমত্ত হয়ে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

শিশুমার জাতক

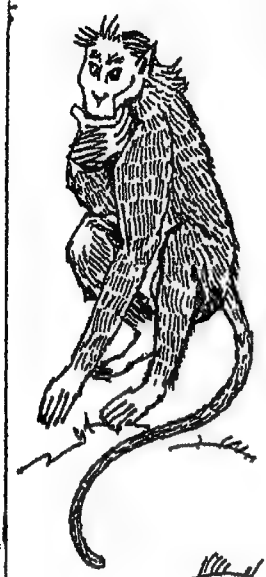

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার বানর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর শরীর ছিল বিশাল। আর তাতে হাতির সমান শক্তি ছিল। গঙ্গার কাছাকাছি এক বনে তিনি বাস করতেন। তখন গঙ্গার ঐ জায়গায় এক কুমির দম্পতি থাকত।

কুমিরের বউ বোধিসত্ত্বের ঐ সুন্দর, বিশাল শরীর দেখে ভাবল, 'এর হৃৎপিণ্ডের মাংস নিশ্চয়ই খুব সুস্বাদু হবে।' সে তার স্বামীকে বলল, 'প্রভু, ঐ বানরের হৃৎপিণ্ড খেতে আমার খুব ইচ্ছে করছে।' শুনে কুমির বলল, 'দেখ সে থাকে ডাঙ্গায়, আমি থাকি জলে, কি করে ওকে ধরব?' বউ কোন কথা শুনতেই রাজি নয়। তার এক কথা: 'আমি ঐ বানরের হৃৎপিণ্ড খেতে না পেলে এ জীবন রাখব না।' তখন কুমির অনেক ভেবে বলল, 'ঠিক আছে, একটা রাস্তা আছে। সে রাস্তায় গেলে কাজ হবে।'

বউকে শান্ত করে কুমির গঙ্গার পারে বোধিসত্ত্বের কাছে গেল। কুমির তাঁকে ডেকে বলল, 'হে বানররাজ! শুধুশুধু গঙ্গার এ পারে, এক জায়গায় থেকে দিনের পর দিন বিস্বাদ ফল খাচ্ছেন কেন? ওপারে বিস্তর আম আর বুনো কাঁঠাল গাছ আছে। ওসব গাছের ফলও তেমনি সুস্বাদু।'

বোধিসত্ত্ব জবাব দিলেন, 'এ কেমন কথা হে কুমিররাজ! এই বিশাল গঙ্গা আমার মত স্থলচরের পক্ষে পেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব।'

কুমির বলল, 'সে কি কথা। আমি আপনাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারলে ধন্য হব। আমার পিঠে বসুন, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।'

তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'বেশ, তাহলে যাওয়া যাক।'

কুমির মাঝ গঙ্গা পর্যন্ত এসে জলে ডুব দিতে গেল। বোধিসত্ত্ব বলে উঠলেন, 'এ কি করছেন? ডুবিয়ে মারবেন না কি?'

'তবে তুই কি ভেবেছিলি?'

'কিন্তু কেন?'

'আমার বউ তোর হৃৎপিণ্ড খাবে।'

'তুমি কি জান না বানবেব হৃৎপিণ্ড তাদেব বুকে থাকে না?'

'তবে কোথায় থাকে?'

'বুকের মধ্যে থাকলে গাছে গাছে লাফালাফি করার সময় হৃৎপিণ্ড ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যেত।'

'তাহলে হৃৎপিণ্ড কোথায় থাকে?'

'ঐ দেখ, ঐ ডুমুব গাছে আমাদেব হৃৎপিণ্ড ঝুলছে।'

'তুমি যদি তোমার হৃৎপিণ্ডটা পেড়ে দাও তাহলে তোমাকে আর মারব না।'

'বেশ, চল।'

বোধিসত্ত্বকে কুমির পাবে নিয়ে গেল। বোধিসত্ত্ব এক লাফে গাছে উঠে গেলেন। গাছেব ডালে বসে কুমিবকে ডেকে বললেন, 'ওবে বোকা কুমিব, তোব শবীরটা যত বড়ই হোক মগজে কিছু নেই। জীবজন্তুর হৃৎপিণ্ড কখনও গাছে থাকে নাকি?'

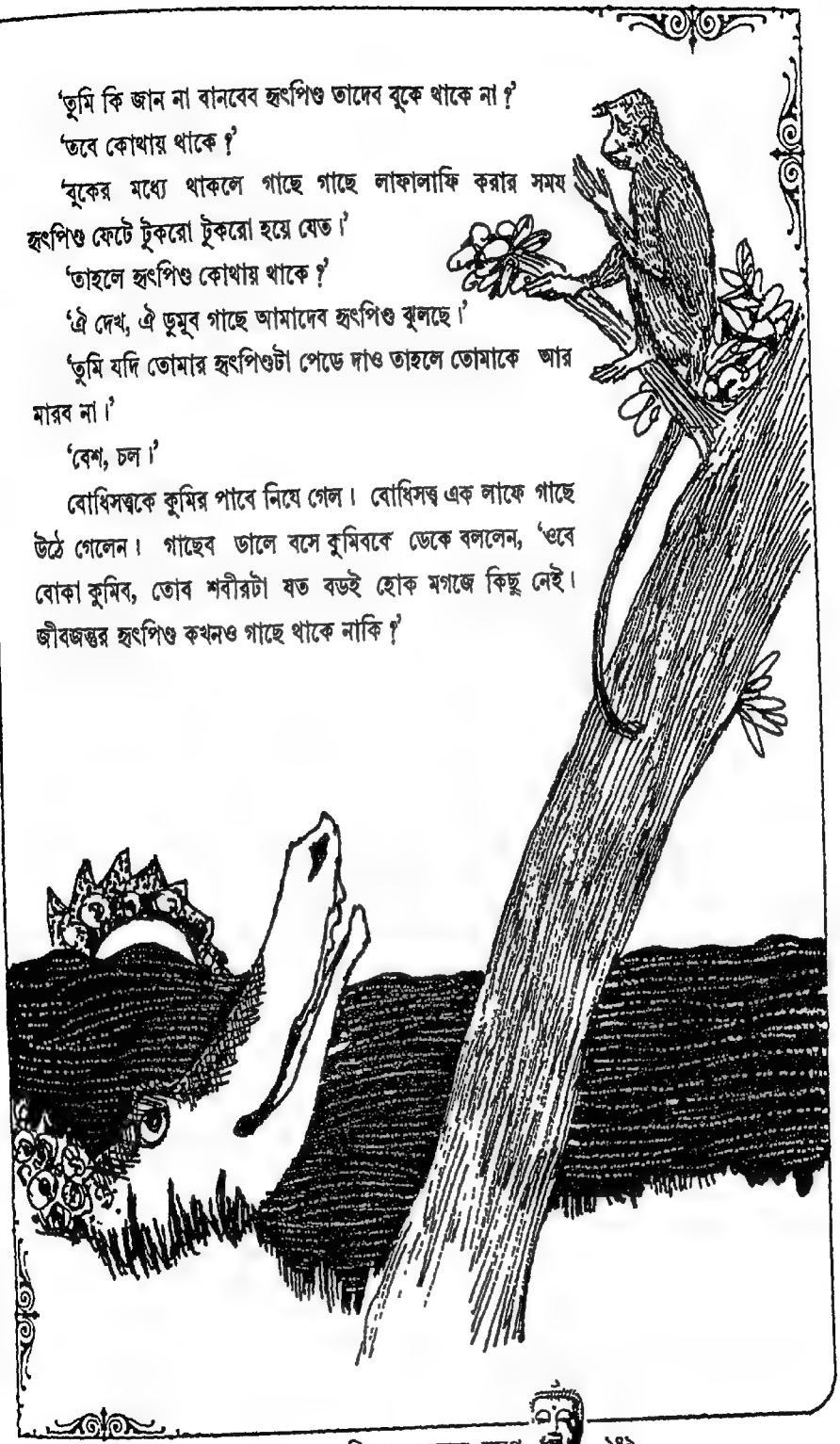

সোমদত্ত জাতক

একবার বোধিসত্ত্ব কাশীতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেন। বড় হয়ে তিনি তক্ষশিলায় গেলেন। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেন। ফিরে এসে দেখলেন বাড়ির হাল খুব খারাপ হয়েছে। তাঁরা গরীব হয়ে পড়েছেন। পরিবারের শ্রী ফিরিয়ে আনতে তিনি যত্নবান হলেন। বাবার কাছে অনুমতি চাইলেন, 'চাকরির খোঁজ করতে যেতে চাই, আপনি অনুমতি দিন।'

তারপর তিনি বারাণসীরাজের কাছে গেলেন। নিজের বিদ্যে-বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। রাজার তাঁকে পছন্দ হল। চাকরি পেলেন। শুধু তাই নয়, অচিরেই রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন।

বোধিসত্ত্বের বাবার চাষের দুটি বলদ ছিল। হঠাৎ একটা বলদ গেল মরে। তখন তিনি বোধিসত্ত্বের কাছে গেলেন। বললেন, 'দেখ বাছা, আমাদের একটা বলদ হঠাৎ মারা গেছে। চাষ করা তো মাথায় উঠল। তুমি রাজার কাছে গিয়ে একটা গোরু চাও।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'বাবা, আমি এইমাত্র রাজার কাছ থেকে আসছি, এক্ষুনি আবার গিয়ে গোরু চাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং আপনিই যান।'

বৃদ্ধ বললেন, 'তুমি তো জান আমি কত মুখচোরা।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'সে যাই হোক, এ আমি পারব না।'

তখন বৃদ্ধ বললেন, 'তাহলে আমাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দাও।'

'তা দিচ্ছি।'

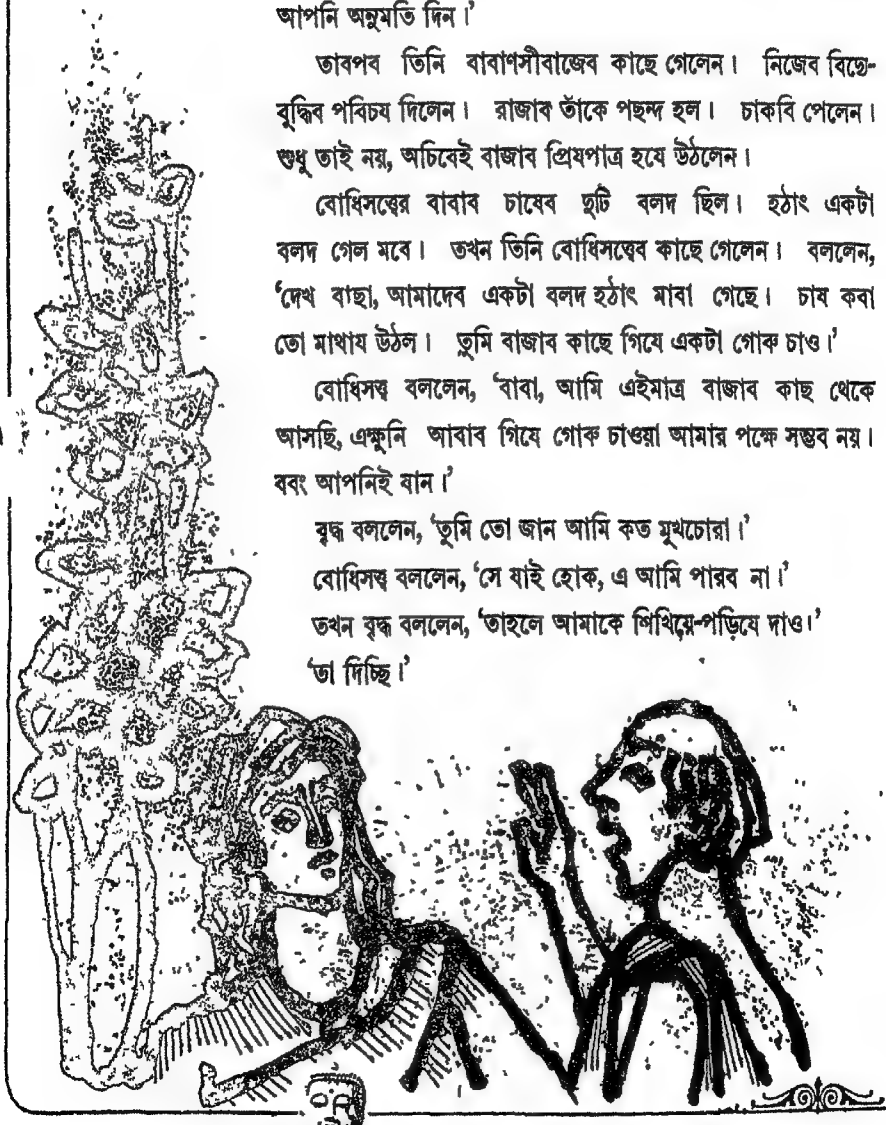

বোধিসত্ত্ব তারপর বাবাকে নিয়ে শ্মশানে গেলেন। সেখানে কাছেই ছিল ঘাসের বন। প্রথমে কয়েক আঁটি ঘাস কেটে এনে চারদিকে সাজালেন। তারপর বললেন, 'মনে করুন এই হচ্ছে রাজা, এই হচ্ছে মন্ত্রী, এই হচ্ছে যুবরাজ, আর এই হল সেনাপতি। আপনি রাজসভায় ঢুকেই প্রথমে বলবেন, 'মহারাজের জয় হোক।' তারপর আমি যে কবিতা শিখিয়ে দিচ্ছি সেটা মুখস্থ বলবেন।' এরপর বোধিসত্ত্ব বাবাকে কবিতা মুখস্থ করাতে লাগলেন। কবিতাটির সারমর্ম ছিল এই :

'মহারাজ, আমি দুটো বলদ দিয়ে জমি চষতাম। এখন একটা হঠাৎ মরে গেছে। আপনি যদি আবার জোড়াটি পুরিয়ে দেন বড় মঙ্গল হয়।'

এক বছর ধরে কবিতাটি মুখস্থ করার পর ব্রাহ্মণ বারাণসীতে ফিরে এলেন। বোধিসত্ত্বকে বললেন, 'বাছা, এখন আমি কবিতাটি নির্ভুল বলতে পারি।' বোধিসত্ত্ব তখন তাঁকে রাজসভায় নিয়ে গেলেন।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ব্রাহ্মণটি কে সোমদত্ত?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ইনি আমার পিতা মহারাজ।' রাজা জানতে চাইলেন, 'উনি কি চান?' ব্রাহ্মণ তখন সেই কবিতাটি মুখস্থ বলতে লাগলেন। যদিও শব্দ উল্টো-পাল্টা হওয়ায় তার মানে দাঁড়াল এই :

'মহারাজ, আমি দুটো গোরু নিয়ে চাষ করতাম। হঠাৎ একটা গোরু মারা গেল। আপনার কাছে করজোড়ে মিনতি করছি, জোড়ার বাকিটি আপনি নিন।'

রাজা বুঝলেন ব্রাহ্মণ পদ্য ওলোট পালোট করে ফেলেছেন। তখন তিনি বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি সোমদত্ত, তোমাদের কি অনেক গোরু?' এর জবাবে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, যদি আমাকে দিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই অনেক গোরু আছে।' বোধিসত্ত্বের জবাবে রাজা খুব খুশি হলেন। ব্রাহ্মণকে শুধু গোরু নয়, নিষ্কর জমিও দিলেন।

কূটবাণিজ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজ্যে বিচারক ছিলেন। তখন রাজ্যে এক গ্রামবাসীর সঙ্গে এক নগরবাসীর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তারা দুজনেই বণিক। গ্রামবাসী বণিক নগরবাসী বণিকের কাছে পাঁচশটি লাঙ্গলের ফলা জমা রেখেছিল। নগরবাসী বণিক ঐ ফলাগুলো বেমালুম বিক্রি করে দিল। তারপর যেখানে লাঙ্গলের ফলাগুলো রেখেছিল সেখানে ইঁদুরের মল-মূত্র ছড়িয়ে রাখল।

একদিন গ্রামবাসী বণিক এসে বলল, 'ভাই, এবার আমার ফলা-গুলো দাও তো।' ফন্দিবাজ বন্ধুটি তখন বলল, 'ভাই, দুঃখের কথা আর কি বলব, তোমার ফলাগুলো সব ইঁদুরে খেয়ে ফেলেছে।' তারপর গ্রামবাসী বণিককে প্রমাণ দেখাবার জন্যে যেখানে ফলাগুলো ছিল সেখানে নিয়ে গেল। মুখ শুকনো করে বলল, 'বিশ্বাস না হয় এই দেখ ইঁদুরের কাণ্ড, ফলাগুলো তো খেয়েইছে, উল্টে জায়গাটা পর্যন্ত নষ্ট করে রেখে গেছে।'

তখন গ্রামবাসী বণিক বলল, 'যাক গে ছাড়, ইঁদুরে খেলে কি আর করা যাবে।' তারপর স্নান করতে যাবে বলে সে নগরবাসী বন্ধুর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে নদীতে গেল। নদীর কাছাকাছি রাস্তায়

আবেক বন্ধুব বাড়িতে ঢুকে ছেলেটাকে ভেতবেব ঘবে বেখে দবজায শিকল তুলে দিল। ঐ বন্ধুকে বলল, 'দেখ, ছেলেটা যেন কোথাও যেতে না পাবে।' তাবপব স্নান সেবে ফিরে এল। নগববাসী বণিক তখন তাকে জিজ্ঞেস কবল, 'আমাব ছেলেটাকে কোথায বেখে এলে ভাই?'

'খুবই দুঃখেব কথা ভাই।'

'দুঃখেব কি আছে?'

'তোমাব ছেলেটাকে চিলে নিযে গেছে।'

'অত বড একটা ছেলেকে চিলে নেয কি কবে?'

'বিশ্বাস না হলে কি বলব। আমি কত চিৎকাব কবলাম, ধবতে গেলাম। কিন্তু চিলটা তাকে নিযে চোখেব নিমেষে উধাও হযে গেল।'

'অসম্ভব। তুমি মিথ্যে কথা বলছ। চিলে ছেলে নিতে পাবে কখনও?'

'পারে না বলেই জানতুম। কিন্তু অসম্ভব যদি ঘটেই তখন আমবা আর কি কবতে পারি বল।'

নগরবাসী বণিক তখন গ্রামবাসী বণিককে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ দিতে লাগল। আব বলল, 'আমি এক্ষুনি বিচারপতিব কাছে যাচ্ছি। আব শোন বদমায়েশ, তোকেও সেখানে টেনে হিঁচডে নিযে যাব।' এই বলে সে ঘব থেকে ছুটে বেবিযে গেল। গ্রামবাসী বণিকও তাব পিছু পিছু চলল।

নগববাসী বণিক বোধিসত্ত্বেব কাছে গিযে নালিশ জানাল, 'ধর্মাবতাব! এই বদমাযেশ বণিক আমাব ছেলেকে সঙ্গে নিযে স্নান করতে গিযেছিল। তারপর ফিরে এসে বলছে আমাব ছেলেকে নাকি চিলে ছোঁ মেরে নিযে গেছে। আপনি এর বিচাব করুন।'

বোধিসত্ত্ব তখন গ্রামবাসী বণিককে জিজ্ঞেস কবলেন, 'ওহে বণিক, আসল ব্যাপারটা একটু পরিষ্কাব কবে বল তো?'

গ্রামবাসী বণিক বলল, 'হ্যাঁ ধর্মাবতাব, সত্যি এরকম একটা অসম্ভব ব্যাপার ঘটেছে।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'চিলে তো আর একটা ছেলেকে নিয়ে যেতে পারে না। এ কথা কেউ কখনও শোনে নি।'

গ্রামবাসী বণিক বলল, 'বেশ, তাহলে আপনি বলুন, ইঁদুর এসে লাঙ্গলের লোহার ফলা খেয়ে নিয়েছে, এমন কথা কেউ শুনেছে কখনও?'

বোধিসত্ত্ব তখন অনুরোধ করলেন, 'একটু খুলে বল পুরো ব্যাপারটা।'

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বোধিসত্ত্ব বেশ মজা পেলেন। শঠে শাঠ্যং নীতি ব্যবহার করেছে গ্রামবাসী বণিক। তারপর বোধিসত্ত্ব বিচার করে বললেন, 'লাঙ্গলের ফলার দাম তুমি চুকিয়ে দাও, আর তুমি ওর ছেলেটাকে এনে দাও।'

ধর্মধ্বজ জাতক

একদা বারাণসীতে যশঃপানি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর সেনাপতির নাম ছিল কালক। বোধিসত্ত্ব ছিলেন সেই রাজার পুরোহিত। তাঁকে 'ধর্মধ্বজ' বলে ডাকা হত। আর ছত্রপানি নামে এক কারিগর মুকুট-পোষাক ইত্যাদি বানাত।

যশঃপানি নিজে রাজা হিসেবে শান্ত, ধীর স্থির ছিলেন। শাস্ত্র মেনে রাজ্য চালাতেন। কিন্তু সেনাপতির চরিত্রটি ছিল খুব খারাপ।

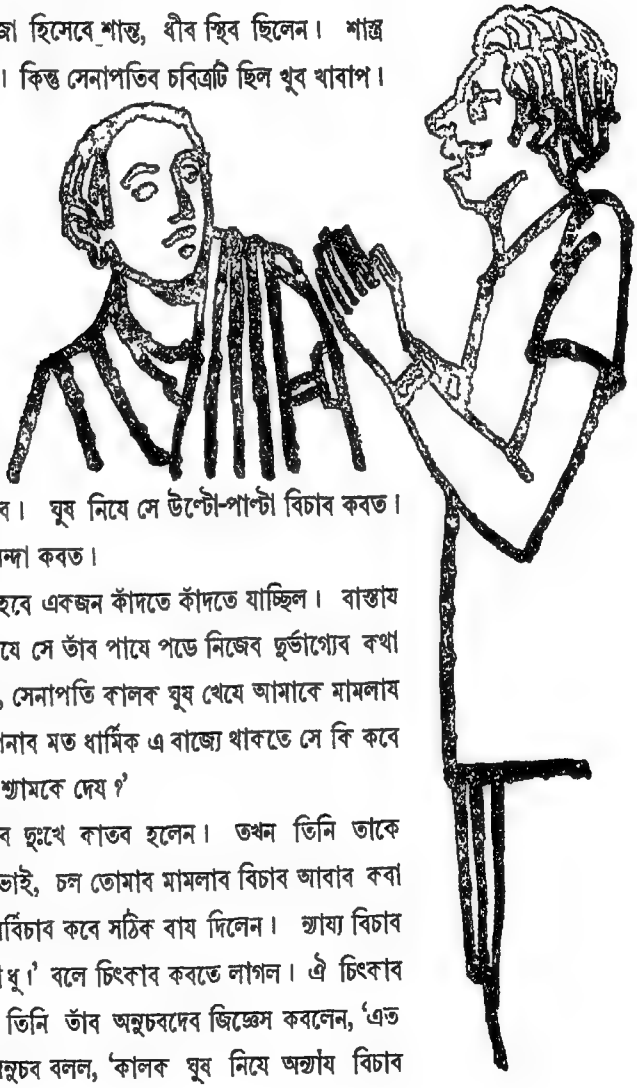

সে ছিল দারুণ ঘুষখোর। ঘুষ নিয়ে সে উল্টো-পাল্টা বিচার করত। তাছাড়া আড়ালে পরনিন্দা করত।

একদিন মামলায় হেরে একজন কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিল। রাস্তায় বোধিসত্ত্বকে দেখতে পেয়ে সে তাঁর পায়ে পড়ে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা জানাল। বলল, 'প্রভু, সেনাপতি কালক ঘুষ খেয়ে আমাকে মামলায় হারিয়ে দিয়েছে। আপনার মত ধার্মিক এ রাজ্যে থাকতে সে কি করে ঘুষ খেয়ে রামের টাকা শ্যামকে দেয়?'

বোধিসত্ত্ব লোকটির দুঃখে কাতর হলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, 'ঠিক আছে ভাই, চল তোমার মামলার বিচার আবার করা হবে।' বোধিসত্ত্ব পুনর্বিচার করে সঠিক রায় দিলেন। ন্যায্য বিচার পেয়ে সবাই 'সাধু! সাধু!' বলে চিৎকার করতে লাগল। ঐ চিৎকার রাজার কানে এল। তিনি তাঁর অনুচরদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এত চিৎকার কিসের?' অনুচর বলল, 'কালক ঘুষ নিয়ে অন্যায় বিচার

করেছিল, রাজপুরোহিত পুনরায় বিচার করে রায় দিয়েছেন। তাঁর সুবিচারে সবাই খুশি হয়েছে।'

রাজা এই খবর জানার পর বোধিসত্ত্বকেই বিচারক পদে নিয়োগ করলেন। বোধিসত্ত্বের সুবিচারে রাজ্যময় তাঁর জয়জয়কার পড়ে গেল। সেনাপতি কালক তখন হিংসেয় কাতর হয়ে রাজার কাছে রোজই বোধিসত্ত্বের নামে মিথ্যে অপবাদ দিতে লাগল। রাজা প্রথমটায় তার কথা বিশ্বাস করতেন না। একদিন সে রাজাকে বলল, 'ধর্মধ্বজ এখন জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে রাজা হওয়ার চক্রান্ত করছে।' রাজা এ কথাও বিশ্বাস করলেন না। কালক তখন বলল, 'ঠিক আছে, ধর্মধ্বজ যখন বিচার করতে আসে আপনি তখন একদিন জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাবেন। দেখবেন গোটা রাজ্য তার বশীভূত।'

রাজা একদিন সত্যিই জানলা দিয়ে ধর্মধ্বজের আসার পথে তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন, সবাই তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

'সেনাপতি, এখন উপায়?'

'একে হত্যা করুন মহারাজ।'

'বিনা দোষে প্রাণদণ্ড দেওয়া যায় না।'

'আমি রাস্তা বলে দিচ্ছি।'

'কি রাস্তা?'

'ওঁকে কোন অসাধ্য কাজ করতে বলুন।'

'তারপর?'

'না পারলে প্রাণদণ্ড দিন।'

'দেখ কালক, ওঁর অসাধ্য কোন কাজ নেই।'

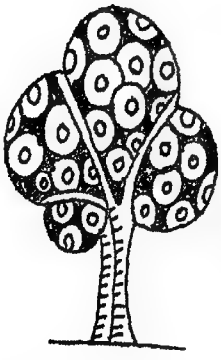

'উর্বর জমিতে গাছ লাগালেও দু-চার বছরের আগে ফল জন্মায় না। পুরোহিতকে ডেকে বলুন, কালই একটা নতুন বাগান চাই। যদি বানাতে না পারে প্রাণ যাবে।'

তখন রাজা বোধিসত্ত্বকে খবর পাঠালেন। বোধিসত্ত্ব এলে বললেন, 'পণ্ডিত, রোজই পুরনো বাগানে বেড়াই, কাল আমি একটা নতুন বাগানে বেড়াতে চাই। তুমি আমার জন্য কাল একটা নতুন বাগান বানাবে। না পারলে কিন্তু তোমার প্রাণ যাবে।' এই অদ্ভুত

আদেশ শুনে বোধিসত্ত্ব বুঝলেন কালকের পরামর্শেই রাজা এ কাজ করেছেন। তিনি রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আমার সাধ্যে কুলোলে নিশ্চয়ই করব।'

বাড়ি ফিরে এসে বোধিসত্ত্ব নিশ্চিন্ত মনে খাবার খেলেন। তারপর শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন, এরপর কি করা যায়। বোধিসত্ত্বের বিপদে স্বর্গে শক্র বিচলিত হল। সে আকাশপথে বোধিসত্ত্বের সামনে এসে বলল, 'পণ্ডিত, কি ভাবছ?'

'আপনি কে প্রভু?'

'আমি শক্র।'

'রাজা আজ রাতের মধ্যে আমাকে নতুন একটা বাগান বানাতে বলেছেন, তাই ভাবছি।'

'চিন্তা না করে ঘুমোও। কাল বাগান তৈরি হয়ে যাবে।'

পরের দিন বাগান দেখে বোধিসত্ত্ব রাজাকে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ, বাগান তৈরি, আপনি সেখানে বেড়াতে যেতে পারেন।' অতীব চমৎকার সেই বাগান দেখে রাজা একদিকে মুগ্ধ হলেন, অন্যদিকে তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। কালকের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, আরেকটা অসম্ভব কাজ ওঁকে দেওয়া যাক। তখন আবার বোধিসত্ত্বকে বলা হল এক রাতের মধ্যে সাতরত্নময়ী পুকুর বানাতে হবে ঐ বাগানে। শক্র তাও করে দিল। তখন আদেশ হল 'বাগানের উপযুক্ত একটি বাড়ি বানাতে হবে।'

এভাবে কোন কিছুতেই যখন বোধিসত্ত্বকে নোয়ানো গেল না, তখন কালক অনেক ভেবে রাজাকে বলল, 'মহারাজ, ধর্মধ্বজকে দেবতারা সাহায্য করেছেন বলেই সে সব করে দিতে পারছে। তাই তাকে এমন কাজ দিতে হবে যা দেবতারাও করতে পারেন না।'

'এ রকম কাজ তুমি কিছু জান?'

'জানি মহারাজ।'

'কি কাজ?'

'হিংসা, রাগ, ক্রোধ ও স্নেহ জয় করেছে এমন মানুষ, যে নেশার উর্ধ্বে—আপনি বলুন চতুর্গুণধারী এরকম একজন মালী না হলে

অত সুন্দব বাগান ন্যাডা ন্যাডা লাগছে।'

বাজা পুবোহিতকে ডেকে তাই বললেন। না পাবলে এবাব তাঁব প্রাণ যাবে। বোধিসত্ত্ব জানতেন, এ কাজ শক্রব পক্ষেও সম্ভব নয়। তাই তিনি গৃহত্যাগকবে বনে গেলেন। শক্র বনে এল। সব শুনে বলল, 'একথা ঠিক, এতদিন যা-যা আদেশ হযেছে তা কবা আমাব পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু এখনকাব আদেশ পালন কবা আমাব সাধ্যেব বাইরে। তবে আমি তোমাকে একজনের খোঁজ দিতে পাবি যে চতুর্গুণধাবী, আব সে থাকে তোমাদেব রাজ্যেই। তাব নাম ছত্রপানি।'

বোধিসত্ত্ব তখন ছত্রপানিব কাছে গেলেন। জিজ্ঞাসা কবলেন, 'তুমি তো চতুর্গুণধাবী?' ছত্রপানি জিজ্ঞেস কবল, 'আপনি কি করে জানলেন?' বোধিসত্ত্ব তখন বাজাব আদেশ ও শক্রব ব্যাপাব খুলে বললেন। পবে ছত্রপানিকে নিযে বাজাব সামনে হাজিব কবিযে বললেন, 'মহাবাজ, এই লোকটি চতুর্গুণধাবী।'

রাজা তখন ছত্রপানিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বেশ, তুমি তাহলে হিংসামুক্ত। কিন্তু বল দেখি, কি দেখে তুমি হিংসামুক্ত হলে?'

ছত্রপানি বলল, 'আগের জন্মে আমি রাজা ছিলাম, হিংসায় নিজের পণ্ডিত পুরোহিতকে মারতে গিয়েছিলাম। তখন ঐ সাধু পণ্ডিত তত্ত্ব জ্ঞান দিয়ে আমার মনকে শান্ত করেন। তারপর থেকে আমি হিংসা ত্যাগ করি।'

রাজা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'মদ ছাড়লে কেন?'

ছত্রপানি বলল, 'রাজা থাকাকালীন আমি রোজ মদ খেতাম। সঙ্গে থাকত মাংস। একবার বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে, ঐ দিন পশু হত্যা নিষিদ্ধ বলে রাঁধুনি মাংস রাঁধতে পারে নি। সে মাংস ছাড়া খেতে দিয়েছিল। আমি বললাম, মাংস নেই কেন? সে বলল, আজ পশু-হত্যা নিষিদ্ধ। তখন আমি চূড়ান্ত মাতাল। সামনে আমার ছেলে ছিল। তার ঘাড় মটকে বললাম, 'এই নাও, মাংস রেঁধে আন এবার।' সেই মাংস খেয়ে যম ঘুম দিলাম। পরের দিন সকালে যখন ছেলের খোঁজ করছি তখন রাণী হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। সব কিছু শুনে সেদিনই মদ খাওয়া ছেড়ে দিলাম।'

রাজা তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'স্নেহ জয় করলে কিভাবে?'

ছত্রপানি বলল, 'রাজা হিসাবে পরে আমি পঞ্চশীল মেনে চলতাম, দান-ধ্যান করতাম। ধর্মপথে থাকতাম। তবু অকালে আমার ছেলে মারা গেল। ছেলের শোকে খুব কাতর হয়ে পড়লাম। কিন্তু পরে বিচার করে বুঝলাম স্নেহ থেকে এই শোক আসছে। আমার ছেলে অধর্ম করেছিল বলে মারা যায়। তবু আমি তার শোক ভুলতে পারছিলাম না। তখন স্নেহ ত্যাগ করে শোককে জয় করি।'

রাজার শেষ প্রশ্ন, 'ক্রোধ জয় করলে কিভাবে?'

ছত্রপানি বলল, 'আগের এক জন্মে আমি অরক নামে জন্মগ্রহণ করি। তখন সতের বছর শুধু মৈত্রী ধ্যান করেছি। তাতেই আমি ক্রোধহীন হই।

সব শুনে রাজা তাঁর অনুচরদের ইশারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা কালককে পিটিয়ে মেরে ফেলল।

তিলমুষ্টি জাতক

রাজা ব্রহ্মদত্ত তাঁর ছেলে ব্রহ্মদত্তকুমারকে লেখাপড়া শেখার জন্য তক্ষশিলায় পাঠালেন। তখনকার কালে রাজারা ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য দূর দেশে পাঠাতেন। কারণ তাতে সে লোকচরিত্র বোঝার সুযোগ পাবে, আর কিছুটা কষ্টসহিষ্ণুও হবে। পরে রাজা হলে তার ওঁইসব সৎ গুণ খুব কাজে লাগবে বলে মনে করা হতো।

রাজা তো ব্রহ্মদত্তকুমারকে এক হাজার টাকা দিয়ে গুরুগৃহে পাঠালেন। ব্রহ্মদত্তকুমার যথাসময়ে গুরুর কাছে পেঁৗছে তাঁকে প্রণাম করল। আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাছা, তুমি কোথেকে আসছ?'

'বারাণসী থেকে প্রভু।'

'তুমি কার ছেলে?'

'বারাণসী রাজের।'

'কি জন্যে এসেছ ?'

'আপনার কাছে লেখাপড়া শিখতে।'

'তুমি কি গুরুদক্ষিণা দিয়ে শিখবে, না কি গুরুশুশ্রূষা করে শিখবে ?'

'গুরুদেব, আমি দক্ষিণা এনেছি।'

তখন দু রকমভাবে গুরুগৃহে বিদ্যা-শিক্ষার পদ্ধতি ছিল। হয় গুরুকে প্রণামী অর্থ দিতে হতোনা হলে গুরুগৃহের নানারকম কাজ করে দিতে হতো। যারা প্রণামী দিয়ে শিখত, গুরুরা তাদের নিজের ছেলে মনে করে বিশেষ যত্ন নিতেন।

যাই হোক, ব্রহ্মদত্তকুমার আচার্যের সহায়তায় বিদ্যাচর্চা করে চলল। শুভদিন, শুভযোগ দেখে আচার্য তাকে নতুন নতুন পাঠ দিতেন। একদিন ব্রহ্মদত্তকুমার আচার্যের সঙ্গে স্নান করতে যাচ্ছিল। রাস্তায় এক বৃদ্ধা তিলের শাঁস শুকোচ্ছিল। কুমার এক মুঠো শাঁস তুলে মুখে দিল। সেদিন বৃদ্ধা কিছুই বলল না। সে ভাবল বেচারার হয়ত খুব খিদে পেয়েছে। এক মুঠো খেলে আর কি-ই বা ক্ষতি হবে। কুমার তার পরের দিনও এক মুঠো তুলে নিল। এমন কি তৃতীয় দিনেও সে যখন একমুঠো শাঁস তুলে নিল তখন বৃদ্ধা চিৎকার করে রাস্তার লোকদের বলল, 'ভাই, দেখে যাও, এই বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁর শিষ্যদের দিয়ে আমার সর্বস্ব লুট করাচ্ছে।'

এ কথা শুনে আচার্য ফিরে এসে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে মা ?'

'দেখুন পণ্ডিত, আমি এখানে তিল শাঁস শুকোতে দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, তা দেখতে পাচ্ছি।'

'আপনার ছাত্র এখান থেকে পর পর তিন দিন তিন মুঠো তুলে খেল।'

'কেঁদো না মা, তোমার তিলের দাম দিয়ে দিচ্ছি।'

'না, বাবা দাম চাই না, শিষ্যকে এমন শিক্ষা দিন যাতে ভবিষ্যতে এ রকম আর না করে।'

'বেশ, তাই দিচ্ছি।'

তারপর আচার্য দুজন শিষ্যকে বললেন ব্রহ্মদত্তকুমারের হাত ধরতে। তারা ওর হাত ধরলে আচার্য লাঠি দিয়ে তিনবার তার পিঠে মারলেন। কুমার আচার্যের দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকাল শুধু। আচার্য বুঝলেন কুমার তাঁর ওপর খুবই রেগে গেছে।

যাই হোক, কুমার এরপর একদিন বিদ্যাচর্চা শেষ করল। আচার্যের মারের কথা কিন্তু তখনও তার হৃদয়ে গেঁথে আছে। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, রাজা হওয়ার পর এই আচার্যকে হত্যা করবে। বারাণসী ফিরে যাওয়ার সময় হলে সে আচার্যকে প্রণাম করল। যাওয়ার সময় বলে গেল, 'গুরুদেব, আমি রাজপদ পেলে আপনাকে নিতে লোক পাঠাব, অনুগ্রহ করে তখন পায়ের ধুলো দেবেন।' আচার্য কুমারের শ্রদ্ধা দেখে যেতে রাজি হলেন।

বারাণসীতে ফিরে গিয়ে কুমার রাজা ও রাণীর কাছে জানাল সে কত কি শিখেছে। কিছুদিন পরে রাজা বললেন, 'বাছা, আমার বয়স হয়েছে। তুমিও শাস্ত্র শিখেছ। এ আমার সৌভাগ্য। আমি চাই আমি থাকতে থাকতেই তুমি রাজা হও।' এরপর কুমার রাজা হল।

রাজা হওয়ার পরও কুমার কিন্তু অতীতের রাগ ভুলতে পারে নি। অতীতের সেই মারের কথা যখনই মনে পড়ত, মাথায় রক্ত উঠে যেত। আচার্যকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সে লোক পাঠাল তাঁকে আনতে।

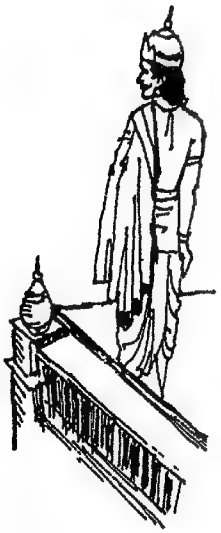

আচার্য সব বুঝে ভাবলেন কুমারের বয়স এখনও কম, তাই তার রাগে জল ঢালা যাবে না। আরও কিছুদিন যাক, তারপর যাব।' এভাবে তিন-চার বার তিনি নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিলেন। একসময় ব্রহ্মদত্ত-কুমারের রাজত্বের অর্ধেক কাল কেটে গেল। আচার্য তখন ভাবলেন 'এবার একবার যাওয়া যেতে পারে।'

রাজদ্বারে পৌঁছে আচার্য খবর পাঠালেন, 'মহারাজকে বল তাঁর আচার্য এসেছেন।' সংবাদ শুনে রাজা সঙ্গে সঙ্গে এক ব্রাহ্মণকে পাঠালেন আচার্যকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য।

আচার্যকে দেখেই রাজার রাগ আবার উসকে উঠল। রক্তচক্ষু ঘুরিয়ে সভাসদদের বললেন, 'দেখ, এই আচার্য আমার শরীরের যেখানে বেত মেরেছিলেন আজও সেখানে ব্যথা অনুভব করি। এঁর

কপালে নির্ঘাৎ মৃত্যু আছে। কপালে মৃত্যু আছে বলেই ইনি আজ এসেছেন।'

আচার্য শান্তভাবে সব শুনে একটি পদ্য আবৃত্তি করলেন। তার মর্মার্থ হল : অন্যায় আচরণকারীকে দমন করার জন্যই রাজারা দণ্ড দেন। এটা রাগ বা অভিমানের ব্যাপার নয়। তাহলেই শাসন হয়।

তারপর ব্যাখ্যা করে বললেন, 'মহারাজ, সেদিন যদি আমি আপনাকে বেত্রাঘাত না করতাম, আস্তে আস্তে আপনি একজন চোর হতেন। বরং আমি বলব সেদিনের ঐ আঘাত আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। আপনি সৎ পথে চলেছেন। যার ফলে আপনার পক্ষে এই রাজসম্মান লাভ সম্ভব হয়েছে।'

কুমার আচার্যের যুক্তি অনুধাবন করতে পারল। সে তখন বারবার ক্ষমা চাইল। আচার্যকে সপরিবারে তক্ষশিলা থেকে তুলে এনে নিজের রাজ্যে সমাদরে রাখল।

সৈন্ধব জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার উত্তরাপথে এক বণিককুলে জন্মান। উত্তরাপথ থেকে সেকালে পাঁচশ ঘোড়ার ব্যবসায়ী বারাণসীতে গিয়ে ঘোড়া বিক্রি করত।

একবার এক ঘোড়ার ব্যবসায়ী পাঁচশ ঘোড়া নিয়ে বারাণসী যাচ্ছিল। বারাণসীর কাছাকাছি এলে একটা হাট দেখা গেল। অতীতে সেখানে বাস করত এক বিরাট বণিক। তার প্রাসাদ ছিল দেখার মত। কিন্তু যখনকার কথা হচ্ছে তখন তার বংশ প্রায় লোপ পেয়েছে। শুধু এক বৃদ্ধা বেঁচে আছে। সে ঐ প্রাসাদে থাকত। ঘোড়ার ব্যবসায়ী এসে ঐ প্রাসাদের দু-তিনটে ঘর ভাড়া নিল। সেদিন রাতেই তার এক আজানেয় ঘোড়ার বাচ্চা হল। ব্যবসায়ী ওখানে দু-তিন দিন থেকে গেল। তারপর সে বাজার সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে তৈরি হল। বৃদ্ধা তখন এসে ভাড়া চাইল। ব্যবসায়ী ভাড়া দিতে গেলে বৃদ্ধা বলল, 'তোমার ঐ ঘোড়ার বাচ্চাটা আমাকে দাও, ভাড়া থেকে দামটা কেটে নিও।'

বৃদ্ধার কাছে ঘোড়াটি খুব আদরযত্নে বড় হতে লাগল। কিছু দিন পরে বোধিসত্ত্ব পাঁচশ ঘোড়া নিয়ে বারাণসী যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে তিনি ঐ বাড়িতে দু-তিন দিন থাকবেন ভাবলেন। কিন্তু তার ঘোড়াগুলো কিছুতেই ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকতে চায় না। আজানেয়

ঘোড়ার গন্ধই এর কারণ। বোধিসত্ত্ব তখন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, এখানে কোন ঘোড়া থাকে কি?'

'হ্যাঁ বাছা, একটা বাচ্চা ঘোড়া থাকে।'

'সে কোথায়?'

'চড়তে গেছে বাবা।'

'কখন ফিরবে?'

'এই ফিরল বলে।'

বোধিসত্ত্ব নিজের ঘোড়াগুলোকে বাইরে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মনে মনে চিন্তা করে স্থির করলেন, সুলক্ষণযুক্ত এই ঘোড়াটিকে বৃদ্ধার কাছ থেকে ন্যায্য দামে কিনতে হবে। কিছুক্ষণ পরে ঘোড়াটি চরে ফিরে এল। সে ঘরে ঢোকার পর বোধিসত্ত্বের ঘোড়াগুলো আপনা থেকেই ঢুকে পড়ল। দু-চার দিন থেকে চলে যাওয়ার আগে বোধিসত্ত্ব বৃদ্ধাকে বললেন, 'মা, আপনাকে আমি দাম দিচ্ছি, ঘোড়ার বাচ্চাটা আমায় দিন।'

'সে কি বাবা। কেউ কি ছেলে বিক্রি করে?'

'আপনি একে কি খাওয়ান?'

'ঘাস, ভাত, আর ক্ষুদের দাউ।'

'আমি একে অনেক ভালো ভালো খাবার খাওয়াব। অনেক সুন্দর জায়গায় রাখব। এবার বলুন।'

'যদি তা হয়, তাহলে নিতে পার।'

বোধিসত্ত্ব ঘোড়ার চার পায়ের আলাদা দাম ধরলেন। লেজ ও মুখের দাম ধরলেন। সব মিলিয়ে ষাট হাজার টাকা তিনি বৃদ্ধাকে দিলেন। তারপর বৃদ্ধাকে নতুন পোশাক পরিয়ে ঘোড়াটির সামনে দাঁড় করালেন। ঘোড়াটি একবার বৃদ্ধার চোখের দিকে তাকিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। বৃদ্ধা তখন ঘোড়াটির পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'বাছা, আমি অনেকদিন তোকে যা পেরেছি খাইয়ে বড় করেছি। এবার তুই এই বণিকের সঙ্গে যা।'

পরের দিন বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'পরীক্ষা করে দেখা যাক এই

আজানেয অশ্ব নিজের শক্তিব ব্যাপাবটা জানে কিনা।' তিনি ঘোড়াটিব জন্য খাবার বানিয়ে বাঁশের টুকরির মধ্যে রাখলেন। ঘোড়া কিন্তু সে খাবার মুখে তুলল না। বোধিসত্ত্ব তখন তাকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'এতদিন অপবেব এঁটোকাটা খেযেছ, আব এখন এই খাবার মুখে নিতে চাইছ না, ব্যাপাবটা কি?' শুনে ঘোড়া বলল, 'যেখানে আমার জাত কেউ জানে না সেখানে যা দেবে খাব। কিন্তু যেখানে জানে সেখানে তা খেতে পারব না।'

যাই হোক বোধিসত্ত্ব এরপর ওকে রাজদ্বারে নিয়ে এলেন। রাজা

ঐ ঘোড়াটি দেখে পছন্দ কবলেন। জানতে চাইলেন, 'এ কেমন ছুটবে?' বোধিসত্ত্ব তখন ঘোড়াব পিঠে বসে নিমেষের মধ্যে ধুলোব ঝড় তুললেন। তারপব ঘোড়াব পেটে লাল কাপড় বেঁধে ছোটালেন। লোকে শুধু লাল কাপড়টা দেখতে পেল। ঘোডাকে তিনি জলের ওপব দিযে ছোটালেন, পদ্মপাতাব ওপব দিযে ছোটালেন।

অবশেষে তিনি ঘোডাব পিঠ থেকে নেমে নিজেব হাতের তালু ছড়িয়ে তুডি দিলেন। ঘোড়া চাব পা জোডা কবে বোধিসত্ত্বের হাতে উঠে এল। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহাবাজ, এই ঘোড়াব বেগ দেখানোব মত জায়গা এ পৃথিবীতে নেই।' রাজা এরপব অর্ধেক বাজত্ব দিযে ঘোড়াটি কিনে নিলেন। তাকে মঙ্গলাশ্ব করলেন।

মান্ধাতৃ জাতক

পুরাকালে মহাসম্মত নামে এক রাজা ছিলেন। মহাসম্মতের ছেলে রোজ। রোজের ছেলে বররোজ। বররোজের ছেলে কল্যাণ। কল্যাণের ছেলে বরকল্যাণ। তারপর উপরোধ-পোষধ। পোষধের ছেলে হল মান্ধাতা।

মান্ধাতা তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করেছিল। সে দু হাতে তালি দিয়ে আকাশ থেকে রত্নবৃষ্টি করাতে পারত। মান্ধাতার ছেলেবেলা চলে চুরাশি হাজার বছর। চুরাশি হাজার বছর সে যুবরাজ ছিল, আর রাজচক্রবর্তী হিসেবে কাটায় আরও চুরাশি হাজার বছর। ফলে তার আয়ুর কোন হিসেব ছিল না। যেজন্য তাকে বলা হত 'অসংখ্যেয়-পরিমিত জীবন।'

এরকম অলৌকিক ও আশ্চর্য শক্তিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও মান্ধাতার মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিল। সে হঠাৎ লোভ-লালসার দ্বারা আক্রান্ত হল। শান্ত, ধীর ও স্থির মান্ধাতার মধ্যে তখন দেখা দিল অস্থিরতা। অমাত্যরা জিজ্ঞেস করল, 'প্রভু, আপনাকে উতলা দেখাচ্ছে কেন?'

'দেখ, আমার পুণ্যবলের তুলনায় এ রাজ্যের আয়তন খুবই কম।'

'যথার্থ প্রভু।'

'বল দেখি কোন্ জায়গা সব চেয়ে সুন্দর?'

'দেবলোক, মহারাজ।'

মান্ধাতা তখন রথ সাজিয়ে অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে হাজির হল। দেবতারা তাকে সমাদরে স্বর্গে আমন্ত্রণ করল। মান্ধাতাকে স্বর্গরাজ্য দান করল। মান্ধাতা সপারিষদ সুদীর্ঘকাল সেখানে রাজত্ব করল। কিন্তু তার লালসা-তৃষ্ণা দূর হল না। মান্ধাতাকে আবার অস্থির দেখাতে লাগল। অমাত্যরা জিজ্ঞেস করলে মান্ধাতা বলল, 'আচ্ছা, এখানের থেকেও রমণীয় কোন জায়গা আছে কি?'

'দেবলোকের সর্বোচ্চ স্থানই সেই জায়গা, প্রভু।'

আবার রথ সাজানো হল। সেখানে দেবরাজ শক্র অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে মান্ধাতাকে বরণ করতে এলেন। মান্ধাতাকে শক্র অর্ধেক রাজত্ব দিলেন।

শক্র তিন কোটি ষাট লক্ষ বছর বাঁচার পর গত হলেন। জন্মাল আরেকজন শক্র। তিনিও দেবরাজ্য শাসন করে লোকান্তরিত হলেন। এভাবে পরপর ছত্রিশ জন শক্রের জন্ম ও মৃত্যু হল। মান্ধাতা এদের সবাইকে অতিক্রম করে বেঁচে রইলেন ও দেবরাজ্যের অর্ধেক শাসন করে চললেন। শেষে মান্ধাতার মনে হল, 'স্বর্গের আধখানা পেয়ে লাভ কি? শক্রকে শেষ করে পুরো স্বর্গ দখল করাই ঠিক।' কিন্তু শক্রকে হত্যা করা তার সাধ্যে কুলোল না।

লালসা তৃষ্ণা তবু তাকে ছাড়ে নি। মান্ধাতার আয়ু ক্রমশ ক্ষীণ হতে লাগল। শরীরে জরা দেখা দিল। এখন সমস্যা হল, স্বর্গে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে না, সেজন্য মান্ধাতা স্বর্গচ্যুত হল তার শরীর মর্ত্যের এক বাগানে এসে পড়ল।

বাগানের মালি তখন দৌড়ে রাজার কাছে গিয়ে জানাল, 'মান্ধাতা এসেছেন।' রাজবংশের সকলে এল তার সঙ্গে দেখা করতে। বাগানে মান্ধাতার বিছানার ব্যবস্থা করা হল। মান্ধাতার তখন আর ওঠার শক্তিটুকুও নেই।

অমাত্যরা তখন প্রশ্ন করল, 'প্রভু, আমাদের কিছু বলবেন কি?' জবাবে মান্ধাতা বলল, 'জনসাধারণকে আমার হয়ে শুধু এই কথা কটি বোলো। দু হাজার দ্বীপের অধিপতি, রাজচক্রবর্তী যে মান্ধাতা স্বর্গে পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল, ছত্রিশ জন শক্রর জীবনকাল ব্যাপী যে স্বর্গে শাসন করেছিল, সে আজ মৃত্যুমুখে পতিত।'

দূত জাতক

সে অনেক কাল আগেকার কথা। বোধিসত্ত্ব জন্মেছেন বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্তের ছেলে হয়ে। বড় হয়ে যথারীতি তিনি তক্ষশিলায় যান। সেখানে আচার্যের কাছে পড়াশুনো শেষ করে ফিরে এলেন। যথাসময়ে তিনি রাজা হলেন। ব্রহ্মদত্ত তখন আর বেঁচে নেই।

রাজা হওয়ার পর বোধিসত্ত্ব খুব ভোজনবিলাসী হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর নাম হয় 'ভোজন শুদ্ধিক রাজা।' লোকে বলত, বোধিসত্ত্বের একেক খাবারের পেছনে বিস্তর খরচ হতো। প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ হতো এক বেলার খাবার বানাতে।

বোধিসত্ত্ব বাড়ির ভেতরে বসে খেতেন না। রাজদ্বারে রত্নমণ্ডপ তৈরি করা হয়েছিল। আহারের সময় মণ্ডপটি যত্ন করে সাজান হতো। মাথার ওপর থাকত শ্বেতচ্ছত্র। খেতে বসতেন সোনার পালঙ্কে। আর তাকে ঘিরে থাকত ক্ষত্রিয় বংশজাত মেয়েরা। যে থালায় তিনি খেতেন তাও ছিল অতি দুর্মূল্য—লক্ষ টাকা দামের সোনার থালা।

জনসমক্ষে বোধিসত্ত্বের এভাবে আহারের পিছনে একটি উদ্দেশ্য

ছিল। আর তা হল জনসাধারণের পুণ্যবৃদ্ধি। ঐ দেশের লোকেদের মধ্যে তখন এ রকম একটি ধারণা প্রচলিত ছিল, রাজাকে আহার করতে দেখলে পুণ্য হয়।

ঐ দেশে এক মহালোভী ছিল। রাজার ভোজনের এই ঘটা, রান্নার সুগন্ধ, এইসবে সে বেসামাল হয়ে পড়ল। তার দারুণ ইচ্ছে হল রাজার খাবারে ভাগ বসাতে। শেষে সে এক ফন্দি বের করল। একদিন রাজা যখন আহার করছিলেন সে তখন ভিড়ের ভেতর থেকে দু হাত তুলে 'আমি দূত', 'আমি দূত' বলে চিৎকার করতে করতে রাজার দিকে ছুটে গেল।

ঐ দেশের প্রথা অনুসারে কেউ নিজেকে দূত বললে তাকে আটকানো হত না। তাই লোকজন-সেপাই-মন্ত্রী দু পাশে সরে গিয়ে তাকে যাওয়ার রাস্তা করে দিল। সে ছুটে গিয়ে রাজার খাবারের থালা থেকে এক গাল ভাত তুলে মুখে দিল। সৈন্যরা তখন অস্ত্র হাতে ছুটে এল, 'এক্ষুনি এর মাথা কেটে ফেলব।'

বোধিসত্ত্ব হাত তুলে বললেন, 'মেরো না।'

তারপর মহালোভীকে বললেন, 'ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্তে খাও।'

রাজা সে সময় নিজে হাত গুটিয়ে বসে রইলেন। লোকটা

পেটপুরে খেল। বোধিসত্ত্বের নির্দেশে তাকে আবার সুগন্ধি জল আর পান দেওয়া হল। সে খেয়েদেয়ে সুস্থ হয়ে বসল।

এবার বোধিসত্ত্ব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাছা, তুমি বলেছিলে তুমি নাকি দূত। তা তুমি কার দূত হে?'

সে বলল, 'মহারাজ, আমি খিদে তেষ্টার দূত। তারাই আমাকে বলেছে তুমি রাজার কাছ যাও।'

বোধিসত্ত্ব তার কথা শুনে বললেন, 'এ যা বলল তা খুবই সত্যি। প্রাণীমাত্রই উদরের দূত। তারা তেষ্টার জ্বালায় পানীয় খুঁজে বেড়ায়। খিদে-তেষ্টাই তাদের পরিচালক। আর এই জিনিসটা কত সহজে লোকটা দেখিয়ে দিল। ইনি মহাপুরুষ। এমন অসাধারণ কথা, এমন সত্যি কথা আমি এর আগে কখনো শুনিনি।' এরপর বোধিসত্ত্ব লোকটিকে খুব যত্নআত্তি করলেন।

মৃদুপাণি জাতক

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের প্রথম রাণীর গর্ভে ছেলে হয়ে জন্মান। ষোল বছর বয়সের মধ্যে তক্ষশিলার এক আচার্যের কাছ থেকে তিনি সব রকম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে ফিরে এলেন। কালক্রমে পিতার যখন মৃত্যু হল তখন বোধিসত্ত্ব সিংহাসনে বসলেন। বারাণসীর রাজা হলেন।

বোধিসত্ত্বের পরমা সুন্দরী এক কন্যা হয়। রাজ-অন্তঃপুরে ঐ কন্যার প্রায় সমবয়স্ক এক মামাত ভাই ছিল। বোধিসত্ত্ব সেই ভাগ্নেকে খুব স্নেহ করতেন। একদিন মন্ত্রী ও সভাসদদের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে বললেন, 'আমার তো ছেলে নেই। ভাগ্নেই আমার ছেলের মত। আমি ভেবেছি, আমার মেয়ের সঙ্গে ভাগ্নের বিয়ে দেব। আর আমার মৃত্যুর পর সে-ই রাজা হবে।'

কিছুদিন পরে মেয়ে আর ভাগ্নে দুজনেই বড় হয়ে উঠল। তখন বোধিসত্ত্বের চিন্তায় কিছু রদবদল ঘটল। তিনি আবার রাজসভা ডাকালেন। মেয়ের বিয়ে, ভবিষ্যতে কে রাজা হবে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা চলল। বোধিসত্ত্ব এবার বললেন, 'ভাবছি ভাগ্নেকে অন্য জায়গায় বিয়ে দেব, মেয়ের জন্যও অন্য পাত্র খুঁজব। এতে কুটুমের সংখ্যা বাড়বে। রাজবংশ বৃদ্ধি পাবে।' সভাসদরাও ভেবে

দেখল আগের চেয়ে এই প্রস্তাবটিই বেশি ভালো। তাই তারাও এতে রাজি হল।

বোধিসত্ত্ব তখন ভাগ্নের জন্য অন্তঃপুরের বাইরে একটা ঘরের ব্যবস্থা করলেন। এবার থেকে ভাগ্নে সেখানেই থাকবে। সে আর অন্তঃপুরে ঢুকতে পারবে না, এই আদেশ দিলেন রাজা।

এদিকে রাজার কন্যা ও ভাগ্নের মধ্যে গভীর প্রণয় জন্মেছিল। তাদের পক্ষে আলাদা থাকা প্রায় অসম্ভব। ভাগ্নে ভাবল, 'দেখি যদি কোনভাবে রাজকুমারীকে অন্তঃপুরের বাইরে আনতে পারি। একটা রাস্তা আছে।' এই ভেবে সে দাই-মাকে ডেকে পাঠাল। তাকে অনেক টাকাপয়সা ঘুষ দিল।

দাই-মা জিজ্ঞেস করল, 'কুমার, আমাকে দিয়ে কি করাতে চাও?'

কুমার বলল, 'রাজকুমারীকে অন্তঃপুরের বাইরে আনতে হবে।'

দাই-মা বলল, 'রাজকুমারীকে কি ব্যাপারটা জানাব?'

কুমার বলল, 'জানাও।'

দাই-মা একদিন রাজকুমারীকে ডেকে বলল, 'এসো মা, তোমার চুল আঁচড়ে দিই।' আঁচড়াতে আঁচড়াতে দাইমা রাজকুমারীর গালে একটু সুড়সুড়ি দিল। কুমারের সঙ্গে খেলার সময় ঠিক এভাবে কুমার সুড়সুড়ি দিত। ফলে রাজকুমারী বুঝতে পারল কুমারের কোন খবর আছে নিশ্চয়ই।

রাজকুমারী দাই-মাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কুমারের কাছে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ মা।'

'সে কি কিছু বলেছে?'

'জানতে চেয়েছে কিভাবে তোমাকে অন্তঃপুরের বাইরে আনা যায়?'

'আমি একটা পদ্য বলছি।'

'বেশ।'

'বুদ্ধিমান হলে সে এই পদ্যের মানে ঠিক বুঝতে পারবে।'

এই বলে রাজকুমারী পদ্যটি দাই-মাকে শোনাল। দাই-মা বারবার

আবৃত্তি করল। তখন রাজকুমারী বলল, 'ঠিক আছে।' দাই-মা বলল, 'আরেকবার শুনে দেখ তো ঠিক বলছি কিনা।'

'নবম হাত
নিপুণ গজ
আঁধার রাত
বৃষ্টিতে কাজ।'

দাই-মা ফিরে গেলে কুমার জিজ্ঞেস করল, 'রাজকুমারী কি বলল?' দাই-মা বলল, 'দেখ কুমার, সে আমাকে একটা পদ্য শিখিয়ে দিয়েছে। বলেছে পদ্যটা তোমাকে বলতে।' এই বলে দাই-মা পদ্যটি আবৃত্তি করল। শুনেই কুমার বুঝতে পারল রাজকুমারীর ইঙ্গিত। দাই-মাকে বলল, 'ঠিক আছে মা, তুমি এসো।'

এরপর কুমারের প্রথম কাজ হল এমন এক বালককে খুঁজে বের করা যার হাতটি খুবই কোমল হবে। বালকটিকে সে নিজের চাকর করল। তাকে এমনভাবে তৈরি করতে লাগল যাতে সে কাজ হাসিল করতে পারে। নিপুণ গজ খুঁজতে কুমারকে বিশেষ বেগ পেতে হল না। মঙ্গলহস্তীর মাহুতকে ঘুষ দিয়ে বশে আনল। তারপর সে অপেক্ষা করতে লাগল। সঠিক দিনক্ষণ না আসা পর্যন্ত তো অপেক্ষা করতেই হবে।

তারপর একদিন অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাতে সে তৈরি হল। কিন্তু বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সে যেতে পারে না। মাঝ রাতে সত্যি বৃষ্টি শুরু হল। কুমার তখন মঙ্গলহস্তীর পিঠে চড়ে সেই বালক ভৃত্যকে সঙ্গে দিয়ে রাজ-অন্তঃপুরের পাঁচিলের সামনে গেল। সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল।

বোধিসত্ত্ব মেয়েকে কড়া পাহারায় রেখেছিলেন। মেয়েকে অন্য ঘরে শুতে না দিয়ে নিজের ঘরেই শুইয়ে রাখতেন। ওদিকে রাজকুমারী মাঝ রাত হতেই বুঝল কুমার এতক্ষণে এসে গেছে। বাবাকে সে বলল, 'বাবা, বড্ড গরম লাগছে, আমি স্নান করব।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ঠিক আছে চল, আমি নিয়ে যাচ্ছি।' তারপর পাঁচিলের পাশে সরোবরের পথের ওপর মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিলেন, কিন্তু তার

একটা হাত ধরে রইলেন। মেয়ে তখন অন্য হাতটা কুমারের দিকে এগিয়ে দিল। কুমার সেই হাত থেকে সোনার গয়না খুলে বাচ্চা চাকরটার হাতে পরিয়ে দিল, তারপর ছেলেটাকে আস্তে আস্তে পথের ওপর নামিয়ে দিল। রাজকুমারী তখন বাবাকে ঐ বালকের হাতটা দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। এবার সে দ্বিতীয় হাতটি থেকে সমস্ত গয়না খুলে বালকটির হাতে পরিয়ে দিল। তারপর হাতির পিঠে চড়ে পালিয়ে গেল। মেয়ের স্নান হলে বোধিসত্ত্ব তাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। অন্ধকারে গয়নার শব্দে তিনি ভাবলেন মেয়েকে নিয়েই ফিরে যাচ্ছেন। ভোরে তাঁর ভুল ভাঙল। এ থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করলেন: রমণীরা অবশ্যগীরা। তাদের বন্দী করে রাখা যায় না।

কুরুধর্ম জাতক

পুরাকালে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করতেন ধনঞ্জয়। বোধিসত্ত্ব তার প্রথম ছেলে হয়ে জন্মান। তক্ষশিলায় বিদ্যালাভ, পরে যুবরাজ হওয়া ইত্যাদির পর বাবা মারা গেলে বোধিসত্ত্ব রাজা হলেন। বোধিসত্ত্ব দশ রকমের রাজধর্ম পালন করতেন। যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি কুরুধর্মও পালন করতেন। কুরুধর্ম পালন বলতে চরিত্রের পাঁচটি দিক বজায় রাখা বোঝায়। বোধিসত্ত্ব, তাঁর মা, ছোট ভাই, পুরোহিত, খাজনা মাপার সরকার, সারথি, বণিক, জমির মাপ-জোককারী ও নগর-সুন্দরী—সকলেই কুরুধর্ম পালন করতেন।

বোধিসত্ত্ব নিজ নগরের চারটি প্রবেশপথে চারটি এবং প্রাসাদের মধ্যে ছটি, মোট দশটি দানশালা গড়ে তোলেন। রোজ ছ লাখ টাকা এখানে দান করা হত। তাঁর এই বিপুল দান দেখে গোটা জম্বুদ্বীপ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। জম্বুদ্বীপের আনাচে-কানাচে তাঁর দানের প্রভাব টের পাওয়া যেত।

তখন কলিঙ্গের দন্তপুর নগরে রাজত্ব করছিলেন কলিঙ্গরাজ। একবার সেখানে সাংঘাতিক খরা দেখা দিল। অনাবৃষ্টিতে রাজ্য জুড়ে আকাল দেখা দিল। দেশের লোক তিনটি ভয়ে ভীত হল :

১ খাবার শেষ হয়ে যাবে।

২ পানীয় জল ফুরিয়ে যাবে।

৩ মহামারী দেখা দেবে।

দেশের লোক এই ঘোর বিপদে রাজার শরণাপন্ন হল। খিদের জ্বালায় আর্তনাদ করতে করতে ছেলেমেয়ের হাত ধরে তারা দন্তপুরে গেল। রাজদ্বারে সে এক বিপুল জনসমুদ্র।

জানলা দিয়ে রাজা দুর্দশাগ্রস্থ প্রজাদের দেখলেন। তারপর মন্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা আর্তনাদ করছে কেন?'

মন্ত্রী বলল, 'দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে মহারাজ।'

'কেন?'

'বৃষ্টি হয়নি বলে।'

'এখন উপায়?'

'যাতে বৃষ্টি হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আগেকার রাজারা এক্ষেত্রে কি করত?'

'দান-ধ্যান করত। এক সপ্তাহ রাজশয্যায় না শুয়ে কুশের বিছানায় শুয়ে থাকত। তারপর বৃষ্টি হতো।'

'ঠিক আছে, আমিও তাই করব।'

রাজা সব কিছু ঠিকঠাক করলেন। তবু বৃষ্টি হল না। রাজা তখন আবার মন্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখ, সবই তো করলাম, কিন্তু কোথায় বৃষ্টি। এখন কি করা যায়?'

'ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা ধনঞ্জয়ের আঙ্গন নামে এক মঙ্গলহস্তী আছে। তাকে নিয়ে এলে বৃষ্টি হবে।'

'সেই রাজা খুবই শক্তিশালী। কি করে তোমরা তাঁর হাতি আনিবে?'

'মহারাজ, হাতি আনার জন্য যুদ্ধ করতে হবে না।'

'তাহলে কি করে আনবে?'

'তিনি খুবই দানশীল। তাঁর কাছে যে কেউ যে কোন জিনিস চাইলেই তিনি দিয়ে দেন। তিনি শুধু দানেই আসক্ত।'

'কে তাঁর কাছে মঙ্গলহস্তী ভিক্ষা করবে?'

'কেন মহারাজ, আমাদের ব্রাহ্মণরা করবে।'

রাজা তখন ব্রাহ্মণদের গ্রামে খবর দিয়ে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আনালেন। তাদের আদর আপ্যায়ন করে, পথ খরচা দিয়ে মঙ্গলহস্তী আনতে পাঠালেন। কয়েক দিন কোথাও না থেমে তারা একসময় ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছল। দানশালার কাছে এসে তারা সমস্বরে বলে উঠল, 'মহারাজের জয় হোক।'

বোধিসত্ত্ব তখন মঙ্গলহস্তীর পিঠ থেকে নেমে এসে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা কি চান?' ব্রাহ্মণরা তখন তাঁকে একটি পদ্য শোনাল। পদ্যটির সারমর্ম হল :

'জনশ্রুতি বলে তুমি মহা ধার্মিক। প্রার্থনাকারী কখনও তোমার কাছ থেকে খালি হাতে ফিরে গিয়েছে এরকম ঘটে নি। আমরা

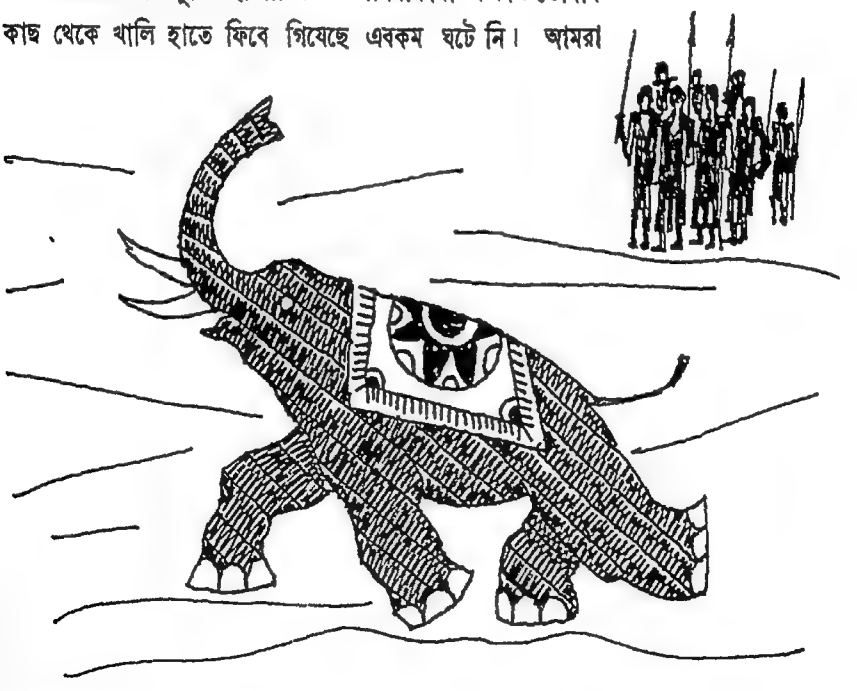

এসেছি সুদূর কলিঙ্গ থেকে। অনেক কষ্ট হয়েছে আসতে। খরচও হয়েছে প্রচুর। তোমার কাছে আমাদের প্রার্থনা, মঙ্গলহস্তীটি আমাদের দাও।'

বোধিসত্ত্ব তাদের আশ্বস্ত করলেন, 'মঙ্গলহস্তীর জন্য আপনারা যে কষ্ট করছেন, যত টাকা খরচ করেছেন, তার কোনটাই বিফলে যাবে না। মঙ্গলহস্তীকে সোনার সজ্জায় সাজিয়ে আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি।' বোধিসত্ত্ব তারপর মঙ্গলহস্তীর কোন অঙ্গ আচরণহীন কিনা খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর তিনবার হাতিকে প্রদক্ষিণ করলেন। সবশেষে ব্রাহ্মণদের হাতে হাতির শুঁড়টা তুলে দিলেন, আরেক হাতে সোনার কলস থেকে সুগন্ধী জল ঢালতে লাগলেন। এভাবে দান-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল।

দুঃখের বিষয় মঙ্গলহস্তী আসার পরও কলিঙ্গরাজের ত্রিসীমানায় এক ফোঁটা বৃষ্টি হল না। রাজা আবার মন্ত্রী, সভাসদ ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন, 'এখন কি হবে? মঙ্গলহস্তী আসা সত্ত্বেও বৃষ্টি হল না কেন?' মন্ত্রী ও সভাসদরা তখন বলল, 'মহারাজ, ধনঞ্জয় কুরুধর্ম পালন করেন, তাই তাঁর রাজ্যে যথাসময়ে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি হয় রাজার গুণেই। হাতি তো একটা পশু মাত্র। তার গুণে কি করে বৃষ্টি হবে?' এ কথা শুনে কলিঙ্গরাজ বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে হাতি ফেরৎ দিয়ে এস, আর ভালভাবে জেনে এস, কি করে কুরুধর্ম পালন করতে হয়।' 'যথা আজ্ঞা' বলে অমাত্যরা রওনা দিল।

কুরুরাজের কাছে গিয়ে মঙ্গলহস্তী ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'মহারাজ, মঙ্গলহস্তীকে নিয়ে গিয়েও আমাদের কোন উপকার হয় নি। এক ফোঁটা বৃষ্টি হল না। লোকমুখে শুনেছি আপনি কুরুধর্ম পালন করেন। আমাদের রাজাও এখন কুরুধর্ম পালনে উৎসাহী। রাজা আমাদের পাঠিয়েছেন আপনার কাছ থেকে কুরুধর্ম বিষয়ে সব কিছু জেনে তা লিখে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখন আপনি আমাদের কুরুধর্ম কি তা ব্যাখ্যা করে বলুন।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'দেখ, এককালে আমি কুরুধর্ম পালন করতাম ঠিকই। তবে মনে সংশয় ঢুকেছে আমি হয়ত যথাযথভাবে তা

পালন করতে পারি নি। মনে হয় আমার হৃদয়ে কুরুধর্মের আসন টলে গেছে। এই অবস্থায় আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় কুরুধর্ম কি।'
তারপর তিনি একটি ঘটনার কথা বললেন :

মহারাজ ধনঞ্জয়ের কি ঘটেছিল

সেকালে প্রতি তিন বছর অন্তর কার্তিক মাসে একটি উৎসব হত। তাকে 'কার্তিকোৎসব' বলা হত। ঐ উৎসবে যোগ দেওয়ার সময় রাজারা দেবতার মত সাজতেন। তারপর তাঁরা যেতেন 'চিত্ররাজ' নামে এক যক্ষের সামনে। সামনে থেকে যক্ষের চারদিকে চিত্রবিচিত্র চারটি পুষ্প-শর ছুঁড়তেন। ধনঞ্জয় একবার কার্তিকোৎসবে যোগ দিয়ে এ রকম চারটি তীর ছোঁড়েন। একটি তীর পুকুরের জলে পড়েছিল। সেই তীরটি আর পাওয়া গেল না। তখন রাজার মনে হল তীরটি কোন মাছের শরীরে লেগেছে। এই সন্দেহ থেকে রাজার মনে ভয় ঢুকল, তিনি ঘাতক হলেন না তো।

কলিঙ্গ দূতদের কাছে ঘটনাটির বিবরণ দিয়ে রাজা বললেন, 'তাই আমি কুরুধর্ম পালন করি কিনা সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ দেখা দিয়েছে।'

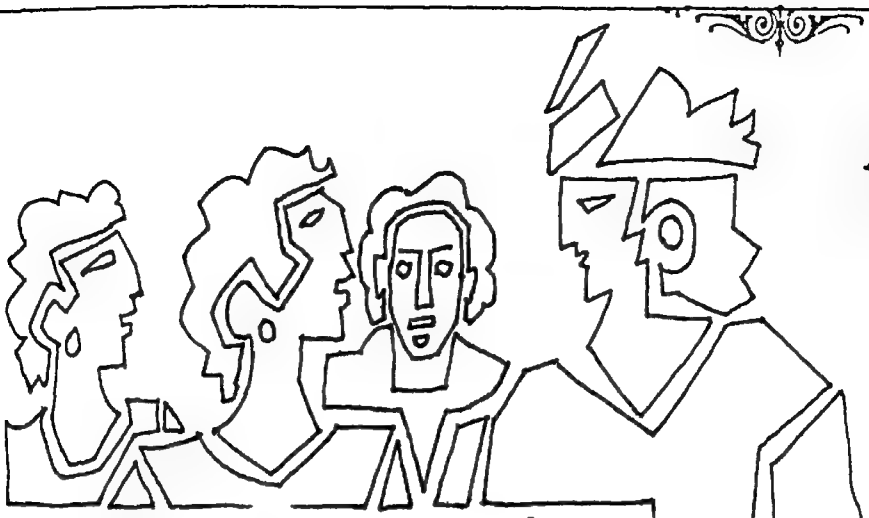

কলিঙ্গবাসীরা বলল, 'কিন্তু মহারাজ, আপনি তো প্রাণীহত্যা করার সংকল্প করেন নি। সংকল্প না থাকলে তো অপরাধ হতে পারে না। আপনি যে কুরুধর্ম পালন করেন তাই আমাদের বলুন। আমরা লিখে নেব।' তারপর রাজা বলে চললেন, কলিঙ্গবাসীরা লিখে নিতে থাকল।

'কাউকে হত্যা কোরো না। দান না করলে সে জিনিস নেবে না। মিথ্যে কথা, মিথ্যা আচরণ করবে না।' এই পর্যন্ত বলার পর রাজা বললেন, 'হয়ত এই সবগুলিই আমার আছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই। তোমরা আমার মার কাছে যাও।'

কলিঙ্গ দূতরা এবার রাজমাতার কাছে গেল। শুনে রাজমাতা বললেন, 'দেখ বাছারা, আমি কুরুধর্ম পালন করতাম ঠিকই, তবে ইদানিং আমারও মনে সংশয় দেখা দিয়েছে, হয়ত আমি ঠিক ভাবে কুরুধর্ম পালন করতে পারি নি।'

রাজমাতা তারপর যে কাহিনীটি বললেন তা হল :

একবার এক রাজা বোধিসত্ত্বকে লক্ষ টাকা দামের চন্দনসার আর হাজার টাকা দামের কাঞ্চনমালা উপহার পাঠিয়েছিল। রাজা সেসব রাজমাতাকে দিয়ে দেন। রাজমাতা আবার তা ছেলের বৌ-দের দিয়ে দিলেন। কিন্তু দেওয়ার সময় তিনি রাজমহিষী, বড়ছেলের বৌ-কে দিলেন হাজার টাকা দামের জিনিসটি। আর ছোট ছেলের বৌ-কে দিলেন লাখ টাকা দামের চন্দনসার। তিনি ভেবে-

ছিলেন ছোট ছেলের বৌ তত বড়লোক নয়, তাই দামী জিনিসটা তাকে দেওয়াটা ঠিক। পরে রাজমাতার মনে হয় বৌ-দের মধ্যে কার অবস্থা ভালো, কার অবস্থা খারাপ সেসব দেখার তার কি দরকার ছিল। কুরুধর্ম অনুসারে বড় বৌ-র সম্মানরক্ষাই তাঁর উচিত ছিল। এরপর থেকে রাজমাতা ভাবতে শুরু করেন যে, তিনি কুরুধর্ম থেকে চ্যুত হয়েছেন। কলিঙ্গ দূতরা সব শুনে বলল, এতে ধর্মচ্যুতি হয়নি। রাজমাতা তখন কুরুধর্ম সম্পর্কে তাদের দু-চার কথা বললেন। তারা সেসব লিখে নিল। কিন্তু রাজমাতা শেষে বললেন, 'কুরুধর্ম পালন করে আমার বড় বৌ। তোমরা তাঁর কাছে যাও।'

রাজমহিষীও কিন্তু একই কথা বললেন, 'আমি নিজের চরিত্রে খুশি নই। সেক্ষেত্রে তোমাদের কি ধর্মকথা শোনাব।' তারপর রাজমহিষী জানালেন, তাঁর মনে একবার খারাপ ইচ্ছে জেগেছিল। শুনে দূতরা বলল, 'তাতে কি? আপনি তো আর ইচ্ছেটাকে কাজে লাগান নি।' যাই হোক রাজমহিষী তারপর কুরুধর্ম সম্পর্কে দু-চার কথা বলে দূতদের বললেন, 'তোমরা আমার দেওরের কাছে যাও।'

রাজার ভাই শোনালেন আরেক কাহিনী। রাজকুমার রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় একটা নিশানা রেখে যেতেন বাইরে। তা দেখে উপরাজের সঙ্গে যারা দেখা করতে আসত তারা বুঝতে পারত, উপরাজ সেদিন বাইরে আসবেন কিনা। নিশানা দেখে যদি বুঝত বাইরে আসবেন তাহলে তারা রথের কাছেই অপেক্ষা করত। একদিন উপরাজ রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পর প্রবল বৃষ্টি নামে। সে রাতে সে রাজার কাছেই থেকে যায়। অথচ বাইরে নিশানা ছিল বেরিয়ে আসার। লোক তার জন্য সারা রাত বৃষ্টিতে ভিজে অপেক্ষা করেছে। এরপর উপরাজের ধারণা হয় সে কুরুধর্ম ঠিক ভাবে পালন করতে পারছে না।

এভাবে কলিঙ্গ দূতরা রাজপুরোহিত, অমাত্য, সারথি, শ্রেষ্ঠী—সকলের সঙ্গে দেখা করল একে একে। সকলেই অপরের কথা বলল। সকলেই বলল, তারা সঠিকভাবে কুরুধর্ম পালন করতে পারে নি। এভাবে এগারো জনের কাছে ধর্মকথা শুনে তারা দন্তপুরে ফিরে এল। কলিঙ্গরাজকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাল। রাজাও কুরুধর্ম পালন করতে শুরু করলে দেশে বৃষ্টি শুরু হল। দেশ আবার শস্যশ্যামলা হল।

শ্রেয়ো জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার ব্রহ্মদত্তের কুমার হিসাবে জন্ম নেন। যথাসময়ে লেখাপড়া, অস্ত্রচর্চা সমস্তই আয়ত্ত করলেন। ব্রহ্মদত্তের মৃত্যুর পর তিনি রাজা হলেন। সযত্নে রাজধর্ম পালন করতে লাগলেন।

একবার বোধিসত্ত্বের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী এক গর্হিত কাজ করে। বোধিসত্ত্বের কানে কথাটা গেল। তখন তিনি ভালো করে খোঁজখবর নিলেন। দেখলেন অভিযোগটা সত্যি। তখন কর্মচারীকে দেশ থেকে নির্বাসন দিলেন।

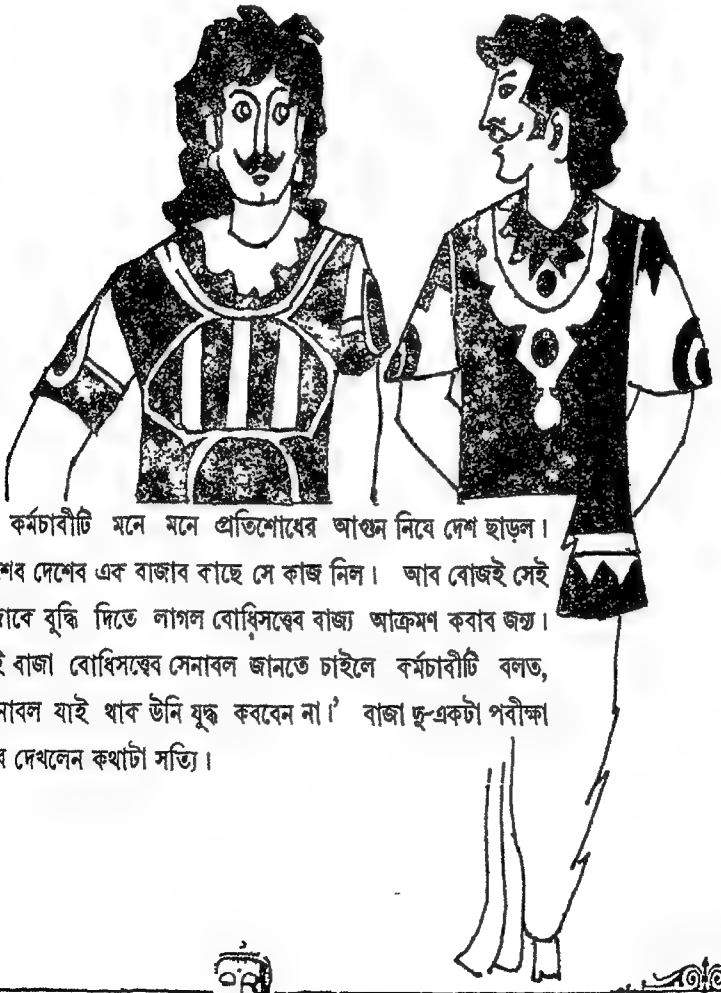

কর্মচারীটি মনে মনে প্রতিশোধের আগুন নিয়ে দেশ ছাড়ল। পাশের দেশের এক রাজার কাছে সে কাজ নিল। আর রোজই সেই রাজাকে বুদ্ধি দিতে লাগল বোধিসত্ত্বের রাজ্য আক্রমণ করার জন্য। সেই রাজা বোধিসত্ত্বের সেনাবল জানতে চাইলে কর্মচারীটি বলত, 'সেনাবল যাই থাক উনি যুদ্ধ করবেন না।' রাজা দু-একটা পরীক্ষা করে দেখলেন কথাটা সত্যি।

একদিন তিনি সত্যি সত্যি বোধিসত্ত্বের রাজ্য আক্রমণ করলেন। বোধিসত্ত্ব সভাসদদের কাছে খবরটা পেলেন। সেনাপতি ছুটে এল। কিন্তু রাজা যুদ্ধ করতে বারণ করলেন। যুদ্ধ মানেই মৃত্যু, লোকক্ষয়। বোধিসত্ত্ব তা চান না। ফল যা হবার তাই হল। বোধিসত্ত্বকে সেই রাজা বন্দী করে কয়েদখানায় রাখল।

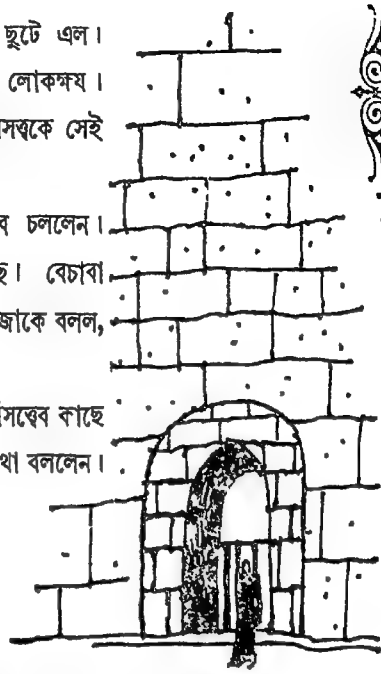

বোধিসত্ত্ব কিন্তু সেখানে বসেও মৈত্রীর কথা ভেবে চললেন। হঠাৎ দেখা গেল সেই রাজার শরীর আগুনে জ্বলে যাচ্ছে। বেচারা যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল। রাজার এক অনুচর রাজাকে বলল, 'ধার্মিক রাজাকে আক্রমণ করাতেই হয়ত ওটা হচ্ছে।'

রাজা তখন কয়েদখানার দরজা খুলে দিলেন। বোধিসত্ত্বের কাছে মাফ চাইলেন। বোধিসত্ত্ব তাকে মৈত্রী সম্পর্কে দু-চার কথা বললেন। যুদ্ধ ত্যাগ করতে বললেন।

বর্ধকি শূকর জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার বৃক্ষ দেবতারূপে জন্ম নেন। বারাণসীর কাছে তখন ছুতোরদের একটি গ্রাম ছিল। এক ছুতোর একবার বনে কাঠ কাটতে গিয়ে দেখল একটা শুয়োর গর্তে পড়ে আছে। ছুতোরের

একটু মায়া হল। সে শুয়োরটাকে বাড়িতে নিয়ে এল। ছুতোরের বাড়িতে ভালমন্দ খেয়ে শুয়োরের দশাসই চেহারা হল।

ছুতোরের কাজকর্মে শুয়োরটা সাহায্য করত। মুখে করে কাঠ বয়ে আনত। যন্ত্রপাতি এগিয়ে দিত। শুয়োরের অত সুন্দর চেহারা দেখে ছুতোর ভাবল লোকালয়ে থাকলে যে কেউ একদিন শুয়োরটাকে জবাই করে ফেলতে পারে, তার চেয়ে বরং বনের জীবকে বনেই ছেড়ে দিয়ে আসি। যেমন ভাবা তেমনি কাজ।

বনের মধ্যে নিজের পছন্দমত একটা জায়গা খুঁজতে লাগল সেই বিশাল শুয়োর। এমন সময় এক পাল শুয়োরের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

নবাগত শুয়োর অন্য শুয়োরদের দেখে বলল, 'এত সুন্দর জায়গা। খাবারের অভাব নেই। তবু তোমাদের শরীরে মাংস নেই কেন?'

'এখানে একটা বাঘ আছে।'

'তাতে কি?'

'সে এসে রোজ একটা করে শুয়োর মেরে ফেলে।'

'তোমরা এতগুলো শুয়োর একটা বাঘের সঙ্গে পার না?'

'আমাদের গায়ে অত জোর নেই।'

'আচ্ছা আমি দেখছি।'

নবাগত শুযোব অন্যদেব একটা ব্যাপাবে বাজি কবাল। তাবা তাব কথামত চলবে। এবাব বোজ সে শুযোবদেব যুদ্ধ কৌশল শেখানো শুরু কবল। চাবদিক দেখেশুনে ঠিক কবে ফেলল কোন জাযগায বাঘেব সঙ্গে লডাই হবে। শুযোববা কোথায থাকবে। কিভাবে লডবে। শক্তিশালী শুযোবদেব সামনে বেখে সে বেশ শক্ত একটা দেযাল খাড়া কবল। সামনে বিশাল গর্ত খুঁডে বাখল সবাই মিলে।

সব কাজ যখন শেষ হল তখন সূর্য উঠছে। বাঘ দেখল শুযোববা আজ ভয পাচ্ছে না। সে কটমট কবে তাকাল। নবাগত শুযোব অন্য শুযোবদেব বলল, 'তোমবাও ঐ ভাবে তাকাও।' শুযোববাও বাঘকে বক্তচক্ষু দেখাল। বাঘ গর্জন কবল। শুযোববাও সবাই একসঙ্গে গর্জন কবল।

বাঘ এতে একটু ঘাবডে গেল। ঐ বনে এক বদমাযেশ সাধু থাকত। বাঘ তাকে শিকাবেব ভাগ দিত। বাঘ সাধুব কাছে গিযে বলল, 'প্রভু, শুযোববা আজ আমাকেই ভয দেখাচ্ছে।' সাধু বলল,

'তোমাব চোখের ভুল। তুমি হলে পশুদের সেবা। তুমি একবার আক্রমণ কবলেই ওবা ভযে পালাবে।'

বাঘ মনে জোর এনে লাফ দিল শুয়োরের পালের ওপর। শুয়োরের পাল সামান্য সরে গেল। বাঘ পড়ল গর্তে। তারপর আর কি। সব শুয়োর মিলে গোত্তা মেরেই বাঘকে শেষ করল। নবাগত শুয়োর অবশ্য এতেই রণে ভঙ্গ দিল না। সে বলল, 'চল, দুষ্ট সাধুটাকেও শেষ করি।' সাধুটার যে কি হাল হয়েছিল তা নিশ্চয়ই আর বলার দরকার নেই।

শালুক জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার গোরু হয়ে জন্মান। তখন তাঁর নাম হয় মহালোহিত। তাঁর ছোট ভাইয়ের নাম ছিল চুল্ললোহিত। তাঁরা থাকতেন এক গেরস্থের বাড়িতে। ঐ গেরস্থের একটি বিবাহ-যোগ্যা মেয়ে ছিল। এক সময় গেরস্থের মেয়ের বিয়ে পাকা হল।

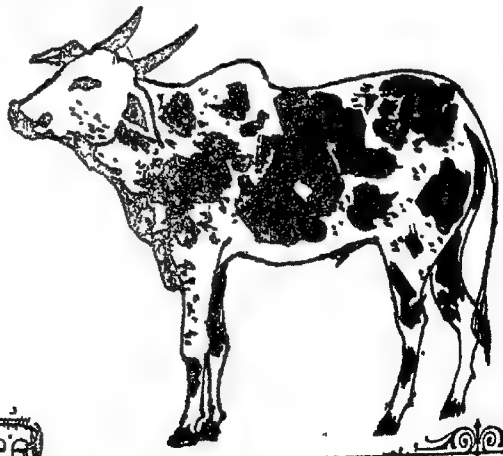

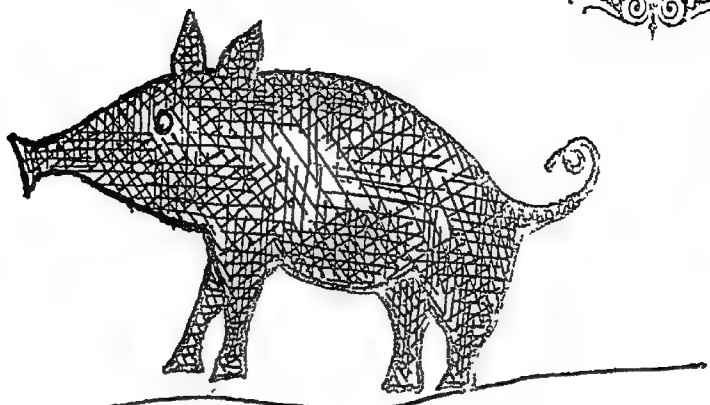

গেবস্থের বাড়িতে শালুক নামে একটা শুয়োর ছিল। শুয়োরটা ছিল বেশ মোটাসোটা। গেবস্থ ঠিক করল বিয়ের দিন ঐ শুয়োরটাকে মেরে বরযাত্রীদের খাওয়াবে। যাতে শুয়োর আরও মোটা হয় সেজন্য গেবস্থ তাকে ভালোমন্দ খেতে দিতে লাগল।

চুল্ললোহিত শুয়োরের খাবারের ঘটা দেখে তার দাদাকে বলল, 'দাদা, আমরা দুজনে এই গেবস্থের কত কাজ করছি। আমরা আছি বলে গেবস্থ খেতে পাচ্ছে। এই শুয়োরটা তার কোন কাজই লাগে না। অথচ ও আমাদের কখনও ভালমন্দ খেতে দেয় না। এদিকে দেখ শুয়োরটাকে কত যত্ন করে খাওয়াচ্ছে।'

শুনে মহালোহিত বললেন, 'ভাই, তুমি তো জান না গেবস্থ শুয়োরকে কেন যত্ন করছে। ওর দিন ফুরিয়ে এসেছে। বিয়ের দিন গেবস্থ একে জবাই করবে। সেজন্যই ওকে মোটা বানাচ্ছে। শুয়োরটাকে হিংসে কোরো না।'

দিন কয়েক পরে বিয়ের দিন এসে গেল। শুয়োরটাকে সেদিন সত্যিই জবাই করা হল। চুল্ললোহিত সব দেখেশুনে বলল, 'আমাদের ভুসিই বেঁচে থাক, কি বল দাদা।'

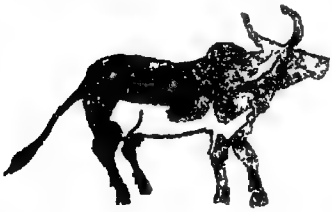

মৎস্যদান জাতক

পুরাকালে ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার এক জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যথাসময়ে বোধিসত্ত্ব বড় হলেন। পেশাগত কাজকর্মে মন দিলেন। সম্পত্তি বৃদ্ধি করলেন।

বোধিসত্ত্বের এক ছোট ভাই ছিল। এক সময় বোধিসত্ত্বের বাবা-মা গত হলেন। দু ভাই একবার বাবার প্রাপ্য টাকা আদায় করার জন্য এক গ্রামে যান। সেখানে এক হাজার টাকা পেলেন। বাড়িতে ফেরার পথে নদীর ঘাটে বসে দুজনে খেলেন। গাছের পাতা কেটে থালা বানিয়ে তাঁরা সেই থালায় খেলেন। এটোকাটা নদীতে ফেলে দিলেন। মাছেরা এটো খেল। আর বোধিসত্ত্ব এই দানের ফল নদী দেবতাকে দিয়ে দিলেন। নদী দেবতা ঐ দানের পুণ্যফল পেয়ে খুবই খুশি হলেন। বুঝতে পারলেন বোধিসত্ত্বই তাঁকে এই পুণ্যফল দান করেছেন।

বোধিসত্ত্বের ছোট ভাই একটু চোর-স্বভাবের। সে ভাবছিল কি করে বোধিসত্ত্বকে ফাঁকি দিয়ে হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া যায়। ভেবে ভেবে সে একটা ফন্দি বের করল। টাকার থলেটার মত দেখতে আরেকটা থলে বানাল সে। তারপর সেই থলেটা পাথরকুচি দিয়ে বোঝাই করল। মনে মনে ভেবে রাখল নদী পার হওয়ার সময় পাথরকুচির থলেটা নদীতে ফেলে দেবে। বোধিসত্ত্ব তাহলে ভাববেন টাকাটাই জলে পড়ল। সে তখন অনায়াসে হাজার টাকা আত্মসাৎ করতে পারবে।

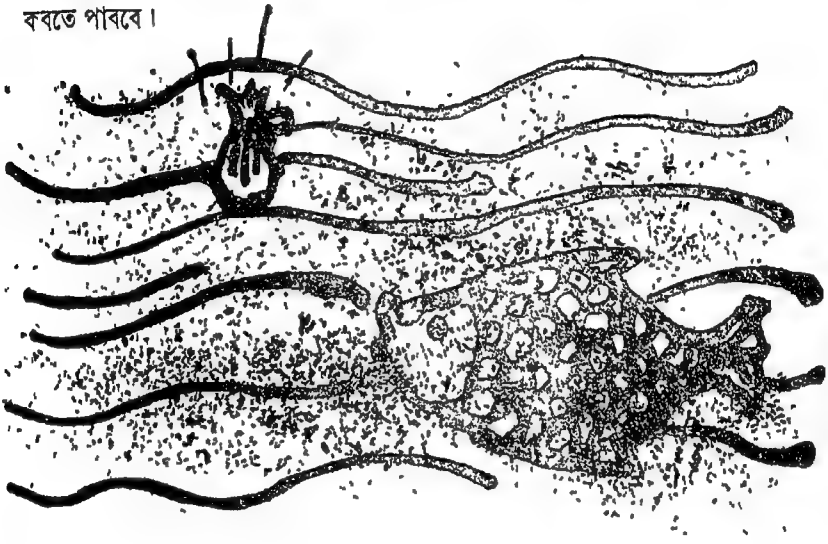

নৌকোয় উঠে সে ঠিক তাই করতে গেল। কিন্তু ভুল করে টাকার থলেটাই নদীতে ফেলে দিল। পাথরকুচির থলেটা নিজের কাছে রেখে দিল। ভাবল এটাই টাকার থলে। টাকার থলে জলে পড়ে যাওয়ায় বোধিসত্ত্ব কিন্তু খুব একটা দুঃখ করলেন না। বললেন, 'যা গেছে তা গেছে, দুঃখ করে আর কি হবে।'

কিন্তু নদী দেবতা ভাবলেন লোকটা আমার উপকার করেছে। আমার উচিত ওর উপকার করা। তিনি তখন এক বিশাল মাছকে বললেন ঐ থলেটা খেয়ে ফেলতে। মাছ তাই করল।

ছোট ভাই বাড়িতে ফিরে এসে থলে খুলে দুঃখে কপাল চাপড়াতে লাগল। ওদিকে পরের দিন সকালেই সেই মাছটা জেলেদের হাতে ধরা পড়ল। জেলেরা মাছের দাম হাঁকল এক হাজার সাত টাকা।

ঐ দামে কেউই মাছ কিনতে রাজি হল না।

শেষে তারা বোধিসত্ত্বের কাছে এসে বলল, 'মহাশয়, মাছটার দাম অন্যদের কাছে এক হাজার সাত টাকা চেয়েছি। আপনি নিলে সাত টাকা দিলেই হবে।'

বোধিসত্ত্ব সাত টাকা দিয়ে মাছটা কিনে নিলেন। তাঁর স্ত্রী মাছ কুটতে গিয়ে টাকার থলেটা পেলেন। টাকাটা পাওয়ার পর বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারলেন জেলেরা কেন মাছটার দাম এক হাজার সাত টাকা চেয়েছিল। আর কেনই বা বোধিসত্ত্বের কাছ থেকে মাত্র সাত টাকা নিয়েছে।

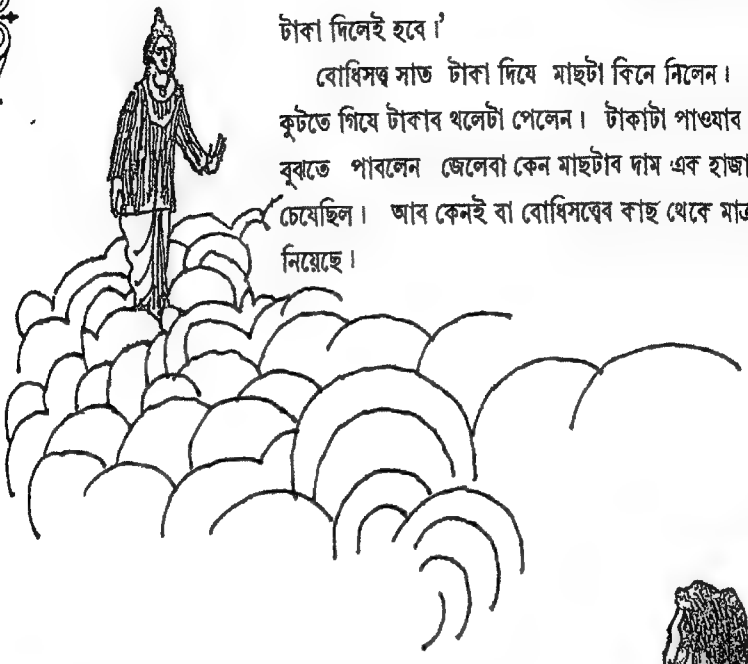

কিন্তু বোধিসত্ত্ব যে জিনিসটা বুঝতে পারছিলেন না, তা হল হারানো টাকার থলে কোন্ অদৃশ্য কারণে তিনি ফিরে পেলেন। বোধিসত্ত্ব যখন এ কথা ভাবছেন, তখন নদী দেবতা আকাশপথে বোধিসত্ত্বকে দেখা দিলেন। ছোট ভাইয়ের কীর্তি ফাঁস করে দিলেন। বোধিসত্ত্বকে বললেন, 'তোমার ওই চোর ভাইটাকে এক পয়সাও দিও না।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তা হয় না। ছোট ভাইয়ের পাওনা টাকা আমি ঠকাতে পারব না। সে ভুল করেছে বলে আমি ভুল করতে পারি না।'

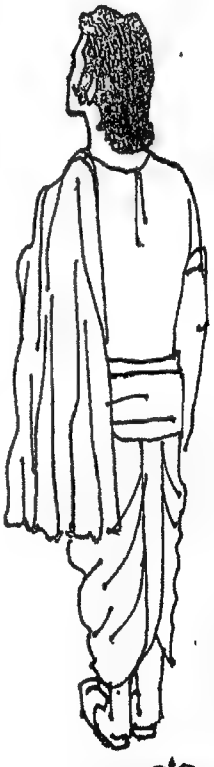

খুল্লকলিঙ্গ জাতক

পুরাকালে কলিঙ্গরাজ্যের দন্তপুরে কালিঙ্গ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। ঠিক সেই সময় অশ্বক রাজ্যের পোতলি নগরে রাজত্ব করতেন অশ্বক নামে এক রাজা। কলিঙ্গ রাজের যেমন সেনাবল, তেমনি তার নিজের শক্তি। তার সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারে এমন কেউ ছিল না।

কালিঙ্গের একবার যুদ্ধ করার ইচ্ছা খুব প্রবল হয়ে উঠল। সে তার অমাত্যদের জিজ্ঞেস করল, 'বল তো কার সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়। আমার সমকক্ষ তো কাউকেই দেখছি না।' তখন অমাত্যরা বলল, 'মহারাজ, এক কাজ করুন। আপনার চার মেয়েই সুন্দরী। তাদের রথে বসিয়ে দেশ ভ্রমণে পাঠান। যে রাজা তাদের নিজের অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে চাইবে আমরা তার সঙ্গেই যুদ্ধ করব।'

কলিঙ্গরাজ তাই করল। কিন্তু গোটা জম্বুদ্বীপে কেউই

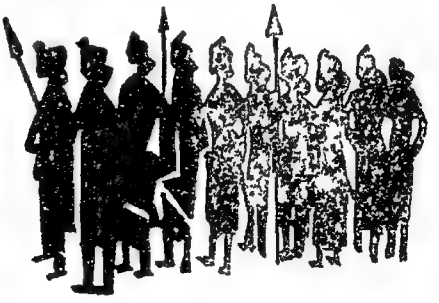

কলিঙ্গবাজাব মেযেদেব স্পর্শও কবল না। ববং তারা উপহার পাঠিযে ভযে ভযে তাদেব বিদায দিল। শেষে রাজকন্যারা পোতলি নগবে এল।

অশ্বক বাজাব এক সুপণ্ডিত অমাত্য ছিল। তাব নাম নন্দীসেন। নন্দীসেন বাজকন্যাদেব আসতে দেখে ভাবল কলিঙ্গ বাজার সঙ্গে যুদ্ধ কবতে পাবে এমন একজন বাজাও কি জম্বুদ্বীপে নেই? জম্বুদ্বীপের পক্ষে এ এক কলঙ্কের কথা। নন্দীসেন নগবের দবজা খোলার হুকুম দিল। রাজকন্যাদের সে রাজাব কাছে নিয়ে এল। অশ্বক রাজাকে সে বলল, 'মহাবাজ, আপনি এই চার কন্যাকে বিবাহ করুন, যুদ্ধেব দাযিত্ব আমাব।' অশ্বক রাজা তাই কবল। দূতদেব বলে দিল, 'যাও কলিঙ্গবাজকে বল, আমি তাব চাব কন্যাকে বাজমহিষী কবেছি।'

কলিঙ্গবাজ যুদ্ধসাজে বওনা দিল। খবব পেযে নন্দীসেন কলিঙ্গ রাজকে একটি চিঠি পাঠাল, 'যুদ্ধ হবে দুই বাজ্যেব সীমানাব কাছে। আপনি আপনার বাজ্যেব সীমানায থাকুন।'

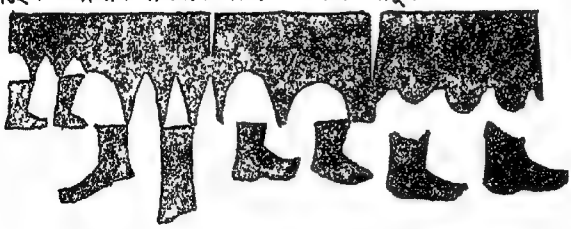

বোধিসত্ত্ব এই সময় দুই রাজ্যের সীমানায় একটি কুঁড়েঘরে থাকতেন। তপস্যা করে দিন কাটাতেন। কলিঙ্গরাজ মনে মনে ভাবল তপস্বীরা অনেক কিছু জানেন। প্রথমে ওকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া ভাল যে এই যুদ্ধে কে জিতবে। কালিঙ্গ বোধিসত্ত্বের কাছে ছদ্মবেশে গেল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আজ আমি বলতে পারব না। তবে আপনি কাল যদি আসেন জানতে পারবেন। কেননা কাল দেবরাজ শক্র এখানে আসবেন। তিনি সবই জানেন।'

পরের দিন কালিঙ্গ এলে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'এ যুদ্ধে কলিঙ্গের জয় হবে। সেজন্য আগেই কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দেবে।' কলিঙ্গরাজ কিন্তু জিজ্ঞেস করল না কি কি লক্ষণ দেখা দেবে। জয় হবে শুনেই সে খুশি হয়ে ফিরে গেল। আর কথাটা চাউড করে দিল।

অশ্বক রাজার কানে ঐ সংবাদ এল। অশ্বক তখন নন্দীসেনকে বলল, 'এ কি শুনছি নন্দীসেন?' নন্দীসেন বলল, 'দেখুন মহারাজ, যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কথা কেউ বলতে পারে না। ও কথা ভাবার দরকার নেই।'

নন্দীসেন তারপর অশ্বক রাজার এক হাজার বাছাই করা বীর সেনাকে নিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠল। তারপর তাদের জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি মহারাজের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত?'

হ্যাঁ প্রভু।

তাহলে এখুনি খাদে লাফ দাও।

তারা লাফ দিতে গেলে নন্দীসেন তাদের আটকাল। বলল, 'যুদ্ধক্ষেত্রে এভাবে লড়াই কোরো, তাহলেই হবে।'

নন্দীসেন বোধিসত্ত্বের কাছে গিয়ে জানতে পেরেছিল যুদ্ধে কলিঙ্গ-রাজ জিতবে। সে তখন জিজ্ঞেস করেছিল, 'তার লক্ষণ হিসেবে কি দেখা যাবে?' বোধিসত্ত্ব বলেছিলেন, 'কলিঙ্গ রাজার রক্ষাকর্তা হবে একটি সাদা ষাঁড়, আর অশ্বক রাজার রক্ষাকর্তা হবে কালো ষাঁড়। এই দুটি ষাঁড়ে লড়াই হবে। কালো ষাঁড় হেরে যাবে।'

যুদ্ধ শুরু হলে কলিঙ্গ রাজার সেনারা অবহেলায় লড়ছিল। ক্রমে তাদের দম ফুরিয়ে গেল। অশ্বক রাজার সেনাদের হাতে তারা প্রাণ দিতে লাগল। কিন্তু তখনই ঐ ষাঁড় দুটি দেখা দিল। তারা লড়াই শুরু করল। কালো ষাঁড় সাদা ষাঁড়ের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। নন্দীসেন তখন সেই হাজার সেনাকে আদেশ করল সাদা ষাঁড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। মুহূর্তের মধ্যে সাদা ষাঁড় মারা পড়ল। কলিঙ্গরাজ রণে ভঙ্গ দিল।

পালাবার সময় কলিঙ্গরাজ বোধিসত্ত্বকে কটু কথা বলে গেল। পরে বোধিসত্ত্ব শক্রকে ধরলেন। 'দেবতারা কি মিথ্যা কথা বলেন?', জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে। শক্র জবাব দিলেন, 'দেবতারা বীরের পক্ষে থাকেন। অশ্বকরাজ বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিল, তাই তার জয় হয়েছে।'

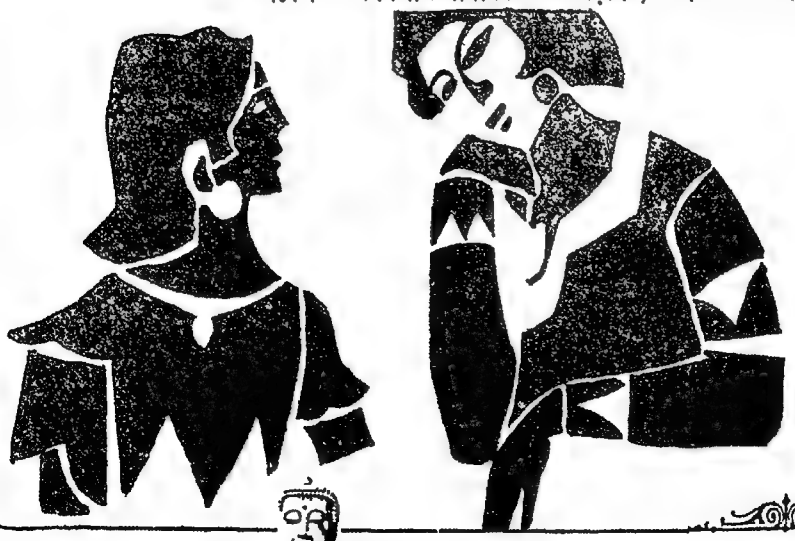

মহাশ্বারোহ জাতক

বোধিসত্ত্ব তখন বারাণসীর রাজা। রাজা হিসেবে তিনি সুবিবেচক ও ন্যায়পরায়ণ। একবার রাজ্যের সীমানার কাছে প্রজারা বিদ্রোহ করল। বোধিসত্ত্ব সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের দমন করতে গেলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁর হার হল। তখন তিনি পালাতে লাগলেন। পালাতে পালাতে সীমানার কাছে এক গ্রামে এলেন।

সেই গ্রামে কয়েক ঘর রাজভক্ত প্রজা বাস করত। তারা তখন সকাল বেলায় গ্রামের নানা কাজে ব্যস্ত ছিল। এমন সময় সুসজ্জিত রাজাকে দেখতে পেল তারা।

রাজপুরুষের বেশবাস দেখে অনেকেই পালিয়ে গেল। কিন্তু

একজন ফিরে গেল না। সে এসে রাজাকে জিজ্ঞেস করল, 'শুনেছি রাজা সীমান্ত অঞ্চলে এসেছেন। তুমি কে? রাজভক্ত, না বিদ্রোহী?'

আমি রাজভক্ত।

তাহলে আমার সঙ্গে এস।

সে রাজাকে ঘরে নিয়ে গেল। নিজের স্ত্রীকে বলল, 'আমার বন্ধুর পা ধুইয়ে দাও।' তারপর সে রাজাকে নিজে সামর্থ্য অনুসারে খেতে দিল। নিজের হাতে বিছানা করে শুতে দিল। রাজার ঘোড়ার যত্নআত্তি করল।

তিন-চার দিন পরে রাজা চলে গেলেন। যাবার সময় সেই গ্রামবাসীকে বলে গেলেন, 'আমার নাম মহাশ্বারোহ। যদি কখনও নগরে যাও দুয়ারীকে বোলো আমি মহাশ্বারোহের বাড়ি যাব। সে তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসবে।'

রাজার সৈন্যরা এতদিন নগরের বাইরে রাজার জন্য অপেক্ষা করছিল। এখন সবাই মিলে নগরে প্রবেশ করল। প্রবেশ করার সময় রাজা দুয়ারীকে বলে গেলেন, 'কোন লোক যদি এসে বলে আমি মহাশ্বারোহের বাড়ি যাব, তাকে আমার কাছে পৌঁছে দিও।'

তবু সেই গ্রামবাসী এল না। রাজা তখন ঐ গ্রামের খাজনা বাড়িয়ে দিলেন। তাতেও সেই গ্রামবাসী এল না। রাজা আরও দু-তিন বার খাজনা বাড়ালেন। কিন্তু কোন ফল হল না।

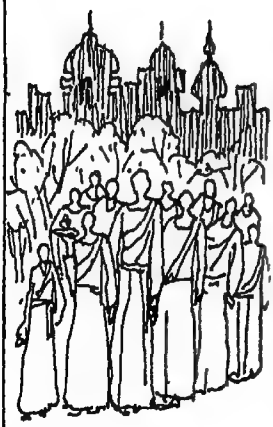

ওদিকে গ্রামবাসীরা সেই অতিথিপরায়ণ, রাজভক্ত প্রজাকে ধরল, 'আপনি রাজার কাছে যান। যেদিন মহাশ্বারোহ ফিরে গেলেন তারপর থেকে আমরা খাজনায় জর্জরিত হচ্ছি। আপনি ব্যবস্থা করুন।' রাজভক্ত প্রজা তখন বলল, 'খালি হাতে আমি যেতে পারব না।'

তখন সবাই মিলে চাঁদা তুলে রাজার স্ত্রীর জন্য পোশাক, অলঙ্কার তৈরি করল। অনেক মণ্ডা মিঠাই দিল। সেইসব নিয়ে ঐ প্রজা নগরে এসে দুয়ারীকে বলল, 'মহাশ্বারোহের বাড়িতে যাব।'

দুয়ারী রাজার কাছে খবর পাঠাল। রাজা বললেন, 'ওঁকে সসম্মানে নিয়ে এস।'

তারপর রাজমহিষীকে বললেন, 'বন্ধুর পা ধুইয়ে দাও।' মোট

কথা, রাজা ঐ বন্ধুর খুব যত্নআত্তি করলেন। শুধু তাই নয়, পুত্রকন্যা সমেত এসে নগরে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাদের মধ্যে গভীর সখ্যতা জন্মাল। দুজনে প্রায় এক হয়ে রাজ্য পালন করতে

লাগলেন।

রাজা নতুন বন্ধুকে খাতির করায় অমাত্যদের কেউ কেউ চটে গেল। একদিন তারা রাজপুত্রকে বলল, 'রাজকুমার, আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন রাজা এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে কি খাতির করছেন। রাজা তাকে অর্ধেক রাজত্ব দিয়েছেন। আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর বন্ধু ও বন্ধুর সন্তানদের সম্মান দেখাতে। এতে আমরা খুবই লজ্জিত। আমরা জানি না লোকটা রাজার এমন কি মহা উপকার করেছে। আপনি রাজাকে সতর্ক করুন।'

রাজকুমার অমাত্যদের সঙ্গে একমত হল। সে রাজাকে গিয়ে বলল, 'মহারাজ, এ আপনি কি করছেন?' রাজা তখন বললেন, 'বৎস, তুমি কি জান যুদ্ধে হেরে গিয়ে আমি যে কদিন অজ্ঞাতবাসী হয়ে ছিলাম, তখন আমি কোথায় ছিলাম?'

না।

আমি এর কাছেই ছিলাম।

তাতে কি?

লোকটি তখন আমার অনেক উপকার করেছে।

তারপর রাজা কুমারকে শিক্ষা দিলেন, 'দেখ বৎস, যে দানের অযোগ্য লোককে দান করে সে যেমন ভুল করে, তেমনি যে দানের যোগ্য তাকে দান না করাটাও ভুল। এ ভুল যে করবে সে বিপদের দিনে কোন বন্ধু পাবে না।'

শীলমীমাংসা জাতক

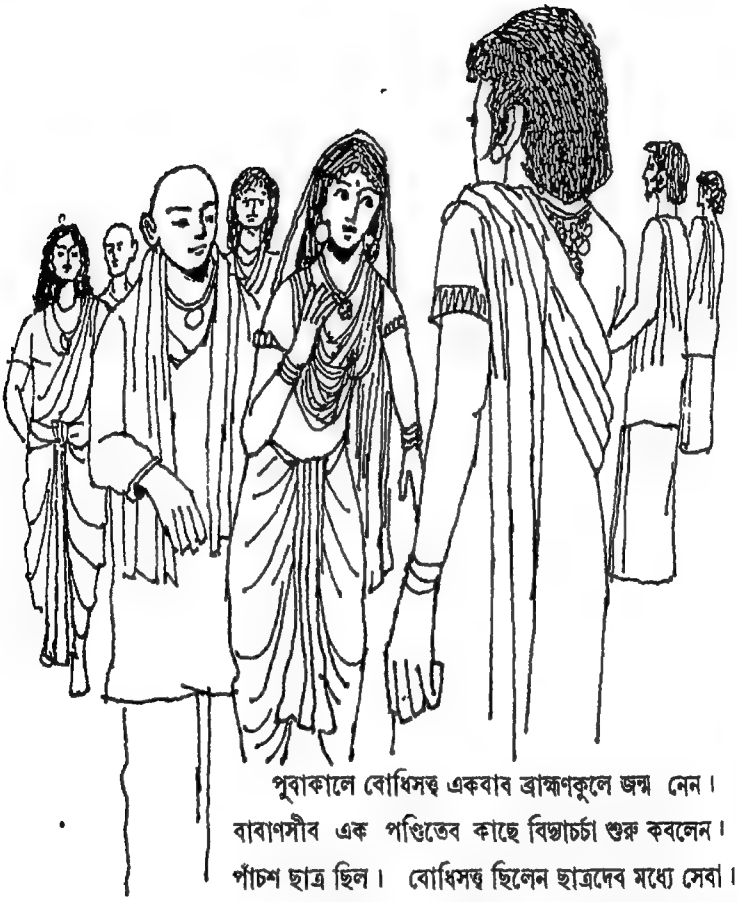

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব একবার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেন। বয়সকালে বারাণসীর এক পণ্ডিতের কাছে বিদ্যাচর্চা শুরু করলেন। আচার্যের পাঁচশ ছাত্র ছিল। বোধিসত্ত্ব ছিলেন ছাত্রদের মধ্যে সেরা।

আচার্যের একটি মেয়ে ছিল। সে বড় হয়েছে। আচার্য ভাবলেন, মেয়ের এবার বিয়ে দেওয়া দরকার। তারপর ভাবলেন শিষ্যদের মধ্যে যার চরিত্র সেরা তাকে জামাই করাই ঠিক।

তারপর তিনি শিষ্যদের ডেকে বললেন, 'শোন বাছারা, আমার মেয়ে তো বড় হয়েছে, এবার তার বিয়ে দেব। কিন্তু বিয়ে দিতে গেলে পোশাক-আশাক-গয়না দরকার। তোমরা যে যা পার নিয়ে

এস। তবে যাই আন না কেন, কোন প্রাণী যেন তা দেখতে না পায়। সকলের চোখ এড়িয়ে আনতে হবে।'

শিষ্যরা রাজি হয়ে বেরিয়ে গেল। একে একে অনেকে অনেক জিনিস নিয়ে এল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব কিছুই আনলেন না। ওদিকে অন্য শিষ্যদের আনা জিনিসপত্র প্রত্যেকের নামে নামে আলাদা করে রাখা আছে। বোধিসত্ত্বের নামে কিছুই জমা পড়ে নি।

আচার্য একদিন বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাছা, সবাই তো তাদের সামর্থ্যমত যা পেরেছে এনেছে। কই, তুমি তো কিছুই আনলে না?'

না, গুরুদেব।

কেন?

আমি পারি নি।

কেন পারলে না?

বোধিসত্ত্ব তখন ব্যাখ্যা করে বললেন, 'গুরুদেব, আপনি বলেছেন লুকিয়ে আনতে। মানে চুরি করতে। কিন্তু পাপ কাজের সাক্ষী তো থাকবেই। মানুষ দেখতে না পাক অন্য প্রাণী দেখবে। এমন কি তারাও যদি না দেখতে পায় তবে যে আনবে সে তো দেখবেই। সেজন্য আমি পারি নি।'

শুনে আচার্য খুব খুশি হলেন। তিনি বুঝলেন যে চরিত্রবান পাত্র তিনি খুঁজছিলেন বোধিসত্ত্বই সেই ব্যক্তি। তারপর তিনি শিষ্যদের সব জিনিসপত্র ফিরিয়ে দিলেন। মেয়েকে স্বর্ণালঙ্কারে সাজিয়ে বোধিসত্ত্বের কাছে সমস্ত দান করলেন।

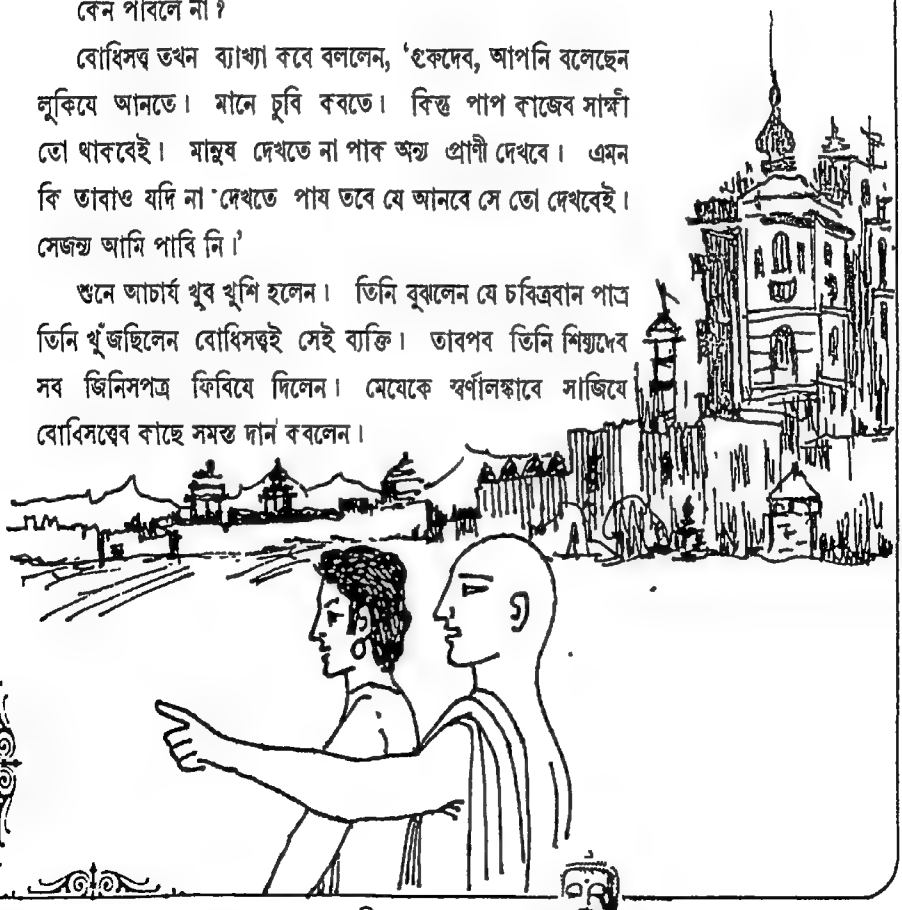

শবক জাতক

একবার বোধিসত্ত্ব চণ্ডাল জন্ম নেন। যথাবয়সে বিবাহ করেন। একদিন বোধিসত্ত্বের স্ত্রী বলল, 'স্বামী, আমার খুব আম খেতে ইচ্ছা করছে।'

তখন আমের সময় নয়। বোধিসত্ত্ব স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি আম-জাতীয় অন্য কোন ফল খাও, কেননা এখন তো আর আমের সময় নয়। আম এখন কোথায় পাব।' কিন্তু তাঁর স্ত্রী এতে আশ্বস্ত হল না। বরং সে বলতে লাগল, 'আম না পেলে আমি বাঁচব না।' বোধিসত্ত্ব তাঁর

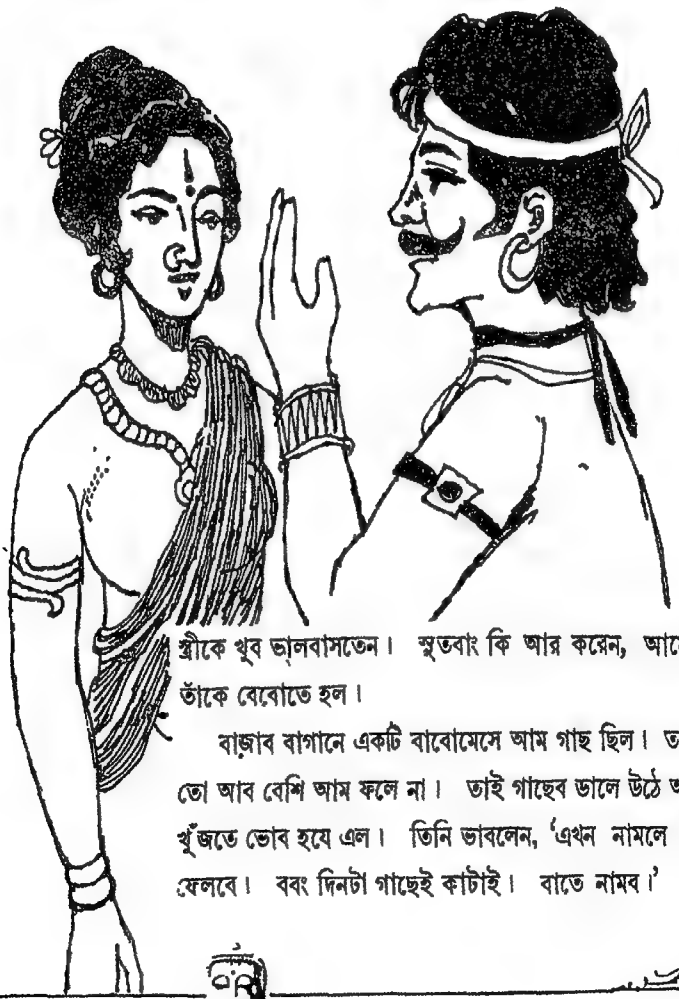

স্ত্রীকে খুব ভালবাসতেন। সুতরাং কি আর করেন, আমের খোঁজে তাঁকে বেরোতে হল।

রাজার বাগানে একটি বারোমেসে আম গাছ ছিল। তবে অসময়ে তো আর বেশি আম ফলে না। তাই গাছের ডালে উঠে আম খুঁজতে খুঁজতে ভোর হয়ে এল। তিনি ভাবলেন, 'এখন নামলে সবাই ধরে ফেলবে। বরং দিনটা গাছেই কাটাই। রাতে নামব।'

সকালবেলা রাজা আর তাঁর পুরোহিত এলেন। রাজা বসলেন গাছের গুঁড়িতে উঁচু আসনে, আর পুরোহিত বসলেন নিচু আসনে। তা দেখে বোধিসত্ত্বের খুব খারাপ লাগল। এই অধর্ম দেখতে না পেরে তিনি নেমে এলেন।

রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আমি অধর্ম করেছি, কিন্তু আপনারা দুজনও অধর্ম করছেন।' রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?' তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'গুরু নিম্নাসনে আর শিষ্য যদি উচ্চাসনে বসে তাহলে অধর্ম হয় না?' পুরোহিতও স্বীকার করলেন কথাটা।

রাজা তখন বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাশয়ের জাত কি?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমি চণ্ডাল।' রাজা তখন বললেন, 'তুমি উঁচু জাতের হলে এই রাজ্য তোমায় দান করতাম। তবে যাই হোক এখন থেকে এ রাজ্যে আমি দিনের রাজা। আর তুমি হলে রাতের রাজা।'

ক্ষান্তিবাদী জাতক

পুরাকালে বারাণসীতে কলাবু নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। বোধিসত্ত্ব তখন সৎ বংশে জন্ম নেন। তাঁর নাম ছিল কুণ্ডল কুমার। সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়ে যথাবয়সে তিনি বিবাহ করেন। তাঁর মা-বাবা একসময়ে গত হলেন। বোধিসত্ত্ব তখন ভাবলেন, 'এত ঐশ্বর্য রেখে ওঁরা চলে গেলেন। একদিন আমাকেও এভাবে চলে যেতে হবে।'

তিনি তখন যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে তপস্বী হলেন। তারপর দীর্ঘকাল হিমালয় অঞ্চলে থেকে তপস্যা করলেন। একবার তাঁর নুন ফুরিয়ে যাওয়ায় তিনি বারাণসীতে এলেন। বারাণসীরাজ কলাবুর বাগানে বিশ্রাম ও ধ্যান করতে লাগলেন।

সেই সময় রাজার সেনাপতি তাঁকে দেখতে পায়। সেনাপতি বোধিসত্ত্বের চালচলনে মুগ্ধ হয়। সে তাকে নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এল। যত্ন করে খাওয়াল। আর এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল যে বোধিসত্ত্ব বেশ কিছুকাল রাজার বাগানে থাকবেন।

রাজা কলাবু একদিন প্রচুর মদ খেয়ে নেশাগ্রস্থ হলেন। দাস-দাসী-নর্তকীদের নিয়ে তিনি বাগানে এলেন। এক সুন্দরী রমণীর কোলে কলাবু শুয়ে থাকলেন, আর অন্য নর্তকীরা নাচতে লাগল। রাজা কলাবু এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন। নর্তকীরা তখন নাচতে নাচতে ক্লান্ত। তারা পরস্পরকে বলল, 'রাজা ঘুমোচ্ছেন, এই বেলা আমরা বাগানটা ঘুরে দেখি।'

ঘুরতে ঘুরতে তারা ধ্যানমগ্ন বোধিসত্ত্বকে দেখতে পেল। তারা বলাবলি করল, 'আমরা এই সুযোগে তপস্বীর কাছে কিছু ধর্মকথা শুনি।' তারা বোধিসত্ত্বকে ঘিরে বসল। বোধিসত্ত্ব ধর্মকথা বলতে লাগলেন।

ওদিকে রাজা কলাবু ঘুম ভেঙ্গে নর্তকীদের দেখতে না পেয়ে রাগে কাঁপতে লাগলেন। তিনি বোধিসত্ত্বের দিকে খাঁড়া হাতে ছুটে এলেন। নর্তকীরা রাজাকে নিরস্ত করল। রাজা ধরেই নিয়েছিলেন বোধিসত্ত্ব এক ভণ্ড তপস্বী। তিনি বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোন মতাবলম্বী?'

আমি ক্ষান্তবাদী।

ক্ষান্ত কাকে বলে?

মনের অ-ক্রুদ্ধ ভাবকে।

এখনই দেখা যাবে।

রাজা কলাবু তখন ঘাতককে ডাকিয়ে আনলেন। ঘাতক এসে জিজ্ঞেস করল, 'মহারাজের কি আজ্ঞা।' রাজা বললেন, 'এই ভণ্ড তপস্বীকে কাঁটার চাবুক দিয়ে সামনে-পেছনে দু হাজার ঘা লাগাও।' ঘাতক তাই করল। বোধিসত্ত্বের গায়ের চামড়া ফেটে মাংস উঠে এল। সারা শরীর দিয়ে রক্ত বইতে লাগল।

ওহে ভণ্ড তাপস, এখন বল তুমি কোন্ বাদী?

আজ্ঞে, ক্ষান্তবাদী।

এখনও?

ভেবেছেন ক্ষান্তি চামড়া-মাংসয থাকে? তা নয়।

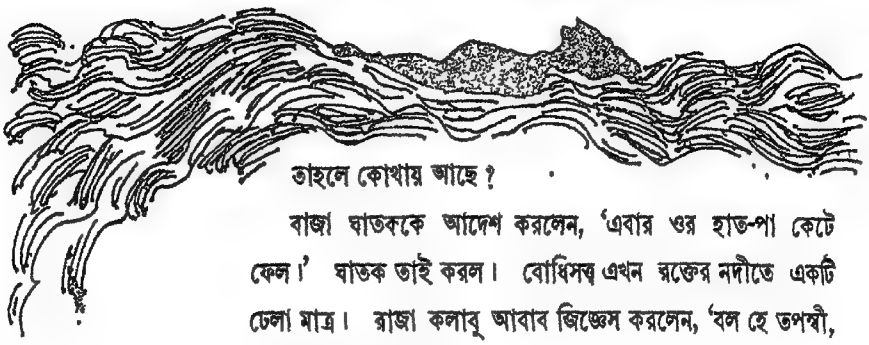

তাহলে কোথায় আছে?

বাজা ঘাতককে আদেশ করলেন, 'এবার ওর হাত-পা কেটে ফেল।' ঘাতক তাই করল। বোধিসত্ত্ব এখন রক্তের নদীতে একটি ঢেলা মাত্র। রাজা কলাবু আবাব জিজ্ঞেস করলেন, 'বল হে তপস্বী, এখন তুমি কোন্ বাদী?'

ক্ষান্তবাদী।

এখনও?

ভেবেছেন ক্ষান্তি হাত-পায়ে থাকে? তা নয, হৃদয়ে আছে।

রাজা এবাব হুকুম কবলেন তপস্বীর নাক-কান কেটে ফেলতে। ঘাতক যথা আজ্ঞা কাজ কবল। রক্তেব স্রোত বইতে লাগল। কলাবু তপস্বীকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এবাব বল, তুমি কোন্ বাদী?'

ক্ষান্তবাদী মহারাজ।

বাজা তখন লোকজনসমেত চলে গেলেন। যাওযার সময বলে গেলেন, 'বেশ, তোমার ক্ষান্তিসমেত এবার মৃত্যুর দরজা দিযে অদৃশ্য হও।'

বাজাকে বেশি দূর যেতে হল না। কযেক পা হাঁটার পর ভযঙ্কর আগুন তাকে টেনে নিয়ে গেল অনন্ত নরকে। সেনাপতি এসে বোধিসত্ত্বকে বলল, 'প্রভু, আপনার কোপদৃষ্টি রাজার ওপর পড়ুক, কিন্তু এ রাজ্যের যেন কোন ক্ষতি না হয।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'কোপদৃষ্টির হাত থেকে আমি মুক্ত হয়েছি, ক্রোধ আমার দ্বারা অসম্ভব।' সেদিন তিনিও ঐ বাগানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মাংস জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার বণিককুলে জন্মান। এক দিন এক ব্যাধ বনে গিয়ে শিকার করে প্রচুর হরিণের মাংস পায়। ঐ হরিণের মাংস নিয়ে সে বাজারে যাচ্ছিল।

তখন বারাণসীর চার বণিকের চার ছেলে এক রাস্তার মোড়ে বসে গল্পগুজব করছিল। ঠিক তখনই ব্যাধ মাংসের গাড়ি নিয়ে সেলাম দিয়ে যাচ্ছিল। এক বন্ধু প্রস্তাব করল, ব্যাধের কাছ থেকে খানিকটা মাংস আদায় করা যাক। সবাই এক বাক্যে রাজি হল।

প্রথম বণিকের ছেলে ব্যাধের কাছে গিয়ে বলল, 'এই ব্যাটা ব্যাধ,

এক টুকরো মাংস দেখি।' শুনে ব্যাধ বলল, 'লোকের কাছে কিছু চাইতে হলে একটু মিষ্টি ভাষায় কথা বলতে হয়। যাই হোক তুমি যে রকম চেয়েছ সে রকম মাংস পাবে।' এই বলে ব্যাধ তাকে এক টুকরো চর্বি দিল।

প্রথম বণিকের ছেলে হতাশ হয়ে ফিরে গেল। অন্যান্য বণিকের ছেলেরা তাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিল সে ব্যাধকে কি বলেছে। দ্বিতীয় বণিকের ছেলে ব্যাধকে মিষ্টি করে বলল, 'দাদা, এক টুকরা মাংস দাও না।' শুনে ব্যাধ বলল, 'লোকে বলে ভাই হচ্ছে মানুষের অঙ্গতুল্য। তুমি যখন ভাই বললে তখন তুমি হরিণের হাতের মাংস নিয়ে যাও।'

এবার তৃতীয় বণিকের ছেলে দ্বিতীয়ের কাছ থেকে সব শুনে নিল। সে ব্যাধকে গিয়ে বলল, 'বাবা, এক টুকরা মাংস দাও না।' শুনে ব্যাধ বলল, 'লোকে সন্তানকে হৃদয়ের তুল্য ভাবে, তাই তোমাকে হরিণের হৃৎপিণ্ড দিলাম।'

চতুর্থ বণিকের ছেলে ব্যাধকে বলল, 'বন্ধু, এক টুকরো মাংস দেবে?' শুনে ব্যাধ বলল, 'দেব বই কি। বন্ধুকে অদেয় কিছু নেই। তার জন্য সর্বস্ব দেওয়া যায়। এই গাড়ির সমস্ত মাংস তোমার হল। এখন তুমি তোমার ঠিকানা বল, আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

চতুর্থ বণিকের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাধ তার বাড়িতে গেল। বণিকের ছেলেও তার স্ত্রীকে ডেকে এনে ব্যাধকে যত্ন করতে বলল। ভবিষ্যতে সে ব্যাধকে নগরের মধ্যে নিজের বাড়ির পাশে একটা বাড়ি বানিয়ে দিল। যতদিন তারা জীবিত ছিল পরস্পরের বন্ধুত্বে কোন দিন ফাটল ধরে নি।

ব্যাধও শিকার করা ছেড়ে দিয়ে ভদ্র জীবিকা বেছে নিল।

শশ জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার খরগোশ হয়ে জন্মান। থাকতেন এক বনে। সেখানে পাহাড় আর নদী ছিল। আর দূরে ছিল একটি ছোট্ট গ্রাম।

বোধিসত্ত্ব একা নন। তাঁর তিন বন্ধু ছিল—বানর, উদবিড়াল আর শিয়াল। বোধিসত্ত্ব বন্ধুদের ধর্মকথা শোনাতেন। তারা খুব মন দিয়ে সেসব শুনত।

একদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারলেন পরের দিন পূর্ণিমা। ঐদিন উপোস করে বিকালে দান-ধ্যান করলে পুণ্য হবে। বন্ধুদের সে কথা বললেন। বন্ধুরা এক বাক্যে রাজি হল।

পরের দিন সকালে উদবিড়াল নদীর দিকে গেল। সেখানে এক জেলে মাছ ধরছিল। সে সাতটি মাছ ধরে বালির তলায় চাপা দিয়ে রেখে আবার মাছ ধরতে নদীতে নেমে গেল। উদবিড়াল বালি খুঁড়ে সাতটি মাছ বের করল। তারপর তিনবার চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'মাছগুলো কার?' কেউ কোন জবাব দিল না। সে তখন মাছগুলো এনে নিজের বাসায় রেখে দিল। আর শুয়ে শুয়ে ধর্মকথা ভাবতে লাগল।

এইভাবে শিয়াল যোগাড় করল এক হাঁড়ি দই। বানর বন থেকে কয়েকটা পাকা আম নিয়ে এল। তারপর তিনজনই বিকেলের অপেক্ষায় শুয়ে রইল। মনে মনে ধর্মকথা ভাবতে লাগল।

বোধিসত্ত্ব কিন্তু ভাবলেন অন্য কথা। প্রথমত তিনি ঘাস খান। কোন ব্রাহ্মণই ঘাস খাবে না। আবার অন্য কোন প্রাণীকে ধরে এনে দিতে হলে অপর জীব হত্যা করা হয়। সেজন্য তিনি বাসায় শুয়ে রইলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, 'আমি এমন দান করব যা আগে কেউ করে নি।'

বোধিসত্ত্ব মনে মনে যা ভাবছেন তা জেনে দেবরাজের শক্রর আসন টলে উঠল। কেননা বোধিসত্ত্ব ঠিক করেছেন তিনি নিজেকেই প্রার্থীর কাছে ভোজ্য দ্রব্য হিসেবে তুলে ধরবেন।

শক্র ভাবলেন, 'একটু যাচাই করে দেখতে হয়।' শক্র তখন ব্রাহ্মণ সেজে বোধিসত্ত্ব ও তাঁর বন্ধুদের কাছে গেলেন একে একে। শিয়াল, উদবিড়াল আর বানর ব্রাহ্মণকে নিজের নিজের খাবার ধরে দিতে চাইল। কিন্তু শক্র বললেন, 'থাক, থাক। কাল সকালে এসে খাব।'

শক্ররূপী ব্রাহ্মণ তারপর বোধিসত্ত্বের কাছে গেলেন। সরাসরি বললেন,

ব্রাহ্মণকে খেতে দাও।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

বলে বোধিসত্ত্ব শক্রকে অনুরোধ করলেন আগুন জ্বালাতে। শক্র

বললেন, 'কেন?' বোধিসত্ত্ব তখন বললেন, 'আমি এমন দান করব যা এর আগে কেউ করেনি। তুমি ব্রাহ্মণ, প্রাণী হত্যা করবে না। তাই তোমাকে আগুন জ্বালাতে বলেছি। তুমি আগুন জ্বালালে আমি সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে শেষ করব। তখন তুমি খিদে মেটাও।'

শক্র আগুন জ্বাললেন। বোধিসত্ত্ব প্রথমে গা ঝাড়া দিলেন। যাতে তাঁর গায়ে কোন পোকামাকড় থাকলে ঝরে পড়ে। কেননা নইলে প্রাণী হত্যার দোষ হবে। তারপর বোধিসত্ত্ব আগুনে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু দেখলেন, আগুন ঠাণ্ডা। তার লোমগুলো ঠাণ্ডা পরশ পাচ্ছে।

ব্রাহ্মণরূপী শক্রকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠাকুর, আগুন জলের মত কেন?'

শক্র হাসলেন। বললেন, 'তোমার গুণের কথা সসাগরা পৃথিবী জানুক।' তারপর পর্বত নিংড়ে সাদা রস বের করলেন। সেই সাদা রস দিয়ে চাঁদের চারপাশে খরগোশের চিহ্ন এঁকে দিলেন।

তারপর বোধিসত্ত্ব বন্ধুদের সঙ্গে অনেকদিন সুখে শান্তিতে রইলেন। ধর্মকর্ম করলেন। যথাসময়ে সকলে গত হল।

দদ্দভ জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব সিংহকুলে জন্ম নেন। বড় হয়ে তিনি বনেই বাস করতেন। সেই বনের পশ্চিমে সমুদ্রের তীরে এক বন ছিল। সেখানে অনেক বেল আর তাল গাছ ছিল।

বেল গাছের তলায় একটা তাল গাছের চারা গজিয়েছিল। একটা খরগোশ ঐ তালগাছের তলায় বাসা বানিয়ে থাকত। একদিন খরগোশ নিজের বাসায় শুয়ে ভাবছিল, পৃথিবীটা যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে যাব কোথায়? ঠিক তখুনি তাল গাছের ওপর থেকে একটা পাকা বেল পড়ল।

'তাই তো, পৃথিবীটা যে ফেটেই গেল।'

এক লাফ দিয়ে খরগোশ ছুটে পালাতে লাগল। খরগোশকে পড়ি কি মরি করে ছুটতে দেখে আর একটা খরগোশ জিজ্ঞেস করল, 'পালাচ্ছ কেন ভাই?' প্রথম খরগোশ বলল, 'পৃথিবী ধ্বংস হয়েছে। পালাও।' শুনে সে-ও প্রথম খরগোশের পিছন পিছন ছুটতে লাগল। এভাবে একপাল খরগোশ প্রাণের দায়ে ছুটে চলল।

হাজার হাজার খরগোশকে ছুটতে দেখে এক হরিণও জানতে চাইল,' 'কি ব্যাপার ভাই, তোমরা ছুটছ কেন?' খরগোশের পাল

প্রথম খরগোশের কথাটাই আবার বলল। শুনে হরিণ তাদের সঙ্গে যোগ দিল। একটা হরিণকে দেখে ক্রমে হাজার হাজার হরিণ সেই মিছিলে ঢুকে পড়ল।

শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে বনের প্রায় সমস্ত জন্তুই ছুটে চলেছে। বোধিসত্ত্ব জন্তুর দলকে পালাতে দেখে এর কারণ জানতে চাইলেন। উত্তর শুনে তিনি ভাবলেন, 'নিশ্চয়ই এরা কোন অদ্ভুত শব্দ শুনে ভয় পেয়েছে, আজগুবি কোন ভয়ে ছুটছে। এদের বাঁচাতে হবে।'

বোধিসত্ত্ব তখন তাদের একে একে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে বলেছে পৃথিবী ধ্বংস হয়েছে?' পশুরা এ কথার জবাবে একে অন্যকে দেখাতে লাগল। শেষে পাওয়া গেল ঐ প্রথম খরগোশটিকে। সে স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, আমি বলেছি।'

তুমি জানলে কি করে?

নিজের চোখে দেখেছি।

কোথায় দেখলে?

সমুদ্রতীরে।

তারপর খরগোশ বলল, 'আমি তাল গাছের চারার তলায় শুয়ে ভাবছিলাম পৃথিবী যদি ধ্বংস হয় তাহলে কোথায় যাব। এমন সময় পৃথিবী ধ্বংসের শব্দ শুনতে পেলাম।' বোধিসত্ত্ব তখন পশুদের একটু অপেক্ষা করতে বললেন। খরগোশকে বললেন, 'চল, তোমার সেই তালচারার কাছে।' অন্যান্য পশুদের বললেন, 'আমি দেখে আসি সত্যি পৃথিবী ধ্বংস হয়েছে কিনা।'

বোধিসত্ত্ব খরগোশকে পিঠে নিয়ে তিন লাফে সেই গাছের কাছে গেলেন। খরগোশকে বললেন, 'এবার নেমে জায়গাটা দেখাও।' খরগোশ দূর থেকে আঙুল দিয়ে দেখাল। বোধিসত্ত্ব সেখানে গিয়ে দেখলেন তালগাছের কচি পাতা ছিঁড়ে একটা পাকা বেল সেখানে পড়ে আছে।

বেলটা হাতে করে এনে তিনি খরগোশকে বললেন, 'তুমি এই বেল পড়ার শব্দ শুনেছ।' তারপর পশুদের কাছে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনাটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বললেন। পশুদেরও ধড়ে প্রাণ এল।

রাজাববাদ জাতক

সে অনেক কাল আগের কথা। ব্রহ্মদত্ত তখন বারাণসীর রাজা। বোধিসত্ত্ব সে সময়ে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেন। বয়সকালে তিনি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেন। সংসারে তাঁর কোন আসক্তি ছিল না। তপস্বী হয়ে তিনি হিমালযে একটি চমৎকাব জাযগা বেছে নিযে সেখানে থাকতে লাগলেন। ধ্যান ছাড়া অন্য কাজে তাঁব মন নেই।

ঠিক সেই সমযে এক বাজাব মনে সংশয দেখা দিল। তিনি ভাবলেন, 'খুঁজে দেখতে হবে কেউ আমাব বিরূপ সমালোচনা কবে কিনা।' রাজা খোঁজ নিতে শুরু কবলেন। প্রথমেই রাজপুবীর লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ কবলেন। কিন্তু সেখানে তাঁব একজন সমালোচকও খুঁজে পেলেন না। বাজপুরীব বাইরে বা নগবেও পাওযা গেল না। রাজা তখন গ্রাম গ্রামান্তবে ছদ্মবেশে ঘুবে দেখবেন ঠিক করলেন। কিন্তু কোথাও নিজের নিন্দুক খুঁজে পেলেন না। একেবারে শেষে রাজা হিমালয় প্রদেশে গেলেন।

ঘুবতে ঘুরতে রাজা বোধিসত্ত্বেব আশ্রমেব কাছে এলেন। বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে পাশে বসলেন।

বোধিসত্ত্ব তখন পাকা বটফল দিযে খিদে মেটাছিলেন। তিনি রাজাকে কয়েকটি বটফল দিযে বললেন, 'বাজা, আপনি এই বটফলগুলো খান।' ফলগুলো খেযে রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

প্রভু, বটফল এত মিষ্টি হল কি করে?

রাজা পুণ্যাত্মা, তাই ফল এত মধুর।

আচ্ছা প্রভু, রাজা পুণ্যাত্মা না হলে কি ফলের মিষ্টত্ব চলে যায়?

হ্যাঁ, রাজা।

রাজা বোধিসত্ত্বকে নিজের পরিচয় দিলেন না। ফিরে এসে তাঁর ইচ্ছে হল তপস্বীর কথা পরখ করে দেখার। সেজন্য তিনি ন্যায় ও ধর্মবিরুদ্ধ কাজ শুরু করলেন। কিছুদিন পরে আবার বোধিসত্ত্বের আশ্রমে গেলেন।

বোধিসত্ত্ব এবারও তাঁকে বটফল খেতে দিলেন। কিন্তু রাজা তা সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে ফেলে দিলেন।

কি হল রাজা?

ফল আগের মত মিষ্টি নেই।

হতে পারে, রাজা তাহলে এখন অধার্মিক হয়েছেন।

এরপর বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্মকথা শোনালেন। সেসব শুনে রাজাও বোধিসত্ত্বকে নিজের পরিচয় দিলেন। যা যা ঘটেছিল সবই তাঁকে খুলে বললেন। তারপর বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে ফিরে গেলেন। আবার ধর্ম অনুসারে রাজ্য শাসন শুরু করলেন।

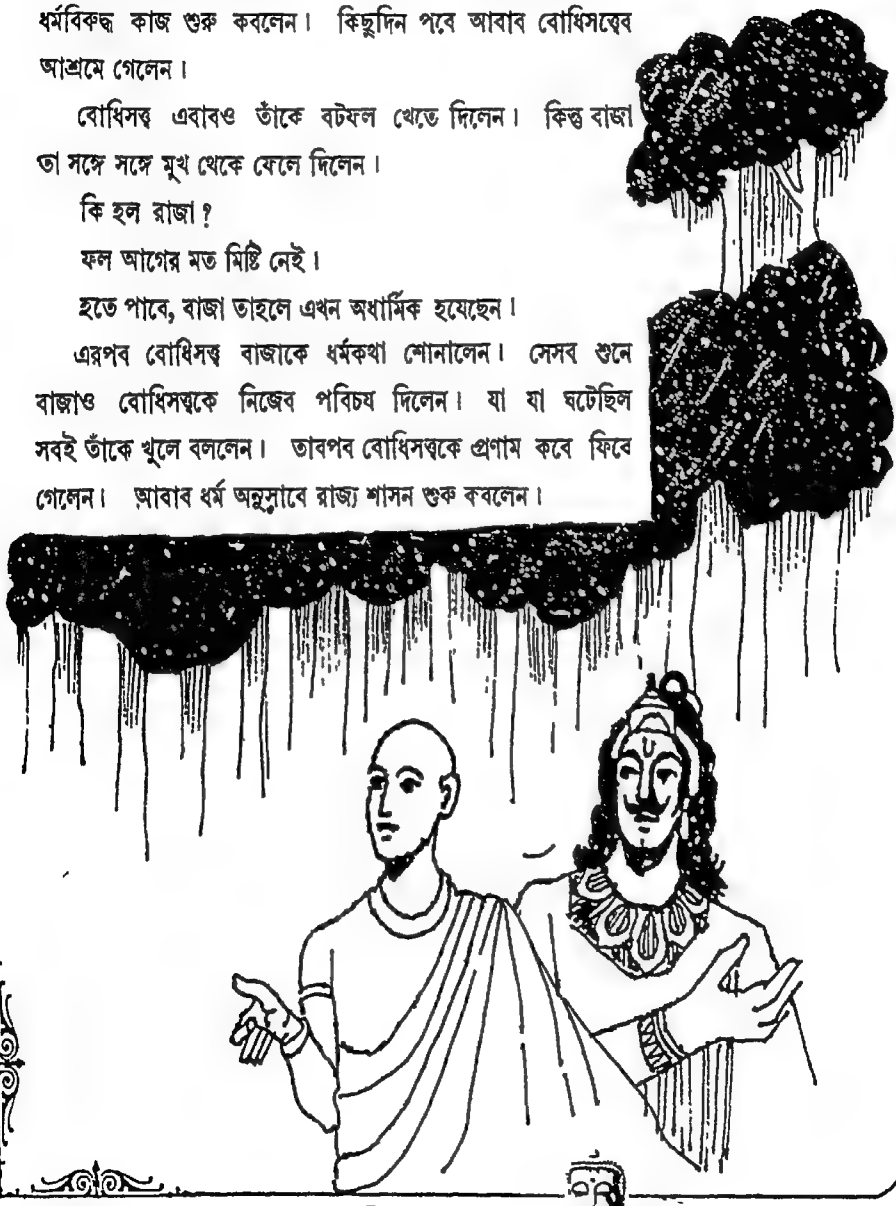

তূষ জাতক

একবার বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নিয়ে তক্ষশিলায় এক বিখ্যাত আচার্য হন। রাজকুমারদের তিনি শিল্প শিক্ষা দিতেন। বারাণসী-রাজের এক ছেলে বোধিসত্ত্বের কাছে শিল্প শিক্ষা করতে এল। বোধিসত্ত্ব তাকে তিনটি বেদ এবং সমস্ত শিল্প বিষয়ে শিক্ষা দিলেন।

যথাসময়ে রাজকুমার ঘরে ফিরতে চাইল। সে আচার্যের কাছে বিদায় নিয়ে গেল। বোধিসত্ত্ব অঙ্গবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। রাজ-কুমারের শরীর দেখে বোধিসত্ত্ব তার ভবিষ্যৎ বিপদ টের পেলেন। বুঝলেন, রাজকুমারের ছেলেই রাজকুমারকে হত্যা করার চেষ্টা করবে। মনে মনে ভাবলেন, 'যে করে হোক এই বিপদ দূর করতে হবে।'

বোধিসত্ত্ব তখন রাজকুমারকে তিনটি কথা শিখিয়ে দিলেন। বললেন, 'তোমার ছেলের যেদিন ষোল বছর বয়স পূর্ণ হবে তখন খেতে বসে প্রথম কথাটি বলবে। রাজসভায় লোকে তোমার সঙ্গে যখন দেখা করতে আসবে তখন দ্বিতীয় কথাটি বলবে। প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে উঠে তৃতীয় কথা আর শোবার ঘরে পৌঁছে চতুর্থ কথাটি বলবে। তাহলে কোন বিপদ হবে না।'

ঐ রাজকুমার একদিন রাজা হল। একদিন তার ছেলের বয়সও ষোল পূর্ণ হল। রাজা একদিন বাগানে বেড়াতে যাচ্ছেন, ছেলের সেদিনই হঠাৎ মনে হল, 'রাজার কত ঐশ্বর্য। কিন্তু রাজা মারা গেলে তবে আমি রাজা হব। ততদিনে আমি বুড়ো হয়ে যাব। তার চেয়ে রাজাকে মেরে ফেলাই ভাল।'

পরে চাকরবাকরদের সঙ্গে রাজকুমার এ নিয়ে আলোচনা করল। তারাও বলল, 'ঠিক কথা।' তারা ঠিক করল বিষ দিয়ে রাজাকে মারতে হবে। কুমার নিজেই ঐ দায়িত্ব নিল। রাজার খাবারে বিষ মেশানোর জন্য সে একদিন তৈরি হল।

রাজার থালায় ভাত দেওয়া মাত্র রাজা প্রথম কথাটা বললেন, 'তূষ আর ভাতের স্বাদ ইঁদুর খুব ভালো জানে, অন্ধকার রাতেও তারা তূষ

আর ভাত আলাদা করে নিয়ে খেতে পারে।' শুনে কুমার ভাবল, 'বিষ দিলেই হয়েছিল আর কি, রাজা তো আগে ইঁদুরকে খাইয়ে তারপর নিজে খেত।' ভয়ে সে আর বিষ মেশাতে পারল না।

আবার পরামর্শ শুরু হল। এবার ঠিক করা হল রাজসভায় রাজকুমার খড়্গ হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে। রাজা অন্যমনস্ক হলেই সে রাজাকে হত্যা করবে। কুমার সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে। এমন সময় রাজা দ্বিতীয় কথাটি জোরে জোরে বলে উঠলেন: 'সঙ্গীদের সঙ্গে কি ফন্দি করেছিস' আমি জানি। জানি এখনই বা কেন তুই দাঁড়িয়ে আছিস।'

শুনে কুমার ভাবল, 'এই রে ধরা পড়ে গেছি।' সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সে গা ঢাকা দিল।

কুমার এবার তার সঙ্গীদের বলল, 'ভাই, বাবা সব টের পেয়ে গেছেন।' সঙ্গীরা বলল, 'কক্ষনো না, আপনি মিছেমিছি ভয় পাচ্ছেন। প্রাসাদে ওঠার সময় রাজাকে শেষ করুন।'

কুমার আবার খড়্গ হাতে লুকিয়ে রইল। রাজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। প্রাসাদের কাছাকাছি পৌঁছে রাজা থামলেন। এবার তিনি তৃতীয় কথাটি বিড়বিড় করে বললেন: 'নিজের ছেলে যদি আমার শত্রু হয় তাহলে তাকে তক্ষুনি শেষ করা দরকার।'

কুমার এবার একেবারে হাড়ে হাড়ে বুঝে গেল, বাবার অজানা কিছুই নেই। কিন্তু সঙ্গীরা বলল, 'দেখুন কুমার, রাজা বিন্দুমাত্র জানলে আপনাকে কখন কয়েদখানায় দিতেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন।'

এবার কুমার রাজার খাটের তলায় খড়্গ হাতে লুকিয়ে রইল। শুতে যাওয়ার আগে রাজা চতুর্থ বাক্যটি বললেন: 'জানি, তুই খাটের নিচে লুকিয়ে আছিস।'

এবাব কুমাব ভাবল, 'যদি না বেবিযে আসি তাহলে আমাব প্রাণ যাবে।'

কুমাব বেবিযে এসে বাজাব পা জডিযে ধবল। কিন্তু পাপেব শাস্তি তাকে পেতেই হবে। বাজা তাকে কাবাদণ্ড দিলেন। বাজা বুঝতে পাবলেন কেন আচার্য ঐ চাবটি কথা তাঁকে শিখিয়ে দিযেছিলেন। ধর্ম অনুসারে বাজ্য শাসন কবে বাজা একদিন গত হলেন। কুমাবও কযেদখানা থেকে মুক্তি পেল। সিংহাসনে বসল।

বাবেরু জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার ময়ূর হয়ে জন্মান। বয়সকালে তিনি খুব সুন্দর হয়েছিলেন। বাস করতেন এক বনে।

সেই সময় কয়েকজন ব্যবসায়ী নৌকোয় করে যাচ্ছিল। তাদের নৌকোয় ছিল একটা কাক। তাকে 'দিশা কাক' বলা হত। কেননা রাস্তা হারালে ঐ কাক দিক ঠিক করে দিত।

ব্যবসায়ীর দল নৌকো নিয়ে বাবেরু রাজ্যে এল। তখন বাবেরু রাজ্যে কোন পাখি ছিল না। ঐ রাজ্যের লোকেরা ব্যবসায়ীর নৌকোর ওপর কাকটাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল।

কি সুন্দর রঙ।

চোখদুটো কি সুন্দর!

তারা এইসব বলাবলি করতে লাগল। তারপর তারা ব্যবসায়ীদের কাছে এসে বলল, 'এই পাখিটা আমাদের দিন।' ব্যবসায়ীরা বলল, 'ন্যায্য দাম পেলে দেব।' অনেক দরাদরি করে একশ টাকা দাম ঠিক হল।

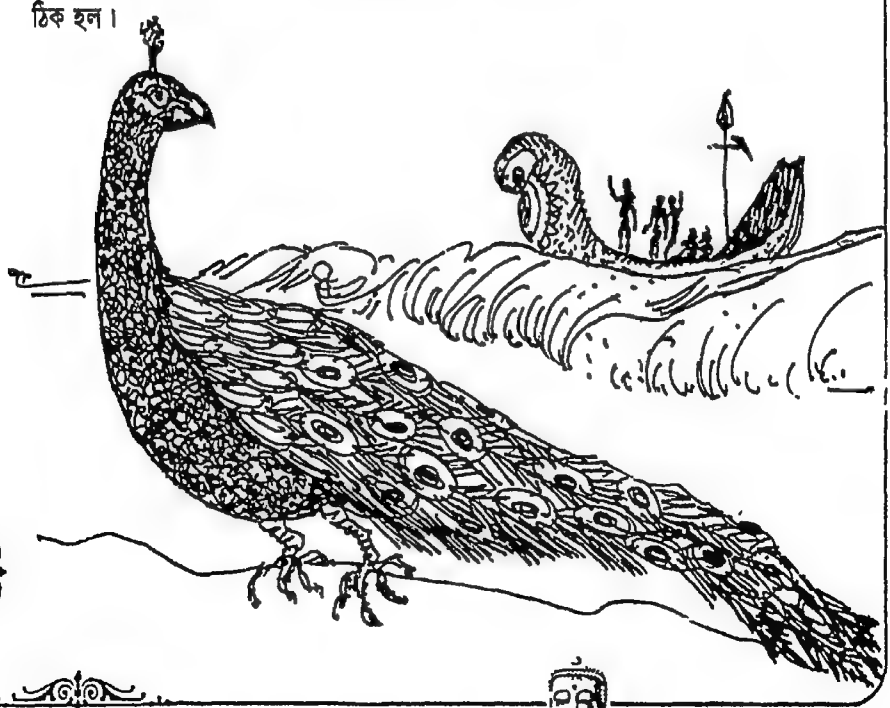

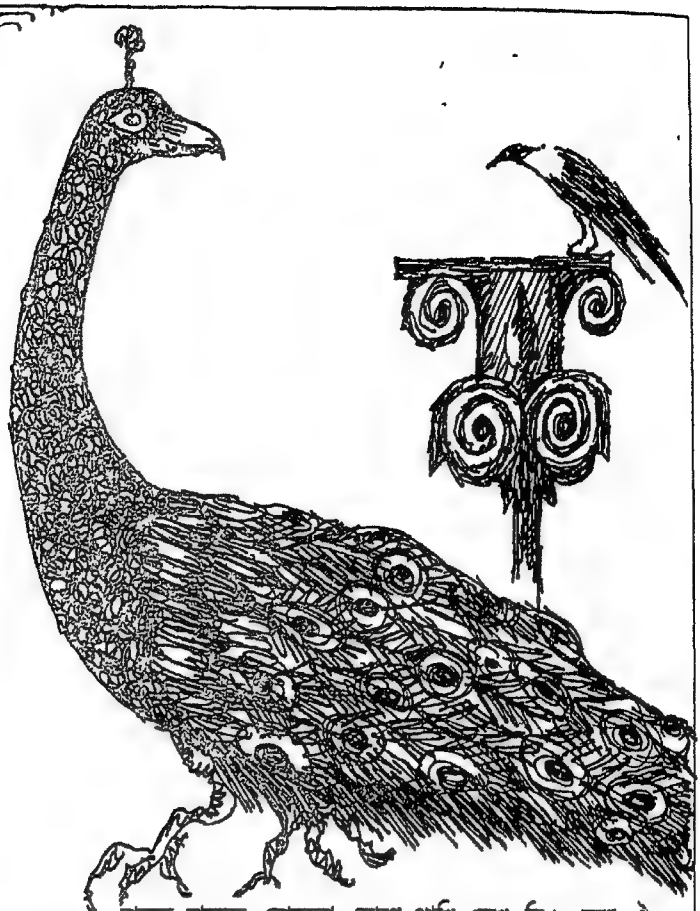

বারেক রাজ্যের লোকেরা আগে পাখি দেখে নি। ফলে ঐ কাকের যত্নের কোন সীমা থাকল না। স্বভাবে বিন্দুমাত্র গুণ না থাকা সত্ত্বেও কাক পরম সুখ ভোগ করতে লাগল।

পরের বার বারেরু রাজ্যে যাওয়ার সময় সেই ব্যবসায়ীর দল সঙ্গে একটা ময়ূর নিয়ে গেল। তারা ময়ূরটাকে এমন শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছিল যে তুড়ি দিলেই সে গান করত।

বারেক রাজ্যের লোকেরা আবার নৌকো দেখতে এল। সুশিক্ষিত ময়ূরকে দেখে তারা আগের বারের চেয়ে বেশি মুগ্ধ হল। যে কোন দামে তারা ময়ূরটা কিনে নিতে চাইল। হাজার টাকা দাম উঠল।

ময়ূর নিয়ে বারেক রাজ্যের লোকেরা মেতে উঠল। তার যত্ন-আত্তির কোন সীমা রইল না। ওদিকে কাকের যত্ন উঠে গেল।

নীতি : প্রকৃত গুণীকে পেলে কে আর গুণহীনের সমাদর করে।

সন্ধিভেদ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের ছেলে হয়ে জন্মান। যথাসময়ে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলা থেকে সব রকম শাস্ত্র শিখে এলেন। এদিকে ব্রহ্মদত্তও গত হলেন। বোধিসত্ত্ব ধর্মপথে থেকে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

ঠিক সেই সময়ে রাজার গোশালার প্রধান কর্মচারী বনের মধ্যে যে গোশালা আছে তা দেখতে গিয়েছিল। ফেরার সময় সে ভুল করে একটা গোরুকে বনে ফেলে আসে। গোরুটি ছিল গর্ভিনী। সেই গোরুর সঙ্গে এক সিংহীর খুব ভাব হল। সিংহীও তখন গর্ভিনী।

কিছুদিন পরে দেখা গেল সিংহী এক সিংহ প্রসব করেছে। আর গোরুটি প্রসব করেছে ষাঁড়। সে যাই হোক, এই বাচ্চাদুটোর মধ্যেও খুব বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। তারা পরস্পরের ছায়া হয়ে থাকত।

কিছুদিন পরে এক কাঠুরে বনে গিয়ে এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেল। ফিরে এসে সে রাজার সঙ্গে দেখা করল। বোধিসত্ত্ব তখন ঐ কাঠুরেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই, বনে আশ্চর্য কিছু দেখলে কি?'

হ্যাঁ, মহারাজ।

কি দেখলে?

সিংহ আর ষাঁড়ের বন্ধুত্ব।

শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'যতদিন এরা দুজন বন্ধুভাবে থাকবে ততদিন কোন বিপদ দেখা দেবে না। কিন্তু তৃতীয় কোন প্রাণী এদের সঙ্গে সখ্যতা পাতালেই বিপদ দেখা দেবে। তুমি তো ভাই প্রায়ই বনে যাও, যদি দেখ এদের সঙ্গে আর কেউ যোগ দিয়েছে তাহলে আমাকে জানাতে ভুলে যেও না।' কাঠুরে 'যে আজ্ঞে' বলে চলে গেল।

ওদিকে কাঠুরে বারাণসীতে চলে যাওয়ার পর এক শিয়াল সিংহ আর ষাঁড়ের খিদমত করতে শুরু করে। শিয়াল মনে মনে ভাবত, কত জন্তুর মাংস খেয়েছি, কিন্তু সিংহ কিংবা ষাঁড়ের মাংস কখনও খাই নি।

শিয়াল ষাঁড়ের কাছে সিংহের নিন্দা, আর সিংহের কাছে ষাঁড়ের

নিন্দা শুক কবল। দুই বন্ধুব মন গেল বিষিযে। ঠিক সেই সময কাঠুরে বনে এসেছিল। সে শিয়ালকে ওদেব সঙ্গে দেখে বাজাব কাছে ফিবে গেল। বাজা সব শুনে বললেন, 'আমবা গিযে হযত দেখব ষাঁড আব সিংহ দুজনেই মবে পড়ে আছে।'

সত্যিই তাই হল। বোধিসত্ত্ব বনে গিযে দেখলেন ষাঁড় আব সিংহ মবে পড়ে আছে। ধূর্ত শিয়াল মহানন্দে একবাব ষাঁড়েব মাংস, একবার সিংহের মাংস খাচ্ছে।

কাকবতী জাতক

সে অনেক দিন আগেকার কথা। ব্রহ্মদত্ত তখন বারাণসীর রাজা। বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্তের ছেলে হয়ে জন্মালেন। বয়সকালে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সারা হল। এক সময় রাজা গত হলে বোধিসত্ত্ব সিংহাসনে বসলেন।

তখন বোধিসত্ত্বের স্ত্রী কাকবতী নামে এক অপূর্ব সুন্দরী নারী। পাশের দেশের এক রাজা বোধিসত্ত্বের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল। তার নাম সুপর্ণরাজ। সে প্রায়ই এসে বোধিসত্ত্বের সঙ্গে পাশা খেলত।

সুপর্ণরাজ কাকবতীর রূপ ও গুণে মুগ্ধ হল। সে ভাবল, কোন রকমে কাকবতীকে নিজের রাজপুরীতে আনতে পারলে তবেই শান্তি।

একদিন সুযোগ জুটে গেল। সুপর্ণরাজ কাকবতীকে চুরি করে নিয়ে গেল। তাকে নিয়ে সোজা গিয়ে উঠল সুপর্ণলোকে।

ওদিকে বোধিসত্ত্ব কাকবতীকে দেখতে না পেয়ে কাতর হলেন। অনেক খোঁজখবর করেও কাকবতীর সন্ধান পেলেন না। বোধিসত্ত্বের সভায় গন্ধর্ব নামে এক নটকুবের ছিল। তিনি গন্ধর্বকে বললেন, যে ভাবে পার কাকবতীর খোঁজ এনে দাও।

সুপর্ণবাজের ছিল এক অলৌকিক যান। সেই যানে করে সে কাকবতীকে নিয়ে এক বনে এসে উঠেছিল। গন্ধর্ব সুপর্ণবাজের বনে যায়। কাকবতীকে দেখে ফিরে আসে। পরে যখন সুপর্ণবাজ আবার পাশা খেলতে এল, তখন গন্ধর্ব ছড়া কেটে বলল, 'কাকবতীর খোঁজ পেয়েছি আর সেখান থেকে ফিরেও আসতে পেরেছি। তবে ভাগ্যে তোমার অলৌকিক যানটি ছিল নইলে ফিরতে পারতাম না।'

শুনে সুপর্ণবাজ মর্মাহত হল। কাকবতীকে বোধিসত্ত্বের কাছে ফিরিয়ে দিল। কিন্তু নিজে পাশা খেলতে আসা বন্ধ করে দিল।

অননুশোচীয় জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নেন। যথাবয়সে তিনি তক্ষশিলায় গেলেন লেখাপড়া শিখতে। শাস্ত্র শিখে ফিরেও এলেন এক সময়। বোধিসত্ত্বের বাবা-মা তখন ঠিক করলেন

ছেলের বিয়ে দেবেন।

বোধিসত্ত্ব তাতে রাজি নন। তাঁর ইচ্ছে তপস্বী হওয়া। গৃহ ধর্ম পালন করায় তাঁর মন ছিল না। কিন্তু বাবা-মা নাছোড়বান্দা। বোধিসত্ত্ব তখন এক ফন্দি করলেন। তিনি একটি সুন্দর সোনার প্রতিমা তৈরি করালেন। তারপর বাবা-মাকে বললেন, 'এই প্রতিমার মত সুন্দরী মেয়ে পাওয়া গেলে তবেই বিয়ে করব।'

বোধিসত্ত্বের বাবা-মা তখন ঐ সোনার প্রতিমাকে একটা গাড়িতে বসিয়ে লোকজন সঙ্গে দিয়ে দেশ ঘুরতে পাঠালেন। যেখানে ঐ রকম মেয়ে পাওয়া যাবে সেখানে পছন্দ করা হবে।

ঠিক সেই সময় কালী রাজ্যের একটি গ্রামে এক দেবী এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছিল। তার নাম রাখা হয়েছিল সম্মিতভাষিণী। সোনার প্রতিমা নিয়ে গাড়িটি কালী রাজ্যের ঐ গ্রামে এল। গ্রামবাসীরা সোনার প্রতিমাকে দেখে সম্মিতভাষিণী বলে মনে করল। তারা বলাবলি করতে লাগল, 'ওহে, এই গাড়িটায় সম্মিতভাষিণী রয়েছে। দেখ, দেখ।'

গাড়ির লোকজন সঙ্গে সঙ্গে সম্মিতভাষিণীর খোঁজখবর নিল।

তার বাবা-মাকে সব কথা জানাল। সম্মিতভাষিণীও তার বাবা-মাকে বলেছিল, 'আমি বিয়ে করব না, তপস্বিনী হব।' তার বাবা-মা সে কথা শুনে খুব দুঃখ পায়। সোনার প্রতিমা নিয়ে লোকজন তাদের বাড়িতে এলে তারা বিয়েতে রাজি হল। সম্মিতভাষিণীকেও রাজি করাল।

যাই হোক দুজনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর বোধিসত্ত্ব ও সম্মিতভাষিণী ভাইবোনের মতই জীবন কাটাতে লাগলেন। দুজনই ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন। এক সময় দুজনেরই বাবা-মা গত হলেন। বোধিসত্ত্ব তখন সম্মিতভাষিণীকে বললেন, 'দেখ, সংসারে আমার মন নেই। যা বিষয়-আসয় আছে তোমার সারা জীবন খুব ভালো ভাবেই চলে যাবে, আমি সন্ন্যাসী হব।' সম্মিত-ভাষিণী বলল, 'প্রভু, আমিও আপনার সঙ্গী হব, সংসারে আমারও মতি নেই।'

তারপর তারা দুজন দু হাতে সমস্ত সম্পত্তি বিলিয়ে দিল। এক কাপড়ে গৃহত্যাগ করে চলে গেল হিমালয় অঞ্চলে। সেখানে জপ-তপ করে দিন কাটাতে লাগল।

একবার দুজনে নুন আর টকজাতীয় জিনিস যোগাড় করতে বারাণসীতে এলেন। বারাণসী রাজার বাগানে তাঁরা থাকতে লাগলেন। হঠাৎ সম্মিতভাষিণীর রক্ত আমাশয় দেখা দিল। ওষুধপথ্য না থাকায় বেচারা কাহিল হয়ে পড়ল। বোধিসত্ত্ব একদিন তাকে কাঁধে করে নগরে ভিক্ষে করতে এলেন।

এক ধর্মশালায় সম্মিতভাষিণীকে শুইয়ে রেখে তিনি ভিক্ষে করতে রওনা হলেন। একটু পরেই সম্মিতভাষিণী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। সম্মিতভাষিণীর দেবীর মত রূপ দেখে পথচারী লোক-জন তার মৃতদেহ ঘিরে দাঁড়াল। নানারকম জল্পনাকল্পনা করতে করতে বলল, 'এই সোনার প্রতিমা কার স্ত্রী, কার কন্যা? সে এমন বেঘোরে মরে আছে কেন?'

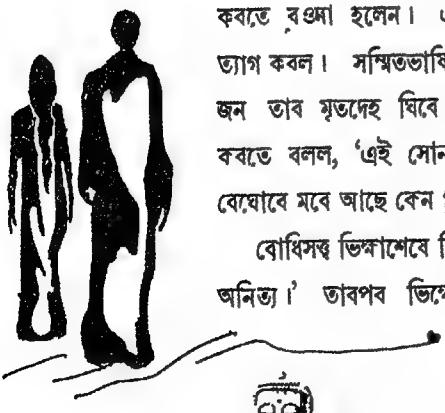

বোধিসত্ত্ব ভিক্ষাশেষে ফিরে এসে ঐ দৃশ্য দেখে শুধু বললেন, 'জীবন অনিত্য।' তারপর ভিক্ষে করে আনা ফলমূল ওখানে বসেই খেতে

শুরু করলেন।

মৃতদেহের পাশে ভিড় করে কত লোকজন। তারা এতে অবাক হল। তারা জিজ্ঞাসা করল, 'হে তপস্বী, মৃতা আপনার কেউ হন কি?'

যখন বেঁচে ছিলেন, তখন ইনি আমার স্ত্রী ছিলেন।

আপনি কাঁদছেন না কেন?

যতকাল বেঁচে ছিলেন ততক্ষণ আমার ছিলেন, এখন তো উনি আমার নন।

তাই কাঁদছেন না?

হ্যাঁ।

তারপর তিনি সবাইকে অনেক ধর্মকথা শোনালেন।

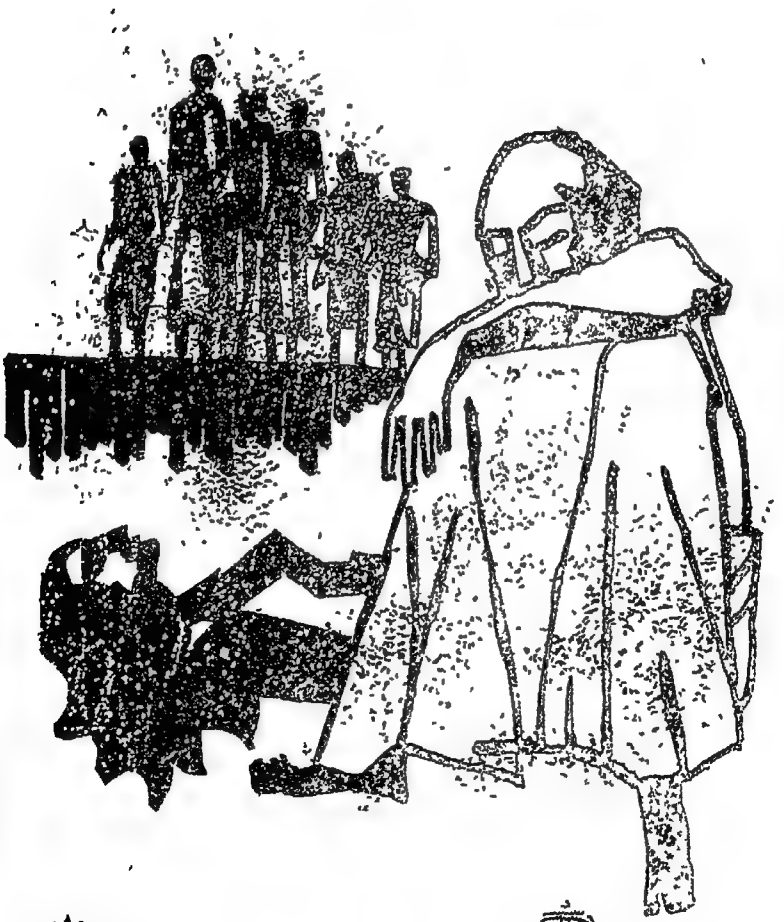

কারন্তিক জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নেন। তক্ষশিলার আচার্যের কাছে লেখাপড়া শিখে সুপণ্ডিত হলেন। তিনি আচার্যের প্রধান শিষ্যও হন।

এই আচার্য হাতের কাছে যাকে পেতেন তাকেই ধর্ম শিক্ষা দিতেন। চরিত্র ভালো করতে বলতেন। বেশির ভাগ লোকই তাঁর কথা কানে নিত না। এরকম বলতে বলতে আচার্য একদিন হতাশ হয়ে কয়েকজন গ্রামবাসীকে বললেন, 'লোকজন ভারি অদ্ভুত, কেউই

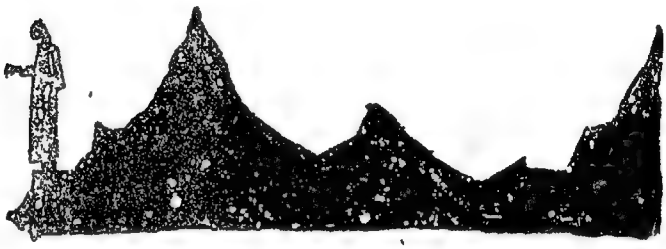

প্রায় ভাল হতে চায় না।'

আপনারও ত্রুটি আছে।

কি রকম?

আপনি পাত্রপাত্রী নির্বাচন করেন না।

ধর্মকথা সবাই শুনতে পারে।

ঠিকই, কিন্তু পালন করতে পারে না।

আচার্য কিন্তু তাদের কথায় কান দিলেন না। তিনি আগের মতই সবাইকে ধর্মকথা বলে চললেন।

একদিন এক ব্রাহ্মণ ভোজনের নেমন্তন্ন ছিল। আচার্যের সঙ্গে কারণ্ডিকরূপী বোধিসত্ত্বকেও নেমন্তন্ন করা হয়েছে। কিন্তু আচার্য ঠিক করলেন তিনি যাবেন না। শিষ্যদের ডেকে বললেন, 'কারণ্ডিক, তুমি তোমার পাঁচশ গুরুভাইকে নিয়ে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাও।'

বোধিসত্ত্ব রওনা হলেন। নেমন্তন্ন সেরে ফেরার পথে বিশাল এক খাদ পড়ল। বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'আচার্যকে শিক্ষা দেওয়ার ভালো

ব্যবস্থা রয়েছে দেখছি।' তখন তিনি পাশের পাহাড় থেকে টুকরো পাথর এনে সেই খাদে ফেলতে লাগলেন।

অন্য শিষ্যরা কিছুক্ষণ দেখার পর কারণ্ডিককে বলল, 'গুরুভাই, এবার চলুন।' বোধিসত্ত্ব তাদের কথায় কান দিলেন না। যেমন পাথর ছুঁড়ছিলেন তেমনি ছুঁড়েই চললেন।

শিষ্যরা তখন আচার্যকে খবর দিল। আচার্য এসে বোধিসত্ত্বকে বললেন, 'কি করছ কারণ্ডিক?'

গর্ত বোঁজাচ্ছি।

এই বিশাল গর্ত?

হ্যাঁ প্রভু।

পারবে না। তুমি তোমার আয়ু শেষ করলেও গর্ত বোঁজাতে পারবে না।

বোধিসত্ত্ব তখন আচার্যকে বললেন, 'প্রভু, আপনি যদি পৃথিবীর সব লোককে ধার্মিক করার চেষ্টা করতে পারেন, তাহলে আমিই বা কেন পৃথিবীর সব গর্তগুলো বুঁজিয়ে হাতের চেটোর মত সমান করতে পারব না?'

এবার আচার্য নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বললেন, 'কারণ্ডিক, তোমার শিক্ষা আমি জীবনে ভুলব না।'

লট্টকা জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার হাতি হয়ে জন্মান। বয়স-কালে তিনি দেখতে খুব সুন্দর হন। তাঁর শরীরও তেমনি বলশালী হয়ে ওঠে। আশি হাজার হাতির তিনি দলপতি হন। হিমালয় অঞ্চল ছিল তাঁর বিচরণক্ষেত্র।

একদিন একটি ছোট পাখি হাতিদের চারণভূমিতে কয়েকটি ডিম প্রসব করল। কিছুদিন পরে ডিম ভেঙ্গে পাখির কচি কচি বাচ্চা বের হল। কিন্তু তখনও তারা উড়তে শেখে নি। এমন সময় আশি হাজার হাতি নিয়ে বোধিসত্ত্ব সেই চারণভূমিতে এলেন।

হাতিদের আসতে দেখে পাখিদের মা বেজায় ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল বাচ্চাদের বাঁচানোর একটাই রাস্তা আছে। দলপতির কাছে সন্তানদের প্রাণ ভিক্ষা করতে হবে। এই ভেবে পাখিটি ডানা তুলে করজোড়ে বোধিসত্ত্বের কাছে প্রার্থনা করল : প্রভু, আমার সন্তানদের জীবন রক্ষা করুন!

বোধিসত্ত্ব হাতিদের নির্দেশ দিলেন তারা যেন পাখির ছানাদের না মেরে ফেলে।

বোধিসত্ত্ব তখন চার পা ফাঁক করে পাখির বাচ্চাগুলোকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। সব হাতি চলে গেলে তিনি পাখিটিকে বললেন: 'দেখ, এরপর আরেকটি হাতি একা আসবে। তার হাত থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারব না। তুমি যেমন আমার কাছে প্রার্থনা করেছ সে রকম তার কাছেও কোরো।'

কিছুক্ষণ পরে সেই মত্ত হাতি এল। সে কিন্তু পাখির প্রার্থনায় কানই দিল না। উল্টে পাখির বাচ্চাগুলোকে পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলল।

পাখিটি তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, 'ও ভাবছে গায়ের জোরই সব, আমি বুদ্ধির জোরে ওকে শেষ করব।'

তারপর পাখিটি এক কাকের সেবা শুরু করল। কাক সন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি চাও?' পাখি বলল, 'প্রভু, মত্ত হাতির চোখদুটো আপনাকে উপড়ে নিতে হবে।' কাক রাজি হল। তারপর পাখিটি এক নীল মাছির শরণাপন্ন হল। নীল মাছিও জানতে চাইল 'তুমি কি চাও?' 'প্রভু, কাক হাতির চোখ উপড়ে নিলে আপনি সেই অক্ষিকোটরে ডিম পাড়বেন', পাখি বলল। এরপর পাখি এক ব্যাঙের

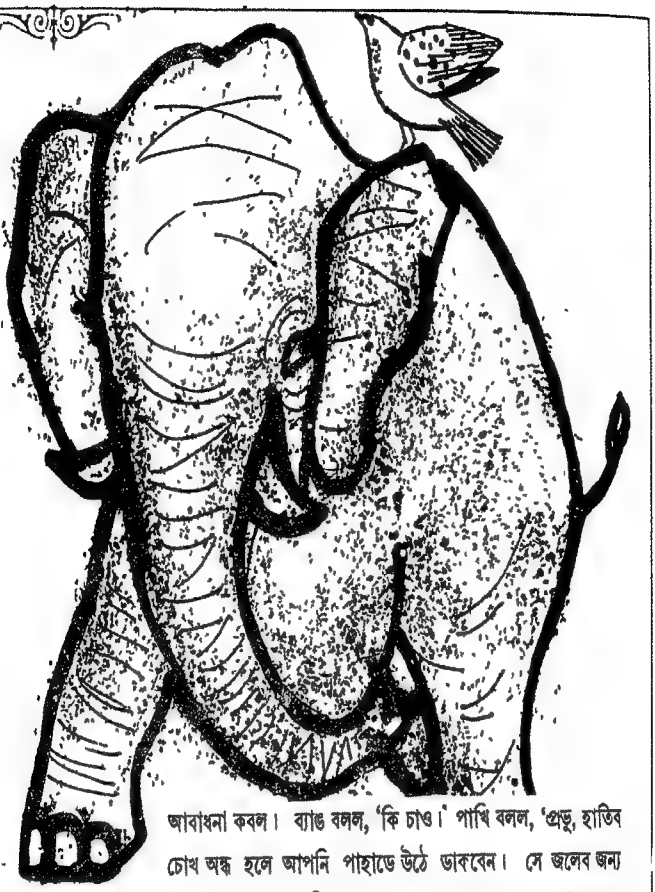

আবাধনা কবল। ব্যাঙ বলল, 'কি চাও।' পাখি বলল, 'প্রভু, হাতিব চোখ অন্ধ হলে আপনি পাহাডে উঠে ডাকবেন। সে জলেব জন্য পাহাডে এলে আপনি ছাদেব ধাবে চলে যাবেন। সেখান থেকে ডাকবেন।'

কাক একদিন সত্যিই হাতিটাব চোখ খুবলে নিল। নীল মাছি তাব চোখে ডিম পাডল। ডিম থেকে পোকা জন্মাল। পোকাবা হাতিব চোখ কুবে কুবে খেতে লাগল। হাতি পাগলেব মত ছুটছে তখন। এই সময ব্যাঙেব ডাক শুনে সে জল খাবাব জন্য পাহাডে উঠে এল। ব্যাঙ খাদেব ধাবে সবে গেল। হাতিও সেদিকে ছুটল। তাবপব খাদে পডে প্রাণ দিল।

পাখিটি তখন হাতিব পিঠে বসে নাচতে লাগল।

নীতিকথা : বুদ্ধির জোবেব কাছে গাযেব জোব হাব মানে।

সুবর্ণমৃগ জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার হরিণকুলে জন্ম নেন। বোধিসত্ত্বের আকৃতি খুবই সুন্দর হয়েছিল। তাঁর গায়ের রঙ ছিল সোনার মত। সেজন্য তাকে সোনার হরিণ বলা হতো।

সোনার হরিণের স্ত্রীও খুব সুন্দর ছিল। তাঁরা দুজনে একসঙ্গে মহানন্দে বনে ঘুরে বেড়াত। বোধিসত্ত্বের সঙ্গে সব সময় আশি হাজার হরিণের একটি দল থাকত। তিনি ছিলেন তাদের দলপতি।

একদিন এক ব্যাধ বনের মধ্যে ফাঁদ পেতে রেখেছিল। সোনার হরিণরূপী বোধিসত্ত্ব সেই ফাঁদে পা দিলেন। ফাঁদ ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসবার জন্য তিনি খুবই চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু যত চেষ্টা করেন ততই ফাঁদে জড়িয়ে যেতে লাগলেন। শেষে জালের দড়ি-দড়া তার মাংস-চামড়া কেটে হাড় অবধি বসে গেল।

ফাঁদে পড়লে সব হরিণ যেমন ডাক ছাড়ে, বোধিসত্ত্ব তখন সেই রকম ডাক ছাড়তে আরম্ভ করলেন। তাঁর স্ত্রী ঐ ডাক শুনে বুঝল বোধিসত্ত্ব বিপদে পড়েছেন।

সে ফাঁদের কাছে ছুটে এসে বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি মহান শক্তিধর, তবু কেন ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসতে পারছ না।'

দেখ, আমি অনেক চেষ্টা করেছি।

আরেকটু করে দেখ।

লাভ নেই। আমার শক্তি ফুরিয়ে এসেছে।

বোধিসত্ত্বের স্ত্রী তখন তাঁকে অভয় দিল, 'তুমি ভয় পেও না। যে ভাবে হোক আমি তোমাকে বাঁচাব। ব্যাধের কাছে আমি প্রাণীহত্যা না করতে বলব। বলব তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে যাক।'

এদিকে ব্যাধ তখন ছুরি নিয়ে আসছিল। সে ফাঁদের সামনে এসে থমকে গেল। এমন দৃশ্য সে কখনও দেখে নি। একটি হরিণ ফাঁদে পড়েছে, আর ফাঁদের বাইরে বসে আরেকটি হরিণ তার শুশ্রূষা করছে।

ব্যাধ সামনে এলে হরিণী তার সামনে করজোড়ে দাঁড়াল। বলল, 'আপনি আমাকে নিয়ে যান। কিন্তু ফাঁদে বন্দী ঐ মহান হরিণকে ছেড়ে দিন। সে আশি হাজার হরিণের দলপতি ও রক্ষক। তাছাড়া ইনি আমার স্বামী।'

ব্যাধের হৃদয় গলে গেল। মানুষের মধ্যে যে প্রেম সে দেখতে পায় না হরিণীর মধ্যে তা দেখে সে অভিভূত হল। বোধিসত্ত্বও তখন ব্যাধকে বনের মধ্য থেকে একটি বিশাল মণি তুলে এনে দিলেন। বললেন, 'আপনি আর প্রাণী হত্যা করবেন না। এই মণি বিক্রি করে আপনার সাত পুরুষ স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারবে।'

অহিতুণ্ডিক জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার এক ধনী গৃহস্থের পরিবারে জন্মান। তাঁর কাজ হল ধানের ব্যবসা করা।

সেই সময়ে এক সাপুড়ে একটা বানরকে ধরে। তারপর বানরটিকে খেলা শেখায়। সাপুড়ে বানরটাকে বিষ প্রতিরোধক ওষুধ খাইয়ে এমনভাবে তৈরি করে নিল যে সাপের সঙ্গে বানরটা অনায়াসে খেলা করত। লড়াই করত। বানর আর সাপের খেলা দেখিয়ে সাপুড়ে বেশ দু পয়সা রোজগার করে নিত।

একদিন শোনা গেল বারাণসীতে বড় একটা উৎসব হবে। সাপুড়ের ইচ্ছা হল মেলায় গিয়ে একটু মজা করে আসে। সে বানরটাকে নিয়ে বোধিসত্ত্বের কাছে গেল।

ভাই, দু-চারদিন বানরটাকে একটু রাখবে?

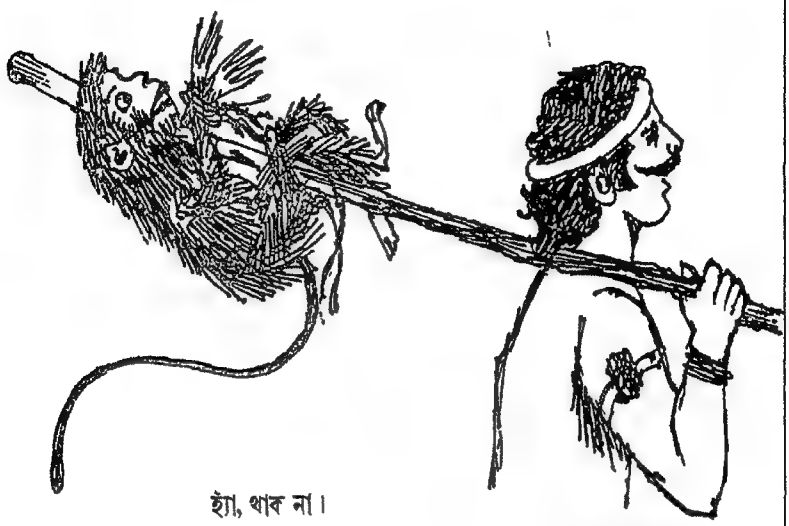

হ্যাঁ, থাক না।

তবে দেখো, তার খাওয়া-দাওয়ার যেন কোন অসুবিধা না হয়।

তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

বোধিসত্ত্ব খুব যত্নআত্তি করলেন। সাপুড়ে একদিন মেলা থেকে মত্ত হয়ে ফিরে এল। সাপুড়ের গলা শুনেই বানরটা ছুটে এল। সাপুড়ে নেশার ঘোরে বানরটাকে লাঠি দিয়ে ঠেঙ্গাল। তারপর বেঁধে নিয়ে চলল এক বাগানে। সেখানে বানরটাকে বেঁধে রেখে নিজে একটা আম গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়ল।

বানরটা অনেক চেষ্টা করে বাঁধন ছিঁড়ে গাছে উঠে গেল। আম পেড়ে খেতে লাগল। আম খেয়ে সে সাপুড়ের মাথায় আঁঠি ছুঁড়ে মারল। সাপুড়ের ঘুম গেল ভেঙে। তখন সে খুব বুদ্ধি করে বানরকে ভোলাবার জন্য বলল, 'আয় বাবা, নেমে আয়। তোর চাঁদমুখ দেখি।'

শুনে বানর নামতে লাগল। তারপর বলল, 'কিছুক্ষণ আগে তুমি আমাকে লাঠি পেটা করেছ। এখন আবার বলছ আমার মুখ চাঁদের মত। বানরের মুখ চাঁদের মত বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। যাই হোক আমি এখন পেট ভরে আম খাই। আর তুমি নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে মনের সুখে থাক।'

এই বলে বানর বনের মধ্যে চলে গেল।

শারিক জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার এক গ্রামে এক গেরস্থের বাড়িতে জন্ম নেন। বালক বয়সে তিনি গ্রামের কাছে এক বিশাল বটগাছের তলায় খেলা করতেন। সঙ্গে থাকত গ্রামের ছেলেমেয়েরা।

একদিন এক বৈদ্য (গ্রামের ডাক্তার) গ্রামে কোন রোগী না পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঐ বটগাছের তলায় চলে আসে। গাছের তলায় বসে সে জিরিয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখল, বটগাছের ডালে একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। বৈদ্য ভাবল, 'এই বাচ্চাগুলোর কোন একটাকে যদি সাপে কাটে তাহলে চিকিৎসা করে দু পয়সা কামানো যেতে পারে।'

এই ভেবে সে বোধিসত্ত্বকে ডেকে বলল, 'কি হে, তুমি কি

শালিক ভালবাস?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'খুব'। তখন বৈদ্য বলল, 'পেলে ধরবে?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'হ্যাঁ।' বৈদ্য তখন গাছের ডালটা দেখিয়ে বলল, 'ঐ দেখ, ওখানে একটা শালিক ছানা আছে।'

বোধিসত্ত্ব গাছে উঠলেন। কিন্তু কাছে যেতেই সাপটা ফণা তুলল। বোধিসত্ত্ব সঙ্গে সঙ্গে সাপের মাথা চেপে ধরে যেখানে বৈদ্য বসেছিল সেখানে ছুঁড়ে দিলেন। সাপটি বৈদ্যের গলায় ছোবল দিল। বৈদ্য সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

গ্রামের লোকজন জড় হল। বোধিসত্ত্ব তখন সবাইকে বললেন কি হয়েছিল। তারপর ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য বললেন:

'শালিক বলে বেউটে সাপ বাচ্চাদের ধরাতে গিয়ে বৈদ্য নিজের প্রাণ দিয়েছে। দুষ্ট বুদ্ধি দিয়ে অপরের ক্ষতি করতে চাইলে তার ফল এই হয়।'

শ্বেতকেতু জাতক

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব ছিলেন এক সুপণ্ডিত আচার্য। তাঁর কাছে পাঁচশ ব্রাহ্মণ সন্তান বেদ পড়তে আসত। এই পাঁচশ জনের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল শ্বেতকেতু। শ্বেতকেতুর জাত-পাত নিয়ে খুব গর্ব ছিল। নিজে উঁচু ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছিল বলেই হয়ত এ ব্যাপারে তার গুমোর ছিল।

গুরুভাইদের সঙ্গে শ্বেতকেতু একদিন বারাণসী নগরের বাইরে গিয়েছিল। ফেরার সময় দেখল সামনে এক চণ্ডাল বসেছে। শ্বেতকেতু তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে হে?' চণ্ডাল জবাব দিল, 'আমি চণ্ডাল।'

শ্বেতকেতু ভাবল, 'চণ্ডাল তো আগে আগে চলেছে, ওর গায়ে লেগে বাতাস অশুচি হচ্ছে, পরে সেই বাতাস আমার গায়ে লেগে আমাকেও অশুচি করছে।' সেজন্য শ্বেতকেতু চিৎকার করে উঠল, 'বেটা পাজি চণ্ডাল, রাস্তা ছাড়। তোর মুখ দেখলে অযাত্রা।' এই বলে সে ছুটে চণ্ডালের সামনে চলে গেল। আগে আগে হাঁটতে লাগল।

চণ্ডালও ছাড়ার পাত্র নয়। সে-ও ছুটে সামনে চলে গেল। চিৎকার করল, 'মর ব্যাটা!'

চণ্ডাল॥ তুমি কে হে বাপু?

শ্বেতকেতু ॥ ব্রাহ্মণ কুমার।

চণ্ডাল ॥ তাহলে তো শাস্ত্র জান।

শ্বেতকেতু ॥ জানি বৈকি।

চণ্ডাল ॥ তাহলে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে নিশ্চয়ই।

শ্বেতকেতু ॥ নিশ্চয়ই।

চণ্ডাল তখন শ্বেতকেতুর সঙ্গী বালকদের ডেকে বলল, 'দেখ, এ বলছে আমার কথার জবাব দিতে পারবে। যদি জবাব দিতে পারে আমি রাস্তা ছেড়ে দেব। না পারলে কিন্তু আমার দু পায়ের ফাঁক দিয়ে ওকে গলে যেতে হবে।'

চণ্ডাল ॥ ব্রাহ্মণ কুমার, দিক বললে কি বোঝায়?

শ্বেতকেতু ॥ দিক মানে তো পূর্ব পশ্চিম এই সব

চণ্ডাল ॥ তুমি জান না।

এই বলে চণ্ডাল শ্বেতকেতুকে জোর করে ধরে নিজের দু পায়ের ফাঁকের মধ্যে চেপে ধরল।

শিষ্যরা ফিরে এসে বোধিসত্ত্বকে সব জানাল। বোধিসত্ত্ব শ্বেতকেতুকে ডেকে বললেন, 'দেখ বাছা, ঐ চণ্ডাল পণ্ডিত। সে তোমাকে কোন সাধারণ দিকের কথা জিজ্ঞেস করে নি। সে জিজ্ঞেস করেছে অন্য দিকের কথা। বাবা-মা হল পূর্ব দিক, দক্ষিণ দিক হল আচার্যের দিক, সু-গৃহস্থ হল উত্তম দিক, যাঁর কাছে থাকলে অপার আনন্দ লাভ করা যায় সে হল শ্রেষ্ঠ দিক।'

শ্বেতকেতু তখন রাগে জ্বলছে। সে অপমান ভুলতে পারছে না। তাই ঠিক করল, 'আমি আর এখানে থাকব না।' সে তখন তক্ষশিলায় চলে গেল। সেখানে এক পণ্ডিতের কাছে নানা বিষয়ে পড়াশুনো করল।

তারপর সে একা একা নানা জায়গায় ঘুরে নানা সম্প্রদায় ও পণ্ডিতের কাছে অনেক কিছু শিখল। শেষ পর্যন্ত তপস্বী হল। একবার এক গ্রামে গিয়ে সে পাঁচশ তপস্বীর দেখা পেল। তাদের কাছে গিয়ে শ্বেতকেতু অনেক কিছু শিখল।

একদিন ঐ পাঁচশ তপস্বীকে সঙ্গে নিয়ে শ্বেতকেতু বারাণসীর

বাজদববাবে গেল। বাজা তপস্বীদেব দেখে খুব খুশি হলেন। তাদেব থাকার জন্য নিজেব বাগান ছেড়ে দিলেন। বাজা একদিন তপস্বীদেব যত্নআত্তি কবে খাওয়ালেন। তাবপর বললেন, 'আজ আপনাদেব

কাছে যাব।'

শ্বেতকেতু তপস্বীদের বলল, 'দেখ, আজ বাজা আসবেন। তোমবা নানাবকম ভেল্কি আব তপস্যা দেখিযে বাজাকে খুশি কববে। তাহলে জীবনে তোমাদেব কোন কিছুব অভাব হবে না।'

বিকেলে বাজা এসে তপস্বীদেব নানাবকম ভেল্কি দেখে মুগ্ধ হযে গেলেন। বাজাব সঙ্গে ছিল বাজাব পুবোহিত। বাজা পুবোহিতকে বললেন, 'এঁবা সত্যি মহান। কত শাস্ত্র পড়েছেন।'

মহাবাজ, শুধু শাস্ত্র পড়লেই সব হয না।

কেন?

পাপে লিপ্ত থাকলে শাস্ত্রে কি হবে?

শ্বেতকেতু দেখল এই পুবোহিতটাব জন্যই সব পণ্ড হল। বাজা আব আমাব মত তপস্বীদেব পছন্দ কবছেন না। সব কিছুব জন্য দাযী এই পুবোহিত। এইসব ভেবে শ্বেতকেতু একদিন পুরোহিতেব সঙ্গে শাস্ত্র নিযে তর্ক করতে গেল।

শ্বেতকেতু॥ শাস্ত্র না জানলে সত্য জানা যায না।

পুবোহিত॥ কিন্তু চবিত্র?

শ্বেতকেতু॥ সংযম চবিত্র এসব সত্যেবই লক্ষণ।

পুবোহিত॥ দেখ শাস্ত্র কীর্তি দেয, শাস্তি দেয না।

শ্বেতকেতু॥ তাহলে শাস্তি কে দেয?

পুবোহিত॥ চবিত্র আব সংযম।

শ্বেতকেতু হাব মানল। রাজা ঐ তপস্বীদেব গৃহী হতে বললেন। সৈন্যবাহিনীতে তাদেব কাজ দেওযা হল।

দরীমুখ জাতক

অনেককাল আগে রাজগৃহ নগরে মগধরাজ রাজত্ব করতেন। বোধিসত্ত্ব তখন মগধরাজের বড় ছেলে হয়ে জন্মান। বোধিসত্ত্বের নাম রাখা হল ব্রহ্মদত্তকুমার।

ব্রহ্মদত্তকুমার যেদিন জন্মান ঠিক সেই দিনই রাজপুরোহিতেরও একটি ছেলে জন্মায়। পুরোহিতের ছেলের মুখটি খুব সুন্দর হয়েছিল। তার নাম রাখা হল দরীমুখ।

দুজনেই রাজবাড়িতে থেকে বড় হতে লাগল। দুজনের মধ্যে খুব

ভাবও হল। একজন আরেকজনকে ছেড়ে থাকতে পারে না। যথা বয়সে দুজনে তক্ষশিলায় গেল লেখাপড়া শিখতে। সেখানে নানা বিষয়ে পণ্ডিত হয়ে তারা আরও জ্ঞান অর্জনের জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে তারা বারাণসীতে এল। মন্দিরে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন সকালে ভিক্ষে করতে বেরোল। এক গৃহস্থের বাড়িতে সেদিন শাস্ত্রপাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। কুমাররা সেই বাড়িতে গেলে বাড়ির লোকজন তাদের ব্রাহ্মণ মনে করে ভেতরে নিয়ে গেল।

বোধিসত্ত্বকে বসতে দিল শুদ্ধ সাদা আসনে। আর দরীমুখকে বসাল লাল কম্বলের ওপর। দরীমুখ এ থেকে টের পেল সেদিনই তার বন্ধু বারাণসীর রাজা হবে এবং সে নিজে হবে তার সেনাপতি।

তারা রাজার বাগানে ফিরে এসে জপতপ শুরু করল। এ ঘটনার

সাতদিন আগে বারাণসীরাজের মৃত্যু হয়েছে। রাজপুরোহিত শেষকৃত্য করেছেন। রাজার কোন ছেলে ছিল না। সেজন্য পুরোহিত সুসজ্জিত রথ সাতদিন ধরে বের করেছেন। রথ নিজে রাজা খুঁজে নেবে বলে।

যাই হোক, সেই রথ এসে রাজার বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাজকেরা বাজনা বাজাতে লাগল। দরীমুখ বুঝল তার বন্ধু এবার রাজা হবে। কিন্তু ভাবল, 'আমার আর ঘরসংসার করার মানে হয় না।' তাই বোধিসত্ত্বকে না জানিয়েই সে লুকিয়ে পড়ল।

রাজপুরোহিত ঘুমন্ত বোধিসত্ত্বের পা দেখে বুঝলেন, লোকটা সামান্য নয়। কিন্তু বোধিসত্ত্বের মতিগতি তিনি জানেন না। সেটা পরখ করার জন্য রাজকদের বললেন, 'জোরে বাজাও।'

বোধিসত্ত্বের ঘুম ভেঙ্গে গেল। এইসব কাণ্ডে বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। একসময় পুরোহিত তাঁকে সব কিছু খুলে বললেন। বোধিসত্ত্ব তখন রথে উঠলেন।

পুরোহিত বোধিসত্ত্বকে বললেন, 'প্রভু, এ রাজ্য আপনার। এখন আপনি দায়িত্ব নিন।' বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, 'রাজা কি কোন ছেলে রেখে গিয়েছেন?' পুরোহিত বলল, 'না।' বোধিসত্ত্ব তখন রাজা হতে সম্মত হলেন।

ওদিকে বোধিসত্ত্ব চলে যাওয়ার পর রাজার বাগান জনহীন হল। দরীমুখ তখন তপস্যায় বসল। একটু পরে দরীমুখের কোলের ওপর

একটা শুকনো পাতা ঝড়ে পড়ল। শুকনো পাতাটি হাতে নিয়ে দরীমুখ ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে উপলব্ধি করল, শুধু এই পাতাই নয়, সমস্ত পদার্থই ক্ষয়ের বশীভূত। সব কিছুই একদিন বিনষ্ট হয়।

এই অবধি ভাবা মাত্র দরীমুখের শরীর ও মন থেকে সংসারী মানুষের সমস্ত চিহ্ন মিলিয়ে গেল। কিন্তু শরীর ও মনে সে প্রবল তপস্যাবল অনুভব করল। সে হিমালয়ের পাদমূলে এক গুহায় চলে গেল।

ওদিকে বোধিসত্ত্ব যথাসময়ে বিষয়সুখ ভোগ করতে লাগলেন। এক এক করে চল্লিশ বছর কেটে গেল। এর মধ্যে একবারের জন্যও তিনি বন্ধু দরীমুখের কথা ভাবেন নি। ঠিক চল্লিশ বছর পরে বন্ধুর কথা তাঁর মনে এল।

বোধিসত্ত্ব বন্ধুকে দেখার জন্য উদগ্রীব হলেন। কর্মচারীদের নানা দিকে পাঠালেন দরীমুখের খোঁজ করতে। কিন্তু একে একে সবাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

বোধিসত্ত্ব যখন দরীমুখের কথা ভাবছিলেন, তখন তপস্যাবলে দরীমুখও তা জানতে পারল। বন্ধুকে শিক্ষা দেবার জন্য সে তখুনি বারাণসীরাজের বাগানে এল। একদিন বাগানে দরীমুখকে দেখে এক প্রহরী তার পরিচয় জানতে চাইল। দরীমুখ নিজের নাম বলল। প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে বোধিসত্ত্বকে খবর পাঠাল।

বোধিসত্ত্ব এসে দরীমুখের পায়ের কাছে বসে সঠিক ধর্মকথা শুনলেন। দরীমুখ তাঁকে খুব অনুরোধ করল বিষয়-বিষ ত্যাগ করে ধর্মকর্ম করতে। কিন্তু বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমি বিষয়ের দাস হয়ে গেছি। বিষয় ছাড়লে মরে যাব।' দরীমুখ আরও বহু ধর্মকথা বলে ইচ্ছাশক্তিতে আকাশে উঠে হিমালয়ের দিকে যাত্রা করল।

তারপর বোধিসত্ত্ব পোশাক আসাক খুলে ফেলে সামান্য চিরবস্ত্র ধারণ করে বললেন, 'আমার অনেক বয়স হয়েছে, আমিও তপস্যা করতে চললাম।'

ধর্মধ্বজ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবাব পাখি হযে জন্মান। তখন তিনি পাখিদের সঙ্গে এক দ্বীপে বাস করতেন।

একবাব কাশীর কযেকজন বণিক নৌকো করে সমুদ্রে যাচ্ছিল। মাঝপথে নৌকো ডুবে গেল। ঐ নৌকোয একটা কাক ছিল। সে নিজেব চেষ্টায় দ্বীপে এসে উঠল। কাক দ্বীপে এসে দেখল দ্বীপটিতে শুধু পাখি আর পাখি।

তখন সে ফন্দি করল পাখিব ডিম আর পাখিব ছানা খেয়ে মজায দিন কাটাবে। এই ভেবে সে পাখি আব পাখিব ছানায বোঝাই একটা গাছেব তলায় গেল। সেখানে এক-ঠেঙে হযে, মুখ ফাঁক কবে দাঁড়িয়ে বইল।

পাখিবা খানিকক্ষণ তা দেখল। বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'কাকটা তো আচার্য!' তখন তিনি কাকেব সঙ্গে আলাপ কবলেন। কাক বলল, 'আমি এক-ঠেঙে হয়েআছি কেননা এই পৃথিবী আমাব দু পায়ের ভব সহ্য করতে পাববে না। আব হাঁ কবে বাতাস খাচ্ছি। আমি প্রাণী বধ করি না, তরুলতাও খাই না। বাতাস খেযে বেঁচে থাকি।'

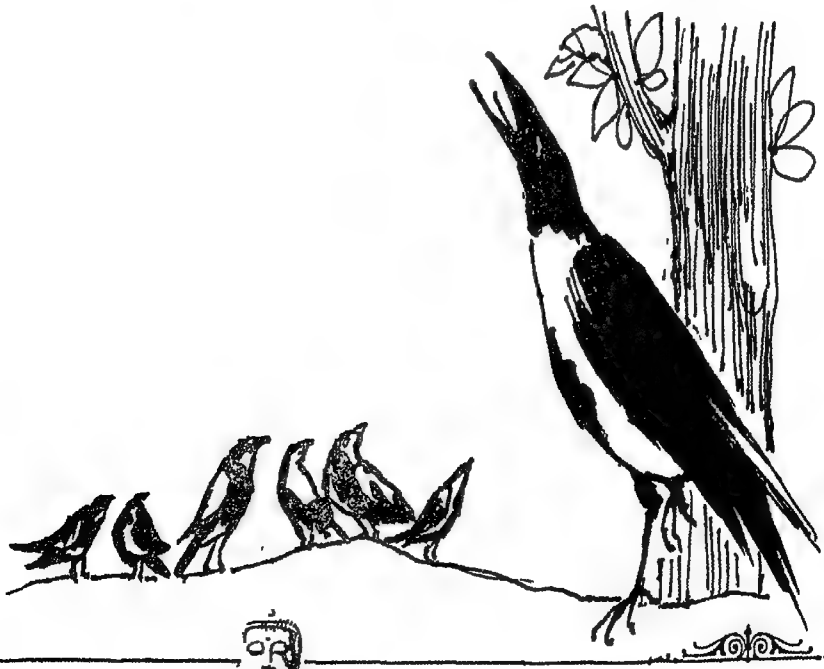

সমস্ত পাখি তখন কাককে ঘিরে ধরল। তাকে ধার্মিক ভেবে তার হাতে নিজেদের শাবক আর ডিমগুলো রক্ষার ভার দিয়ে চড়তে বেরোল। প্রথমদিন ফিরে এসে দেখল, ডিম আর শাবক কমে গেছে। রোজই এরকম ঘটতে থাকল। বোধিসত্ত্বকে তারা ঘটনাটার কথা জানাল।

তখন বোধিসত্ত্ব হিসেব করে দেখলেন কাক আসার পর থেকেই এ রকম ঘটছে। তারপর একদিন তিনি চড়তে যাবার ছুতো করে কিছু দূর উড়ে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন কাকটা বেজায় আনন্দে পাখির ডিম আর ছানাগুলোকে খাচ্ছে।

বোধিসত্ত্ব কিছুই বললেন না। সব পাখি ফিরে এলে গোপনে তাদের সবাইকে সব বৃত্তান্ত জানালেন। তখন সবাই মিলে কাকটাকে থেঁৎলে মেরে ফেলল।

নীতিকথা : অন্যায় করলে শাস্তি পেতেই হবে।

খরপুত্র জাতক

বারাণসীতে একসময় সেনক রাজা রাজত্ব করতেন। বোধিসত্ত্ব তখন শক্র ছিলেন। মানে, দেবতা। একবার সেনক নিজের বাগানে বেড়াতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ শুনতে পেলেন, গ্রামের ছেলেরা নাকি একটা সাপকে মারতে চেষ্টা করছে। শুনে সেনক তাঁর কর্মচারীদের বললেন, ছেলেগুলোকে ঠেকাও। সাপটাকে চলে যেতে দাও।'

ছেলেগুলোর হাত থেকে নিস্তার পেয়ে সাপ চলে গেল।

মুক্ত ঐ সাপটি কিন্তু সামান্য সাপ ছিল না। সে ছিল স্বয়ং নাগরাজ। প্রাণ ফিরে পেয়ে নাগরাজ সেনকের ওপর খুব খুশি হলেন। রাতে রাজার ঘরে নাগরাজ এলেন। সেনককে তিনি অনেক ধনরত্ন দিলেন। আর বললেন, 'রাজা, তোমার দয়াতেই আমি বেঁচেছি। তোমার সঙ্গে আমার চিরদিন বন্ধুত্ব থাকবে।'

নাগরাজ তারপর রাজা সেনকের দরবারে নাচার জন্য এক নাগিনীকে পাঠালেন। রাজার হাতে নাগকন্যাকে তুলে দিয়ে নাগরাজ বলে গেলেন, 'এ হল নাগকন্যা। এখন যেমন একে মানুষীরূপে দেখছ সব সময় এর কিন্তু এই রূপ থাকবে না। ইচ্ছে করলেই সে আবার নাগকন্যা হয়ে যেতে পারবে। তোমাকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি, তার জোরে এ যেখানেই যাক তুমি তাকে দেখতে পাবে।'

তারপর থেকে নাগিনী নাচগান করে রাজাকে খুশি করত। একদিন পাতালের এক বিষধর সাপকে দেখে নাগকন্যার খুব নাচতে ইচ্ছে করল। সে রাজাকে ছেড়ে ঐ সাপের কাছে চলে গেল। রাজা সেনক নাগকন্যাকে অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে মনে মনে মন্ত্রটা আওড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলেন নাগিনী ঐ নাগের সঙ্গে নাচছে। রাজার খুব রাগ হল। লাঠি দিয়ে নাগিনীর পিঠে দু-একবার মারলেন।

নাগিনী তখন পাতালে গিয়ে নাগরাজকে দেখাল সেনক রাজা তাকে কিভাবে মেরেছেন। নাগরাজ তা শুনে খুবই চটে গেলেন। কয়েকটা বিষধর সাপকে বললেন রাজার ঘরে যেতে। রাতে রাজা

যখন ঘুমোবেন বিষধর সাপরা তখন রাজাকে দংশন করবে।

রাতে রাজা রাণীকে বললেন, 'নাগকন্যা আজ একটা কাণ্ড করেছে। নাগরাজ তাকে আমার কাছে দিয়ে দিলেও সে একটা বিষধর সাপের সঙ্গে নাচার লোভ সামলাতে পারে নি। দেখে আমার রাগ হল। হাতের লাঠি দিয়ে তাকে খুব মারলাম। তারপর থেকে তাকে আর দেখতে পাচ্ছি না। হয়ত সে নাগরাজকে গিয়ে সত্যি-মিথ্যে অনেক কিছু বলেছে। এখন কি হয় দেখ।'

বিষধর সাপরা রাজার মুখে এই কথা শুনে নাগরাজের কাছে ফিরে গেল। নাগরাজ সব শুনে নিজে এলেন সেনকের সঙ্গে দেখা করতে। দেখা করে তাঁকে বললেন কি ভুল তিনি করতে যাচ্ছিলেন। তারপর বললেন, 'রাজা, আমি তোমাকে এমন এক মন্ত্র শেখাব যার বলে তুমি জীবজগতের সমস্ত প্রাণীর ভাষা বুঝতে পারবে। কিন্তু সেই মন্ত্র তুমি কাউকে শেখাতে পারবে না। শেখালেই তুমি আগুনে পুড়ে মারা যাবে।'

যাই হোক রাজা সেনক নাগরাজের কাছ থেকে সেই গোপন মন্ত্র শিখে নিলেন। একদিন রাজা মধু দিয়ে রুটি খাচ্ছিলেন। পাশে রাণী বসে আছেন। দু-এক ফোঁটা মধু পড়েছিল মেঝেতে। রাজা দেখলেন একটা পিঁপড়ে চিৎকার করতে করতে মধুর দিকে ছুটে আসছে: 'ওরে রাজার মধুর হাঁড়ি ভেঙে গেছে। কে কত খাবি আয়।' শুনে রাজা হাসছিলেন। রাণী জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, হাসছেন কেন?' রাজা কোন জবাব দিলেন না।

খাওয়ার পর রাজা বিশ্রাম করছেন। পাশে রাণী বসে আছেন। এমন সময় রাজা দেখলেন একটা মৌমাছি আরেকটা মৌমাছিকে বলছে, 'চল, আমরা একটু বাগানে ঘুরে বেড়াই।' শুনে সেই মৌমাছিটা বলল, 'একটু পরে রাজাকে চন্দন আর সুগন্ধী মাখান হবে। তখন মাটিতে সুগন্ধীর গুঁড়ো পড়বে। আমরা দুজনে ঐ গুঁড়ো মেখে বেড়াতে যাব, কেমন।' ওদের এই কথা শুনে রাজা আবার হাসলেন। রাণী বললেন, 'মহারাজ, হাসছেন কেন?' রাজা বললেন, 'এমনি, কিছু নয়।' রাণী তখন বললেন, 'মহারাজ আমার কাছে কিছু লুকোতে চাইছেন।

আমি কি এতই ভাগ্যহীনা হলাম যে আপনার মনের কথা জানতে পারব না?' রাজা তবু মুখ খুললেন না। রাতে খাওয়ার সময় আবার একটা পিঁপড়ে তার সঙ্গীকে ডেকে বলল, 'ঐ দেখ রাজার ভাঁড়ার ভেঙ্গে পড়েছে। কত ভাত, খাওয়ার লোক নেই।' আসলে রাজার থালার পাশে দু-একটা ভাত পড়েছিল মাত্র। ফলে রাজা আবার হেসে ফেললেন। রাণী এবার নাছোড়বান্দা।

মহারাজ, আপনি বলবেন কি বলবেন না।

কিছু নয়, তেমন কিছু নয়।

আপনি যদি না বলেন

বেশ বলছি, শোন।

রাজা তখন মন্ত্রের কথা বললেন। বললেন পোকামাকড়ের এইসব কথা শুনেই রাজার হাসি পেয়েছে। রাণী তখন বায়না জুড়ে দিলেন

আমাকে শেখাও।

ও কথা বোলো না।

কেন?

তাহলে আমার মৃত্যু হবে।

আমি জানি না।

আমার মৃত্যু হবে, তবু শিখবে?

শেষ পর্যন্ত রাজা রাজি হলেন। দেবরাজ শক্র সেনক রাজার এই ভয়ঙ্কর ইচ্ছে টের পেয়ে ভাবলেন, 'রাজাকে আমি ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না।' অসুর কন্যা সুজাকে সঙ্গে নিয়ে শক্র মর্ত্যে এলেন। সুজা আর শক্র দুজনে ছাগল সেজে রাজার সামনে এলেন।

রাজা তখন রথে চড়ে বাগানে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। ছাগল-রূপী শক্র আর সুজাকে চিনতে না পারলেও ছাগলদুটিকে রাজা দেখতে পেলেন। কিন্তু আর কেউ তাদের দেখতে পেল না, একমাত্র রাজার সৈন্ধব গর্দভ ছাড়া।

ছাগলদুটো রাজার রথের সামনে এসে বিশ্রি গুঁতোগুঁতি শুরু করে দিল। তা দেখে রাজরথের সৈন্ধব গর্দভ বলল, 'ছাগল বোকা জানতাম, কিন্তু রথের সামনে গুঁতোগুঁতি করে প্রাণ দেয়, এত বোকা বলে জানতাম না।'

শুনে ছাগলরূপী শক্র বললেন, 'আর বড়াই করো না। দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে, তবু ছাড়া পেলে পালাও না। ওই জন্যই লোকে গাধা বলে। তুই তো মূর্খ বটেই। তবে রাজা যে রথে চড়ে বসেছে সে আরো মূর্খ।' গাধা তাতে বলল, 'আমাকে মূর্খ বলছিস তাতে আপত্তি নেই, গাধাদের সবাই মূর্খ বলে। কিন্তু কোন্ সাহসে তুই রাজাকে মূর্খ বলিস?' এ কথা শুনে ছাগরূপী শক্র বললেন, 'এই মূর্খ রাজা বৌ-কে মন্ত্র শেখাবে বলছে। অথচ ও মারা গেলে রাণী কি আর এর বৌ থাকবে?'

রাজা ছাগরূপী শক্রর কথায় হুঁশ ফিরে পেলেন। তিনি শক্রর পরিচয় জানতে চাইলেন। শক্র সব কথা খুলে বললেন।

রাজা ফিরে এসে রাণীকে বললেন, 'মন্ত্র শিখবে তো সব আয়োজন করে ফেল।' রাণী বলল, 'কি কি আয়োজন মহারাজ?' 'কসাইকে

ডাকিয়ে আন। মন্ত্র শেখাব আগে একশ ঘা চাবুক খেতে হবে', রাজা বলল। শুনে রাণী সেই ব্যবস্থাই করল। কিন্তু দু-চার ঘা চাবুক খেতেই রাণী বলল, 'মহারাজ, ছেড়ে দিন, আমি শিখব না।' রাজা বললেন, 'তা কি হয়, আমি মারা যাব জেনেও তুমি মন্ত্র শিখতে চেয়েছিলে, তোমাকে শিখতেই হবে।' চাবুকে চাবুকে রাণীর পিঠের চামড়া উঠে গেল।

সে আর জীবনে কখনও মন্ত্র শিখতে চায় নি।

সুতনু জাতক

ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার খুব গরীবঘরে জন্ম নেন। বোধিসত্ত্বের নাম রাখা হল সুতনু। বড় হয়ে সুতনু মজুর খেটে বাবা-মাকে খাওয়াতেন। বাবা মারা গেলে সুতনু মাকে নিয়ে থাকতেন।

বারাণসীর রাজার শিকারের খুব নেশা ছিল। একবার বহু লোক-লস্কর নিয়ে রাজা শিকারে গিয়েছেন। একটা হরিণকে তাড়া করে রাজা তীর ছুঁড়লেন। হরিণটা ছিল চালাক। সে এমনভাবে পড়ে গেল যেন তীরবিদ্ধ হয়েছে। রাজা তীরধনুক রেখে ধরতে যেতেই হরিণ সঙ্গে সঙ্গে উঠে পালাতে লাগল। রাজার অনুচর এ রকম মজার কাণ্ড দেখে হাসি সামলাতে পারল না। রাজা তাতে খুবই অপমান বোধ করলেন। তিনি হরিণের পেছনে তাড়া করে চললেন।

ছুটতে ছুটতে রাজা হরিণের নাগাল পেলেন। খড়গ দিয়ে হরিণকে দু টুকরো করে ফেললেন। তারপর বাঁকে করে জল নেওয়ার মত হরিণের দেহটা লাঠির দু পাশে বেঁধে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চললেন। অনেকটা হাঁটার পর রাজা খুব অবসন্ন হয়ে পড়লেন।

সামনেই একটা বটগাছ ছিল। রাজা বটের ছায়ায় বসে জিরিয়ে নিতে লাগলেন। ক্লান্তিতে তাঁর চোখ বুঁজে এল। রাজা ঘুমিয়ে পড়লেন। ঐ বটগাছে মহাদেব নামে এক যক্ষ জন্মেছিল। ঐ গাছের ছায়ায় যে আসত তাকেই খাওয়ার অধিকার ছিল মহাদেবের। বৈশ্রবন মহাদেবকে এই বর দিয়েছিলেন।

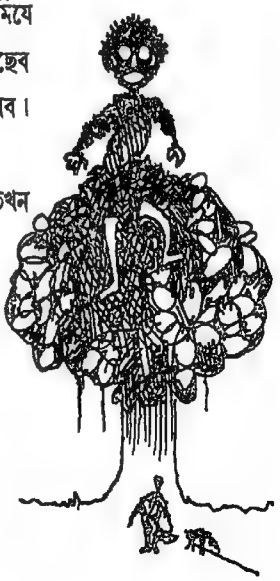

রাজা ঘুম থেকে উঠে যখন চলে যেতে উদ্যত হয়েছেন, তখন মহাদেব তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

দাঁড়াও।

কেন?

তুমি আমার খাবার।

তুমি কে?

আমি যক্ষ, এই গাছে থাকি।

যক্ষ আরও বলল, 'এই গাছের ছায়ায় যে আসবে তার নিস্তার

নেই।' রাজা প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও পরে বুদ্ধি করে বললেন, 'তুমি কি শুধু আজকের খাবারটা নিয়েই চিন্তিত, নাকি রোজই খেতে চাও?'

পেলে তো রোজই খাই।

তাহলে আজ হরিণের মাংস খাও।

তারপর?

আমি রোজ তোমাকে খাদ্য পাঠাব।

তুমি কে?

বারাণসীর রাজা।

খাবার না পাঠালে কিন্তু তোমাকে খেয়ে আসব।

রাজা তো নিজের প্রাণ নিয়ে ফিরলেন। কিন্তু এখন কি উপায়। অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, কয়েদখানা থেকে রোজ একজন করে কয়েদীকে পাঠানো হবে। বন্দীরা জানত না যে তারা যক্ষের কাছে যাচ্ছে। তারা ভাত-তরকারি নিয়ে বনে যেত। আর যক্ষ তাদের খেয়ে ফেলত।

এভাবে কয়েদখানা খালি হয়ে গেল। আর লোক পাওয়া যাচ্ছে না। রাজার অমাত্য বলল, 'প্রভু, চিন্তা করবেন না, প্রাণের আশার থেকেও লোকের ধনের আশা অনেক বেশি।' অমাত্যর পরামর্শ অনুসারে হাতির মাথায় হাজার টাকার থলে রেখে ভেরী বাজিয়ে ঘোষণা করা হল, যে যক্ষের জন্য খাবার নিয়ে যাবে ঐ হাজার টাকা সে পাবে।

সুতনু ভাবলেন, 'আমরা গরীব, মার কত কষ্ট। আমি এই টাকাটা নিলে মার দুঃখ ঘোচে।' শুনে তাঁর মা কেঁদে ভাসাল। কিন্তু সুতনু রাজার কাছে গেলেন। বললেন, 'মহারাজ, আমি যাব।'

তোমার কি কি চাই বল।

পাদুকা, রাজছত্র, সোনার থালা।

রাজা জানতে চাইলেন, 'কেন, এগুলো দিয়ে কি করবে?'

সুতনু বললেন, 'মহারাজ, আমি খড়ম পায়ে দিলে যক্ষ মাটিতে দাঁড়িয়েছি বলতে পারবে না। মাথায় ছাতা থাকলে ঐ আমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছি তাও বলতে পারবে না। আর শাস্ত্র জানা প্রাজ্ঞ হয়ে কি করে খারাপ পাত্রে খাবার নিয়ে যাই। এছাড়া আমাকে আপনার খড়্গ দেবেন। সমস্ত মানুষকে রাক্ষস যক্ষ সবাই-ই ভয় পায়।'

মাকে প্রণাম করে সুতনু রওনা হলেন। যক্ষ সুতনুর বেশবাস দেখে একটু অবাক হল। সে ভাবল কৌশলে লোকটাকে আমার ছায়ার মধ্যে আনতে হবে। বলল, 'এসো হে আমার ছায়ার মধ্যে। বারাণসীরাজ আজ তোমাকে আর থালার ঐ খাবার আমাকে দিয়েছে। আজ তুমি আমার খাদ্য।'

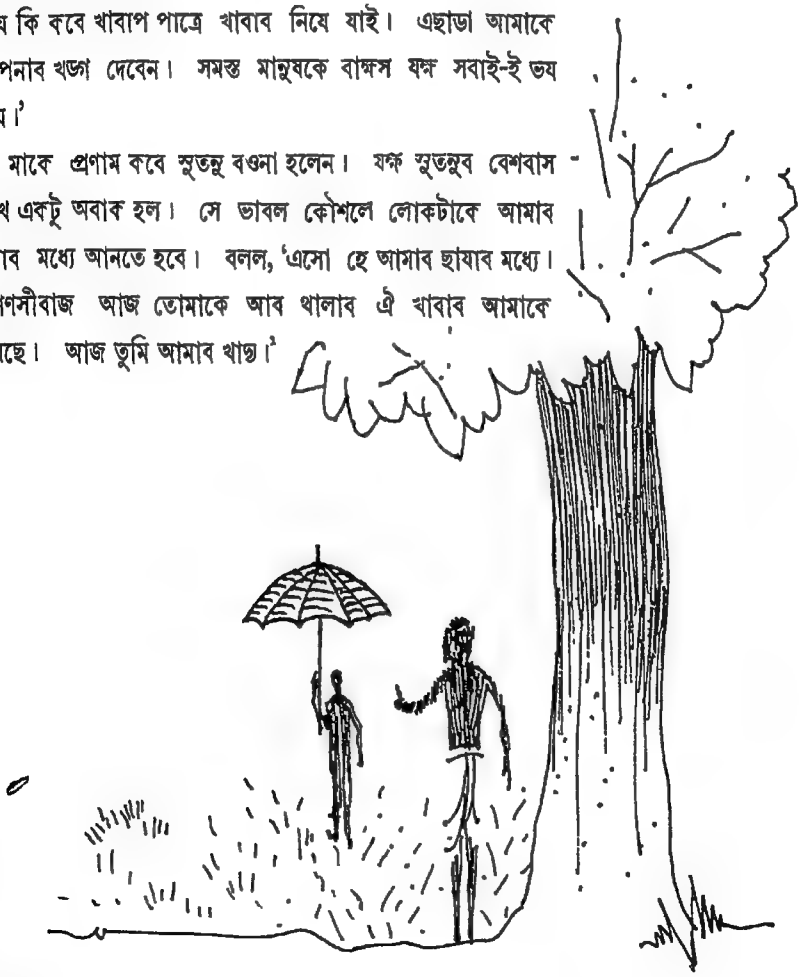

সুতনু বললেন, 'খেতে পার। কিন্তু এতে তোমারই ক্ষতি হবে। এরপর প্রাণের ভয়ে আর কেউই তোমার খাবার বয়ে আনবে না।'

যক্ষ সুতনুর কথার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পেল। সে বলল, 'ঠিকই বলেছ, তোমাকে আমি খাব না। খাবার দাবার রেখে তুমি ফিরে যাও। তোমার মা কাঁদছে।'

সুতনু কিন্তু এতে থামলেন না। যক্ষকে বোঝালেন, 'পাপের ফলে তুমি যক্ষ হয়ে জন্মেছ। এ জন্মে পুণ্য কর্ম না করে যদি প্রাণীহত্যা করে যাও তোমার উদ্ধার নেই। তার চেয়ে তুমি শীল ব্রত গ্রহণ কর। আমার সঙ্গে চল। নগরদ্বারে থাকবে। শুদ্ধ জীবন কাটাবে।'

সুতনুর সঙ্গে যক্ষ নগরদ্বারে এল। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে রাজা দেখতে এলেন। যক্ষ যাতে রোজ ভালো খাবার পায় সে ব্যবস্থা করে রাজা সুতনুকে নিজের সেনাপতি করলেন।

মনোজ জাতক

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব একবার সিংহ হয়ে জন্মান। বয়সকালে তিনি এক সিংহীকে বিয়ে করলেন। তাদের দুটি সন্তান হল। একটি সিংহ, অপরটি সিংহী।

বোধিসত্ত্ব ছেলের নাম রাখলেন মনোজ। মনোজ দিনে দিনে বড় হল। ওদিকে বোধিসত্ত্ব আর তাঁর স্ত্রীর ক্রমে বয়স হল। এখন তাঁরা শিকার করতে যেতে পারেন না। মনোজ শিকার করে আনে। মনোজও এক সিংহীকে বিয়ে করল। পরিবারে এখন পাঁচজন। মনোজই এই পাঁচজনকে খাওয়ায়।

মনোজ একদিন চরতে গিয়ে দেখল একটা শিয়াল মাটিতে পেট দিয়ে শুয়ে পড়ে আছে। মনোজ জিজ্ঞেস করল, 'কি হে বন্ধু!' শিয়াল তখন বলল, 'প্রভু, আমি আপনার সেবা করতে চাই।' মনোজ শিয়ালকে নিজের গুহায় এল। তাকে দেখে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'বাছা, শিয়ালরা খুব ধূর্ত আর খারাপ হয়। তাদের সংস্রবে থেকো না।'

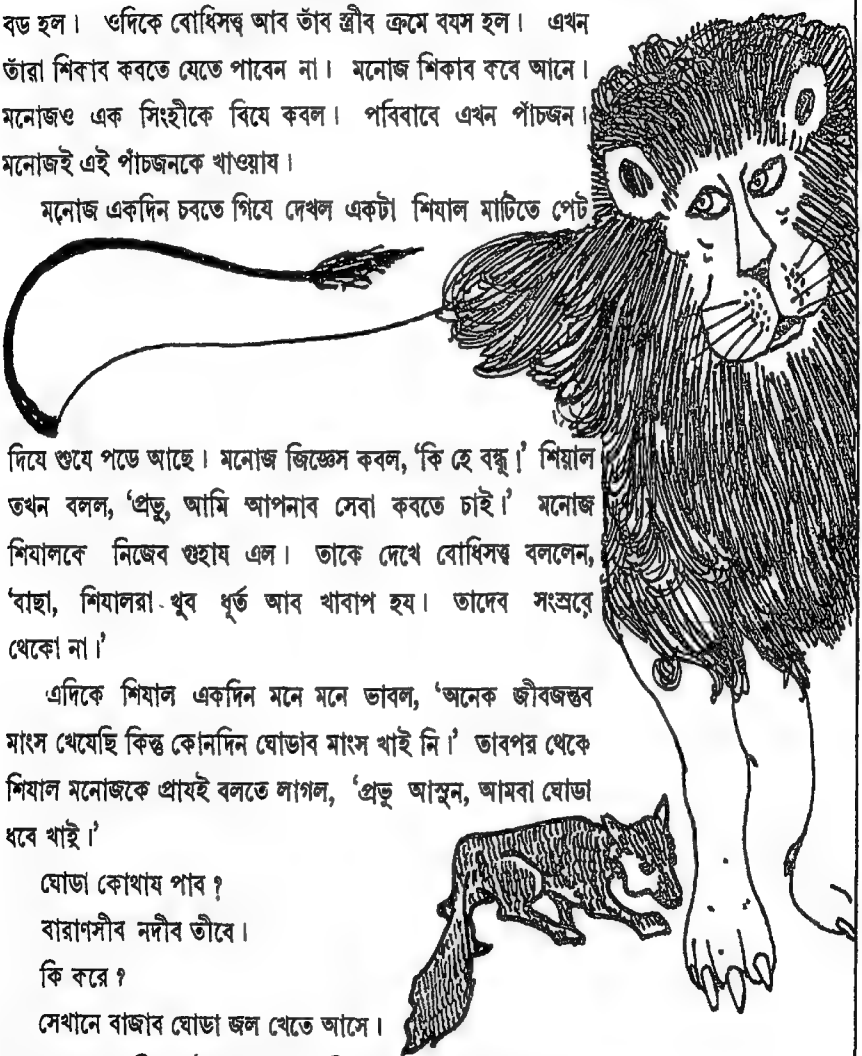

এদিকে শিয়াল একদিন মনে মনে ভাবল, 'অনেক জীবজন্তুর মাংস খেয়েছি কিন্তু কোনদিন ঘোড়ার মাংস খাই নি।' তারপর থেকে শিয়াল মনোজকে প্রায়ই বলতে লাগল, 'প্রভু আসুন, আমরা ঘোড়া ধরে খাই।'

ঘোড়া কোথায় পাব?

বারাণসীর নদীর তীরে।

কি করে?

সেখানে রাজার ঘোড়া জল খেতে আসে।

মনোজ একদিন তাই করল। বোধিসত্ত্ব কিন্তু ঘোড়ার মাংস খেয়ে

মনোজকে বললেন, 'বাছা, সিংহ ঘোড়ার মাংস খায় না, খেলে বেশিদিন বাঁচে না। তুমি আর ঘোড়া শিকার করো না।'

মনোজ বাবার কথায় কান দিল না। সে রোজই ঘোড়া শিকার করতে লাগল। বারাণসীরাজ ভাবলেন, 'কি করে সিংহকে ধরা যায়?' মন্ত্রীর পরামর্শে বিশাল একটা পাঁচিল তুলে তার ভেতরে ঘোড়াকে রাখার ব্যবস্থা করা হল। এক দক্ষ তীরন্দাজকে নিয়োগ করা হল সিংহকে মারার জন্য। তীরন্দাজ পাঁচিলের অনেক ওপরে মাচা বেঁধে বসে রইল।

মনোজ লাফ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘোড়া শিকার করতে ঢুকল। তীরন্দাজ জানত শিকার করতে আসার সময় সিংহ এত তাড়াতাড়ি যাবে যে তখন তীর না ছোঁড়াই ভালো। সে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘোড়া শিকার করে ঐ ভারি জন্তুটাকে পিঠে ফেলে ফিরে যাওয়ার সময় মনোজ খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছিল। তীরন্দাজ তখন এক মোক্ষম তীরে তার গলা বিঁধে ফেলল। মনোজ আর্তনাদ করে উঠল। শিয়াল কিছুটা দূরে অপেক্ষা করছিল। সে বুঝল সিংহ বিপদে পড়েছে। নিঃশব্দে সে সরে পড়ল। মনোজ গুহা পর্যন্ত ফিরে এল কোন রকমে। তারপর প্রাণত্যাগ করল।

নীতিকথা: সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নরকবাস।

সূচী জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার কালীরাজ্যে কামারকুলে জন্মান। বয়সকালে তিনি কামারের কাজ এত ভাল শিখেছিলেন যে তাঁর তুল্য কামার সেই গ্রামে আর একজনও ছিল না। বোধিসত্ত্ব যে গ্রামে থাকতেন তার কিছু দূরে আরেকটি কামার-গ্রাম ছিল। সেখানে এক হাজার ঘর কামার থাকত। তাদের মধ্যে যে সেরা কামার সে রাজবাড়ির কাজ করত। সে খুব ধনী ছিল।

রাজ-কর্মকারের একটি মেয়ে ছিল। সে যেমন সুন্দর, তেমন গুণের আধার। তার রূপগুণের প্রশংসা আশপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। বোধিসত্ত্ব ঐ কুমারীর প্রশংসা শুনে ভাবলেন, 'বিয়ে করলে এ রকম মেয়েকেই বিয়ে করা উচিত। কিন্তু রাজ-কর্মকার যার-তার সঙ্গে তো আর মেয়ের বিয়ে দেবে না। আমাকে এমন কিছু করতে হবে যাতে সে মুগ্ধ হয়ে যায়।'

বোধিসত্ত্ব তখন এক অতি সূক্ষ্ম অথচ দারুণ শক্ত একটি সূঁচ বানালেন দীর্ঘদিন ধরে। ঐ সূঁচটিকে রাখলেন একটা কোষের মধ্যে। সেই কোষটির জন্য তৈরি করলেন আরকটি কোষ। এভাবে সাতটি কোষ তৈরি করলেন। কিন্তু দেখলে মনে হত কোন কোষ নেই, একটি সূঁচই কেবল আছে। আবার সূঁচটি এমন হালকা যে জলে ফেলে দিলে ভাসে।

তারপর তিনি কোষের মধ্যে রাখা সূঁচটি নিয়ে সেই কামার গ্রামে গেলেন। সেখানে হাঁক পাড়তে লাগলেন, 'সূঁচ নেবে গো, ভালো সূঁচ।'

গ্রামের একজনও সূঁচ সম্পর্কে কোন কৌতূহল দেখাল না। বোধিসত্ত্ব তখন রাজ-কর্মকারের বাড়ির কাছে গিয়ে হাঁক পাড়লেন।

কর্মকারের মেয়ে ঐ সুমধুর স্বর শুনে বেরিয়ে এল, 'কে গো তুমি? কি চাও?'

সূঁচ বিক্রি করতে এসেছি।

এমন আশ্চর্য কথা শুনি নি।

কেন?

কামারের গ্রামে কখনও সূঁচ বিক্রি হয়?

যদি ওস্তাদ কামার থাকে নিশ্চয়ই হয়।

রাজ কর্মকার দু-একটা কথা শুনতে পেয়েছিল। সে মেয়েকে ডাকল, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস?'

ভিনদেশী কামার।

কি চায়?

কামার-গ্রামে সূঁচ বিক্রি করতে চায়।

সে কি কথা!

হ্যাঁ বলছে, ওস্তাদ কামার কেউ থাকলে সে বুঝবে।

শুনে রাজ-কর্মকার বোধিসত্ত্বকে ডাকল। ভাবল, 'দেখা যাক, যুবক এমন কি কারিগরি করেছে।'

যাই হোক অত সূক্ষ্ম সাতটি কোষ ও কোষের মধ্যে যে একটা সূঁচ আছে রাজ-কর্মকার নিজেও তা ধরতে পারে নি। বোধিসত্ত্ব ঐ সূঁচ দিয়ে লোহা ফুটো করে দিলেন। রাজ-কর্মকার খুশি হয়ে নিজেই মেয়েকে তাঁর হাতে সম্প্রদান করল।

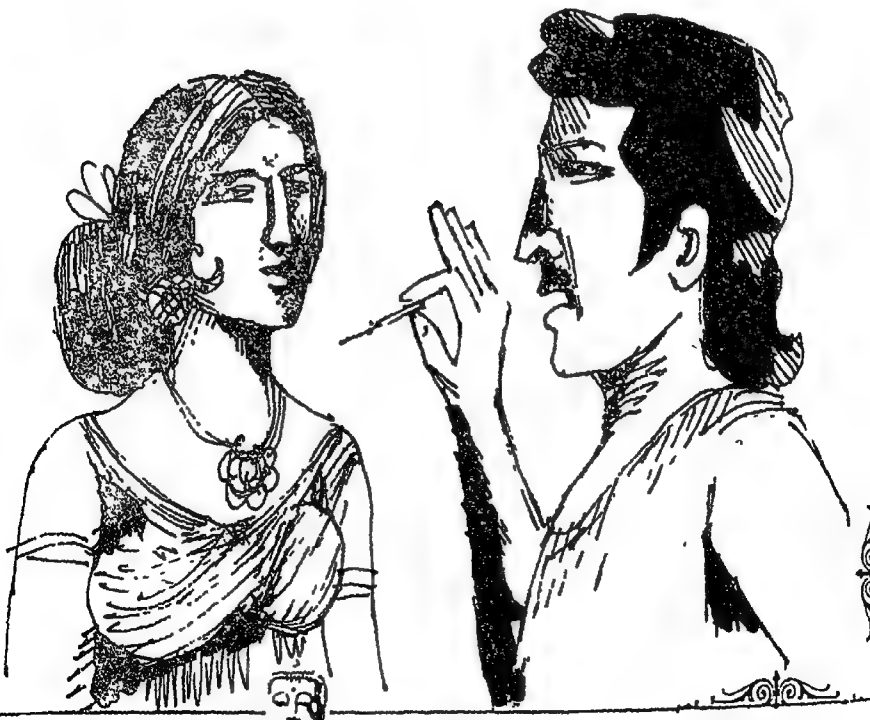

আশঙ্কা জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার কাশীগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেন। লেখাপড়া শিখে এক সময় পণ্ডিত হলেন। কিন্তু গৃহধর্মে রইলেন না। তপস্বী হয়ে হিমালয়ে চলে গেলেন। বনের ফুলমূল খেয়ে জীবনধারণ করতেন।

তখন স্বর্গ থেকে এক দেবী এক পদ্মের গর্ভে মেয়ে হয়ে জন্মান। সরোবরে সব পদ্ম ফুটে পড়ে যায়, কিন্তু ঐ দেবী যে পদ্মে আছেন তার কোন লয়ক্ষয় নেই। পদ্মটি রোজই বিকশিত হয়ে থাকে। বোধিসত্ত্ব এই দৃশ্য দেখে অবাক হলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, 'একবার দেখতে হয়।' পদ্মের কাছে গিয়ে ঐ দেবকন্যাকে পেলেন। মেয়েটিকে বোধিসত্ত্ব নিজের কন্যা হিসেবে গ্রহণ করলেন। যত্ন করে বড় করতে লাগলেন।

একদিন মেয়ের বয়স ষোল হল। দেখতে যেমন সুন্দরী, তেমনি রূপবতী হল। শক্র একদিন বোধিসত্ত্বকে পুজো করতে এসে মেয়েটিকে দেখতে পেলেন। শক্র জানতে চাইলেন, 'মেয়েটি কে?' বোধিসত্ত্ব সব খুলে বলে শক্রকে অনুরোধ করলেন, 'শূন্যে এর জন্য একটি প্রাসাদ বানিয়ে দাও। ভালো খাবার আর সজ্জাও দিও আমার মেয়েকে।'

একবার এক কাঠুরে বোধিসত্ত্বের কাছে মেয়েটিকে দেখতে পায়। মেয়েটি তখন বোধিসত্ত্বের পরিচর্যা করছিল। কাঠুরে বোধিসত্ত্বকে

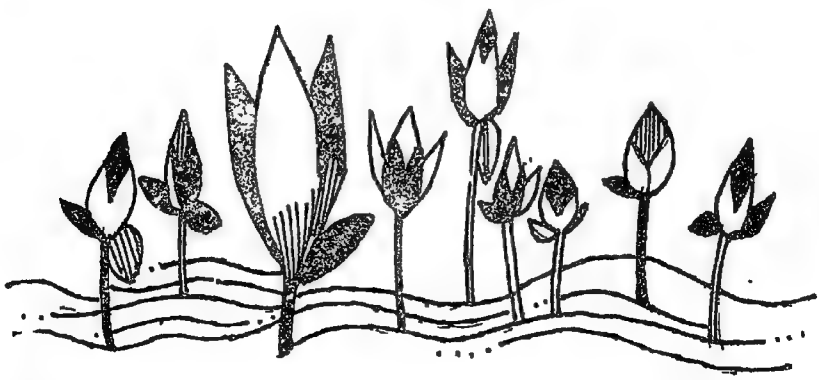

জিজ্ঞেস করল, 'প্রভু, এই মেয়েটি কে?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'এটি আমার মেয়ে।'

কাঠুরে নগরে ফিরে গেল। সে ভাবল এই আশ্চর্য সংবাদ বারাণসীরাজকে দিলে তিনি খুশি হবেন। রাজা তার মুখে ঐ পরমা সুন্দরী কন্যার বৃত্তান্ত শুনে নিজেই বনে এলেন। বোধিসত্ত্বকে বললেন, 'হে তাপস, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

যদি আমার মেয়ের নাম বলতে পার তবে বিয়ে হবে।

সে আর এমন কি কঠিন কাজ?

বেশ, তবে বল। বলতে পারলে বিয়ে দেব।

রাজা বহু চেষ্টা করে অনেকগুলো নাম বললেন, কিন্তু মিলল না। রাজা এভাবে এক বছর ঐ পরমা সুন্দরী কন্যাকে পাওয়ার জন্য বহু নাম খুঁজে বললেন। শেষে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে চাইলেন। কন্যা তখন সেই শূন্যের প্রাসাদের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'রাজা, চলে গেলে আমার মত মেয়ে আর কোথাও পাবেন না।'

কন্যা আরো বলল, 'আশার জিনিস পাওয়ার জন্য অতীতে লোকে কত বছরই না চেষ্টা করেছে। আর আপনি মাত্র এক বছরেই অধৈর্য হচ্ছেন?'

রাজা ভাবলেন, 'ঠিক, আরেকটু চেষ্টা করা যাক।' আবার এক বছর গেল, কিন্তু রাজা পারলেন না।

এবার তিনি ঠিক করলেন, 'রাজ্য নষ্ট হচ্ছে, আমি বরং চলে যাই।' এবারও কন্যা এসে নিজের রূপ ও গুণে মুগ্ধ করে তাঁকে আটকে রাখল।

মেয়েটি বলল, 'রাজা, আপনি মাত্র তিন বছরেই ধৈর্যহারা হলেন?'

রাজা বললেন, 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে। খাবার-দাবারও ফুরিয়ে এসেছে।'

কন্যা তখন বলল, 'মহারাজ, এই মাত্র আপনি আমার নাম বলেছেন। আপনি তো চিনে ফেলেছেন।'

রাজা তখন বোধিসত্ত্বের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনার মেয়ের

নাম আশঙ্কা।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'যখন মেয়ের নাম বলতে পেরেছ তখন মেয়ে তোমার হল। তুমি একে ধর্মপত্নী কর।'

রাজা আশঙ্কাকুমারীকে নিয়ে বারাণসীতে ফিরে গেলেন। সুখে দিন কাটিয়ে, সুশিক্ষিত ছেলেমেয়ে রেখে রাজা ও আশঙ্কাকুমারী দুজনেই একদিন গত হল।

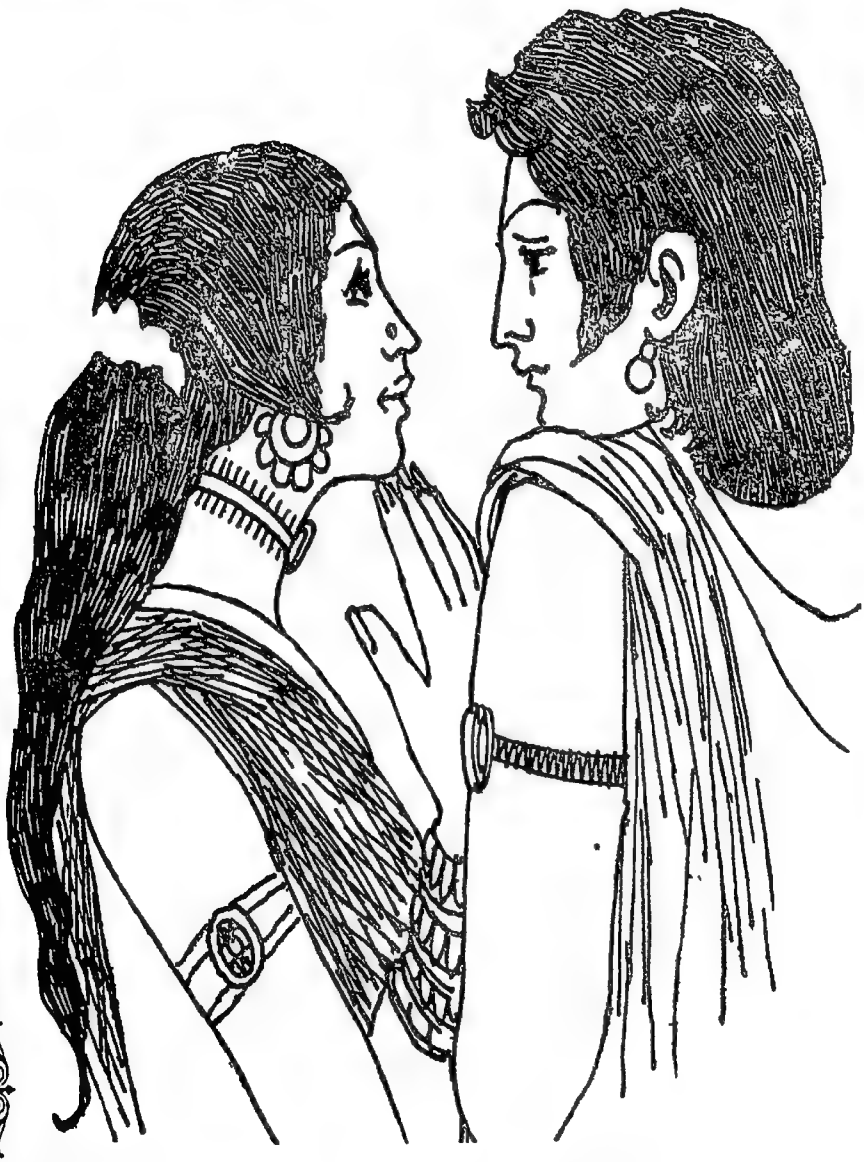

শ্রীকালকর্ণী জাতক

সে অনেককাল আগের কথা। বারাণসীর রাজা তখন ব্রহ্মদত্ত। সেই সময় বোধিসত্ত্ব ছিলেন বণিক। দান-ধ্যান করতেন। বোধিসত্ত্ব একাই যে এ সব পুণ্য কর্ম করতেন তা নয়। তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, চাকরবাকর সবাই ধর্মপথে চলত। এজন্য তাঁদের বাড়ির নাম হয় 'শুচি পরিবার।'

বোধিসত্ত্ব একদিন ভাবলেন, 'অতিথি এলে তো আমার ঘরেই তাঁকে থাকতে দিই। এখন অতিথির চরিত্র যদি আমার চেয়ে শুদ্ধাচারী হয় তাহলে তাঁকে তো এখানে থাকতে দেওয়া ঠিক নয়।' এই ভেবে তিনি বৈঠকখানায় নতুন খাট তোষক পেতে রাখলেন।

ঠিক তখন স্বর্গে বিরূপাক্ষের মেয়ে কালকর্ণী আর ধৃতরাষ্ট্রের মেয়ে স্ত্রী সাঁতার কাটার জন্য এক হ্রদের কাছে গেল। হ্রদের সামনে পৌঁছে দুজনের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল কে আগে স্নান করবে তা নিয়ে। কালকর্ণী বলল, 'আমি জগৎ শাসন করি, আমিই আগে স্নান করব।' স্ত্রী বলল, 'মহাজনদের আমিই ঐশ্বর্য দিয়ে থাকি, সুতরাং আমিই আগে স্নান করব।'

কিছুতেই নিষ্পত্তি হচ্ছে না দেখে তারা ধৃতরাষ্ট্র ও বিরূপাক্ষের কাছে গেল। ধৃতরাষ্ট্র আর বিরূপাক্ষ দুজনেই বললেন বৈশ্রবনের কাছে যেতে। কিন্তু বৈশ্রবনও এর মীমাংসা করতে পারলেন না। তখন তারা শক্রের কাছে গেল।

শক্র ভাবলেন, 'এরা আমারই দুই অনুচরের মেয়ে, তাই আমার বিচার করা উচিত নয়।' তিনি তাদের বললেন, 'বারাণসীতে শুচি-পরিবার নামে এক বণিক পরিবার আছে। তোমরা তার কাছে যাও। তার ঘরে একটি নতুন শয্যা আছে অতিথিদের জন্য। যে সেই শয্যায়

আগে জায়গা পাবে সে-ই আগে স্নান করবে।'

কালকর্ণী সঙ্গে সঙ্গে নীল কাপড় পরে, সারা গায়ে নীল রং মেখে, নীল মণিরত্নের গয়না পড়ে শুচি পরিবার বণিকের বাড়ির কাছে এসে শূন্যে সংস্থান করতে লাগল। তার নীল মালা ফেলতে লাগল বণিকের

বাড়িতে। মাঝরাতে এই কাণ্ড দেখে বোধিসত্ত্ব বেরিয়ে এলেন। এক নজরে তাঁর কালকর্ণীকে পছন্দ হল না। মনে হল কুচ্ছিত দেখতে।

ওখানে কে হে তুমি, বসে আছ?

আমি বিরূপাক্ষের মেয়ে কালকর্ণী।

কি চাও?

তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি।

আগে তোমার স্বভাব চরিত্র জানি একটু, তারপর দেখা যাবে।

কালকর্ণী নিজের সম্পর্কে বলতে লাগল, 'বদরাগী, নিন্দুক ও নিষ্ঠুর লোকেরা আমার খুব প্রিয়।' শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তাহলে এখানে তোমার জায়গা হবে না।'

কালকর্ণী চলে গেলে স্ত্রী এল। সোনার বরণ কাপড়, সোনার অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে এল। তাকে দেখে বোধিসত্ত্ব তার পরিচয় জানতে চাইলেন। স্ত্রী বলল, 'আমি ধৃতরাষ্ট্রের মেয়ে স্ত্রী। তোমার কাছে আশ্রয় চাই।' শুনে বোধিসত্ত্ব কালকর্ণীকে যেমন জিজ্ঞেস করেছিলেন তেমনি স্ত্রীকেও বললেন, 'তোমার স্বভাব চরিত্র না জেনে আমি থাকতে দিতে পারি না।'

স্ত্রী বলল, 'সৎ, পরিশ্রমী, অনিন্দুক, বন্ধুবৎসল ও বিনয়ী লোকেরাই আমার প্রিয়।'

বোধিসত্ত্ব স্ত্রীকে আমন্ত্রণ করে ঘরে নিয়ে এলেন। সেই নতুন শয্যায় স্ত্রীকে শয়ন করতে দিলেন।

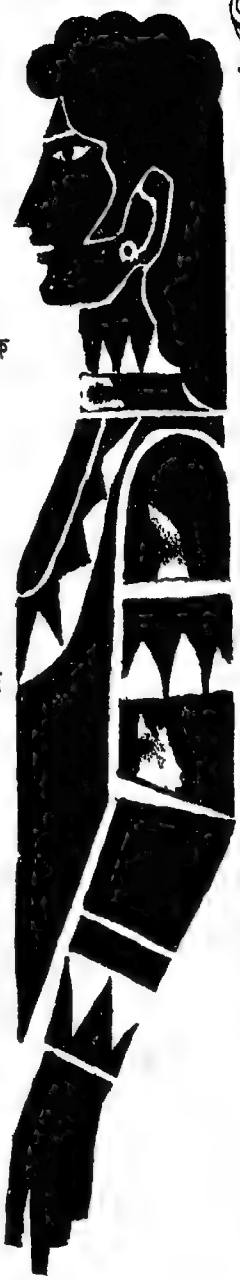

সুবর্ণ কর্কট জাতক

অনেককাল আগে রাজগৃহের পূর্ব দিকে শালিন্দী নামে একটি গ্রাম ছিল। গ্রামটি ব্রাহ্মণদের। বোধিসত্ত্ব সেখানে এক চাষী ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেন। গ্রামের পূর্ব দিকে তিনি অনেকটা জমিতে চাষ করতেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব চাকরবাকর সঙ্গে নিয়ে চাষ করতে গেছেন। লোকজনকে হাল দিতে বলে নিজে হাত মুখ ধোয়ার জন্য একটা ডোবার কাছে গেলেন। ডোবায় সোনালি রঙের একটি কাঁকড়া থাকত। তার স্বভাবটিও খুব সুন্দর। কাঁকড়াটি বোধিসত্ত্বের কাছে চলে এল। বোধিসত্ত্ব তাকে তুলে নিয়ে কাপড়ের মধ্যে রেখে দিলেন।

কাজ শেষ করে ঘরে ফেরার সময় আবার কাঁকড়াটাকে ডোবায় ছেড়ে দিলেন। এ রকম রোজই চলতে লাগল। ফলে দুজনের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব জন্মাল।

বোধিসত্ত্বের চোখদুটি ছিল খুব সুন্দর। যখন তিনি চারাগাছ দেখতে ক্ষেতে আসতেন তখন এক কাকের বৌ তাঁর চোখদুটো দেখত। শেষে সে তার স্বামী কাককে বলল, 'ঐ ব্রাহ্মণের চোখদুটো আমাকে এনে দাও।' কাক বলল, 'কি করে আনব, অসম্ভব। তা ছাড়া ব্রাহ্মণের চোখ দিয়ে তুমি কি করবে?' কাকের বৌ বলল, 'ঐ চোখদুটো খাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়েছে আমার। চোখ না পেলে আমি মারা যাব।' কাক বলল, 'এ আমি পারব না।'

জানি তুমি পারবে না।

তাহলে?

তালগাছের ঐ কেউটে সাপকে বল।

সে কেন আমার কথা শুনবে?

ওকে খুশি করো।

সেই থেকে কাক কেউটের ভজনা শুরু করে দিল। একদিন কেউটে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি চাও?' কাক বলল, 'ঐ ব্রাহ্মণের চোখ।' কেউটে বলল, 'ঠিক আছে, চিন্তা করো না।'

কয়েকদিন পরে কেউটে জমির আলের পাশে লুকিয়ে রইল। বোধিসত্ত্ব এসে প্রথমে ডোবায় হাত-মুখ ধুলেন, তারপর কাঁকড়াকে কোচরে নিলেন। তারপর ক্ষেতের দিকে চললেন।

কেউটে ব্রাহ্মণকে আসতে দেখে বিদ্যুৎগতিতে গিয়ে তাঁর পায়ে কামড় দিল। ব্রাহ্মণ মাটিতে পড়ে গেলেন। সাপ ঝোপে লুকিয়ে পড়ল। বোধিসত্ত্ব পড়ে যাওয়া মাত্র কাঁকড়া বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে কাকও উড়ে এল। কাক এসে বোধিসত্ত্বের চোখের কোটরে ঠোঁট লাগাল, কাঁকড়াও সঙ্গে সঙ্গে কাকের গলা কামড়ে দিল। কাক বিপদে পড়ে সাপকে ডাকতে লাগল। সাপ ফণা তুলে ছুটে এলে কাঁকড়া আরেক দাঁড়া দিয়ে তার গলাও চেপে ধরল।

সাপ তখন জিজ্ঞেস করল, 'ওহে কাঁকড়া, তুমি তো কাক বা সাপের মাংস খাও না। তাহলে ওদের মারতে চাও কেন?' কাঁকড়া বলল, 'ওই ব্রাহ্মণ আমার বন্ধু। তোমরা ষড়যন্ত্র করে এঁকে মেরেছ, সেই জন্যই তোমাদের শেষ করব।'

সাপ তখন কাঁকড়াকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও, দেখি একে বাঁচাতে পারি কিনা।' কাঁকড়া বলল, 'একেবারে ছেড়ে দেব না। ঢিলে দিচ্ছি, আগে বিষ তোল, পরে ছেড়ে দেব।'

সাপ বোধিসত্ত্বের বিষ তুলে ফেলল। কিন্তু কাঁকড়া বলল, 'এরা আমার বন্ধুর শত্রু। সুযোগ পেলেই বন্ধুকে শেষ করবে।' এই ভেবে সে ছুরির মত দাঁতের জোরে দুটোকেই শেষ করল।

শক্তুভস্ত্রা জাতক

একবার বারাণসীতে জনক নামে এক রাজা ছিল। জনকের আমলে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেন। তখন তাঁর নাম হয় সেনক। যথাসময়ে সেনক আচার্যের কাছে শাস্ত্র শিখে সুপণ্ডিত হলেন। তারপর বারাণসীতে ফিরে জনক রাজার সঙ্গে দেখা করলেন। রাজা সেনককে অমাত্য পদে নিয়োগ করলেন।

সেই সময় এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বেরিয়ে এক হাজার টাকা পায়। ব্রাহ্মণ ঐ টাকা আরেক ব্রাহ্মণের কাছে জমা রেখে আবার ভিক্ষায় বেরিয়ে যায়। কিন্তু যার কাছে সে জমা রাখল সেই ব্রাহ্মণ টাকা-গুলো সব খরচ করে ফেলল। ব্রাহ্মণ ফিরে এলে টাকা শোধ করতে না পেরে নিজের মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিয়ে দিয়ে দিল।

এদিকে ব্রাহ্মণের বৌ ছিল অন্য এক ব্রাহ্মণের বাগদত্তা। সে সেই ভাবী স্বামীকে খুব ভালবাসত। বিয়ের পরেও তার কথা সে ভুলতে পারল না। ওদিকে ব্রাহ্মণ বাড়িতে থাকলে তাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করা যাচ্ছে না। সেজন্য ব্রাহ্মণের বৌ একদিন অসুখের ভান করে শুয়ে রইল। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে তোমার?' ব্রাহ্মণী বলল, 'শরীর খারাপ। তোমার সংসারের এত কাজ আমি পেরে উঠি না। ঝি রাখ একটা।'

আমি গরীব ব্রাহ্মণ।

তাতে কি ?

টাকা কোথায়, ঝি রাখব ?

ভিক্ষে করতে যাও দেশে দেশে।

ব্রাহ্মণীর পরামর্শমত ব্রাহ্মণ নানা দেশে ভিক্ষা করতে গেল। ভিক্ষে করে ব্রাহ্মণ সাতশ টাকা পেল। একদিন সে ঘরে ফেরার পথ ধরল। হাঁটতে হাঁটতে খিদেয় ক্লান্ত হয়ে ব্রাহ্মণ ছাতুর থলে খুলে ছাতু খেল। তারপর থলের মুখ বন্ধ করে সামনের এক পুকুরে জল খেতে গেল। একটা কেউটে সাপ ছাতুর লোভে ঐ থলের ভেতর ঢুকে পড়ল। ব্রাহ্মণ ফিরে এসে ভালো করে না দেখেই থলের মুখ বেঁধে ফেলল। আবার হাঁটা শুরু করল।

রাস্তায় এক বৃক্ষ দেবতা গাছের মধ্যে লুকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ব্রাহ্মণ, তুমি যদি মাঝ রাস্তায় জিরোতে যাও তাহলে নিজে মরবে। আর যদি আজই বাড়িতে যাও তাহলে তোমার বৌ মরবে।'

শুনে ব্রাহ্মণ খুব ভয় পেয়ে গেল। দুশ্চিন্তায় সে কাহিল হয়ে পড়ল। পথে দেখল বহু লোক পুণ্য তিথিতে ধর্মকথা শোনার জন্য জনক রাজার অমাত্য সেনক পণ্ডিতের কাছে চলেছে। ব্রাহ্মণ ভাবল, 'সেনক পণ্ডিতের খুব নামডাক আছে। দেখি তিনি যদি আমার দুশ্চিন্তা দূর করতে পারেন।'

সেনকের কাছে ব্রাহ্মণও চলল। তখন সেনককে ঘিরে আছে নগরবাসী অসংখ্য মানুষ। সেনক তাদের ধর্মকথা বলছেন। হঠাৎ সেনকের চোখ গেল ব্রাহ্মণের দিকে। তিনি ব্রাহ্মণের কাছে জানতে চাইলেন, 'তুমি এত শোকার্ত হচ্ছ কেন ?'

তারপর সব শুনে বললেন, 'তোমার ছাতুর থলের মধ্যে কালসাপ ঢুকেছে।' ব্রাহ্মণ থলেটা ফাঁকা জায়গায় রাখল। এক সাপুড়ে সাপটাকে ধরে বনে ছেড়ে দিয়ে এল। তারপর সেনকের সঙ্গে ব্রাহ্মণের এই রকম কথাবার্তা হল :

তোমাকে দূর দেশে ভিক্ষে করতে কে পাঠাল ?

আমার বৌ।

তোমার বৌ তোমাকে ভালবাসে না।

সে কি প্রভু!

সে আর একজনকে ভালোবাসে। তুমি টাকা নিয়ে বাড়িতে ঢুকো না।

ব্রাহ্মণ বাড়ির কাছাকাছি একটা জায়গায় টাকা লুকিয়ে রেখে বাড়িতে ঢুকল। ব্রাহ্মণীর বন্ধুটি তখন ঘরেই ছিল। ব্রাহ্মণকে আসতে দেখে ব্রাহ্মণী তাকে লুকিয়ে রাখল। ব্রাহ্মণী দেখল থলের মধ্যে টাকাকড়ি নেই। সে তখন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করল, 'টাকাকড়ি কিছু পাও নি?' ব্রাহ্মণ তখন তাকে বলল, পেয়েছি, তবে ঐ পেঁপে গাছের তলায় রেখে এসেছি।'

পরের দিন পেঁপে গাছের তলাটা খুঁড়ে ব্রাহ্মণ টাকা পেল না। সে আবার সেনকের কাছে গেল। সেনক জিজ্ঞেস করলেন, 'টাকা কোথায় রেখেছ কাউকে বলেছিলে কি?'

হ্যাঁ প্রভু।

কাকে বলেছিলে?

ব্রাহ্মণীকে।

তাহলে সে তার বন্ধুকে বলে দিয়েছে। বন্ধুটি টাকা নিয়ে গিয়েছে।

এখন উপায় কি প্রভু?

তুমি ব্রাহ্মণীকে বল সাত ব্রাহ্মণ খাওয়াতে।

ব্রাহ্মণ তাই বলল। সেনক তাকে টাকা দিয়েছিলেন খরচ বাবদ। ব্রাহ্মণী সাত ব্রাহ্মণকে নেমন্তন্ন করল। প্রায় দিনের শেষে ব্রাহ্মণ বলল, 'কাল ছ'জনকে বল।' এভাবে শেষ পর্যন্ত বলল, 'কাল শুধু একজনকেই বলবে।' শেষের দিন ব্রাহ্মণীর সেই বন্ধুটিই কেবল খেতে এল।

ব্রাহ্মণ সেনককে গিয়ে সব বৃত্তান্ত জানালেন। সেনক তখন পরপর সাতদিন যে ব্রাহ্মণ খেয়েছে তাকে ডাকিয়ে আনালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এই ব্রাহ্মণের টাকা চুরি করেছ?'

না প্রভু।

সত্যি কথা বল।

না প্রভু।

দেখ, আমি সেনক পণ্ডিত।

আমি নিই নি প্রভু।

বেশ, তাহলে এক্ষুনি ফল পাবে।

সেনকেব ধমকে কাজ হল। সে টাকাটা এনে দিল। স্বীকাব কবল, সে চুবি করেছিল। সেনক ব্রাহ্মণীকে শাস্তি দিলেন। আব সেই চোরকে দিলেন নির্বাসন।

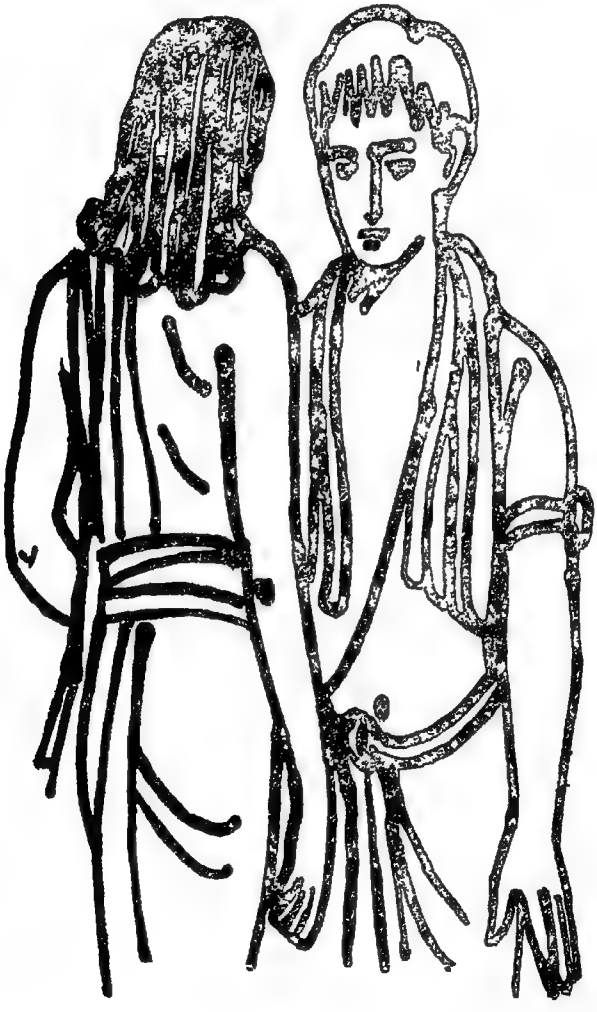

কপি জাতক ৩৬

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব বানরকুলে জন্মেছিলেন। পাঁচশ বানরের তিনি নেতা ছিলেন। থাকতেন রাজার বাগানে। দেবদত্তও তখন বানর জন্ম নিয়েছিল। তার সঙ্গেও পাঁচশ বানর থাকত।

রাজার পুরোহিত একদিন বাগানে গিয়ে স্নান করে গলায় মালা দিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন। এমন সময় একটা দুষ্টু বানর পুরোহিতের মাথায় বিষ্টা ত্যাগ করল। পুরোহিত দেখার জন্য ওপর দিকে তাকাতে বানর তাঁর মুখেও মলত্যাগ করল।

পুরোহিত খুবই রেগে গেলেন। তিনি আবার স্নান করে 'বানরদের বংশ লোপ করব' ভাবতে ভাবতে ফিরে গেলেন।

অন্য বানরেরা বোধিসত্ত্বকে জানাল কি ঘটেছে। বোধিসত্ত্ব তখন তাঁর অনুচরদের বললেন, 'এই জায়গা এখন শত্রুপুরী, আমরা এখানে থাকলে মরতে হবে। চল, বনে যাই।' বোধিসত্ত্বের অনুচররা তাঁর সঙ্গে বনে গেল। কিন্তু অন্য দল ভাবল, 'দেখাই যাক না পুরোহিত কি করেন।'

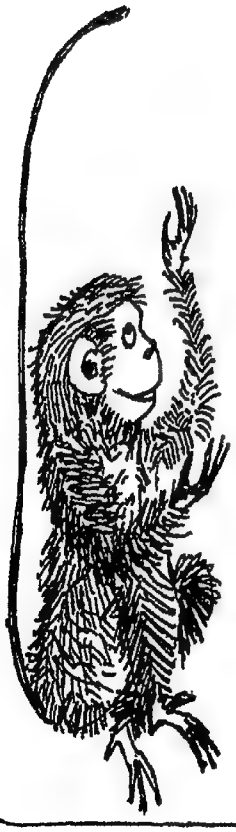

রাজবাড়ির এক দাসী ধান ভানছিল। ধান ভেনে রোদে শুকোতে দিয়েছিল। এমন সময় একটা ছাগল এসে ধান খেতে শুরু করল। দাসী তখন জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে ছাগলকে মারল। এতে ছাগলের সারা শরীর দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। ছাগল হাতিশালের খড়ের ঘেরার গায়ে পিঠ ঘষে আগুন নেভাতে গেল। এতে হাতিশালে আগুন লেগে হাতিদের গায়ে ফোস্কা পড়ল। ফোস্কা থেকে ঘা হল। এই ঘা আর কিছুতেই সারে না।

রাজা তখন পুরোহিতকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রভু, আপনি কি জানেন, কি ওষুধ দিলে হাতিদের ঘা শুকোবে?' পুরোহিত বললেন, 'জানি।'

তাহলে বলুন দয়া করে।

বানরের মাংসের মলমে।

সে কোথায় পাব ?

কেন, আপনার বাগানেই তো শত শত বানর আছে।

তারপর বানর নিধন শুরু হল। সব বানর মারা পড়ল। শুধু একটা বানর তীর খেয়েও কোন রকমে পালিয়ে গেল। সে বোধিসত্ত্বের কাছে এসে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল।

বোধিসত্ত্ব তখন ঐ বানরকে দেখিয়ে সবাইকে শিক্ষা দিলেন। বললেন, 'দেখ, এই বানরের মতই অন্যান্য বানরদের দশা হয়েছে। আমরা বেঁচে গেলাম শুধু শত্রুপুরী ত্যাগ করেছি বলে। যে মূর্খ শুধু সে-ই শত্রুপুরীতে থাকে। পরিণামে মারা যায়।'

মহাকপি জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার বানরকুলে জন্ম নেন। আশি হাজার বানরের তিনিই রাজা। থাকেন হিমালয় অঞ্চলে। সেখানে গঙ্গার ধারে একটি আম গাছ ছিল। তাতে প্রচুর আম হত।

ওই আমগাছের একটা ডাল ছিল গঙ্গার দিকে। বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'এই ডালে আম পাকলে বানরদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না।' সেজন্য তিনি ঐ ডালের আম পাকার আগেই বানরদের বলতেন খেয়ে ফেলতে। একবার কিভাবে যেন একটা আম থেকে যায়।

যথাসময়ে সেই আমটি পাকল। তারপর একদিন নদীর জলে খসে পড়ল। পাকা আমটি ভাসতে ভাসতে চলে এল বারাণসীরাজের স্নানের ঘাটে। রাজা আমটি পেয়ে ভাবলেন, 'এটা কি ফল।' সবাইকে জিজ্ঞেস করেন, কেউ বলতে পারে না। শেষে অমাত্যরা বলল, 'বনবাসীরা বলতে পারবে।' তখন এক বনবাসীকে ডেকে আনা হল। সে বলল, 'মহারাজ, এ হল মধুর আম ফল।'

রাজা সেই আম কেটে প্রথমে বনবাসীকে এক টুকরো খেতে দিলেন। তারপর নিজে খেলেন এবং মহিষীদের খাওয়ালেন। আম খেয়ে রাজার খুবই ভাল লাগল। আরো খাওয়ার ইচ্ছে হল।

বনবাসী, আম গাছ কোথায় আছে?

হিমালয়ে।

তুমি চেন ?

হ্যাঁ।

দেখাতে পারবে ?

পারব মহারাজ।

বনবাসীকে সঙ্গে নিয়ে রাজা সৈন্যসামন্তসমেত হিমালয়ের দিকে রওনা হলেন। অনেকদিন ধরে যেতে লাগলেন। পথ আর ফুরোয় না। শেষে বনবাসী বলল, 'মহারাজ, ঐ যে আম গাছ।'

রাজা তখন তাঁর নৌবহর তীরে বাঁধলেন। অল্প কিছু লোক নিয়ে হেঁটে হেঁটে আমগাছটির তলায় এল। গাছের তলায় সুন্দর বিছানা পাতা হল। সেই বিছানায় বসে রাজা পাকা আম খেলেন। তারপর সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝ রাতে যখন সবাই ঘুমোচ্ছে তখন বানররাজ তাঁর দলবল নিয়ে গাছে আম খেতে এলেন। ডালে ডাল লাগিয়ে বানররা আম খেতে লাগল। ফলে দু-চারটে পাকা আম রাজার গায়ে এসে পড়ল। রাজার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে বানরদের কাণ্ড দেখে রাজা তীরন্দাজদের ডাকলেন।

বানরের দলকে দেখতে পাচ্ছ ?

হ্যাঁ মহারাজ।

গাছটার এরা সর্বনাশ করছে ?

হ্যাঁ।

সব আম শেষ করে দিল ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ।

এরা যখন ফিরে যাবে তখন সব কটাকে শেষ করা চাই।

যথা আজ্ঞা।

তীরন্দাজরা তখন তীরধনুক নিয়ে গাছটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। তা দেখে বানররা ভয়ে কাঁপতে লাগল। বানররাজকে জানাল, 'প্রভু, সর্বনাশ হয়েছে, এরা আমাদের মেরে ফেলবে।' বানররাজ বললেন, 'কোন ভয় নেই, আমি বাঁচাব।'

তাবপব বোধিসত্ত্ব গঙ্গাব দিকের ডালে গেলেন। সেখান থেকে এক লাফে গঙ্গাব ওপাবে বেতবনে পড়লেন। একবার পেছন ফিবে তাকিযে মনে মনে আন্দাজ কবে নিলেন কত দূব লাফিযে এলেন। তাবপর প্রায় ততখানি লম্বা একটা বেত গাছ কোমরে বেঁধে আবার লাফ দিলেন। বানররাজ গাছের মূল ডালে পডতে পারলেন না। গঙ্গার ওপর ঝুলন্ত শাখা ধরে ঝুলতে লাগলেন, আর বানরদের হাত নেড়ে ইশারা কবলেন। বানররা তাঁর পিঠে ভর দিয়ে বেত বেয়ে ওপারে চলে গেল। দেবদত্তও তখন বানব ছিল। কিন্তু সে যাওয়ার সময বোধিসত্ত্বের পিঠে এমন আঘাত করে গেল যে তাঁর হৃৎপিণ্ড ফেটে যাওয়ার মত হল।

সবাই চলে গেলেও বানররাজের আর নড়বার শক্তি নেই।

তিনি গাছেই রয়ে গেলেন। বাজা জেগে ছিলেন। সব কিছু নিজেব চোখে দেখে তিনি স্তম্ভিত হলেন। মনে মনে ভাবলেন, 'মানুষ তাব স্বজাতির জন্য যা না কবে, ওই সামান্য বানর তা-ই করল।'

সকালবেলা রাজা লোক লাগিয়ে বানররাজকে সযত্নে নামিযে আনলেন। তার পিঠে ওষুধ লাগিযে দিলেন। সুন্দর সুন্দর খাবার খেতে দিলেন। তারপর বানরবাজের পাযের কাছে বসে বললেন, 'আপনি সামান্য বানর নন। যা কবলেন অবিশ্বাস্য।'

এ আমার কর্তব্য।

কেন?

আমি বাজা, ওবা আমার প্রজা।

নিজেব জীবন তুচ্ছ কবেও?

বাজার কাছে প্রজাব মঙ্গল সাধনই বড় কর্তব্য।

এভাবে বাজা বানররাজেব কাছে রাজধর্ম বিষয়ে শিক্ষা লাভ কবলেন। কিছুক্ষণ পবে বানবরাজ দেহত্যাগ করলেন। রাজা খুব ঘটা কবে বানববাজের দাহ ও পাবলৌকিক কাজ সমাধা করলেন। তারপব বানবরাজের অস্থি নগরীতে নিযে এলেন। সেই অস্থি স্থাপন কবে বিশাল এক চৈত্য গডা হল। বাজা সেখানে প্রতিদিন অর্ঘ্য দিতে যেতেন।

কুম্ভকার জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার কুমার বংশে জন্ম নেন। বড় হয়ে যথাসময়ে তিনি ঘর সংসার শুরু করেন। তাঁর একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হল। এ ঘটনা বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ের।

কলিঙ্গরাজ্যে দন্তপুর নগরে তখন কুরুণ্ডু নামে এক রাজা ছিলেন। একদিন রাজা কুরুণ্ডু অনেক লোকজন সঙ্গে নিয়ে বাগানে গেলেন। সেখানে একটি বিশাল আমগাছ ছিল। তাতে এত ফল ধরেছিল যে গাছটি ফলের ভারে নত হয়ে ছিল। রাজা হাতির পিঠে বসেই হাত দিয়ে কিছু আম পেড়ে নিলেন। রাজার দেখাদেখি তাঁর লোকজনও আম পাড়তে লাগল। সকলে মিলে গাছের সমস্ত আম পেড়েছিল। শুধু তাই নয়, তাদের দাপটে অত সুন্দর গাছটার শ্রী পর্যন্ত নষ্ট হল।

সারাদিন বাগানে ঘুরে বেরিয়ে ফেরার সময় রাজা কুরুণ্ডু আবার আম গাছটাকে দেখলেন। এখন আর তার আগের সেই শ্যামল শোভা নেই। একটু দূরেই একটা বাঁজা আমগাছ ছিল। রাজা দেখলেন সেই গাছটির কোন ক্ষতি হয় নি। বরং তাকেই এখন সুন্দর দেখাচ্ছে। এই দৃশ্য রাজার কাছে এক দারুণ তত্ত্বজ্ঞান বয়ে আনল।

রাজা সিদ্ধান্ত করলেন, গার্হস্থ্য জীবনও ফলদায়ী বৃক্ষের মত। যে ধনবান ভয় তারই। নির্ধনের কোন ভয় নেই। রাজা সেই বিনষ্ট গাছের মূলে বসে ধ্যান করতে লাগলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন, 'আর গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে যাব না।'

রাজার অনুচররা তার খোঁজ করতে করতে সেখানে হাজির হল। তারা রাজাকে ফিরে যেতে বলল। রাজা বললেন, 'আমি তপস্বী হয়েছি।'

কিন্তু আপনার মধ্যে তপস্বীর চিহ্নমাত্র নেই।

তপস্বীর চিহ্ন কি রকম?

মুণ্ডিত মস্তক, পীত বস্ত্রধারী হোন।

রাজা তখন তাঁর হাতটি একবার মাথায় বুলিয়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথা থেকে সমস্ত চুল গায়ে পড়ল। নিজের পোশাকে হাত বোলালেন। সঙ্গে সঙ্গে পোশাকটিও পীতবস্ত্র হল। রাজা মুহূর্তের মধ্যে শূন্যে উঠে গেলেন। মধ্য আকাশে বসে অনুচরদের ধর্মজ্ঞান শিক্ষা দিলেন।

গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নামে একটি নগর ছিল। সেখানে নগগজি নামে এক রাজা ছিলেন। একদিন নগগজি প্রাসাদে গিয়ে পালঙ্কের মধ্যে আধশোয়া হয়ে আরাম করতে করতে দেখতে পেলেন দূরে এক পরিচারিকা বাটনা বাঁটছে। তার দু হাতে অনেকগুলি বালা। বালাগুলোর সংঘর্ষ হচ্ছে বলে শব্দ উঠছে। কাজের সুবিধের জন্য পরিচারিকা বালাগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল। তখন আর শব্দ হচ্ছিল না। কিন্তু যেই তারা পরস্পরের কাছাকাছি আসছে তখনি সংঘর্ষ হচ্ছে, আর ঝঙ্কারও শোনা যাচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখে রাজা ভাবলেন আমি ঐ রকম এক বলয়ের (বালাব) মত হব। অন্য লোককে শাসন না করে, নিজেকে শাসন কবব। আত্ম-শাসনে মন দেব। রাজা এই সিদ্ধান্ত ভুললেন না। সত্যি সত্যি রাজ্য ত্যাগ করলেন। আগের গল্পটিতে যা ঘটেছে, এ গল্পেও তাই ঘটল। রাজা তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ কবলেন।

বিদেহ রাজ্যের মিথিলা নগরে নিমি নামে এক রাজা থাকতেন। একদিন সকালবেলা রাজা জলখাবাব খেয়ে জানালার ধারে বসেছিলেন। এমন সময় দেখলেন একটা বাজপাখি মাংসের দোকান থেকে একটুকরো মাংস ছোঁ মেবে নিয়ে উড়ে চলে গেল। তার পিছু পিছু ধাওয়া করে গেল আরো অনেকগুলো বাজপাখি। তারা প্রথম পাখিটাকে ঠোকরাতে শুরু করল। সে প্রাণ বাঁচাতে মাংসের টুকরোটা ফেলে দিল। আবেকটা বাজ যেই সেই মাংসেব টুকবো তুলে নিযেছে তখন অন্যান্য পাখি তাকেই আক্রমণ করল। এভাবে অনেক পাখিই পালা কবে আহত হল।

রাজা পাখিদেব এই কাণ্ড দেখে মনে মনে ভাবলেন, মাংসেব টুকরোটাই বিপদের মূল, যে সেটা ত্যাগ করছে সে-ই নিরাপদ হচ্ছে। যে গ্রহণ করছে তাকেই কষ্ট পেতে হচ্ছে। রাজা দিব্যচক্ষুতে দেখতে পেলেন সংসাব-বাজত্ব সবই ঐ মাংসেব টুকরো। যে এব মধ্যে থাকবে তাব কষ্টেব শেষ নেই। রাজা এই তত্ত্বজ্ঞানেই ডুবে বইলেন। সংসার ত্যাগ কবে প্রব্রজ্যা নিলেন।

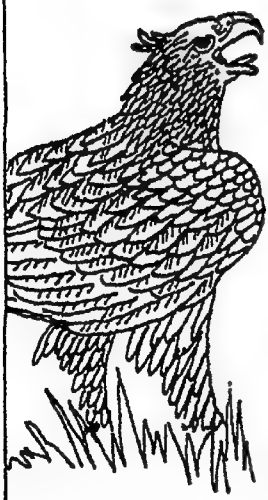

উত্তব পাঞ্চাল বাজ্যে কাম্পিল্য নামে একটি নগব ছিল। সেখানকাব বাজাব নাম দুর্মুখ। একদিন বাজা সকালবেলা জলখাবাব খেযে অনুচবদেব সঙ্গে নিযে জানালাব ধাবে বসে গল্পগুজব কবছিলেন। এমন সময় দেখলেন গোশালা থেকে একটা ষাঁড় ছুটে যাচ্ছে, তাকে তাড়া কবছে আবেকটা ষাঁড়। ষাঁড় দুটো লড়াই করে চোখেব সামনে মরে গেল।

বাজা এই দৃশ্য দেখে এক তত্ত্বজ্ঞান লাভ কবলেন। হিংসার অর্থ বিনাশ। সংসাব হিংসামুক্ত নয়। সুতবাং সংসারে থাকা মানেই হিংসার মধ্যে থাকা। বাজা সংসার ত্যাগ কবলেন। তপস্বী হয়ে বাকি

জীবন কাটাতে লাগলেন।

এই চার তপস্বী একবার নন্দমূল গুহা থেকে বেরিয়ে তপস্যাবলে সকালে উড়ে চলে এলেন সেই গ্রামে যেখানে বোধিসত্ত্ব থাকতেন। তারা বোধিসত্ত্বের বাড়িতে এসে ভিক্ষা চাইলেন। বোধিসত্ত্ব তপস্বীদের ভিক্ষা দিলেন। তাঁদের যত্নআত্তি করলেন। আর জানতে চাইলেন, কিভাবে তাঁরা তপস্বী হলেন। তপস্বীদের বিবরণ শুনে তিনি ভাবলেন,

এঁরা রাজা হয়েও যখন রাজত্ব ত্যাগ করে তপস্বী হতে পেরেছেন তখন মজুর খেটেই জীবিকা নির্বাহ করে আমিই বা সময় নষ্ট করি কেন?

বোধিসত্ত্ব তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি ছেলে দুটিকে বড় কর। আমি আর সংসারে থাকতে চাই না। আমি তপস্বী হব।' কিন্তু এ কথা শুনে তাঁর স্ত্রী বলল, 'স্বামী, আমারও সংসারধর্মে বাসনা নেই।' বোধিসত্ত্ব তখন আর কোন কথা বললেন না। ওদিকে তাঁর স্ত্রী জল আনার অছিলায় কলসী নিয়ে বেরিয়ে গেল। তপস্বীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সে তপস্বিনী হল।

বোধিসত্ত্ব অনেকটা সময় অপেক্ষা করেও যখন দেখলেন স্ত্রী

ফিরছে না, তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। কিন্তু ছেলে দুটিকে ছেড়ে যাওয়া অনুচিত মনে করলেন। ক্রমে ছেলেদুটি বড় হল। বোধিসত্ত্ব তখন ইচ্ছে করে একেক দিন একেক রকম ভাবে ভাত রান্না করতেন। কোনদিন ভাত আলুনি করতেন। কোনদিন বা গলিয়ে ফেলতেন। ছেলেরা ভাত খেয়ে বলত, 'বাবা, ভাতে আজ নুন হয়নি।' 'আজ বড্ড ফুটে গেছে।' বোধিসত্ত্ব বুঝলেন, 'এরা বুঝতে শিখেছে, এখন নিজেদের রক্ষা করতে পারবে।' তিনিও এবার তপস্বী হলেন।

পরে একবার তাঁর সঙ্গে এক তপস্বিনীর দেখা হয়। তপস্বিনী তাঁকে বলে, 'মহারাজ, আপনি কি ছেলেদুটোকে মেরে ফেলেছেন।' বোধিসত্ত্ব তখন তাকে যা যা ঘটেছে খুলে বললেন। তারপর এ কথাও বললেন, 'অধ্যাত্ম-সুখের জন্য ঐ শিশুদের ত্যাগ করা ঠিক হয় নি।' এর পর তাঁদের দুজনের মধ্যে আর কখনও কথা হয় নি।

উট জাতক

অনেককাল আগে বারাণসীতে দৃঢ়ধর্মা নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব ছিলেন তাঁর অমাত্য।

রাজার একটি দারুণ শক্তিশালী উট ছিল। যুদ্ধের সময় সে শত্রুশিবিরে ঢুকে শিবির তছনছ করে দিত। রাজার চিঠি গলায় বেঁধে নিয়ে দূর দূরান্তে যেত। আবার রাজার জন্য চিঠি বয়ে আনত। রাজা উটটাকে খুব ভালবাসতেন। আদর যত্ন করতেন। ভাল ভাল

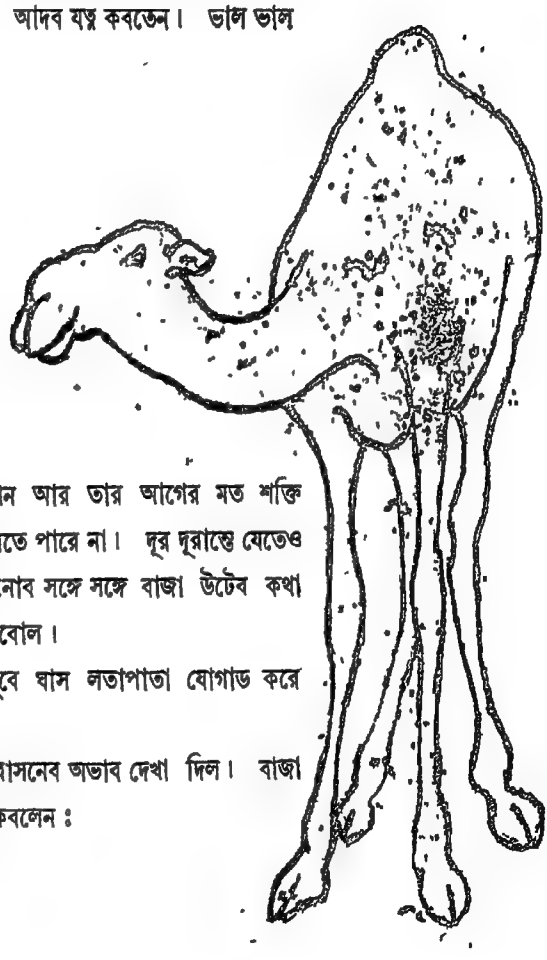

খাবার খেতে দিতেন।

ক্রমে উটের বয়স হল। এখন আর তার আগের মত শক্তি নেই। শত্রুর সঙ্গে সে লড়াই করতে পারে না। দূর দূরান্তে যেতেও সে অক্ষম। উটের প্রয়োজন ফুরনোর সঙ্গে সঙ্গে রাজা উটের কথা ভুলে গেলেন। উটেরও সুদিন ফুরোল।

উটটি তখন থেকে বনে বনে ঘুরে ঘাস লতাপাতা যোগাড় করে খায়। মনের দুঃখে থাকে।

একদিন রাজবাড়িতে মাটির বাসনের অভাব দেখা দিল। রাজা কুমোরকে ডাকিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলেন :

মাটির বাসন দিচ্ছ না কেন?

মহাশয়, গোবর পাচ্ছি না।

কেন?

গোবর আনার জন্য অনেকটা দূর যেতে হবে।

তা যাও না কেন?

গাড়িতে যাওয়ার মত গোরু নেই।

তখন রাজার আবার সেই উটের কথা মনে পড়ল। অনুচরদের বললেন, 'সেই উটটা কোথায়? ওটাকে ধরে আন।' অনুচর উটটাকে টানতে টানতে নিয়ে এল। রাজা কুমোরকে সেই উটটা দান করলেন।

বেচারা উটের আরো দুর্দিন এল। তার শক্তি নেই, অথচ খাটতে হচ্ছে খুব। এ রকম সময়ে একদিন সে দেখল বোধিসত্ত্ব আসছেন। উট তাঁর পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল। তারপর বলল, 'প্রভু, আপনি তো জানেন এককালে আমি মহারাজের কত কাজ করেছি, কিন্তু এখন আমার অবস্থা দেখুন। আপনি দয়া করে রাজাকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিন। এমন করুন যাতে বুড়ো বয়সে আমি একটু আরামে থাকতে পারি।'

বোধিসত্ত্ব রাজসভায় এসে রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আমাদের সেই চমৎকার উটটি কোথায় গেল।' রাজা বললেন, 'ওটা কুমোরকে দিয়ে দিয়েছি।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজের নিশ্চয়ই মনে আছে সেবার উটটি শত্রু শিবির তছনছ করেছিল। আরেকবার সে-ই মুখে করে আপনার জন্য একটি চিঠি এনেছিল,' রাজা বললেন, 'বিলক্ষণ মনে আছে।' বোধিসত্ত্ব তখন বললেন, 'না মহারাজ, আপনার মনে নেই।' রাজা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, 'কেন এ কথা বলছেন।'

বোধিসত্ত্ব তখন উটের কথা রাজাকে বললেন। অনুরোধ করলেন উটটিকে যত্ন করতে।

এরপর উটটির বুড়ো বয়স বেশ আরামেই কেটেছিল।

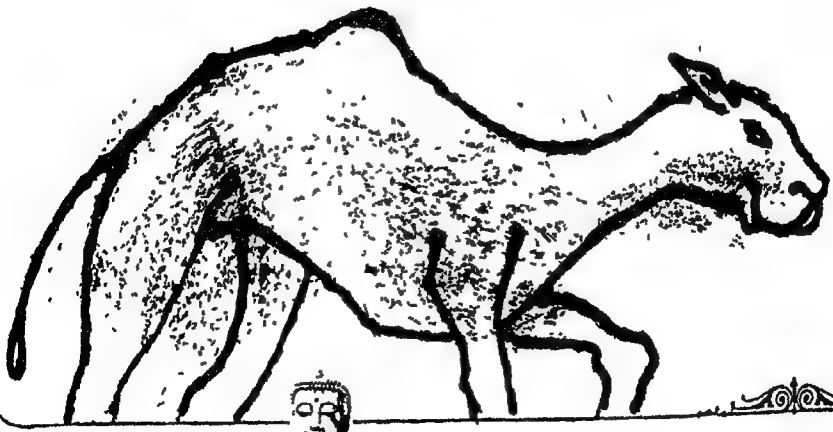

গাছ জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার বৃক্ষ দেবতা হয়ে জন্মান। এক বনে তিনি শান্তিতে গাছের মধ্যে বাস করতেন।

একবার এক বিরাট বাজ সমুদ্রের ভিতর থেকে নাগরাজের লেজ ধরে টেনে ডাঙ্গায় তোলে। নাগরাজ তখন শিকার করছিল। তার মুখে খাবার। সে তখনও খাবার গিলতে পারে নি। বাজ এমন ভাবে নাগরাজের গলায় ধাক্কা দিল যে বমির বেগে নাগরাজের মুখ থেকে খাবারটা বেরিয়ে গেল।

নাগরাজও সামান্য নয়। সে খাবার জন্য এক অশ্বত্থ গাছের কোটরে নিজের মাথাটা ঢুকিয়ে সারা শরীর দিয়ে গাছটাকে পেঁচিয়ে ধরল। ওদিক অতিকায় বাজও ছাড়ার পাত্র নয়। সে গাছটা সমেত নাগরাজকে টানতে লাগল। গাছ উপড়ে পড়ল। বাজ আমগাছ সমেত নাগরাজকে নিয়ে আরেকটা গাছের ওপর বসল। সাপটার পেট চিরে মাংস খেল বাজ। তারপর সাপের কঙ্কাল সমুদ্রে ফেলে দিল।

ঐ ওপরানো গাছে একটা পাখি বসে ছিল। সে তখন ভয় পেয়ে

পাশের একটা গাছে গিয়ে বসল। পাখিটা গাছে বসায় গাছ খুব ভয় পেল। কেননা পাখিটা অশ্বত্থ ফল খেয়েছে। এখন যদি পাখিটা গাছে বসে মলত্যাগ করে তাহলে এই গাছেই পরগাছা হিসেবে অশ্বত্থ জন্মাবে। যার পরিণামে গাছটা মারা পড়বে ভয়ে গাছটা কাঁপতে লাগল।

গাছটাকে কাঁপতে দেখে বাজ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কাঁপছ কেন?'

ভয়ে।

কিসের ভয়?

এই পাখিটা যদি মলত্যাগ করে।

তা থেকে অশ্বত্থ জন্মাবে বলে?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে, আমি পাখিটাকে তাড়াচ্ছি।

এই বলে বাজ পাখিটাকে তাড়া করল। পাখি সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল। বৃক্ষদেবতা বোধিসত্ত্বও বিপন্মুক্ত হলেন। বাজ তখন বোধিসত্ত্বের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করল।

ধোঁয়া জাতক

অনেককাল আগে কুরুরাজ্যের ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে যুধিষ্ঠিরের বংশের এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর নাম ধনঞ্জয়। বোধিসত্ত্ব তখন ঐ রাজ্যে জন্ম নেন। বয়সকালে সুপণ্ডিত হয়ে তিনি রাজা ধনঞ্জয়ের পুরোহিত হন। তখন তাঁর নাম হয় বিদুর পণ্ডিত।

রাজা ধনঞ্জয় নিজের সৈন্যদের তেমন খাতির করতেন না। কিন্তু বাইরে থেকে যারা আসত তাদের খুব খাতির করতেন। একদিন দূরের গ্রামবাসীরা বিদ্রোহ করল। বিদ্রোহ দমন করার জন্য রাজা সৈন্য পাঠালেন। কিন্তু সৈন্যরা যুদ্ধ করল না। বাইরে থেকে যারা এসেছিল তারাও রাজার হয়ে যুদ্ধ করল না। রাজার নিজের সৈন্যরা ভাবল, 'বাইরে থেকে আসা রাজার পেয়ারের লোকেরা লড়াই করুক।' আবার বহিরাগতরা ভাবল, 'আমাদের কি দরকার, রাজার সৈন্যরা লড়ুক।'

ফলে রাজা গেলেন হেরে। তখন রাজা ভাবলেন, কেন এমন হল, বিদুর পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করে দেখা যাক। রাজা বিদুরকে জিজ্ঞেস করায় বিদুর তাঁকে একটি গল্প বললেন। গল্পটি এ রকম :

ধূমকারি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। এক পাল ছাগল নিয়ে সে বনের মধ্যে থাকত। রোজ রোজ আগুন জ্বেলে ধোঁয়া তৈরি করত, যাতে হিংস্র পশুরা ছাগলদের না খেতে পারে। আর নিজে ছাগলের দুধ দিয়ে ক্ষীর তৈরি করে খেত।

একদিন কতকগুলো সাদা ভেড়া দেখে ব্রাহ্মণের খুব পছন্দ হল। সে ভেড়াগুলোকে খাতির করতে শুরু করল। ছাগলদের কথা একদম ভুলে গেল। এভাবে দিন যেতে লাগল।

ভেড়াগুলো ছিল বুনো। আর তাদের বাসস্থান হল হিমালয়। শীতকালে ঐ বন ছেড়ে এক রাতে ভেড়ার পাল হিমালয়ে ফিরে গেল।

ওদিকে ততদিনে ছাগলের পাল নষ্ট হয়েছে। ব্রাহ্মণ খুবই দুঃখ পেল। এভাবে প্রকৃত বন্ধুকে অনাদর ও অচেনা লোককে খাতির করে আনার ফলেই তার কষ্ট বেড়েছে।

যব জাতক

একবার বোধিসত্ত্ব খুব গরীব ঘরে জন্মান। বড় হয়ে তাঁকে দিন-মজুরি করতে হত। একদিন কাজ করতে যাওয়ার সময় খুব খিদে পেল তাঁর। তখন তাঁর কাছে মাত্র একটা পয়সা ছিল। তিনি এক পয়সা দিয়ে চারটে যবের ডেলা (সিদ্ধ যবের ডেলা) কিনলেন।

কিন্তু খাওয়ার আগেই দেখলেন চারজন তপস্বী ভিক্ষে করতে বসেছেন। বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, এই মহাপুরুষদের যদি আমি যব পিণ্ড খেতে দিই তাহলে আমার মঙ্গল হবে। হয়ত ভবিষ্যৎ-জন্মে আমাকে আর গরীব ঘরে জন্মাতে হবে না।

চার তপস্বীকে খুব সমাদর করে তিনি বসালেন। তারপর শ্রদ্ধাভরে তাঁদের যব পিণ্ড খেতে দিলেন। তপস্বীরা তাঁর ব্যবহারে খুবই তৃপ্ত হলেন। তাঁরা তাঁকে বর দিলেন। তারপর আকাশপথে ফিরে গেলেন।

বোধিসত্ত্ব অতি কষ্টে সেই দরিদ্র জীবন কাটালেন। কিন্তু সর্বক্ষণ তাঁর মনে পড়ত ঐ চার তপস্বীর কথা। ভাবতেন, পরজন্মে তাঁর জীবন সুন্দর হবে। এসব বিষয় মনে মনে ভাবতে ভাবতে তাঁর দরিদ্র জন্ম একদিন শেষ হল।

পরজন্মে বোধিসত্ত্ব রাজপরিবারে রাজার ছেলে হয়ে জন্মান। তখন তাঁর নাম হল প্রসেনজিৎকুমার।

রাজা হয়ে বোধিসত্ত্ব কোশল রাজার মেয়েকে বিয়ে করলেন। তাঁর রাজ্যে শান্তির অন্ত নেই, সম্পদের শেষ নেই। রাজ্যের এই শ্রী, নিজের সৌভাগ্য ইত্যাদি লক্ষ্য করলেই বোধিসত্ত্বের পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যেত। সেই তপস্বীদের কথা মনে পড়ত। তাঁদের যব খেতে দিয়েছিলেন বলেই আজ তাঁর এত সম্পদ। এইসব ভাবতে ভাবতে বোধিসত্ত্ব একটা পদ্য বলতেন।

রাণী প্রায়ই এই পদ্যটা শুনত, কিন্তু তার মানে বুঝতে পারত না। রাণীর ওপর খুশি হয়ে বোধিসত্ত্ব একদিন তাকে একটা উপহার দিতে

চাইলেন। রাণী তখন বলল, 'প্রভু, আমার অন্য কোন উপহার চাই না, আপনার ঐ পদ্যটার মানে আমাকে বুঝিয়ে দিন।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ঠিক আছে বলব। তবে একা তোমাকে নয়, রাজসভায় সকলের সামনে বলব।'

সকলের সামনে রাজসভায় বসে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমি আগের জন্মে নিতান্ত গরীব ছিলাম। একবার চারজন তপস্বীকে নিজের মুখের খাবার যবের ডেলা তুলে দিয়েছিলাম। তাঁদের আশীর্বাদেই আমি আজ রাজা হয়েছি। পদ্যটির সার কথা হল এই।' শুনে রাণীও সর্বসমক্ষে বলল, 'আমিও গরীব ঘরে জন্মেছিলাম আগের জন্মে। কিন্তু তপস্বীদের তুষ্ট করেছিলাম, তাই আজ রাণী হয়েছি।'

এরপর তাঁরা একযোগে দান-ধ্যানে মন দিলেন। নিয়মবিধি মেনে রাজ্য পরিচালনা করলেন। কালক্রমে তাঁদের জীবন অন্ত হলে তাঁরা স্বর্গে গেলেন।

অষ্টশব্দ জাতক

পুরাকালে একবার বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেন। বয়সকালে শাস্ত্র শিক্ষা ভালভাবে শেষ করলেন। তারপর তাঁর বাবা-মার মৃত্যু হল। তাঁরা অনেক সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। বোধিসত্ত্ব সমস্ত সম্পত্তি দানব্রত পালন করে শেষ করলেন। তারপর হিমালয় অঞ্চলে তপস্যা করতে চলে গেলেন। সেখানে দীর্ঘকাল তপস্যার পর তিনি টক আর নুন যোগাড় করার জন্য আবার বারাণসীতে এলেন।

বারাণসীরাজ একদিন পালঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। তখন ভোর হয়ে আসছে। রাজা তখন পর পর আটটি শব্দ শুনতে পেলেন—প্রথমে একটা বক, তারপর কাক, তারপর ঘুন, পোষা কোকিল, পোষা হরিণ, বানর এবং সপ্তম শব্দটি পোষা কিন্নরের। অষ্টম শব্দটি এক তপস্বীর।

এতগুলি শব্দ শুনে রাজা অমঙ্গলের ভয়ে কাতর হলেন। পরের দিনই রাজপুরোহিতকে ডেকে সব খুলে বললেন। পুরোহিত বিচার করে বলল, 'মহারাজ, সামনে বিপদ আসছে।'

কি করব তাহলে?

ভয় নেই, যজ্ঞ করতে হবে।

কিসেব যজ্ঞ ?

সর্বচতুষ্ক যজ্ঞ।

ঐ রাজ্যে এক তরুণ ব্রাহ্মণ ছিল। সে সর্বচতুষ্ক যজ্ঞেব কথা শুনে আতঙ্কিত হল। কেননা তাতে অকাবণে প্রাণী বধ কবা হয। সে পুবোহিতদের অনেক অনুবোধ কবল, 'এতগুলো প্রাণীকে অযথা বধ কববেন না।' পুবোহিত বলল, 'দেখ, এই যজ্ঞে যদি বিপদ না-ও কাটে আমবা অন্তত দুদিন পেট ভবে মাংস খেতে পাবব।'

তরুণ ব্রাহ্মণ তখন দুঃখিত মনে ফিবে চলল। সে সত্যিকাবেব ধার্মিক তপস্বীব খোঁজ কবতে লাগল। বাজাব বাগানে সে বোধিসত্ত্বেব দেখা পেল। তরুণ ব্রাহ্মণ তাঁকে অনুবোধ কবল : 'প্রভু, আপনি প্রাণীদেব বক্ষা করুন।'

কি হযেছে বাবা ?

বাজা প্রাণীবধ যজ্ঞ কববেন।

তাবপব সে যা যা ঘটেছে সবই বোধিসত্ত্বকে খুলে বলল। বোধিসত্ত্ব বললেন রাজাকে নিযে আসতে। তিনি বাজাকে বলে দেবেন আট বকম শব্দেব আসল মানে কি।

তরুণ ব্রাহ্মণ বাজাকে খবব দিতেই বাজা ছুটে এলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁকে বললেন, 'এতে আপনাব কোন বিপদেব সম্ভাবনা নেই। ববং আমি বলছি এতে আপনাব মঙ্গল হবে।'

বোধিসত্ত্ব তখন বললেন বক শব্দ কবেছে খিদেয, কাক শব্দ কবেছে হস্তিশালায মাহুতেব অত্যাচাবে, ঘুনকীটটা বুড়ো হযেছে —তাব খাওযাব শক্তি পর্যন্ত নেই, সে শব্দ কবেছে কাঠে বন্দী আছে বলে, কোকিলটি বনে যেতে চায, বানব, কিন্নব এবাও মুক্তি চায। শেষ শব্দটি এক তপস্বীর, মুক্তিব আনন্দে তিনি শব্দ কবেছেন।

বাজা পশুপাখিদেব মুক্ত কবে দিলেন। বোধিসত্ত্বেব কাছে ধর্মকথা শুনলেন। প্রাণী হত্যা বন্ধ কবে দিলেন।

সুলসা জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে সুলসা নামে এক সুন্দরী গায়িকা ছিল বারাণসীতে। সে গান গেয়ে রোজগার করত। তার গলা এত সুরেলা ছিল যে সুলসার বাড়িতে গানের জলসা শুনতে রোজ ভিড়

হতো। সুলসা একেক রাতে হাজার হাজার টাকা আয় করত।

সেই সময় বারাণসীতে দারুণ শক্তিশালী এক চোর ছিল। তার নাম শক্তুক। শক্তুকের চুরির ঠেলায় রাজ্যের লোক অস্থির হয়ে পড়ল। তারা রাজার কাছে রোজ নালিশ করতে লাগল। ব্রহ্মদত্ত তখন নগরের চারদিকে কড়া পাহারা বসালেন। শক্তুক ধরা পড়ল।

বিচারে ঠিক হল এই চোরকে ফাঁসি দেওয়া হবে। শক্তুককে যখন জল্লাদ বেঁধে নিয়ে চলেছে সুলসা জানলা দিয়ে তাকে দেখতে পেল। শক্তুকের অত সুন্দর শরীর দেখে সুলসার মায়া হল। সে ভাবল, 'আহা, বেচারার এত সুন্দর শরীর এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে।' সুলসা ঠিক করল যেভাবে হোক চোরটাকে বাঁচাবে। সে তখন জল্লাদকে ঘুস দিয়ে এমন ব্যবস্থা করল যে শক্তুক রক্ষা পেল।

এরপর থেকে ঐ চোর সুলসার বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকতে

লাগল। সুলসা তাকে ভাল খাবার-দাবার পোশাক-আসাক দিয়ে খুবই যত্ন করল। কিন্তু শক্তুক ভাবল, 'আর এখানে নয়। কিন্তু এখান থেকে খালি হাতে গেলে না খেয়ে মরতে হবে।' সে তখন ফন্দি করল সুলসার গয়না টাকাকড়ি চুরি করবে।

শক্তুক একদিন সুলসাকে বলল, 'আমাকে একটু যেতে হবে। আমি মানত করেছিলাম বৃক্ষ দেবতার পুজো দেব।' সুলসা বায়না ধরল সে-ও যাবে। তারপর সুলসা প্রচুর গয়না পরে শক্তুকের সঙ্গে রওনা দিল। লোকজন ও পুজোর নৈবেদ্য ইত্যাদি নিয়ে তারা এক বনের কাছে গেল। তারপর শক্তুক বলল, 'লোকজনের আমার আর দরকার নেই। ওরা ওখানে থাকুক। পুজো দিতে আমরা পাহাড়ে উঠি চল।'

পাহাড়ে উঠে শক্তুক ভিন্ন মূর্তি ধারণ করল। সে বলল, 'সুলসা, পুজোটুজো বাজে কথা। আমি তোমাকে খুন করব বলেই এখানে এনেছি।' সুলসা খুব তার হাত-পা ধরল। কিন্তু শক্তুকের সেই এক কথা। তখন সুলসা বলল, 'মরার আগে আমি তোমাকে চারদিক থেকে প্রণাম করে নিই তাহলে। আমি তো তোমাকে ভাল-বেসেছি। তুমি বাসো আর না বাসো।'

এই বলে সে শক্তুককে প্রণাম করতে শুরু করল। সামনে আর দু পাশে প্রণাম সারা হলে সে পেছন দিকে গেল। আগেই দেখে রেখেছিল সামনে আছে বিশাল খাদ। প্রণাম করার অছিলায়

সে শক্তুককে সে প্রাণপণে ধাক্কা দিল। শক্তুক খাদে গিয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

সুলসাকে একা ফিরে আসতে দেখে তার লোকজন জিজ্ঞেস করল, 'প্রভু, শক্তুক কোথায়।' এর জবাবে সুলসা বলল, 'ওর কথা আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না।'

সুমঙ্গল জাতক

অতীতকালে একবাব বোধিসত্ত্ব বারাণসীবাজ হন। তখন সুমঙ্গল নামে তাঁব এক সাথী ছিল।

একদিন হিমালয় অঞ্চল থেকে এক তাপস এলেন বারাণসীতে। রাজা তাঁকে দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি তাপসকে অনুরোধ করলেন রাজার বাগানে থেকে যেতে। বিশেষ করে যতদিন বাবাণসীতে থাকবেন। তাপস বাজি হল। তাপস সেই বনে থাকেন। বাজাব বাড়িতে গিযে খেযে আসেন। সুমঙ্গলেব সঙ্গে তাঁব বেশ ভাব হল।

একদিন তাপস সুমঙ্গলকে বললেন, 'বৎস, আমি অমুক গ্রামে যাচ্ছি। বাজাকে বোলো, দিন কযেক পরে ফিবব।' তাপস চলে গেলেন। তাব পব কিছুদিন বাদে ফিবেও এলেন। ফিবে এসে ধ্যানে বসলেন।

ঐদিন সুমঙ্গলেব বাড়িতে কযেকজন অতিথি এসেছে। সে শিকাব কবতে বনে ঢুকেছে। বনেব মধ্যে তাপসকে দেখে তাব মনে হল ওটা বুঝি হরিণ। সে তীব ছুঁড়ল। তীববিদ্ধ হয়ে তাপস মারা গেলেন। সুমঙ্গল তাঁর কাছে ক্ষমা চাইল। তাপস বলল, 'তুমি জেনেশুনে ছোড় নি, তাই তোমাব কোন দোষ নেই।' এই বলে তাপস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সুমঙ্গল কিন্তু এতে খুবই ঘাবড়ে গেল। সে জানত তাপসেব মৃত্যুর জন্য বাজা তাকে ক্ষমা করবেন না। সে তাই দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি দিল।

বছব খানেক পবে বাজাব এক অমাত্যের সঙ্গে সুমঙ্গলেব দেখা হল। সুমঙ্গল তাকে বলল, 'তুমি বাজাব কাছে আমাব কথা উত্থাপন কবে বাজাব মনোভাব শোনাব চেষ্টা করো।' অমাত্য ফিবে এসে রাজার কাছে সুমঙ্গলেব কথা তুলল। রাজা কোন উচ্চবাচ্য কবলেন না।

আবও এক বছব কেটে গেল। দ্বিতীয বছবেব শেষে সুমঙ্গল সপবিবাবে নগবে এল। অমাত্য তাকে বলল, 'বাজাব মন এখন নবম হযেছে।' সুমঙ্গল তখন বাজাব সঙ্গে দেখা কবল। বাজা তাকে ডেকে জানতে চাইলেন, 'তুমি তাপসকে হত্যা কবেছিলে কেন?' সুমঙ্গল বলল, 'প্রভু, এটা চোখেব ভুলেব ব্যাপাব। তাপসকে দূব থেকে আমি হরিণ মনে কবেছিলাম।' বাজা তখন তাকে বললেন, 'তাহলে তুমি নির্ভযে এ দেশেই থাক।'

সব দেখেশুনে অমাত্যবা বাজাব কাছে জানতে চাইল, 'মহাবাজ তাহলে প্রথম দু বছব সুমঙ্গলেব কথা তুললেও কেন আপনি কিছু বললেন না?'

বাজা বললেন, 'দেখ, বাজাদেব পক্ষে ক্রুদ্ধ হওযা উচিত নয প্রথমে বাগের বদলে আমি বিবাগ হই। পবে মন নবম হওযায সুমঙ্গলকে ডাকিযে আনাই।' বাজাব ধৈর্য ও ক্ষমাগুণ দেখে প্রজাবা ধন্য ধন্য কবতে লাগল।

গঙ্গমাল জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বারাণসীতে একটি শুচিস্থ পরিবার ছিল। পরিবারের কর্তা ধর্মকর্ম করত। সে তিথিনক্ষত্র দেখে উপোস করত। এমন কি তার পরিবারের চাকরবাকররা পর্যন্ত উপোস করত সেইসব পুণ্যতিথিতে।

নগরে একদিন উৎসব ঘোষণা করা হল। কর্তা সবাইকে ডেকে বলে দিল, আজ পোষধের দিন। তাড়াতাড়ি চাকরদের খেতে দিও, পরে উপোস করতে হবে।

বোধিসত্ত্ব তখন দিনমজুর হয়ে জন্মেছিলেন। ঐ পরিবারেই কাজ করতেন। সেদিন তাঁর কাজ থেকে ফিরতে অনেক দেরি হল বলে খাবার পেলেন না। উনি শুনলেন, সেদিন পোষধ। তখন তিনি ঠিক করলেন উপোস করবেন। দীর্ঘ সময় অনাহারে থাকায় বোধিসত্ত্ব মরণাপন্ন হলেন। ঠিক তখন বারাণসীরাজ রাজকীয় সাজে বোধিসত্ত্বের চোখের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। মৃত্যুকালে বোধিসত্ত্বের ইচ্ছে হয়েছিল রাজা হওয়ার।

পোষধ পালন করেছিলেন বলে বোধিসত্ত্বের অতৃপ্ত বাসনা পরজন্মে পূর্ণ হল। তিনি ব্রহ্মদত্তের ছেলে হয়ে জন্মালেন। তখন তাঁর নাম

হল উদয়কুমার। বয়সকালে রাজ্য লাভ করার পরও বোধিসত্ত্ব কিন্তু পূর্বজন্মের কথা ভোলেন নি। তিনি অর্ধেক পোষধ পালন করে এই ফল পেয়েছেন বলে একটি গান গাইতেন মাঝে মাঝে: 'সামান্য কাজ করে এ ফল পেলাম।'

একদিন নগরে আবার একটা উৎসবের দিন এসে পড়ল। তখন এক মজুর অনেক কষ্ট করে আধ পয়সা জমিয়েছিল। তার বৌ বলল, 'চল, আমরা ঐ আধ পয়সায় সহজ একটু আনন্দ করব।' লোকটি ঐ আধ পয়সা অনেক কষ্টে এক পাঁজা ইটের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। সে তক্ষুনি সেটা আনতে চলল। দারুণ গ্রীষ্মের চাপ তখন। গ্রীষ্মের দাপটে মাটি গরম হয়ে উঠেছে। এ রকম অবস্থায় তাকে এভাবে উন্মাদের মত ছুটতে দেখে রাজা তাকে ডাকিয়ে আনালেন।

রাজা॥ তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?

লোকটা॥ আমার আধ পয়সা আনতে।

রাজা॥ কোত্থেকে?

লোকটা॥ ঐ ইটের পাঁজার ভেতর থেকে।

রাজা॥ কেন?

লোকটা॥ আজ উৎসবে আমি আর আমার বৌ আনন্দ করব।

রাজা॥ ছেড়ে দাও, অত কষ্ট করতে হবে না। আমি তোমাকে এক টাকা দিচ্ছি।

লোকটা॥ তা-ও যাব।

রাজা॥ দশ টাকা পেলে?

লোকটা॥ তা-ও আধ পয়সা ছাড়ব না।

রাজা তাকে অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে ঐ কাজ থেকে নিবৃত্ত করলেন।

লোকে ঐ লোকটাকে আধ পয়সার রাজা বলত। দুই রাজার খুব ভাব। একদিন বোধিসত্ত্ব আধ পয়সার রাজার কোলে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। তখন আধ পয়সার রাজা ভাবল, 'এ লোকটা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন আমি পুরো রাজা হতে পারব না। একে শেষ করি।' আবার পর মুহূর্তে তার মনে হল, 'এই রাজা আমার এত উপকার

করল, আর আমি কিনা [illegible] হত্যা করতে চাইছি। ধিক! ধিক!'

শেষ পর্যন্ত আধ পয়সার রাজা বোধিসত্ত্বকে ডেকে নিজের মনের সব কথা খুলে বলল। বোধিসত্ত্ব তখন তাকে সম্পূর্ণ রাজত্ব দিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু সে বলল, 'না বন্ধু, বিষয়বহ্নি নিভবে না। আমি ব্রহ্মজ্ঞানের তপস্বী হব।'

রাজা এবার তাঁর গানের সাথে আর একটি লাইন যোগ করলেন: 'অল্প কাজ করে আমি পেয়েছি এ ফল—কিন্তু যে তপস্বী হল সে আমার চেয়েও বেশি ফল পেল।'

রাজার স্ত্রীর ঐ গানের মানে জানার খুব ইচ্ছে হল। কিন্তু উপায় নেই। রাজার চুল কাটত গঙ্গাজল নামে এক নাপিত। সে প্রথমে চুল কেটে তারপর সন্না দিয়ে রাজার পাকা চুল তুলত। এতে রাজার খুব ভাল লাগত। রাজার স্ত্রী গঙ্গাজলকে ডেকে বলল, 'দেখ, তুমি প্রথমে পাকা চুল তুলে রাজার আরাম দিয়ে তারপর তাঁর চুল কেটে দিও। রাজা এতে খুশি হবে। তোমাকে পুরস্কার দিতে চাইবেন। তখন তুমি অন্য কোন পুরস্কার না নিয়ে গানটার মানে জানতে চাইবে।'

গঙ্গাজলকে রাণী যা বলল সে ঠিক সেই রকম করল। রাজাও তাকে পুরস্কার দিতে চাইলেন। কিন্তু সে গানের মানে জানতে চাইল। গানের মানে বলতে রাজার লজ্জা হচ্ছিল। গঙ্গাজল নাছোড়বান্দা হওয়ায় রাজাকে শেষ পর্যন্ত বলতেই হল।

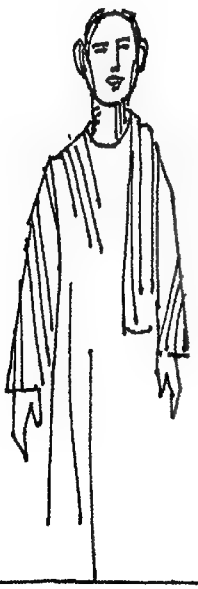

গঙ্গাজল তখন ভাবল, মাত্র অর্ধেক পোষধ পালন করে যদি রাজা হওয়া যায় তাহলে বিষয়ের আর কি-ই বা মূল্য। তার চেয়ে বরং তপস্যায় আত্মনিয়োগ করা উচিত। গঙ্গাজল সত্যিই তপস্বী হয়ে চলে গেল। অনেকদিন পরে সাধুবেশে এসে গঙ্গাজল উদয়রাজকে 'তুমি' সম্বোধন করে। এতে রাজার অমাত্য থেকে শুরু করে স্ত্রী পর্যন্ত সবাই রেগে যায়। নিচু জাতের লোকের এত বড় স্পর্ধা।

উদয়রাজ তখন সবাইকে শান্ত করে বললেন, 'উনি জ্ঞানের দ্বারা জাত নস্যাৎ করেছেন। জ্ঞানের কাছে উঁচুনিচু বলে কিছুই নেই। এঁকে প্রণাম করুন সবাই।'

চেদি জাতক

পুরাকালে মহাসম্মত নামে এক রাজা ছিলেন। মহাসম্মতের আয়ুর কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। তাঁর ছেলেব নাম বোজ, রোজের ছেলে বররোজ, ববরোজের ছেলে কল্যাণ, কল্যাণের ছেলে বরকল্যাণ, বরকল্যাণেব ছেলে পোষধ। আবার পোষধের ছেলে মান্ধাতা, মান্ধাতার ছেলে বরমান্ধাতা—এভাবে নামের কোন শেষ ছিল না।

বরমান্ধাতার ছেলে চর, চরের ছেলে উপচর। উপচরকে অপচরও বলা হত। অপচর চেদি রাজ্যে [illegible] করতেন। তাঁর তপস্যাবল ছিল অসাধারণ। আকাশপথে বিচরণ করতে পারতেন। চেদি রাজার শরীর থেকে চন্দনের গন্ধ পাওয়া যেত।

চেদি রাজার পুরোহিতের নাম কপিল। কপিলের ছোট ভাই কোরকলম্ব রাজার সঙ্গে একই আচার্যের কাছে পড়াশুনো করেন, ফলে দুজনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব ছিল। রাজা মনে মনে ঠিক করেছিলেন, রাজত্ব পেলে কোরকম্বলকে পুরোহিত করবেন।

কিন্তু কপিলকে রাজা কোন দিনই সে কথা বলতে পারলেন না। কপিলও দেখলেন রাজার পুরোহিত রাজার সমবয়সী কেউ হলেই ভাল হয়। তখন তিনি ঠিক করলেন, ছেলেকে প্রধান পুরোহিত পদ দিয়ে তিনি নিজে তপস্যায় ডুবে থাকবেন। তারপর রাজাকে নিজের ইচ্ছার কথা জানালেন। রাজাও তাতে বাদ সাধলেন না। পুরোহিতের ছেলে রাজপুরোহিত হল। আর পুরোহিত নিজে তপস্যাব্রত নিলেন, যদিও তিনি গৃহত্যাগ করলেন না। এই ঘটনা জানার পর কোরকলম্ব পুরোহিতের ওপর খুব রেগে গেল। সে ভাবল, 'যেভাবে হোক পুরোহিতকে শিক্ষা দিতে হবে।'

রাজা একদিন কোরকলম্বের সঙ্গে গল্প করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি তুমিই পুরোহিতের কাজ কর?'

না, মহারাজ।

তবে কে করেন?

কেন, আমার দাদা।

তিনি যে তপস্যাব্রত নিয়েছেন?

হ্যাঁ, তবে তাঁর হয়ে তাঁর ছেলেই এ কাজ করছে।

কেন, তুমিই কর না এ কাজ।

না মহারাজ, ব্রহ্মানুকুলে বড় ভাই-ই এ কাজ করে আসছেন।

তাহলে আমি তোমাকে বড় করে দেব।

কিভাবে করবেন?

মিথ্যে কথা বলে।

আপনি কি জানেন না বড়দা তাহলে তপস্যাগুণে আপনার ক্ষতি করবে?

সাত দিনের মধ্যে কি করি তুমি দেখ।

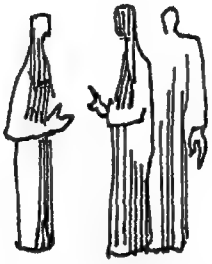

খবরটা নগরে রটে গেল। সবাই শুনল আগামী সাত দিনের মধ্যে রাজা বড় ভাইকে ছোট ভাই করবেন, ছোট ভাইকে বড় করবেন। লোকজন শুনে অবাক। তারা ভাবতে লাগল রাজা কি করে এ রকম আশ্চর্য ব্যাপার ঘটাবেন। যে সময়ের কথা হচ্ছে, সেটা সত্যযুগ। লোকে তখন মিথ্যা কথা কাকে বলে জানত না।

লোকমুখে এইসব খবর শুনে কপিল পুরোহিতের ছেলে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, রাজা নাকি মিথ্যে কথা বলে কাকাকে বড় আর আপনাকে ছোট করবেন।' কপিল বললেন, 'দেখ, রাজা মিথ্যে বলেও পুরোহিত পদ কেড়ে নিতে পারবেন না। তা উনি কবে কাজটা করবেন?' কপিলের ছেলে বলল, 'আজ থেকে সাত দিন পরে।' কপিল বললেন, 'ঠিক আছে। সাত দিন পরে তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিও।'

সাত দিনের দিন রাজ্যের লোক ভেঙ্গে পড়ল। তারা সবাই এসেছে 'মিথ্যে কথা' নামে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখতে। রাজসভায় লোক ধরছে না। রাজা সেজেগুজে আকাশপথে এসে শূন্যে বসলেন। কপিল পুরোহিতও এসে শূন্যে বসলেন। প্রথম কথা বললেন কপিল।

রাজা, আপনি মিথ্যে কথা বলে বড় ভাইয়ের পদ ছোট ভাইকে দেবেন ঠিক করেছেন, এ কথা কি সত্যি?

হ্যাঁ আচার্য।

কিন্তু রাজা, মিথ্যা বললে ধর্মহানি হয়।

সে যাই হোক, কোরকলম্ব বড়া আর আপনি হলেন ছোট।

সঙ্গে সঙ্গে রাজা আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর

শরীর থেকে চন্দন গন্ধ উঠে গেল। তার বদলে নোংরা পচা গন্ধ উঠতে লাগল। কপিল তখন বললেন, 'মহারাজ, ভয় পাবেন না, আপনি সত্য কথা বলুন। তাহলে আবার আগেকার অবস্থা ফিরে পাবেন।' কিন্তু রাজা আবারও বললেন, 'আপনি ছোট ভাই, আর কোরকলম্বই বড় ভাই।' বলা মাত্র মাটিতে গর্ত হয়ে গেল। রাজার পা দুটি মাটিতে পুঁতে গেল। এভাবে কপিল তাঁকে বার বার জিজ্ঞেস করলেন। রাজা বার বারই মিথ্যে কথা বললেন। রাজা মোট ছ-বার মিথ্যে কথা বললেন। পাতাল থেকে জ্বলন্ত আগুন উঠে এল। ঐ আগুন রাজাকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলল।

পদকুশল মানব জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের মহিষী একবার মিথ্যে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, 'আমি যদি অমুকটা করে থাকি তবে যেন ঘোড়ামুখো রাক্ষসী হয়ে জন্মাই।' এই মিথ্যে প্রতিজ্ঞার ফলে পরজন্মে রাণী সত্যি সত্যি ঘোড়ামুখী রাক্ষসী হয়ে জন্মালেন।

ঘোড়ামুখী রাক্ষসী থাকত এক পাহাড়ের কাছে। তিন বছর বৈশ্রবনের সেবা করেছিল বলে সে বর পায় ঐ অঞ্চলের ত্রিশ যোজন এলাকার মধ্যে কোন লোককে পেলে, সে রাক্ষসীর খাদ্য হবে।

একদিন রূপবান এক ব্রাহ্মণ অনেক লোকজন নিয়ে ঐ পাহাড়ের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখে রাক্ষসী বেজায় খুশি। ভাবল পেট পুরে খাওয়া যাবে। কিন্তু রাক্ষসী ধরার আগে ব্রাহ্মণের লোকজন পালিয়ে গেল। রাক্ষসী ব্রাহ্মণকে ধরে ফেলল। ব্রাহ্মণকে সে পিঠে করে গুহায় নিয়ে এল। গুহায় ফিরে ব্রাহ্মণের সুন্দর চেহারা দেখে রাক্ষসীর মন নরম হল। ভাবল, একা একা থাকি। এই ব্রাহ্মণকে বিয়ে করলে ভাল সঙ্গী পাওয়া যায়। প্রাণের দায়ে ব্রাহ্মণ রাজি হল। এরপর রাক্ষসী পথিকদের খেয়ে ফেলত, আর পথিকদের চাল-ডাল এনে দিত ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণ নিজে রান্না করে খেত। কিন্তু রাক্ষসী তাকে বাইরে যেতে দিত না। ব্রাহ্মণ যদি পালিয়ে যায় এই ভয়ে শিকার করতে যাওয়ার সময় সে গুহার মুখে ভারি পাথর চাপা দিয়ে যেত।

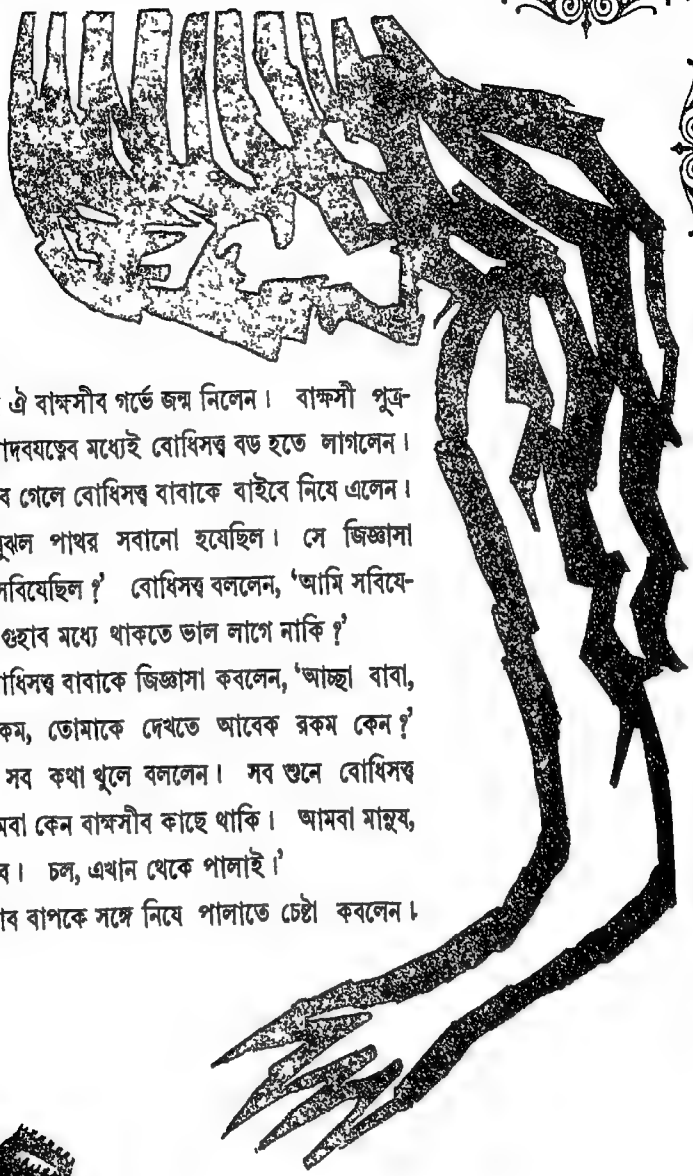

বোধিসত্ত্ব একদিন ঐ রাক্ষসীর গর্ভে জন্ম নিলেন। রাক্ষসী পুত্র-স্নেহে অন্ধ। বেশ আদরযত্নের মধ্যেই বোধিসত্ত্ব বড় হতে লাগলেন। একদিন রাক্ষসী বাইরে গেলে বোধিসত্ত্ব বাবাকে বাইরে নিয়ে এলেন। রাক্ষসী ফিরে এসে বুঝল পাথর সরানো হয়েছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'পাথরটা কে সরিয়েছিল?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমি সরিয়েছিলাম মা, দিবারাত গুহার মধ্যে থাকতে ভাল লাগে নাকি?'

কিছুদিন পরে বোধিসত্ত্ব বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা বাবা, মাকে দেখতে এক রকম, তোমাকে দেখতে আরেক রকম কেন?' ব্রাহ্মণ ছেলেকে তখন সব কথা খুলে বললেন। সব শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তাহলে আমরা কেন রাক্ষসীর কাছে থাকি। আমরা মানুষ, মানুষের সঙ্গেই থাকব। চল, এখান থেকে পালাই।'

এরপর তিনি দুবার বাপকে সঙ্গে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু দুবারই বোধিসত্ত্ব ধরা পড়ে গেলেন। নেহাৎ রাক্ষসী ছেলেকে খুব ভালবাসত তাই সে কিছু বলল না। তখন বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, রাক্ষসদের চরার জায়গা মাপা থাকে, তার বাইরে তারা কাউকে খেতে পারে না। কায়দা করে মার এলাকার সীমা জেনে নিতে হবে।

একদিন তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, তুমি মরে গেলে এই এলাকা তো আমার হবে।'

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

তাহলে এলাকাটা আমার জানা দরকার।

ঠিকই তো। বলছি, শুনে নাও।

রাক্ষসী বোধিসত্ত্বকে বলে গেল উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে তার এলাকার সীমা কোথায় কোথায়। বোধিসত্ত্ব দেখলেন নদীর দিকটাই সংক্ষিপ্ত। একবার নদীতে পা দিতে পারলে রাক্ষসী আর কিছুই করতে পারবে না।

দু-তিন দিন পরে রাক্ষসী শিকার করতে বেরিয়ে গেলে বোধিসত্ত্ব বাবাকে কাঁধে নিয়ে বাতাসের বেগে ছুটে চললেন। যে করে হোক রাক্ষসীর এলাকার বাইরে যেতে হবে। রাক্ষসীও পেছন পেছন ছুটে আসতে লাগল। ততক্ষণে বোধিসত্ত্ব বাবাকে নিয়ে কোনক্রমে নদীতে নেমে পড়েছেন। রাক্ষসী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল : আয় বাবা, ফিরে আয়। কি তোদের দুঃখ বল।

বোধিসত্ত্ব বললেন : মা, আমরা মানুষ। আমাদের মানুষের কাছে যেতে দাও।

অনেকবার ডাকাডাকি করেও যখন তাঁরা ফিরলেন না তখন রাক্ষসী বলল, 'দেখ বাছা, যাবিই যখন একটা কথা শুনে যা। মানুষের দেশ সহজ নয়। সেখানে নিজের খাবারটা জোগাড় করতে গেলে কোন না কোন বিদ্যে জানা থাকা চাই। তুই তো মানুষদের কোন বিদ্যেই জানিস না। আমি চিন্তামণি নামে একটা বিদ্যা জানি। তুই ঐ মন্ত্রটা জলে দাঁড়িয়ে শিখে নে। এই বিদ্যে দিয়ে এক বছর আগে যে মানুষ চলে গেছে তার পায়ের দাগ দেখতে পাওয়া যায়।'

বোধিসত্ত্ব রাক্ষসী মার কাছ থেকে মন্ত্রটি শিখে নিলেন। মন্ত্র শেখানোর পর রাক্ষসী শোকে বুকে চাপড় মারতে লাগল। পুত্রশোকে ঐখানেই মারা গেল। বাবাকে নিয়ে বোধিসত্ত্ব ফিরে এলেন। রাক্ষসীর মরদেহ দাহ করলেন। তারপর লোকালয়ের দিকে রওনা হলেন।

এরপর বোধিসত্ত্ব তার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বারাণসীতে এলেন। বারাণসীরাজকে খবর পাঠালেন পদকুশল নামে এক ব্যক্তি রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী। রাজা তাঁকে ডেকে পাঠালেন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, বার বছর আগেও কোন জিনিস চুরি গিয়ে থাকলে আমি চোর এবং চুরি যাওয়া জিনিস বের করতে পারি।' রাজা বললেন, 'বেশ, তাহলে তুমি আমার এখানে চাকরি কর।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'কিন্তু মহারাজ, আমার মজুরি প্রতিদিন হাজার টাকা।' রাজা বললেন, 'বেশ, তাই পাবে।'

এভাবে কিছুদিন কাটলে রাজার পুরোহিত রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, এই ছেলেটাকে আমরা এত টাকা দিচ্ছি, কিন্তু সে ঠিক কি বিদ্যা জানে তা পরীক্ষা করা হয় নি। একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক।' রাজারও প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না।

তখন রাজা এবং পুরোহিত দুজনে রত্নরক্ষকদের না জানিয়ে কিছু দামী রত্ন প্রাসাদ থেকে নামালেন। অন্ধকারে তিনবার রাজবাড়িটা ঘুরলেন। পাঁচিলে উঠলেন, পাঁচিল থেকে নামলেন। তারপর রাজবাড়ির পুকুরটা তিনবার পাক খেয়ে পুকুরের মধ্যে সব রত্ন যত্ন করে পুঁতে রাখলেন।

পরের দিন রটে গেল রাজবাড়ি থেকে অনেক মূল্যবান রত্ন চুরি গেছে। রাজা বোধিসত্ত্বকে ডেকে বললেন, 'বাছা, এবার তোমার ক্ষমতা দেখাও। কাল রাতে রাজকোষ থেকে রত্ন চুরি হয়েছে শুনেছ নিশ্চয়ই।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আমি এক্ষুনি চোর ধরে দিচ্ছি, সবে তো গতকাল চুরি হয়েছে। বার বছর আগে চুরি হলেও আমি চোরের পায়ের দাগ খুঁজে বের করতে পারতাম।'

প্রথমে বোধিসত্ত্ব মনে মনে তাঁর রাক্ষসী মাকে প্রণাম করলেন। তারপর মন্ত্র পাঠ করে কাজ শুরু করে দিলেন। রাজকোষের সামনে একটু দেখেই বললেন, 'মহারাজ, দুজন চোরের পায়ের ছাপ দেখছি।' তারপর ঐ পায়ের ছাপ অনুকরণ করে রাজা ও রাজার পুরোহিতের শোবার ঘরে ঢুকলেন। তারপর সেখান থেকে গেলেন রাজকোষের কাছে। তারপর নিচে নেমে এসে রাজবাড়িকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন। মোট কথা, রাজা এবং রাজপুরোহিত যেভাবে যা করেছিলেন বোধিসত্ত্ব সেইসব জিনিস করে শেষ পর্যন্ত রত্নগুলো পুকুর থেকে তুলে

আনলেন। রাজা এতে কিছুটা মুগ্ধ হলেও তখন তাঁকে পরীক্ষা করার নেশায় পেয়েছে। বললেন, 'কই বাপু, চোর ধরলে না।'

মহারাজ, আপনি তো রত্নগুলো ফেরৎ পেলেন।

চোরকে ধর এবার।

আর চোরকে ধরে কি করবেন?

সেটাই তোমার কাজ, চোর ধরা।

বোধিসত্ত্ব তখন রাজাকে একে একে অনেকগুলো গল্প বললেন।

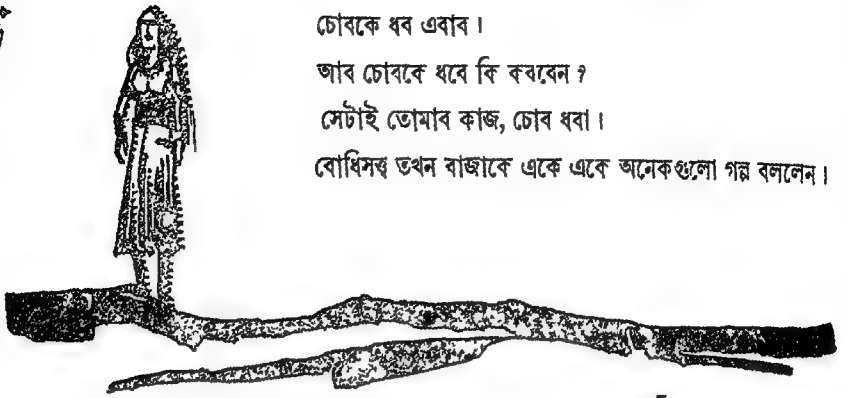

প্রথম গল্প ঃ

এক গায়ক তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বারাণসীতে গান করতে গিয়েছিল। সেখানে গান করে গায়ক অনেক টাকা পেল। নদীপথে ফিরে আসার সময় তারা জলে পড়ে যায়। গায়কের গলার সঙ্গে মহাবীণা বাঁধা ছিল। বীণায় জল ঢুকে গায়ক ডুবতে লাগল। তার স্ত্রী কোন মতে সাঁতরে নদী পেরিয়ে গেল। তারপর তার মনে হল গায়কের কাছে দু-একখানা গান যদি শিখে নিই তাহলে টাকার অভাব হবে না। সে গায়ককে বলল, 'স্বামী, আপনি তো ডুবে গেছেন, এদিকে আমি কি করে বাঁচি। আপনি মৃত্যুর আগে আমাকে একটা গান শেখান।' এর জবাবে তার স্বামী বলল, 'দেখ, যে জলের আর এক জীবন, সে-ই এখন আমার জীবন শেষ করে দিচ্ছে। এ রকম অবস্থায় আমি কি করে তোমাকে গান শেখাই।'

গল্পটি বলা হলে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, রাজারাই মানুষের আশ্রয়। যেমন জীবের আশ্রয় জল। তাই রাজা বিপদ ঘটাতে পারেন জানলে লোকে শিউরে ওঠে।'

দ্বিতীয় গল্প :

এক কুমোর মাটির ভাঁড় বানাত। সে এক জায়গায় গর্ত করে মাটি নিয়ে আসত। একবার বর্ষাকালে ওপরের মাটি ধসে পড়ল। কুমোর তখন মরতে মরতে ভাবল এই ধরিত্রীই সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করে আছে। আর এখন সে-ই আমার শেষ জীবন করতে চাইছে। ধরিত্রী যেমন জীবের রক্ষাকর্তা, রাজাও তেমনি মানুষের রক্ষাকর্তা। বোধিসত্ত্ব বললেন, 'সুতরাং রাজা বিপথগামী হলে প্রজাদের ভয়ের শেষ থাকে না।'

তৃতীয় গল্প :

এই বারাণসী নগরেই একজনের ঘরে আগুন লেগেছিল। সে তার প্রতিবেশী একজনকে বলে ঘরের মধ্যে ঢুকল জিনিসপত্র বের করে আনতে। কিন্তু ঘরের ভেতরে ঢোকার পর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আগুনে পুড়ে সে মারা গেল।

বোধিসত্ত্ব রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, এখন দেখলেন তো যে আগুনে ভাত রান্না হয়, যে আগুন রক্ষক, সেই আগুনেই বেচারা প্রাণ হারাল। ঠিক তেমনি প্রজাদের যিনি রক্ষক যদি তিনিই অন্যায় কাজ করেন তাহলে আর উপায় থাকে না।'

রাজা শুনে বললেন 'বাপু, তুমি হেঁয়ালি ছেড়ে স্পষ্ট কথায় আমাকে বল কে চোর।'

বোধিসত্ত্ব তখন আরও দুটো গল্প বললেন।

চতুর্থ গল্প :

এই নগরেই একটা লোক খুব বেশি খেয়ে ফেলেছিল। অথচ তার পেটে অত শক্তি নেই যে বাড়তি খাবার হজম করে। তখন তার অজীর্ণ রোগ হল। বেচারা সেই রোগে মারা গেল।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'এখন দেখুন, শত সহস্র মানুষ যা থেকে পুষ্টি লাভ করে, সেই খাবারই লোকটির মৃত্যুর কারণ হল। এবার বুঝলেন তো?'

রাজা আবার বললেন : 'এসব শুনতে চাই না। কে চোর সেই কথাটা বল।'

পঞ্চম গল্প :

এই নগরেই একবার সাংঘাতিক ঝড় হয়েছিল। একজন ঝড়ে পড়ে যায়। তার হাত-পা ভেঙ্গে গেল। সে তখন বিলাপ করতে করতে লাগল এই বলে—গ্রীষ্মে যখন পৃথিবী আর মানুষ পুড়ে যাচ্ছে তখন ঝড় আসে বৃষ্টির সংবাদ নিয়ে। সে জীবন দান করে। জীবন-দাতাই যদি জীবনহানি করে তাহলে কে আর বাঁচবে?

ষষ্ঠ গল্প :

কাশী রাজ্যের এক গ্রামে এক দম্পতি থাকত। আর থাকত দম্পতিটির দুজনেরই মা। চার জনের সংসার। বৌ-টি শাশুড়িকে খুন করার জন্য স্বামীর কাছে শাশুড়ির নামে অনেক নিন্দে করল। শেষে ঠিক হল যেহেতু দুজনেরই মা এক ঘরে শোয়, সেজন্য স্বামীটির মার খাটে শিকল বাঁধা থাকবে। রাতে খাটশুদ্ধ তুলে নিয়ে সেই বৃদ্ধাকে নদীতে ফেলে দেবে। কুমিররা তার সদগতি করবে। স্বামীটি ফন্দি করে বৌর মার খাটে শিকল বেঁধে রাখল। ফলে পরের দিন বৌ-টি দেখল শাশুড়ি যেমন ছিল তেমনি আছে, নিজের মা-কেই সে শেষ করেছে।

আবার ষড়যন্ত্র করল সে। এবার স্বামীকে বাধ্য করল মাঝ রাতে খাটিয়া শুদ্ধ বুড়িকে তুলে নিতে। কিন্তু শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল তারা দাহ্য বস্তু কিছুই আনে নি। তখন দুজনেই আবার ঘরে ফিরে গেল।

ওদিকে শাশুড়ি হঠাৎ জেগে উঠে শ্মশান দেখে ব্যাপারটা খানিক আন্দাজ করতে পারল। বুড়ি তখন শ্মশানে একটা লাশ খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়ে নিজে পাশের এক গুহায় আত্মগোপন করে রইল।

ছেলে-ছেলের বৌ ফিরে এসে মরা লাশটাকে বুড়ি ভেবে দাহ করল। বুড়ি নিজের চোখে সেসব দেখল। বৃদ্ধা যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছে সেখানে এক চোর অনেক মণিমাণিক্য রেখে গিয়েছিল। বুড়ি সেসব নিয়ে পরের দিন বাড়ি ফিরল। বৌ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ঐসব মণিমাণিক্য কোথায় পেলেন?' বৃদ্ধা ফন্দি করে বলল, 'তোমার দয়ায় মা। আমাকে তুমি পুড়িয়ে দিয়েছিলে। জ্যান্ত মানুষকে পোড়ালে সে মরে না, উল্টে সোনাদানা পায়।' সে কথা শুনি বৌ নিজে সোনার লোভে শ্মশানে গিয়ে শুয়ে রইল। স্বামীকে বলল, আগুন লাগাতে।

'মহারাজ, বুঝতেই পারছেন সেই বৌটি আর বাঁচে নি।'

পরের দিন ছেলে জিজ্ঞেস করল, 'মা, বৌ কোথায় গেল?' বৃদ্ধা বলল, 'ওরে বদমাইস, মরলে কেউ ফেরে?' তারপর মনে মনে ভাবল, ছেলেকে জোর করে বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ আনালাম তার আশ্রয়ে থাকব বলে। আর সে কিনা আমাকেই মারতে চায়!

এত গল্প শুনেও রাজা নাছোড়বান্দা। তখন বোধিসত্ত্ব প্রজাদের ডেকে বললেন, 'ভাই। এই রাজা আর তার পুরোহিত রাজকোষের অর্থ চুরি করেছিল। তোমরা বিচার কর।' মুহূর্তের মধ্যে প্রজারা রাজা আর পুরোহিতকে শেষ করল।

মিত্রবন্দিক জাতক

কাশ্যপের আমলে এক ধনী ব্যবসায়ীর একটি ছেলে ছিল। তার নাম মিত্রবন্দিক। মিত্রবন্দিকের বাবা-মা ছিলেন ধর্মপরায়ণ ও সৎ চরিত্রের মানুষ। তাঁরা উপোস করতেন, দান-ধ্যান করতেন। মিত্রবন্দিকের স্বভাবটি কিন্তু একেবারে উল্টো।

এক সময় মিত্রবন্দিকের বাবা মারা গেলেন। তখন তার মা-ই সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন। মা যতই ভাল ভাল কথা বলুন, নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে চলতে বলুন, সেসব কথা মিত্রবন্দিকের মনে ধরত না। একদিন মা-ছেলেতে কথাবার্তা হল:

বাবা, আজ মহাপোষধ।

সে আবার কি?

আজ পুণ্যদিন।

তা আমি কি করব?

তুমি উপোস কর, মঠে যাও। ধর্মকথা শোন।

কেন?

ফিরে এলে তোমাকে এক হাজার টাকা দেব।

টাকার লোভে মিত্রবন্দিক রাজি হল। জলখাবার খেয়ে সকাল বেলাতেই সে মঠে গেল। সারাটা দিন সেখানে কাটাল। রাতে ধর্মকথা হবে। মিত্রবন্দিক মঠ ছেড়ে পালাল, কারণ তা না হলে ধর্মকথা তার কানে ঢুকবে। ধর্মকথা সে একেবারেই পছন্দ করে না। ফলে সে মঠ ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে ঘুমিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিল।

সকাল বেলায় মিত্রবন্দিককে ফিরে আসতে দেখে মা অবাক। সে একা আসছে। মা ভেবেছিল, যে তপস্বীর কাছে ধর্মকথা শুনেছে ভোরবেলা তাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে।

কথক মশাইকে সঙ্গে করে আনলি না?

কেন, তাকে দিয়ে কি হবে?

মা তখন আর তর্কাতর্কি না করে মিত্রবন্দিককে খেতে দিল। খাবার সামনে পড়ে আছে কিন্তু মিত্রবন্দিক মুখে তুলছে না দেখে মা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'খাচ্ছিস না কেন?' তখন মিত্রবন্দিক বলল, 'আগে টাকাটা দাও।'

টাকার থলেটা পাওয়ার পর মিত্রবন্দিক খাওয়া শেষ করল। তারপর ঐ টাকা নিয়ে বাণিজ্য করতে যাবে ঠিক করল। নৌকো বানাতে দিল। মা অনেকবার বলল, 'কি দরকার বাবা, ঘরে কি টাকার অভাব আছে? কেন দূর দেশে যাবি?' কিন্তু কে কার কথা শোনে। মা আটকাতে গেলে, মাকে মেরে ফেলে দিয়ে সে চলে গেল।

নৌকো ছেড়ে দিল। সাত দিনের মাথায় সমুদ্রের বুকে নৌকো অচল হল। দাঁড়ি-মাঝিরা পড়ল মহা সমস্যায়। অনেক ভেবে তারা দেখল নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একজন ঘোর পাপী আছে। দেখতে হয় কে সেই পাপী। কড়ি গণনা করা হল। তিনবার গণনা করা হল। তিনবারই মিত্রবন্দিকের নাম উঠল। তখন তারা একটা ভেলা বানিয়ে তাতে মিত্রবন্দিককে ভাসিয়ে দিল।

মিত্রবন্দিক ভাসতে ভাসতে এক দ্বীপে এসে ঠেকল। ঐ দ্বীপে চারজন প্রেতিনী নাচগান করছিল। মিত্রবন্দিককে তাদের পছন্দ হল। তারা তাকে বেশ যত্নআত্তি করল। এক সপ্তাহ পরে তারা বলল: 'প্রভু, আমাদের এক সপ্তাহ সুখ ভোগ আর এক সপ্তাহ দুঃখ ভোগ করতে হয়। আমাদের সুখভোগের সপ্তাহের কাজ শেষ হল। এবার দুঃখ ভোগের জন্য অন্য জায়গায় যেতে হবে। আপনি সাতদিন এখানে অপেক্ষা করবেন, আমরা ফিরে আসব।'

তারা চলে যেতে মিত্রবন্দিক ভাবল, 'কেন খামোখা ওদের জন্য অপেক্ষা করি। এক সপ্তাহে আমি আরও সুন্দর, চমৎকার দ্বীপে যেতে পারি।' সে ভেলায় চড়ে আবার রওনা হল। নতুন এক দ্বীপে এল সে। সেখানে ছিল ছাপ্পান্ন জন প্রেতিনী। মিত্রবন্দিক তাদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করে এক সপ্তাহ কাটাল। তারপর তারাও আগে-কার প্রেতিনীদের মত দুঃখভোগ করতে চলল। যাওয়ার সময় মিত্রবন্দিককে অপেক্ষা করতে বলে গেল।

মিত্রবন্দিক এখানেও তাদের জন্য অপেক্ষা করল না। বরং ভেলায় চড়ে নতুন দ্বীপের খোঁজে রওনা হল। এবার সে হাজির হল উৎখাত নরকে। সেখানে নানা লোকে নানা নারকীয় শাস্তি আর যন্ত্রণা ভোগ করছিল। মিত্রবন্দিক মনে মনে ভাবল আমি এখানকার রাজা হব।

শহরের মধ্যে ঢুকে দেখল একজনের মাথার ওপর চক্র ঘুরছে। মিত্রবন্দিকের মনে হল ওটা চক্র নয়, পদ্মফুল। মিত্রবন্দিক চোখের ভুলে চক্রটাকে পদ্মফুল ভাবল। লোকটার সারা শরীরে রক্তের ধারা নামছিল। মিত্রবন্দিক ভাবল তা খুব দামী পোশাক। সে তার কাছে গিয়ে বলল: সম্রাট, আপনি তো অনেকক্ষণ পদ্মফুলটাকে মাথায় করে আছেন, আমায় একবারের জন্য ধরতে দিন।

এটা চক্র, পদ্মফুল নয়।

কেন মিছে কথা বলছেন?

চক্রধারী লোকটি বুঝতে পারল, 'ও তাহলে আমার মত পাপী, নিজের মাকে মেরেছে বলেই নরকে পতিত হয়েছে।' তারপর সে এগিয়ে এসে বলল, 'এই নিন।' মিত্রবন্দিকের মাথায় সে চক্রটি ফেলে দিল। যন্ত্রণায় মিত্রবন্দিক চিৎকার করতে লাগল। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গেল।

লোকটির কর্মফল তখন শেষ হয়েছে। কিন্তু মিত্রবন্দিকের সবে শুরু হল। একদিন বোধিসত্ত্ব তাঁর অনুচরদের সঙ্গে নরক দেখতে এলেন। বোধিসত্ত্বকে দেখে মিত্রবন্দিক বলল, 'প্রভু, যাঁতা যেমন তিল পেষে এই চক্র আমাকে সেইভাবে পিষে ফেলছে। আমি কি পাপ করেছি?'

বোধিসত্ত্ব একে একে তাকে তার পাপগুলো বুঝিয়ে দিলেন।

কৃষ্ণ জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে এক ধনবান ব্রাহ্মণ বাস করত। ব্রাহ্মণের কোন ছেলে ছিল না। তখন তিনি ছেলে পাওয়ার আশায় শীলব্রত নিলেন। এই ব্রতের ফলে বোধিসত্ত্ব তাঁর ছেলে হয়ে জন্মান। বোধিসত্ত্বের গায়ের রঙ কালো হয়েছিল, সেজন্য লোকে তাঁকে কৃষ্ণকুমার বলে ডাকত।

কৃষ্ণকুমারের বয়স যখন ষোল বছর হল তখন তাঁকে দেখতে অপূর্ব লাগত। লেখাপড়া শেখাবার জন্য বাবা তাঁকে তক্ষশিলায় পাঠালেন। কৃষ্ণকুমার যথাসময়ে সুশিক্ষিত হয়ে বারাণসীতে ফিরে এলেন। ধনী ব্রাহ্মণ দেশের উপযুক্ত পাত্রী খুঁজে ঘরে পুত্রবধূ আনলেন। তারপর একদিন তাঁর বাবা-মা গত হলেন। কৃষ্ণকুমার এক বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেন।

একদিন কৃষ্ণকুমার তাঁর রত্নভাণ্ডার খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর বংশের হিসেবের খাতা খুলে বসলেন। ঐ খাতায় লেখা ছিল কৃষ্ণকুমারের পূর্বপুরুষরা কে কত ধনসম্পত্তি রেখে গেছেন।

কৃষ্ণকুমার খাতাটি খুলে ভাবতে ভাবতে চিন্তায় তলিয়ে গেলেন। প্রত্যেকে কত না ধন রেখে গেছেন। যাঁরা ধন রেখে গেলেন তাঁদের কথা কিছুই জানা যাচ্ছে না। শুধু তাঁরা যে সম্পত্তি উপার্জন

করেছিলেন তার পরিমাণ জানা সম্ভব। তাঁরা কেউই ধনসম্পত্তি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন নি।

ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণকুমার একেকটি স্তর অতিক্রম করতে থাকেন। শত্রু, চোর আর বিপদেই শুধু ধনক্ষয় হয়ে থাকে। সুতরাং ধন হচ্ছে অসার বস্তু। অথচ মানুষ এই অসার বস্তুর পেছনেই নিজেদের মরণশীল জীবন খরচ করে থাকে।

কৃষ্ণকুমার ঠিক করলেন, আমি তা করব না, বরং এই অসার ধন আমি দান করে নিঃশেষ করব। তারপর তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা করব।

কৃষ্ণকুমার এ ব্যাপারে রাজার অনুমতি চাইলেন। রাজার অনুমতি পাওয়ার পর কৃষ্ণকুমার একনাগাড়ে সাত দিন ঢেলে দান করলেন। যখন তাতেও ধন ফুরোচ্ছে না, তখন তিনি বাড়ির সব দরজা খুলে দিলেন। ঘোষণা করলেন: আমি সমস্তই দান করলাম—যার যা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পার।

কৃষ্ণকুমার তারপর নগর ছেড়ে বনের দিকে চললেন। তপস্বী হলেন। ন্যায়বাদীরা রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। বনের মধ্যে একটা সুন্দর জায়গা বেছে মাকাল গাছের তলায় তিনি তপস্যা করতে বসলেন। তিনি কোন কুটির বানালেন না। খাবার রান্না করতেন না। মাকাল গাছ থেকে যে দু-একটা ফল পড়ত তাই খেতেন। পৃথিবী, জল, আগুন, আর বায়ুর মতই তিনি ক্ষমাশীল হলেন। এবারের জন্মে বোধিসত্ত্ব খুব সামান্য ইচ্ছা নিয়ে জন্মলাভ করেছিলেন।

বোধিসত্ত্বের সিদ্ধিলাভে বিলম্ব হল না। তাঁর তপস্যার জোরে শক্রের আসন টলে উঠল। শক্র ঠিক করলেন তপস্বীকে দিয়ে গর্বভরে ধর্মকথা বলাবেন, তারপর তাঁকে ধ্রুব ফল লাভের বর দিয়ে ফিরে আসবেন। এতে তপস্বীর তেজ নষ্ট হবে।

প্রথমে শক্র এসে বোধিসত্ত্বের কালো রঙের নিন্দা শুরু করলেন। বোধিসত্ত্বকে রাগাতে চাইলেন।

'ছিঃ ছিঃ, কি কালো রঙ, দেখলে ঘেন্না করে। একে তো নিজে কালো, আবার কালো কালো ফল-লতা খাস। যে মাটির ওপর তুই বসে আছিস সেটাও কালো। একসঙ্গে এত কালো বেশ মিশেছে।'

বোধিসত্ত্ব তপস্যা ভঙ্গ করে চোখ খুললেন না। তপস্যার শক্তিতেই বুঝলেন শক্র এসেছেন। তখন তিনি বললেন: 'যার অন্তঃকরণ ঘৃণ্য সেই ঘৃণার বস্তু, সেই কালো, আমি কেন কালো হতে যাব মশাই।'

শক্র বোধিসত্ত্বের কথা শুনে খুশি মনে বর দিতে চাইলেন। বেশ কয়েক বার চেষ্টা করলেন তাঁকে সুযোগ সুবিধে দিতে, কিন্তু বোধিসত্ত্ব অন্য বর চেয়ে নিলেন।

রাগ হিংসা যাতে না হয়, অন্যের ক্ষতি না হয় ইত্যাদি ছটি বর তিনি শক্রের কাছে চাইলেন।

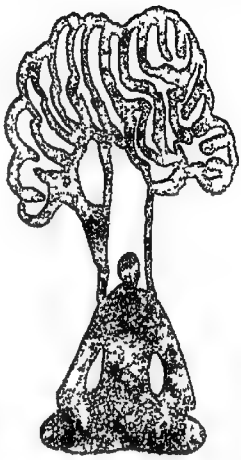

শঙ্খ জাতক

অতীত কালে বারাণসীর নাম ছিল মোলিনী। ব্রহ্মদত্তের আমলে এই মোলিনী নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন, তাঁর নাম শঙ্খ। ব্রাহ্মণ নগরের চারদিকে, নগরের মাঝখানে আর নিজের বাড়ির পাশে ছটি দানশালা বানিয়েছিলেন। প্রত্যেক দিন দুঃস্থ গরিবদের তিনি হাজার হাজার টাকা দান করতেন।

শঙ্খ একদিন মনে মনে ভাবতে লাগলেন এভাবে দান করলে আমার সম্পত্তি ফুরিয়ে যাবে, তখন দান বন্ধ করতে হবে। আরও ধন-সম্পত্তি উপার্জন করতে পারলে তবেই এভাবে দান করা সম্ভব। তাহলে কোন দিনই দানশালার দরজা বন্ধ করতে হবে না। যেভাবেই হোক দানশালাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। পূর্ব উপদ্বীপে বাণিজ্য করতে যেতে হবে।

শঙ্খ নৌকো সাজালেন। নৌকোয় মাল তোলা হল। তারপর স্ত্রী-পুত্রকে ডেকে বললেন, 'আমি না ফেরা পর্যন্ত তোমরা দানশালা বন্ধ কোরো না।' তার পরদিন লোকজন সঙ্গে নিয়ে নদীর ঘাটের দিকে চললেন। তখন মাঝ দুপুর। শঙ্খের হাতে ছাতা। পায়ে খড়ম দিয়ে শঙ্খ চলেছেন।

ঠিক তখন এক সিদ্ধ পুরুষ গন্ধমাদন পর্বতে বসে অনুভব করলেন শঙ্খ বাণিজ্যে যাচ্ছেন। তিনি চিন্তা করে দেখলেন শঙ্খ সমুদ্রে পৌঁছলে তাঁর বিপদ দেখা দেবে। কারুকাজ করা মণিমুক্তা বসানো তাঁর নৌকোটি ডুবে যাবে। সিদ্ধ পুরুষ দেখলেন শঙ্খকে বাঁচানোর একটাই উপায় আছে। যদি শঙ্খ তাঁকে পাদুকা দান করেন, তাহলে তাহলে শঙ্খ ঐ বিপদে রক্ষা পাবেন।

সিদ্ধপুরুষ আকাশপথে চললেন। একটু দূরে গেলে গরম বালিতে খালি পায়ে হেঁটে তিনি এগিয়ে চললেন। শঙ্খ তাঁকে দেখে ভাবলেন, ওই তপস্বী আমার প্রণম্য। তিনি তাঁকে সমাদর করে একটি গাছের তলায় আসন পেতে বসালেন। নিজের হাতে তাঁর পা-দুটি ধুইয়ে দিলেন। তারপর তাঁকে ছাতা এবং নিজের পাদুকা দান করলেন।

এ ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে শঙ্খ মাঝসমুদ্রে পড়লেন। তখন হঠাৎ তাঁর নৌকোর তলায় ফুটো দেখা দিল। সেখান দিয়ে জল ঢুকতে লাগল। কিছুতেই জল সেঁচে ফেলা সম্ভব হচ্ছে না দেখে শঙ্খ সারা গায়ে তেল মাখলেন, একজন অনুচরকেও তেল মাখতে বললেন। তারপর ঘিয়ে চিনি মিশিয়ে দুজনেই অনেকটা খেয়ে নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

এক সপ্তাহ তাঁরা সাঁতার কেটে চললেন। সমুদ্রের মধ্যে ঐ অবস্থায়ও শঙ্খ জপতপ করলেন। ধ্যান করলেন।

ঐ সময় মণিমেখলা নামে এক দেবী ছিলেন সমুদ্র বন্দিনী। তাঁর ওপর নির্দেশ ছিল দানশীল, তপোবল আছে, বাবা-মাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে এখন কেউ সমুদ্রে বিপদে পড়লে তাকে রক্ষা করতে হবে। প্রথম এক সপ্তাহ মণিমেখলা নিজের কাজ ভুলে ছিলেন। পরে যেই দেখলেন এক সৎ ব্রাহ্মণ বিপদে পড়েছেন তখন তাঁকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এলেন।

মণিমেখলা প্রথমে তাঁর কাছে খাদ্য নিয়ে এলেন : তুমি সাত দিন না খেয়ে আছ, এই খাবারটা খেয়ে নাও।

শঙ্খ বললেন : আমি উপবাস ব্রত পালন করছি, এখন খেতে পারব না।

শঙ্খের অনুচর ভাবল, ব্রাহ্মণ সাতদিন অনাহারে থেকে, এত কষ্ট পেয়ে এখন প্রলাপ বকছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'প্রভু, কার সঙ্গে কথা বলছেন?' শঙ্খ বুঝলেন লোকটা দেবীকে দেখতে পাচ্ছে না। তিনি তাকে বললেন সমুদ্র বন্দিনী এসেছেন।

উনি কি মানবী, না দেবী?

উনি দেবী।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত শঙ্খ এবং তাঁর অনুচর বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন। দেবী তাঁদের একটি বিশাল নৌকো দিলেন। অঢেল সম্পদ দিলেন। শঙ্খের উদ্দেশ্য সফল হল। দানশালা চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত রইল।

ন্যগ্রোধ জাতক

অতীতকালে রাজগৃহে মগধ মহারাজ নামে এক রাজা ছিলেন। রাজগৃহের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী সেই সময় আর এক ব্যবসায়ীর মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দেন। বিয়ের পর অনেক দিন কেটে গেল। কিন্তু তাঁর ছেলের বৌর কোন ছেলেমেয়ে হল না। তাঁরা তখন ভাবলেন, 'বৌ বাঁজা।' বলে বৌ-র আদর যত্ন কমল।

ছেলের বৌ দেখল এরকম চললে সে আর কোনদিনই আদরযত্ন ফিরে পাবে না। তাই সে রটিয়ে দিল, 'আমি মা হতে চলেছি।' তারপর কিছুদিন পরে সে শ্বশুর-শাশুড়ির মত নিয়ে বাপের বাড়ি রওনা হল। রাস্তায় সে এক নবজাতককে কুড়িয়ে পেল। কিছুক্ষণ আগেই ঐ নবজাতকের জন্ম হয়েছিল। নবজাতক আর কেউ নন, স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। ছেলেকে নিয়ে সে শ্বশুর বাড়িতে ফিরে এল। ছেলের নাম হল ন্যগ্রোধকুমার।

ঠিক ঐদিন নগরের আর এক ব্যবসায়ীর একটি ছেলে হয়, তার নাম রাখা হয় শাধকুমার। সেদিন এক দরিদ্রেরও একটি ছেলে হয়, তার নাম রাখা হল পৌত্তিক। রাজগৃহের ব্যবসায়ী ঐ দুটি শিশুকেও নিজের বাড়িতে আনালেন। তিনটি শিশু একসঙ্গে বড় হতে থাকল। তাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব জন্মাল। তারা একই গুরুর কাছে শাস্ত্র শিক্ষা সম্পূর্ণ করল।

শিক্ষা শেষ করে তাঁরা তক্ষশিলা থেকে বেরিয়ে এলেন লোকচরিত্র জানার জন্য। নানা জায়গায় ঘুরে শেষে বারাণসীতে পৌঁছলেন। সেখানে এক মন্দিরের মধ্যে থাকতেন। যখনকার এই ঘটনা, তার ছদিন আগে বারাণসীর দেহ রেখেছেন। নগরে প্রচার করা হল, রাজার খোঁজে আগামীকাল স্বচ্ছ রথ বের করা হবে।

তিন বন্ধু গাছের তলায় শুয়ে আছেন। পৌত্তিক খুব ভোরে উঠে ন্যগ্রোধকুমারের পা টিপছিল। ঐ গাছে কয়েকটা মুরগী থাকত। একটা মুরগী আরেকটি মুরগীর গায়ে মলত্যাগ করল। এতে অপর মুরগীটি রেগে গেল।

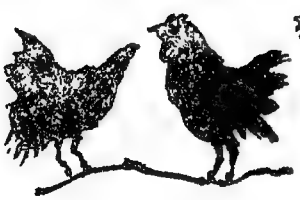

গায়ে কি পড়ল রে?

রাগ করিস নে ভাই।

তবে রে, জানিস আমি কে। আমার কি ক্ষমতা জানিস?

বললাম তো, না জেনে ফেলেছি। বল দেখি তোর কি ক্ষমতা।

আমার মাংস যে খাবে সে এক হাজার টাকা পাবে।

এই মুরোদ। শোন তবে, আমার মুণ্ডু যে খাবে সে রাজা হবে।

ধড় যে খাবে সে সেনাপতি হবে, ঠ্যাং খেলে হবে ভাণ্ডারিক।

পৌত্তিক গাছে উঠে মুরগীটাকে ধরল। তারপর কেটে রান্না করল। ন্যগ্রোধকে দিল মাথাটা, শাধকুমারকে দিল ধড়, নিজে ঠ্যাংগুলো খেল। তারপর বন্ধুদের কাহিনীটি খুলে বলল।

তিন বন্ধু তারপর বারাণসীতে ঢুকলেন। সেখানে রাজার বাগানে গিয়ে ন্যগ্রোধ শুয়ে রইলেন। দু পাশে রইল দুই বন্ধু। পুষ্পক রথ এসে বাগানের বাইরে থেমে গেল। রাজপুরোহিত বুঝলেন, 'নিশ্চয়ই বাগানের মধ্যে কোন সুলক্ষণযুক্ত পুরুষ আছেন। বাগানে ঢুকে ন্যগ্রোধকে দেখে প্রথমেই তাঁর পায়ের চলা দেখলেন। সেখানে এমন সব লক্ষণ ছিল যাতে ঐ লোকটি সমগ্র জম্বু দ্বীপের রাজা হতে পারেন পুরোহিতের এ রকম বিশ্বাস হল।

ন্যগ্রোধ রাজা হয়ে শাধকুমারকে সেনাপতি করলেন। পৌত্তিকও সঙ্গে থাকলেন। কিছু কাল রাজ্য পরিচালনা করার পর ন্যগ্রোধের বাবা-মার জন্য মন খারাপ হল। তিনি শাধকুমারকে বললেন, 'ভাই-আমাদের সকলের বাবা-মাকে এখানে নিয়ে এস।' কিন্তু শাধকুমার বললেন, 'এটা আমার কাজ নয়।' শেষ পর্যন্ত পৌত্তিককে পাঠান হল।

পৌত্তিক তিন জনের বাবা-মার কাছেই গেলেন, কিন্তু তাঁরা কেউই বারাণসীতে আসতে রাজি হলেন না। তখন তিনি আবার ফেরার পথ ধরলেন। বারাণসীতে এসে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, 'সামনেই শাধকুমারের বাড়ি, একটু জিরিয়ে নিই এখানে।' শাধকুমারের বাড়িতে এসে তিনি খবর পাঠালেন: 'ভাই, বল শাধকুমারের বন্ধু পৌত্তিক এসেছে।'

শাধকুমার মনে মনে পৌত্তিকের ওপর রেগেছিলেন। কেননা পৌত্তিক যদি তাঁকে মুরগীর মাথাটা খেতে দিত, তাহলে আজ সে রাজা হতে পারত। শাধকুমার পৌত্তিককে চাকর দিয়ে মার খাওয়ালেন, মুখে বললেন, 'এই মিথ্যুককে মার।'

পৌত্তিক ন্যগ্রোধকে সমস্ত ঘটনা জানালেন। শাধকুমারের সামনেই। শাধকুমার কোন জবাব দিতে পারলেন না। ন্যগ্রোধ তখন শাধকুমারকে প্রাণদণ্ড দিলেন অকৃতজ্ঞতার অপরাধে।

পৌত্তিক বলল, 'বন্ধু, আপনি ওঁকে ক্ষমা করুন। আমি আঘাত পেয়েছি ওর ব্যবহারে। তাই বলে ওর মৃত্যু চাই না।' ন্যগ্রোধ পৌত্তিকের অনুরোধে শাখকে মার্জনা করলেন। পৌত্তিককে দিলেন ভাণ্ডারিকের পদ।

মহাধর্মপাল জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীরাজ্যে ধর্মপালগ্রাম নামে একটি গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে ধর্মপাল বংশ বাস করত বলেই গ্রামটির নাম হয়েছিল ধর্মপালগ্রাম। ধর্মপালের বাড়ির আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব থেকে চাকরবাকর পর্যন্ত সবাই ধর্মপথে চলত। বোধিসত্ত্ব একবার ঐ পরিবারে জন্ম নেন। তখন তাঁর নাম হয় ধর্মপালকুমার।

ধর্মপালকুমারকে তাঁর বাবা তক্ষশিলা পাঠালেন লেখাপড়া শেখার জন্য। ধর্মপাল যে আচার্যের কাছে শাস্ত্র পাঠ করতেন, তাঁর পাঁচশ ছাত্র ছিল, ধর্মপাল ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হঠাৎ একদিন আচার্যের বড় ছেলে মারা গেল। ছেলেকে দাহ করতে আচার্য জ্ঞাতি এবং শ্মশানযাত্রী ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে চললেন। সবাই কাঁদছিল, শুধু ধর্মপালকুমারের চোখে জল নেই। শ্মশান থেকে ফিরে ছাত্রবন্ধুরা বলতে লাগল, 'আহা, এত কম বয়সে তরুণ অবস্থায় বেচারা মারা গেল!'

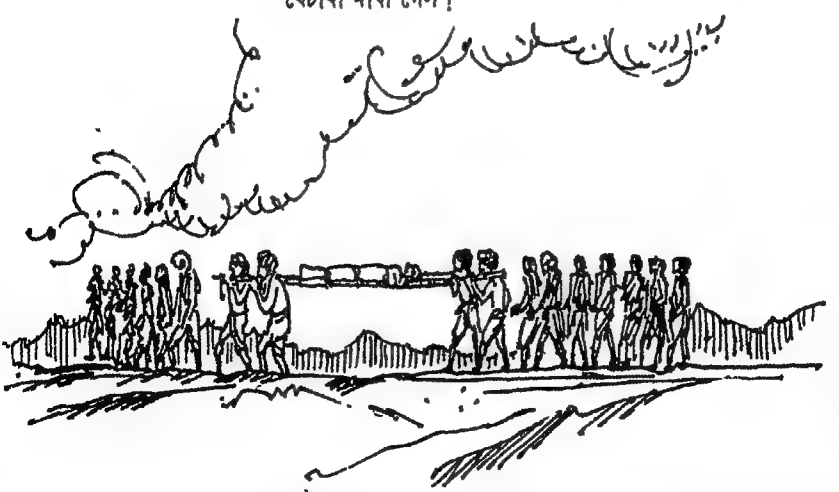

ধর্মপাল জিজ্ঞাসা করলেন : তরুণ হলে মারা যায় কি করে ?

ছাত্রবন্ধুরা বলল : কেন ভাই, তুমি কি জান না মানুষ মরণশীল ?

ধর্মপাল : মরণশীল ঠিকই। কিন্তু মৃত্যু হয় বার্ধক্যে।

ছাত্রবন্ধুরা : সংসার অনিত্য, জন্মালে মরতেই হয়।

ধর্মপাল : কিন্তু তরুণ বয়সে মরবে কেন ?

ছাত্রবন্ধুরা : তোমাদের বয়সে কি কেউ তরুণ বয়সে মরেন নি ?

ধর্মপাল : না, এটাই আমাদের বংশের রীতি।

আচার্যের কানে গেল কথাটা। তিনি ধর্মপালকে ডেকে জানতে চাইলেন : 'এ কথা কি সত্যি, তোমাদের বংশে কেউ কম বয়সে মরেন না ?' ধর্মপাল জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ আচার্য।' আচার্য বললেন : 'খুবই আশ্চর্য কথা। আর এ কথা সত্যি হলে আমি তোমাদের বংশের ধর্মই পালন করব।'

কিছু দিন পরে আচার্য ধর্মপালকে বললেন : বাছা, আমি এক বিশেষ কাজে দিনকয়েক বাইরে থাকব। তুমি সেই সময় শিষ্যদের শিক্ষা দিও।

তারপর তিনি একটা ছাগলের হাড়গোড় থলের মধ্যে পুরে ধর্মপালগ্রামের উদ্দেশে রওনা হলেন।

আচার্য ধর্মপালের বাড়ির কাছে গিয়ে খবর পাঠালেন : বল, ধর্মপালকুমারের আচার্য এসেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে লোকজন ছুটে এল তাঁকে আপ্যায়ন করতে। কেউ তাঁর হাত থেকে ছাতাটি নিল, কেউ তাঁর হাতের থলিটি নিল। তারপর তাঁর হাত-পা ধুইয়ে তাঁরা তাঁকে ভক্তির সঙ্গে বসতে আসন দিলেন।

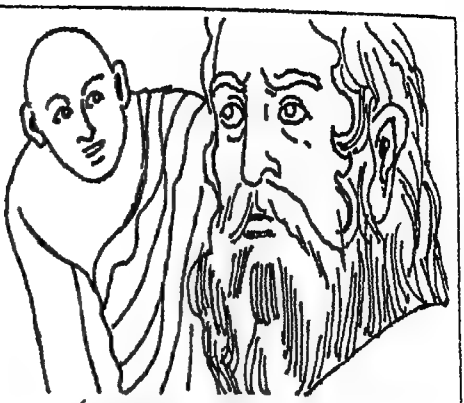

আচার্য দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে ধর্মপালকুমারের বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে বললেন : আপনার ছেলে ছিল আমার ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হঠাৎ এক কাল ব্যাধি তাকে শেষ করেছে। আমি এই দুঃসংবাদ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

এ কথা শোনা মাত্র গৃহস্বামী হো হো করে হেসে উঠলেন। তখন আচার্য জানতে চাইলেন : 'আপনি হাসছেন কেন?' ধর্মপালের বাবা তখন বাড়ির সবাইকে ডেকে বললেন, 'শুনে যাও আচার্য কি বলছেন।' শুনে তাঁরাও হাসতে লাগলেন।

আচার্য তখন ছাগলের হাড় বের করে বললেন, 'তাহলে এই দেখুন ধর্মপালকুমারের অস্থি।' গৃহস্বামী তাতেও অটল। তিনি বললেন, 'ছাগল-কুকুরের হাড় হবে ওটা, আমার ছেলের নয়। আমাদের বংশে একশ বছরের মধ্যে কেউ তরুণ বয়সে মারা যায় নি।'

আচার্য তখন সব কথা স্বীকার করলেন। বললেন, পরীক্ষা করার জন্যই তিনি এই কৌশল নিয়েছিলেন। তারপর নিজের পুত্রশোকের কথা গোপন করলেন না। শেষে ধর্মপালকুমারের বাবার কাছে তাঁর ধর্মচর্চা জেনে নিলেন। বললেন, 'এবার থেকে আমিও এই পথেই চলব।'

ঘট জাতক

পুরাকালে উত্তরাপথে কংসভোগ নামে একটি দেশ ছিল। সেখানে মহাকংস নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল

অসিগঞ্জন। কংসভোগের দুই ছেলে: কংস আর উপকংস। মেয়ে একটি মাত্র, তাঁর নাম দেবগর্ভা।

দেবগর্ভার জন্মের পর জ্যোতিষীরা গণনা করে বলেছিলেন, 'দেবগর্ভার ছেলে কংসরাজ্য ধ্বংস করবে।' মহাকংস এই সাংঘাতিক গণনা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু দেবগর্ভা তাঁর একমাত্র মেয়ে। বাবা হয়ে তিনি মেয়েকে হত্যা করতে পারেন না। মহাকংস ভাবলেন, 'দেবগর্ভার ভাইবাই বরং ঠিক করবে কি করা উচিত।'

যথাসময়ে মহাকংস বৃদ্ধ হলেন। ইহজগৎ ত্যাগ করলেন। কংস আর উপকংস রাজা হলেন। দু ভাই অনেক বিবেচনা করে দেখলেন, 'বোনকে হত্যা করলে সবাই আমাদের নিন্দে করবে। বরং এক কাজ করা যাক, বোনের বিয়ে দেব না।' এভাবে তাঁরা একটি স্তম্ভের ওপর একটি প্রাসাদ বানালেন। দেবগর্ভাকে রাখা হল সেই প্রাসাদের মধ্যে। নন্দগোপা নামে এক পরিচারিকাকে দেবগর্ভার দেখাশোনার ভার দেওয়া হল।

সেই সময় উত্তর মথুরায় মহাসাগর নামে এক রাজা ছিলেন। মহাসাগরের দুই ছেলে। বড় ছেলের নাম সাগর, ছোট ছেলের নাম উপসাগর। মহাসাগরের মৃত্যুর পর সাগর রাজা হলেন। উপসাগর একটি মারাত্মক অন্যায় করলেন। সাগর তাঁকে শাস্তি দেবেন ঠিক করলেন। উপসাগর প্রাণের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালালেন।

উপসাগরের সঙ্গে উপকংসের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। কারণ তাঁরা দুজনে একই গুরুর কাছে শাস্ত্র শিখেছেন। উপসাগর এই বিপদের দিনে উপকংসের কাছে আশ্রয় চাইলেন। উপকংস উপসাগরকে নিয়ে গিয়ে কংসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। কংস তাঁকে বেশ সম্মান দেখালেন। নগরে তাঁকে থাকার অনুমতি দিলেন।

উপসাগর একদিন রাজসভায় যাওয়ার সময় সেই এক স্তম্ভের প্রাসাদটি দেখলেন। সঙ্গের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন: এ প্রাসাদ কার?

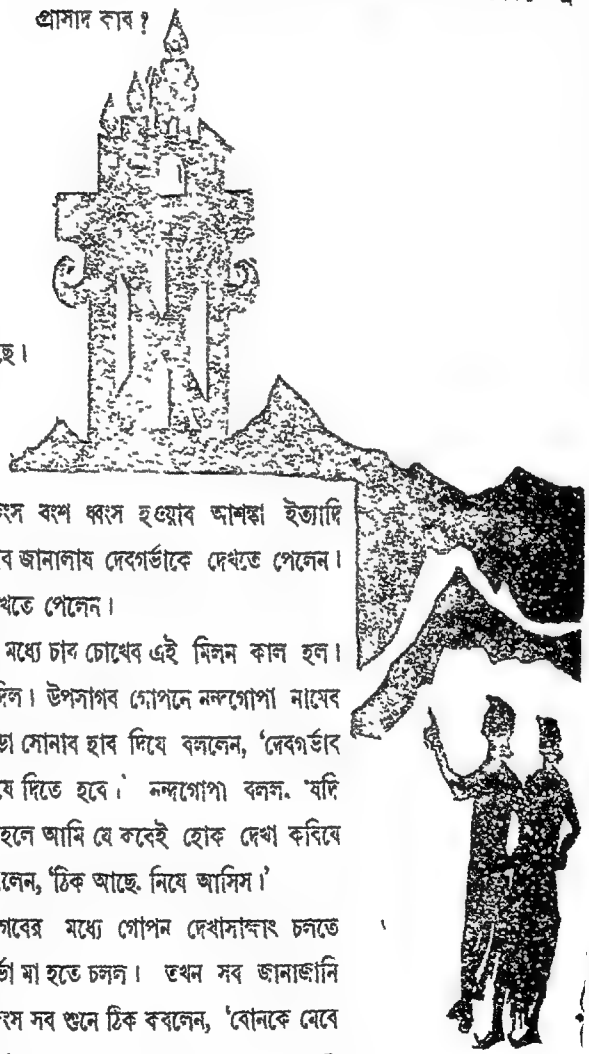

দেবগর্ভার।

তিনি কে?

কংসরাজের বোন।

এখানে থাকেন কেন?

এঁকে ঘরে বন্দী করা হয়েছে।

কেন?

তারপর উপসাগর কংস বংশ ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা ইত্যাদি জানতে পারলেন। আবার জানালায় দেবগর্ভাকে দেখতে পেলেন। দেবগর্ভাও উপসাগরকে দেখতে পেলেন।

এভাবে ওঁদের দুজনের মধ্যে চার চোখের এই মিলন কাল হল। দুজনের মধ্যে প্রণয় দেখা দিল। উপসাগর গোপনে নন্দগোপা নামের ঐ পরিচারিকাকে এক ছড়া সোনার হার দিয়ে বললেন, 'দেবগর্ভার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিতে হবে।' নন্দগোপা বলল, 'যদি দেবগর্ভা রাজি থাকে, তাহলে আমি যে করেই হোক দেখা করিয়ে দেব।' শুনে দেবগর্ভা বললেন, 'ঠিক আছে, নিয়ে আসিস।'

দেবগর্ভা আর উপসাগরের মধ্যে গোপন দেখাসাক্ষাৎ চলতে লাগল। এক সময় দেবগর্ভা মা হতে চলল। তখন সব জানাজানি হয়ে গেল। কংস ও উপকংস সব শুনে ঠিক করলেন, 'বোনকে মেরে ফেলে লাভ নেই। দেখা যাক ছেলে হয় না মেয়ে হয়। মেয়ে হলে তো আর কোন চিন্তা নেই।'

দেবগর্ভার একটি মেয়ে হল। কংস উপকংস এতে খুব খুশি হলেন। তাঁরা মেয়েটির নাম রাখলেন অঞ্জনা দেবী। তারপর তাঁরা বোন-ভগ্নীপতিকে একটি গ্রাম লিখে দিলেন। উপসাগর দেবগর্ভার সঙ্গে গোবর্ধমান নামের সেই গ্রামটিতে বসবাস করতে লাগলেন।

কিছু দিন পরে দেবগর্ভা আবার মা হতে চললেন। তখন নন্দগোপাও মা হতে চলেছে। দুজনে একই দিনে মা হলেন। কিন্তু এবার দেবগর্ভার ছেলে হল। নন্দগোপার মেয়ে হল। ভাইদের হাত থেকে ছেলেকে বাঁচানোর জন্য দেবগর্ভা নন্দগোপার মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলেকে বদলে নিলেন। ভাইরা যখন দেখলেন দেবগর্ভার মেয়ে হয়েছে তাঁরা আবার খুশি হলেন।

এভাবে দেবগর্ভার দশটি ছেলে আর নন্দগোপার দশটি মেয়ে হল। যদিও তাঁরা প্রত্যেক বার বদলে নিলেন বলে সকলে জানল দেবগর্ভার দশটি মেয়ে হয়েছে। নন্দগোপার কাছে দেবগর্ভার যে ছেলেরা বড় হতে লাগল তাদের যথাক্রমে নাম হল : বাসুদেব, বলদেব, চন্দ্রদেব, সূর্যদেব, অগ্নিদেব, বরুণদেব, অর্জুন, প্রদ্যুম্ন, ঘটপণ্ডিত এবং অঙ্কুর। সবাই তাদের অন্ধ কবিঞ্চু দাসের ছেলে বলে জানত। তাই একসঙ্গে তাদের 'দাস দশ ভেয়ে' বলে ডাকা হত।

বড় হয়ে এই দশ ভেয়ের গায়ে অসুরের মত জোর হল। স্বভাব হল অত্যন্ত নির্দয়। তারা ডাকাতি করে বেড়াত। ভিনদেশী রাজা আর প্রজারা কংস-উপকংসের জন্য কোন উপহার নিয়ে যেতে থাকলে তারা রাস্তায় হামলা করে সেসব কেড়ে নিত।

তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রজারা রাজার কাছে দরবার করল।

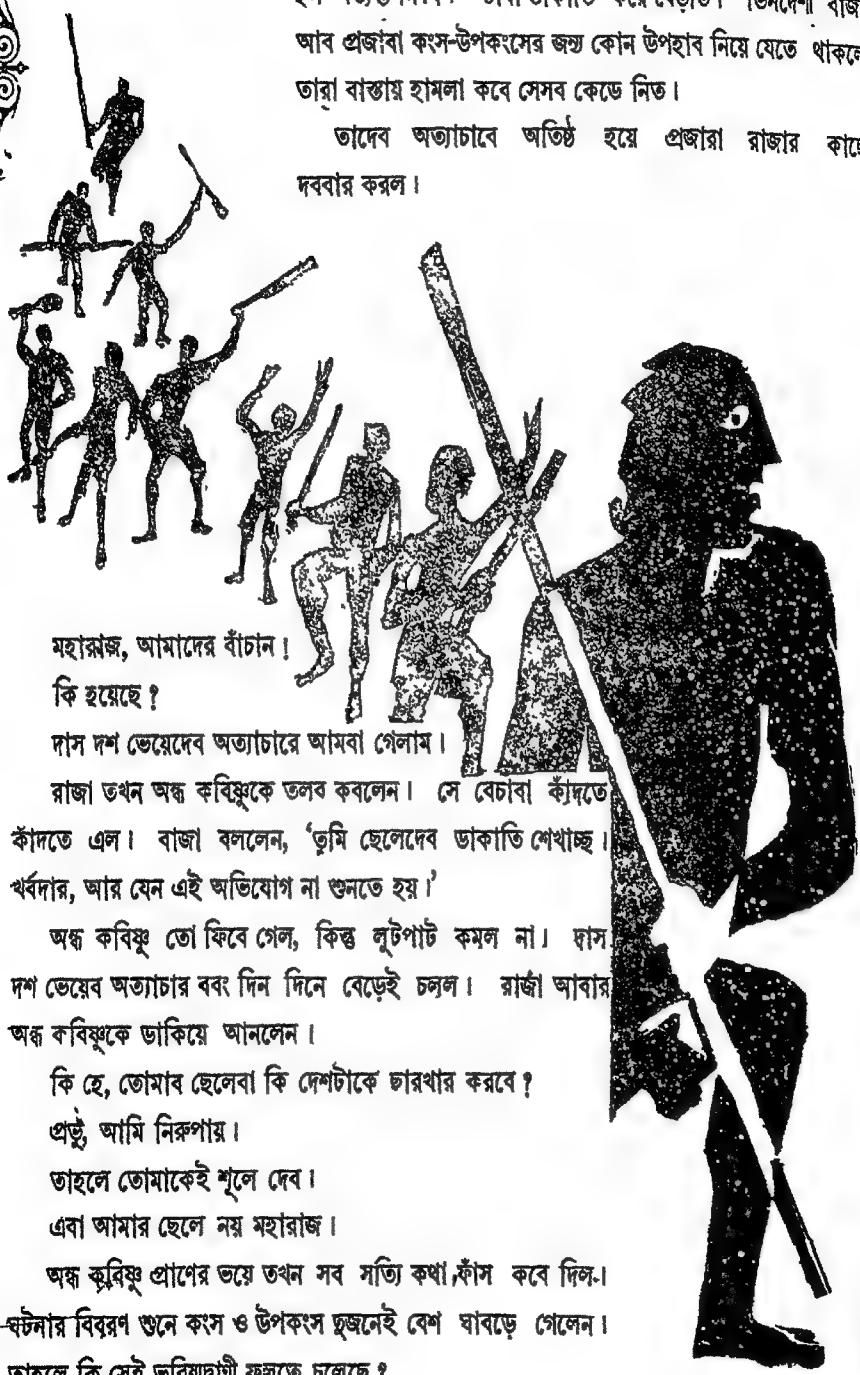

মহারাজ, আমাদের বাঁচান!

কি হয়েছে?

দাস দশ ভেয়েদের অত্যাচারে আমরা গেলাম।

রাজা তখন অন্ধ কবিষ্ণুকে তলব করলেন। সে বেচারা কাঁদতে কাঁদতে এল। রাজা বললেন, 'তুমি ছেলেদের ডাকাতি শেখাচ্ছ। খবর্দার, আর যেন এই অভিযোগ না শুনতে হয়।'

অন্ধ কবিষ্ণু তো ফিরে গেল, কিন্তু লুটপাট কমল না। দাস দশ ভেয়ের অত্যাচার বরং দিন দিনে বেড়েই চলল। রাজা আবার অন্ধ কবিষ্ণুকে ডাকিয়ে আনলেন।

কি হে, তোমার ছেলেরা কি দেশটাকে ছারখার করবে?

প্রভু, আমি নিরুপায়।

তাহলে তোমাকেই শূলে দেব।

এরা আমার ছেলে নয় মহারাজ।

অন্ধ কবিষ্ণু প্রাণের ভয়ে তখন সব সত্যি কথা ফাঁস করে দিল। ঘটনার বিবরণ শুনে কংস ও উপকংস দুজনেই বেশ ঘাবড়ে গেলেন। তাহলে কি সেই ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে চলেছে?

রাজার পরামর্শদাতারা অনেক আলোচনা করে রাজাকে বলল, 'প্রভু, এই দস্যুরা কুস্তি লড়তে খুব ভালোবাসে। আপনি মল্লযুদ্ধের আয়োজন করুন। আমাদের চামুর আর মুষ্টিক নামে যে দুজন ভয়ঙ্কর মোল্লাযোদ্ধা আছে তাদের দিয়ে এদের শেষ করে ফেলুন।' রাজার মনে ধরল কথাটা। তিনি ঘোষণা করে দিলেন, 'আজ থেকে সাত দিনের মাথায় এখানে মল্লযুদ্ধ হবে।' রাজপুরীর সামনে বিশাল সামিয়ানা টাঙানো হল।

সারা রাজ্যের লোক ভেঙ্গে পড়ল মল্লযুদ্ধ দেখার জন্য। চামুর আর মুষ্টিক মঞ্চে ঢুকে খুব লম্ফঝম্ফ করছে। এমন সময় বে বে করে সেই দশ ভাই এসে পড়ল। আসার সময় তারা ধোপাপাড়া লুঠ করে

রঙিন কাপড় পরেছে। মালীপাড়া লুট করে ফুলের মালা গলায় গলিয়েছে। বীরের হুঙ্কারে দশ ভাই মঞ্চে ঢুকল।

চামুর তখন খুব আস্ফালন করছিল। প্রথমে বলদেবই চামুরের মুখোমুখি হল। সে ঠিক করল, 'আমি একে হাত দিয়েও ছোঁব না।' সে হাতিশাল থেকে একটা দড়ি আনাল। তারপর চামুরকে সেই দড়ির ফাঁসে আটকে তুলে আছাড় মারল। চামুর মারা গেলে মুষ্টিক এল। বলদেব তার দু চোখ কানা করে দিল। তারপর তার হাড় গুঁড়িয়ে ফেলার যোগাড় করল। মুষ্টিক প্রাণভয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'আমি কুস্তিগীর নই, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি কুস্তিগীর নই।' বলদেব বলল, 'সে আমার দেখার দরকার নেই, সঙ্গে এসেছ, এখন মর।' বলে তাকে এমন আছাড় মারল যে মুষ্টিক সেখানেই প্রাণত্যাগ করল।

মৃত্যুর সময় মুষ্টিক প্রার্থনা করেছিল, 'আমি যেন যক্ষ হয়ে জন্মাই, আর বলদেবের মাংস ছিঁড়ে খেতে পারি।' মুষ্টিক তাই হল, সে যক্ষ হয়ে কালমাটি নামে একটি গ্রামে বাস করতে লাগল। ওদিকে দশ ভাইকে মারতে তখন রাজার সেপাই ছুটেছে। কিন্তু দশ ভাইর কাছে তারা মার খেয়ে পালাল। দশ ভাই তাদের মেরে ফেলল। অসিগঞ্জন নগর দখল করে নিল।

দশভেয়েরা রাজা হয়ে বাবা-মাকে নিয়ে এল রাজপ্রাসাদে। তারপর জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হওয়ার জন্য তারা বিজয় অভিযানে বেরিয়ে পড়ল। কয়েক দিনের মধ্যে কালসেন রাজাকে হারিয়ে অযোধ্যা অধিকার করল। রাজাকে বন্দী করল। এরপর তারা রওনা হল দ্বারাবতীর দিকে।

দ্বারাবতীর একদিকে পাহাড়, আরেক দিকে সমুদ্র। দ্বারাবতী এক অদ্ভুত নগর। এক যক্ষ দ্বারাবতী পাহারা দিত। শত্রু আসছে দেখলে সে ডাক ছাড়ত। সঙ্গে সঙ্গে দ্বারাবতী শূন্যে উঠে সমুদ্রের মাঝখানে এক দ্বীপে গিয়ে নামত। দশভেয়েরা যত বার আক্রমণ করল তত বারই এই কাণ্ড ঘটল।

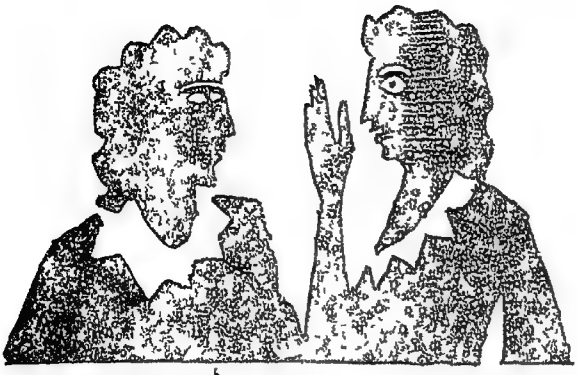

দশভেযেবা তখন কৃষ্ণ দ্বৈপাযনেব তপস্যা কবতে লাগল। কৃষ্ণ দ্বৈপাযন তাদেব তপস্যায খুশি হলেন। তিনি তাদেব বললেন, 'দ্বারাবতীর পবিখাব কাছে একটা গর্দভ চবছে দেখতে পাবে। তোমবা তার পায়ে গিযে পড।' দশভেযেবা তাই কবল। গাধা বলল,

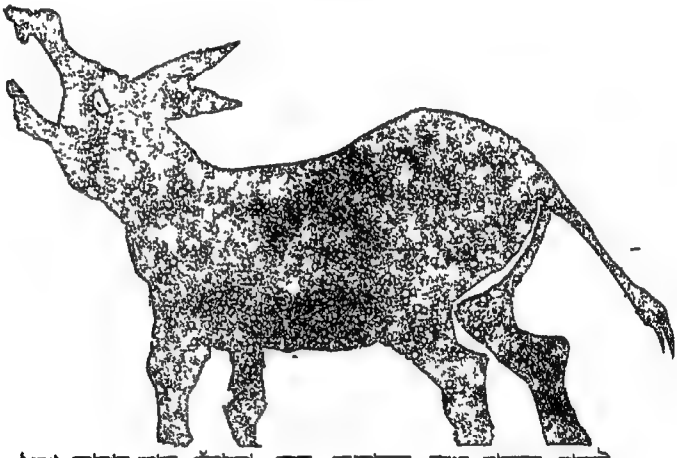

'দেখ, আমাব কাজ চেঁচানো, তবে তোমাদেব মধ্যে চাবজন চাবটে লোহাব লাঙল নিযে এসে নগবীব চাব পাশে গর্ত কবে লোহাব থাম গেঁথে ফেলবে, তাবপব লোহাব শিকল দিযে লাঙল চাবটেকে ঐ গ্রামেব সঙ্গে বেঁধে বাখবে। আমি ডাক ছাডলে যেই নগব শূন্যে উঠবে সঙ্গে সঙ্গে লাঙল ছুঁড়ে আটকে ফেলবে, তাহলে নগব আব উঠতে পারবে না।'

ঠিক ঠিক ঐভাবে কাজ করার ফলে নগব উঠতে পাবল না। দশভেযেবা তখন নগবের ভেতব ঢুকে রাজাকে মেরে ফেলল। রাজ্য দখল কবে নিল।

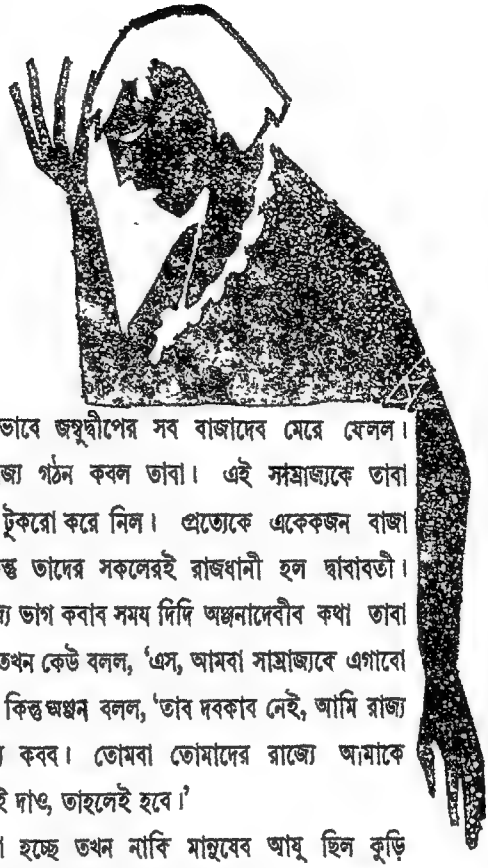

দশভেয়েরা এভাবে জম্বুদ্বীপের সব রাজাদের মেরে ফেলল। বিশাল এক সাম্রাজ্য গঠন করল তারা। এই সাম্রাজ্যকে তারা নিজেদের মধ্যে দশ টুকরো করে নিল। প্রত্যেকে একেকজন রাজা হয়ে বসল। কিন্তু তাদের সকলেরই রাজধানী হল দ্বারাবতী। নিজেদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করার সময় দিদি অঞ্জনাদেবীর কথা তারা ভুলে গিয়েছিল। তখন কেউ বলল, 'এস, আমরা সাম্রাজ্যকে এগারো ভাগ করে নিই।' কিন্তু অঞ্জন বলল, 'তার দরকার নেই, আমি রাজ্য নেব না। বাণিজ্য করব। তোমরা তোমাদের রাজ্যে আমাকে খাজনা থেকে রেহাই দাও, তাহলেই হবে।'

যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন নাকি মানুষের আয়ু ছিল কুড়ি হাজার বছর। তাই কুড়ি হাজার বছর রাজত্ব করার পর দশভেয়ের বাবা-মা গত হলেন।

তারপর বাসুদেবের ছেলে মারা গেল। এতে বাসুদেব শয্যা নিল। সে শোকে এত কাতর হল যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করল।

তখন ঘটপণ্ডিত দেখলেন, 'আমি ছাড়া কেউই এই শোক নিবারণ করতে পারবে না।' এই ভেবে ঘটপণ্ডিত পাগল সাজলেন। 'চাঁদ দাও, চাঁদ দাও' বলে চিৎকার করতে লাগলেন। বাসুদেব ঘটপণ্ডিতকে বলল, 'আকাশের চাঁদ কি পাওয়া যায়? তুমি কি শিশু হয়ে গেলে ঘটপণ্ডিত?'

ঘটপণ্ডিত: চাঁদ দেখতে পাচ্ছেন কিনা?

বাসুদেব: হ্যাঁ, তা পাচ্ছি।

ঘটপণ্ডিত: আপনার পুত্রের যে মৃত্যু হয়েছে তাকে কি দেখতে পাচ্ছেন?

বাসুদেব : না।

ঘটপণ্ডিত : চাঁদ পেতে চাই, চাঁদ আছেও. কিন্তু আপনার পুত্র তো নেই, তার জন্য কি করে শোকার্ত হন? যা নেই, কেউ কি তার জন্য কাঁদে?

ছোট ভাইয়ের উপদেশে বাসুদেবের দুঃখ-শোক শেষ হল। আবার সে রাজ্য শাসনে মন দিল।

এই ঘটনার অনেক দিন পরে, দশভেয়ের ছেলেরা যুক্তি করল: 'আচ্ছা, লোকে বলে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের দিব্যচক্ষু আছে। কিন্তু কেউ পরীক্ষা করে দেখে না। আমরা পরীক্ষা করে দেখব।' তারপর তারা এক কুমারকে এমনভাবে সাজাল, যেন সে এক গর্ভবতী নারী। তারপর তারা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের কাছে তাকে নিয়ে গেল।

বলুন তো, এই নারীর ছেলে হবে না মেয়ে হবে?

তপস্বী বুঝতে পারলেন দশ ভেয়েদের বিনাশের সময় এসে গেছে। তিনি ধ্যানবলে একবার নিজের আয়ু দেখে নিলেন। বুঝতে পারলেন সেদিনই তাঁর মৃত্যু হবে। তারপর তিনি কুমারদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, এই মেয়েটার কথা জেনে তোমাদের কি লাভ?'

সে যাই হোক, আপনি উত্তর দিন।

তাহলে শোন। এ এক টুকরো কাঠ প্রসব করবে। সাত দিন পরে ঐ কাঠের টুকরোটি বাসুদেব বংশ ধ্বংস করবে।

কুমারেরা তখন রাগে অন্ধ হয়ে গেল। তারা তপস্বীর গলায় ফাঁস পরিয়ে তাঁকে হত্যা করল। বাসুদেব যখন জানতে পারলেন কুমাররা তপস্বীকে হত্যা করেছে, তখন তিনি কুমারদের ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'তোমরা কেন তপস্বীকে মারলে?' কুমাররা তখন সমস্ত ঘটনা জানাল। বাসুদেব তখন সেই কুমারটিকে (যাকে স্ত্রী সাজানো হয়েছিল) কঠিন পাহারায় রাখার ব্যবস্থা করল।

সত্যি সত্যি সাতদিনের মাথায় কুমার এক টুকরো কাঠ প্রসব করল। কুমাররা কাঠটা পুড়িয়ে তার ছাই নদীতে ফেলে দিল। ছাই ভাসতে ভাসতে তীরে এসে এক জায়গায় লাগল। সেখানে নল খাগড়ার বন হয়ে গেল।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। দ্বারাবতীর রাজা আর রাজার ছেলেরা সমুদ্রে স্নান করবে বলে একটা মণ্ডপ বানিয়েছে। সেখানে খুব ঘটা করে পানভোজন করল। তারপর তারা খেলাচ্ছলে একে

অন্যকে ধরতে গেল। ক্রমে তারা দু দলে ভাগ হয়ে মিছেমিছি মারামারি শুরু করল। কিছুক্ষণ পরে সেই মারামারি সত্যিকারের মারামারিতে পরিণত হল।

মণ্ডপ বাঁধা হয়েছিল সেই নলখাগড়ার কাছে। মারামারি করতে করতে তারা নলখাগড়ার পাতা ছিঁড়তে লাগল। পাতা তাদের হাতে ওঠামাত্র সেগুলো মুগুর হয়ে যেতে লাগল। একের পর এক তারা সেই মুগুরের আঘাতে প্রাণ দিতে লাগল।

রাজবংশ এভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে বাসুদেব, বলদেব, অঞ্জনা দেবী ও রাজপুরোহিত রথে উঠে পালালেন। বাদবাকি সবাই মারা গেল। বাসুদেবরা রথে করে কালমাটিতে হাজির হল। মুষ্টিক নামে সেই কুস্তিগীর তার প্রার্থনা অনুসারে এখানেই যজ্ঞ হয়ে আছে। বাসুদেব আসছে দেখে সে মায়ার সাহায্যে একটা গ্রাম বানিয়ে ফেলল।

মুষ্টিক সেখানে মল্লবীরের সাজ পরে চিৎকার করতে লাগল, 'কে আমার সাথে লড়বি, চলে আয়।' তা দেখে বলদেব বাসুদেবকে বললেন, 'দাদা, এর বাড়াবাড়িটা বন্ধ করতে হয়। তুমি আজ্ঞা দাও, আমি ওর গর্ব চূর্ণ করি।' বাসুদেব বললেন, 'এখন এই ঘোর বিপদের দিনে এসবের মধ্যে না যাওয়াই ভালো।' কিন্তু কে কার কথা শোনে। বলদেব মুষ্টিকের সামনে যাওয়া মাত্র মুষ্টিক তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলল। অক্লেশে তাকে মূলো খাওয়ার মত পেটে চালান করে দিল।

ভাই মারা যাওয়ার পর তাঁরা সেখান থেকেও পালাতে লাগলেন। এক গ্রামের কাছাকাছি এসে রোন আর পুরোহিতকে বললেন, 'তোমরা গ্রাম থেকে কিছু খাবার নিয়ে এস। আমি এখানে জিরোই।' তারা চলে গেলে এক ব্যাধ দেখল ঝোপের মধ্যে কি যেন নড়ছে। সে তীর ছুঁড়ল। বাসুদেবের গায়ে লাগল সেই তীর। তিনি চিৎকার করে উঠলেন। ব্যাধ পালিয়ে যাচ্ছিল। বাসুদেব তাকে ডাকলেন, 'তোমার নাম কি?' ব্যাধ বলল, 'জরা'। বাসুদেব শুনেছিলেন তিনি জরার হাতে নিহত হবেন। আর সংশয় নেই। ব্যাধকে বললেন, 'তোমার কোন দোষ নেই, জায়গাটা একটু বেঁধে দিয়ে যাও।'

কিছুক্ষণ পরে অঞ্জনা দেবী এবং পুরোহিত খাবার নিয়ে ফিরে

এলেন। বাসুদেবের পক্ষে তখন আর খাওয়া সম্ভব নয়। তিনি তাঁদের বললেন: 'দেখ, আমি মারা যাব কিছুক্ষণের মধ্যেই। তোমরা কখনও খেটে খাও নি। ফলে খাটতে পারবে না। আমি তোমাদের একটা বিদ্যা শিখিয়ে দিতে চাই। তাহলে তোমরা না খেটেও খেতে পারবে।'

অঞ্জনা দেবী এবং পুরোহিতকে গুপ্ত মন্ত্রটি শিখিয়ে বাসুদেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এভাবে একমাত্র অঞ্জনা দেবী ছাড়া উপসাগরের বংশের সবাই শেষ হল।

মাতৃপোষক জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার হাতিকুলে জন্ম নেন। তখন তিনি থাকতেন হিমালয় অঞ্চলে। বোধিসত্ত্বের মা ছিলেন এক অন্ধ হস্তিনী। বোধিসত্ত্বকে দেখতে ছিল অতি সুন্দর। সারা শরীর সাদা। আশি হাজার হাতি ছিল তাঁর অনুচর।

বোধিসত্ত্ব নানারকম ফল-মূল-মধু আহরণ করতেন। তারপর তার কিছুটা ভাগ পাঠাতেন অন্ধ মা-র জন্য। কিন্তু যে হাতিদের ভার ছিল ঐ খাবার-দাবার পৌঁছে দেওয়ার, তারা খুব লোভী বলে নিজেরাই সব খেয়ে ফেলত। যখন বোধিসত্ত্ব জানতে পারলেন মা অনাহারে আছেন, তখন তিনি দলত্যাগ করলেন।

এক রাত্রে অন্য হাতিদের না জানিয়ে, মাকে সঙ্গে নিয়ে চণ্ডোরণ পাহাড়ের দিকে গেলেন। সেই পাহাড়ের তলায় ছিল একটা সুন্দর বনভূমি। আর ছিল স্বচ্ছ জলের একটি সরোবর। বোধিসত্ত্ব মাকে পাহাড়ের গুহায় রেখে দিলেন। নিজে সারাদিন খাবার খুঁজে বেড়াতেন। সন্ধ্যাবেলা গুহায় ফিরে এসে নিজে মাকে খাওয়াতেন। মা-ছেলের মধ্যে ছিল অচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

একদিন বারাণসীর এক কাঠুরে কাঠ কাটতে ঐ বনে ঢুকল। সন্ধ্যেবেলা বেচারা বনে রাস্তা হারিয়ে ফেলল। চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। বোধিসত্ত্ব ভাবলেন লোকটাকে সাহায্য করা উচিত। তিনি তার দিকে এগিয়ে গেলেন। এতে সে আরও ঘাবড়ে গেল। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ভয় পাবেন না ভাই, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। আমি আপনাকে নগরে পৌঁছে দিচ্ছি চলুন।' বোধিসত্ত্ব তারপর সেই কাঠুরেকে পিঠে তুলে নিলেন।

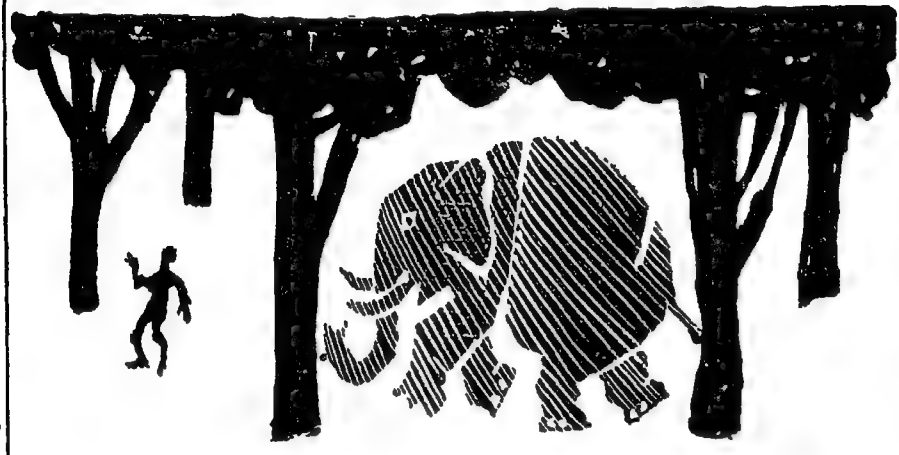

বন পেরিয়ে লোকালয়ে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

কাঠুরেটা ছিল দারুণ শয়তান। বোধিসত্ত্বের সুন্দর চেহারা দেখে সে বুঝেছিল, এ মঙ্গলহস্তী হওয়ার যোগ্য। সেরকম সব সুলক্ষণ এর আছে। সেজন্য সে বন থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তাটা ভালো করে চিনে নিচ্ছিল। পথে কোন্ কোন্ গাছ পড়ছে সে খেয়াল করে রাখল।

তারপর নগরে পৌঁছে সোজা চলে গেল বারাণসীতে। রাজার সঙ্গে দেখা করল। যে সময়ের কথা হচ্ছে ঠিক তখনই রাজার মঙ্গলহস্তী মারা গিয়েছিল। তিনি মঙ্গলহস্তী খুঁজছিলেন। কাঠুরের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে তাঁর ধারণা হল, 'ঐ হাতিটি নিশ্চয়ই সুলক্ষণযুক্ত।'

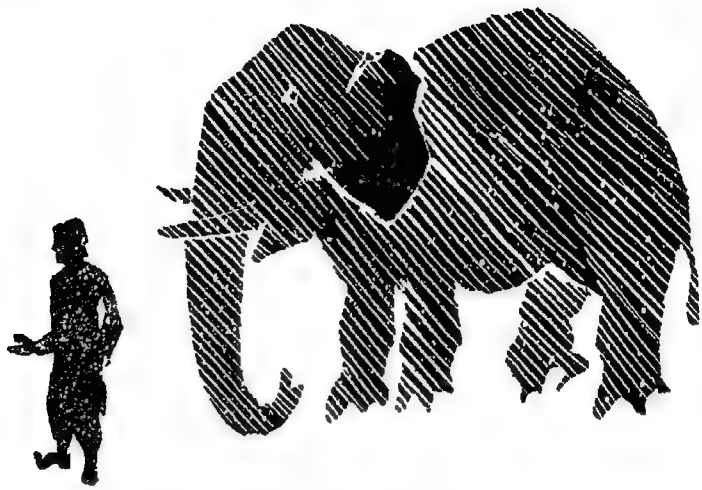

রাজা গজাচার্যকে ডাকিয়ে আনলেন। গজাচার্য কাঠুরের সঙ্গে সেই বনে গেলেন। সঙ্গে লোকলস্করও গেল। বোধিসত্ত্ব তখন সরোবরে স্নান করছিলেন। এদের দেখে বুঝতে পারলেন কাঠুরের উপকার করেই তিনি নিজের সর্বনাশ করেছেন। মনে মনে ভাবলেন, 'আমি ইচ্ছা করলে এদের শুধু নয়, স্বয়ং বারাণসীরাজের রাজ্য ছারখার করতে পারি। কিন্তু তাতে আমি ক্রোধের বশবর্তী হব। আমার পতন ঘটবে। সুতরাং শান্তি বজায় রাখতে হবে।'

গজাচার্য বললেন, 'এস বাছা।' বোধিসত্ত্ব গজাচার্যকে অনুসরণ করলেন। ওদিকে ছেলে ফিরছে না দেখে বোধিসত্ত্বের অন্ধ মা চিন্তা করে বুঝলেন যে, রাজা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। অন্ধ হস্তিনী কাঁদতে লাগলেন।

বোধিসত্ত্বকে খুব আদরযত্ন করে হাতিশালায় রাখা হল। রাজা নিজে তাকে খাওয়ানোর জন্য সুস্বাদু খাবার নিয়ে এলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব কিছুই খেলেন না। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'বাছা, খাচ্ছ না কেন?' বোধিসত্ত্ব তখন মানুষের ভাষায় বললেন, 'আমার মা অন্ধ, তিনি আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলা। আজ তিনি অনাহারে থাকবেন।'

শুনে দয়ালু রাজা বড়ই কষ্ট পেলেন। বোধিসত্ত্বকে মুক্ত করে দিলেন। অন্ধ মা তার ছেলেকে ফিরে পেয়ে বারাণসীরাজার উদ্দেশ্যে অনেক ভাল ভাল কথা বললেন। বললেন: রাজার মঙ্গল হোক!

পানীয় জাতক

কাশীরাজ্যের এক গ্রামে দুই বন্ধু ছিল। তারা এক সঙ্গে ঘটিতে করে জল নিয়ে রোজ চাষ করতে যেত। ক্ষেতে পৌঁছে দুজন দুধারে ঘটিদুটো মাটিতে রেখে কাজে মন দিত।

একদিন দুই বন্ধুর একজন নিজের ঘটি থেকে জল না খেয়ে অন্য বন্ধুর ঘটির জল খেয়ে ফেলল। তারপর সে স্নান করে উঠে ধর্ম স্মরণ করতে গিয়ে ভাবল, 'আজ কি আমি কেবল পাপ করছি?' ভাবতেই মনে পড়ে গেল, 'আজ আমি বন্ধুর ঘটির জল খেয়েছি চুরি করে।'

সেই থেকে সে তৃষ্ণা সম্পর্কে ভাবতে শুরু করল। এই তৃষ্ণা রোজই বেড়ে যাবে। একদিন এই তৃষ্ণায় ডুবেই তার মৃত্যু হবে। এভাবে তার ভাবনা একটার পর একটা ধাপ পেরিয়ে আধ্যাত্মিকতায় পৌঁছে গেল। সে তপস্বী হয়ে গেল।

তখন প্রথম ব্যক্তি এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

চল বাড়ি যাই।

তুমি যাও।

কেন, তুমি কি করবে?

আমি যাব না।

কেন?

আজ থেকে আমি তপস্বী।

তোমাকে তপস্বীর মত তো দেখাচ্ছে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন নিজের মাথায় হাত বোলাল। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার সব চুল পড়ে গেল। গায়ে গৈরিক বসন এসে গেল। তপস্বীদের সমস্ত ভাবই তার মধ্যে দেখা দিল।

দ্বিতীয় গল্প:

কাশী গ্রামের একজন লোক একটা দোকানে বসে ছিল। সে দেখল দোকানের সামনে দিয়ে এক সুন্দরী নারী যাচ্ছে। দেখে লোকটি খুব আকৃষ্ট হল: 'আহা! কি সুন্দর!'

এইটুকু ভেবেই তাব মনে পড়ে গেল সৌন্দর্যতৃষ্ণাকে যদি সে বাড়তে দেয় তাহলে তাব কোন সীমাপবিসীমা থাকবে না। এই তৃষ্ণাব আগুনে পুড়েই তার মৃত্যু হবে।

এই পর্যন্ত ভেবেই সে নিজেকে সংযমী হতে হবে বুঝল। তপস্যা ও ধ্যানবল ছাড়া তা সম্ভব নয়। সে তখনই ধ্যানস্থ হল। তপস্বীর ভাব ফুটে উঠল তাব সর্ব শবীরে।

তৃতীয় গল্প :

বাবা আব ছেলে কুটুম বাড়ি যাচ্ছিল। মাঝপথে একটা বন ছিল। তাদের সেই বনটি পেবিয়ে যেতে হবে। বনটি খুবই বিপজ্জনক। ঐ বনে একদল দস্যু থাকত। তারা বাবা-ছেলেকে পেলে ছেলেকে আটকে বেখে বাবাকে পাঠাত মুক্তিপণ আনতে। দু ভাইকে ধরলে বড় ভাইকে পাঠাত টাকা আনতে। গুরু-শিষ্যকে পেলে গুরুকে পাঠাত মুক্তিপণ আনতে।

বনেব কাছে এসে বাবা ছেলেকে বলল, 'দেখ, দস্যু ধবলে তুই বলবি আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।' দুজন একটু দূবত্ব বেখে বন পেবোতে লাগল। মাঝপথে দস্যুবা তাদের ধবলে ছেলে বাবাব শিখিয়ে দেওয়া কথাটাই বলল। দস্যুবা তাদেব ছেড়ে দিল।

বনভূমি পেবিয়ে ছেলেটি খুব বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ল। মহাপঙ্কে পতিত হয়েছে সে। মিথ্যে কথা বলেছে। একবাব মিথ্যে বললে পবে কত না মিথ্যে কথা বলতে হবে। যে করে হোক এই পাপেব নিষ্পত্তি ঘটাতে হবে। এরকম ভাবতে ভাবতে ছেলেটি দিব্য ভাব অর্জন করল। তপস্বীর সমস্ত লক্ষণ ফুটে উঠল তাব শবীবে।

চতুর্থ গল্প :

কাশীগ্রামেব এক শাসক প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ কবেছিলেন। একদিন অনেক লোক একজোট হয়ে তাঁব কাছে দববাব কবতে গেল।

প্রভু, আজ বলিদানের যোগ।

তাতে কি হয়েছে?

আমাব পশু বলি দিতে চাই, আপনি অনুমতি দিন।

ঠিক আছে।

তারা ফিবে গিয়ে মহানন্দে পশুহত্যা শুরু করল।

এক বেলার মধ্যে মাংসেব স্তূপ জমা হল। মাংসের ঐ স্তূপ দেখে রাজা খুব বিপন্ন বোধ কবলেন। অন্যমনস্কভাবে যে ব্যাপাবে তিনি সম্মতি দিযেছিলেন তা যে এত ভযাবহ এ কথা আগে ভাবতে পাবেন নি।

'আমাব মুখের একটা কথায এত কাণ্ড ঘটেছে', তিনি ভাবলেন। মনে মনে একটা কথাই জপ কবে বললেন, 'প্রাণিহত্যাব জন্য আমিই দাযী।' মন্ত্র উচ্চাবণের মত এই কথা আর পাপবোধে কষ্ট পাওয়া মাত্রই তাঁব মধ্যে দিব্য ভাবেব জন্ম হল।

পঞ্চম গল্প :

কাশী বাজ্যেরই আরেক শাসক নগবেব মধ্যে মদ বিক্রি করা বারণ কবেছিলেন।

একদিন অনেক লোক একসঙ্গে এসে বলল, 'প্রভু, আগেকার দিনে এই সময সুবাপান উৎসব হত। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে এবার আমবা ঐ উৎসবেব ব্যবস্থা কবি।'

শাসক বললেন, 'ঠিক আছে। তোমবা তোমাদেব বীতি অনুসাবে যা কবা উচিত তাই কব।'

তুমুল মদ্যপান, বীভৎস চিৎকাব আব মাবামাবিব এক তাণ্ডব লীলা লেগে গেল। বহু লোকেব প্রাণহানি হল। অনেকের হাত-পা ভাঙ্গল। ধনসম্পত্তি নষ্ট হল। অনেকে শাস্তি পেল।

এই পরিণাম সেই শাসককে গভীব চিন্তামগ্ন কবল। তিনি ভাবলেন, 'আমি অনুমতি না দিলে এই ভযাবহ কাণ্ড ঘটত না। এত লোকেব প্রাণহানির জন্য আমিই দাযী।' গভীব অনুতাপে জর্জবিত হলেন তিনি। এই অনুতাপ থেকেই তাঁর মধ্যে এক দিব্য ভাব প্রস্ফুটিত হল। তপস্বীব লক্ষণাদি দেখা দিল।

ষষ্ঠ গল্প :

যে পাঁচজন তপস্বীর কথা এ পর্যন্ত বলা হয়েছে, একদিন তাঁরা ভিক্ষার জন্য বারাণসীতে এলেন। তাঁদের অপরূপ লাগছিল দেখতে।

বারাণসীরাজ তাঁদের যথেষ্ট সম্মান দেখালেন। সুস্বাদু খাবার খেতে দিলেন। তারপর প্রশংসা করে বললেন, 'আপনারা যে নিতান্ত কম বয়সে প্রব্রজ্যা নিয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এতে আপনাদের সুবিচার ও প্রজ্ঞাই প্রকাশ পেয়েছে। এখন বলুন তো, কেন আপনারা অত কম বয়সে প্রব্রজ্যা নিলেন?'

ভিক্ষুরা নিজের নিজের সব ঘটনা খুলে বললেন। তারপর কয়েক দিন রাজার বাগানে থেকে একদিন হিমবন্ত প্রদেশের উদ্দেশে রওনা হলেন।

এরপর থেকে রাজা পুণ্যকর্ম ও তপস্যায় মেতে রইলেন। সব ব্যাপারে সংযমী হলেন। রাজার প্রধান স্ত্রী রাজাকে বিচলিত করার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন।

এরপর রাজা অমাত্যদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে নিজেও হিমবন্ত প্রদেশে যাত্রা করলেন। সেখানে আয়ুক্ষয় করে তপস্যা করলেন। পরে তিনি ব্রহ্মলোকে স্থান পান।

যুবঞ্জয় জাতক

রাজা সর্বদত্তের এক হাজার ছেলে ছিল। বড় ছেলের নাম যুবঞ্জয়। রাজা যুবঞ্জয়কে সিংহাসনে বসালেন। যুবঞ্জয় রাজা হলেন।

মহারাজ যুবঞ্জয় একদিন রথে চড়ে বাগানে যাচ্ছিলেন। তখন সকালবেলা। যুবঞ্জয় গাছের পাতায় ঘাসের ওপর মুক্তাবিন্দুর মত ঝলমলে আস্তর দেখতে পেলেন।

সাবথি !

বলুন মহাবাজ।

এগুলো কি ?

শিশিবকণা।

সারাটা সকাল যুবঞ্জয় বাগানে ঘুবে বেড়ালেন। ফিবতে ফিবতে সন্ধ্যা হল। ফেবাব সময় তিনি আব শিশিবকণাগুলো দেখতে পেলেন না।

সাবথি !

বলুন মহাবাজ।

সেই শিশিবকণাগুলো কোথায় গেল ?

সূর্যেব তাপে বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেছে।

যুবঞ্জয় ফিবতি পথে ভাবতে লাগলেন, 'মানুষ আব প্রাণীদেব জীবনও তো শিশিবকণাব থেকে বেশি কিছু নয়। বোগে ভুগে, বার্ধক্যেব কষ্টে হয় মৃত্যু। তাব চেয়ে ভাল আগেই প্রব্রজ্যা নেওয়া। বাবা-মাব অনুমতি নিয়ে আমি প্রব্রজ্যাই নেব।'

যুবঞ্জয় বাবার কাছে প্রার্থনা কবলেন, 'বাবা, আমাকে অনুমতি দিন, আমি তপস্বী হব।' যুবঞ্জযেব বাবা জানতে চাইলেন, 'বাছা, তোমাব কিসেব অভাব বল, আমি সমস্তই পূবণ কবব।' কিন্তু যুবঞ্জয় তাঁব কাছে বাববার একই প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। বাজা অনুমতি না দিয়ে পারলেন না। যুবঞ্জযেব অনুগামী হলেন তাঁব ভাই যুধিষ্ঠির। রাজ্যের প্রজারা দুই কুমারকে অনুসরণ করতে লাগল। আব যুবঞ্জয়-যুধিষ্ঠিরের মা কেঁদে ভাসাতে লাগলেন। নগরেব প্রান্তে এসে

কুমারেরা প্রজাদের ফিরে যেতে বললেন। নিজেরা হিমবন্ত প্রদেশের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

বোধিসত্ত্বই এই জাতকে যুবঞ্জয়।

দশরথ জাতক

পুরাকালে বারাণসীতে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম দশরথ। রাজা দশরথ সাধনার জোরে রাগ-হিংসা-মোহ জয় করেছিলেন। রাজা দশরথের অন্তঃপুরে ছিল ষোল হাজার মহিষী। রাজার প্রধানা মহিষী দুটি অনিন্দ্যসুন্দর পুত্র ও একটি লাবণ্যময়ী কন্যা প্রসব করেন।

বড় ছেলের নাম রাখা হল রামপণ্ডিত। ছোট ছেলের নাম ঠিক করা হল লক্ষ্মণকুমার। মেয়ের নাম রাখা হল সীতাদেবী।

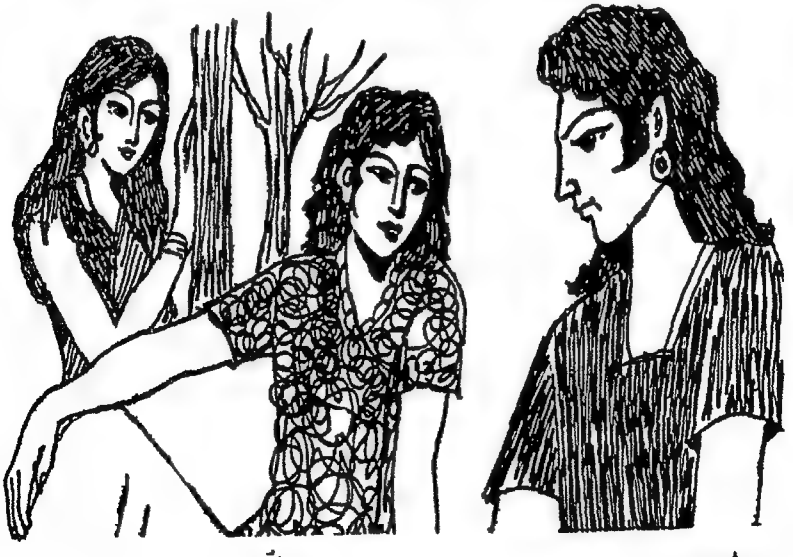

আয়ুক্ষয় হলে প্রধানা মহিষীর মৃত্যু হল। রাণীর মৃত্যুতে রাজা দশরথ শোকে মুহ্যমান হলেন। দিনের পর দিন এভাবে কাটে। রাজা কিছুতেই শোক কাটাতে পারেন না। অমাত্য ও অনুচররা রাজাকে সৎপরামর্শ দিয়ে যেতে লাগলেন।

উঠুন মহারাজ।

জীবন অনিত্য।

শেষে তাঁরা রাজাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। অন্তঃপুরচারিণীদের একজনকে প্রধানা মহিষী করার পরামর্শ দিলেন। রাজা সম্মত হলেন।

নতুন এই রাণী রাজার খুবই প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠেন। কিছুদিন পরে নবীনা মহিষীও একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। রাজা ছেলের নাম রাখলেন ভরতকুমার। রাজা একদিন স্নেহের বশে রাণীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি তোমাকে বর দিতে চাই, কি বর নেবে বল।' রাণী বললেন, 'মহারাজ, আমি এখন বলব না, পরে চেয়ে নেব।'

ভরতকুমার এখন সাত বছরের ছেলে। রাণী একদিন রাজা দশরথকে বললেন, 'মহারাজের নিশ্চয়ই মনে আছে, আপনি আমাকে একটা বর দিতে চেয়েছিলেন।'

নিশ্চয়ই, মনে আছে বৈ কি।

আমি এখন সেই বরটি চাই।

বেশ তো, বল।

ভরতকে রাজত্ব দিন।

রাজা এই প্রার্থনার অসম্ভব রেগে গেলেন। বললেন, 'ভরতের বড় দুই দাদা রয়েছে, তাদের বঞ্চিত করে ভরতকে রাজা করব? তুমি কি আমার বড় ছেলেদের মেরে ফেলতে চাও? দূর হও।'

রাণী তখনকার মত চলে গেলেন। কিন্তু মাঝে মাঝেই তিনি রাজাকে বরের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ঐ একই প্রার্থনা জানিয়ে যেতে লাগলেন।

রাজা বর না দিলেও মনে মনে ভাবলেন, 'স্ত্রীলোকেরা পারে না এ রকম কোন কাজ নেই। হয়ত ভরতের রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য সে রামপণ্ডিত আর লক্ষ্মণ কুমারকে বিষ খাইয়েই মেরে ফেলবে।' এইসব ভেবে একদিন তিনি ছেলেদের আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন।

রাম-লক্ষ্মণকে প্রথম থেকে সমস্ত খুলে বললেন, 'এখানে থাকলে তোমাদের ঘোরতর বিপদ দেখা দিতে পারে। তোমরা অন্য কোন রাজ্যে বা বনে গিয়ে বসবাস কর। যখন শুনবে আমার মৃত্যু হয়েছে তখন ফিরে এসে সিংহাসনে বসবে।' ছেলেদের এ কথা বলে রাজা জ্যোতিষীকে ডাকিয়ে আনলেন, 'বলুন তো, আমি আর কতদিন বাঁচব?'

বার বছর মহারাজ।

ঠিক দেখছেন?

হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা দশরথ তখন রামপণ্ডিত ও লক্ষ্মণ কুমারকে বললেন, 'তোমরা বার বছর পরে ফিরে এসে রাজচ্ছত্র অধিকার কর।' কুমাররা রাজাকে প্রণাম করে রওনা দেওয়ার উদ্যোগ করলেন। তখন সীতাদেবী বললেন, 'বাবা, আমিও দাদাদের সঙ্গে যাব, আমাকে অনুমতি দিন।' রাজা দশরথের চোখ জলে ভরে এল। কিন্তু মুখে বললেন, 'তাই এস মা।'

তিনজন রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র হাজার হাজার প্রজা তাঁদের অনুগামী হল। রাম পণ্ডিত এবং লক্ষ্মণ কুমার তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন, 'আপনারা ফিরে যান।' শেষে তারা চোখের জলে রাজপুত্রকন্যাদের বিদায় দিলেন।

তিনজন এরপর বহু পথ ঘুরে তাঁরা হাজির হলেন হিমবন্ত প্রদেশে। ফলমূল প্রচুর আছে এ রকম একটি জায়গা বেছে নিয়ে তাঁরা আশ্রম বানালেন। সেখানেই তিনজন থাকতে শুরু করলেন।

লক্ষ্মণ কুমার আর সীতাদেবী রাম পণ্ডিতকে বললেন, 'দাদা, আপনি আমাদের বড়, পিতৃস্থানীয়, কাজেই আপনাকে ফলমূল জোগাড় করতে যেতে হবে না। ঐ কাজটুকু আমরা দুজনেই করতে পারব। আপনি আশ্রমেই থাকুন।'

রাম লক্ষ্মণ সীতা যখন বনের ফল খেয়ে জীবনধারণ করছেন, রাজা তখন প্রতিদিনই সন্তানদের শোকে ভেঙ্গে পড়ছেন। জ্যোতিষীর বাণী ব্যর্থ করে ন' বছরের মাথায় রাজা দশরথ দেহ রাখলেন।

দশরথের অন্ত্যেষ্টি শেষ হলে ভরতের মা ভরতকে রাজসিংহাসন দেওয়ার কথা বললেন। কিন্তু মন্ত্রী, অমাত্য, অনুচররা কেউই সে কথায় কান দিলেন না। তাঁরা বললেন, সিংহাসন যাঁদের প্রাপ্য, তাঁরা এখন বনে আছেন। অমাত্যরা ভরতকে সিংহাসন অধিকার করতে দিলেন না। ভরত তখন ঠিক করলেন, 'আমি বনে গিয়ে রাম-পণ্ডিতকে নিয়ে আসব, তাঁকে রাজচ্ছত্র দেব।'

খড়্গ, ছত্র, উষ্ণীষ, পাদুকা, চামর—এই পাঁচ রকম রাজচিহ্ন সঙ্গে নিয়ে ভরত বনের দিকে চললেন। সঙ্গে চলল চতুরঙ্গ সেনা-বাহিনী আর অমাত্যরা। ভরত যখন আশ্রমে এলেন, লক্ষ্মণ পণ্ডিত এবং সীতা দেবী তখন ফল যোগাড় করতে বনের মধ্যে

ঘুরছিলেন। আশ্রমে তখন কেবল রাম পণ্ডিত।

দাদা, বাবা দেহ রেখেছেন।

আপনি এবার সিংহাসনে বসুন।

ইত্যাদি বলে ভরত এবং অমাত্যরা কাঁদতে লাগলেন। রামপণ্ডিত কিন্তু চোখের জল ফেললেন না। সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্মণ আর সীতা ফিরে এলেন। রামপণ্ডিত ভাবলেন, এরা এখনও বয়সে নবীন, শোক সহ্য করতে পারবে না, এদের পরে বলা যাবে।

তারপর হঠাৎ যেন খুব রেগে গিয়েছেন এমন ভাব করে বললেন, 'আজ এত দেরি করলে কেন, তোমাদের শাস্তি পেতে হবে।'

যথা আজ্ঞা।

যাও, ঐ জলে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক।

লক্ষ্মণ পণ্ডিত আর সীতা সামনের এক সরোবরে গিয়ে নামলেন। তাঁরা জলে নামার পর রাম পণ্ডিত বললেন, 'আজ ভরত এসে বলল, আমাদের বাবা মহারাজ দশরথ দেহ রেখেছেন।'

লক্ষ্মণ আর সীতা বাবার মৃত্যুর খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাঁরা বারবার মূর্চ্ছা যেতে লাগলেন। তিনবার সংজ্ঞাহারা হবার পর অমাত্যরা তাঁদের জল থেকে তুলে আনলেন। তাঁরা সকলে মিলে একসঙ্গে কাঁদতে লাগলেন। শুধু রামপণ্ডিতের চোখে জল নেই।

ভরত মনে মনে চিন্তা করলেন সবাই বাবার মৃত্যুতে এত কাতর হয়ে কাঁদছেন, অথচ দাদা রামপণ্ডিতের চোখে জল নেই কেন। এই ভেবে তিনি রাম পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করলেন :

দাদা, সকলেই যখন শোকার্ত তখন আপনি কি করে স্থির থাকছেন?

রাম পণ্ডিত তখন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন।

'দেখ, দিনরাত কেঁদেও কাউকে বাঁচানো যায় না। জ্ঞানী মানুষ তাই কাঁদেন না।

আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই মৃত্যুর অধীন।

গাছের ডালে যে ফল ধরে, সেই ফল পাকলেই যেমন পড়ে যাওয়ার ভয় যেমন থাকে, জীবনও তেমনি। জন্মাবার পরই মৃত্যুর ভয়ে দিন রাত কাঁপে।

ভোরবেলা যাদের দেখা পাই, তাদের অনেককেই সন্ধ্যেবেলা দেখতে পাই না। ওদের মধ্যে অনেকে ভোর হওয়ার আগেই যমের কবলে পড়ে।

লোকেরা শোকে বৃথাই কাতর হয়। যদি শোক করে কোন সুফল পাওয়া যেত তাহলে পণ্ডিতরাও শোক প্রকাশ করতেন।

শোকে আয়ুক্ষয় হয়, শরীর অস্থিচর্মসার হয়। এছাড়া শোকে আর কি হয় বল? শোক তো মৃত্যুকে ফিরিয়ে আনতে পারে না।

গৃহস্থ লোক প্রচণ্ড দাবানলকে জল দিয়ে শাসন করে যাকে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা তেমনি জ্ঞানের সাহায্যে শোককে দমন করেন। বাতাসের দাপটে যেমন তুলো উড়ে যায়, জ্ঞানের শক্তিতে তেমনি শোক উড়ে যায়।

কর্মের জন্যই জীবরা যাতায়াত করে। জন্মায়, মরে, আবার জন্মায় —অথচ ভাবে, এ আমার বাবা, এ মা, ভাই-বোন ইত্যাদি। আর এই সুখেই মজে থাকে তারা।

বাবা স্বর্গে গেছেন। কেঁদে কি হবে? বাবার কাজ এখন কাঁধে তুলে নিতে হবে। এবার আমরা সম্মানীয় ব্যক্তিকে সম্মান করব। গরীবকে দান করব। জ্ঞাতি কুটুমকে সযত্নে রাখব।

সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকের পার্থক্য করেন। শোক যত বড়ই হোক, তাতে তাঁদের হৃদয় পোড়ে না।'

রাম পণ্ডিত এভাবে সংসারের অনিত্যতা ব্যাখ্যা করে বোঝালে সকলে মুগ্ধ হলেন। অমাত্যরা এবং ভরত তখন রামকে বললেন, 'প্রভু, এবার দেশে ফিরে চলুন।'

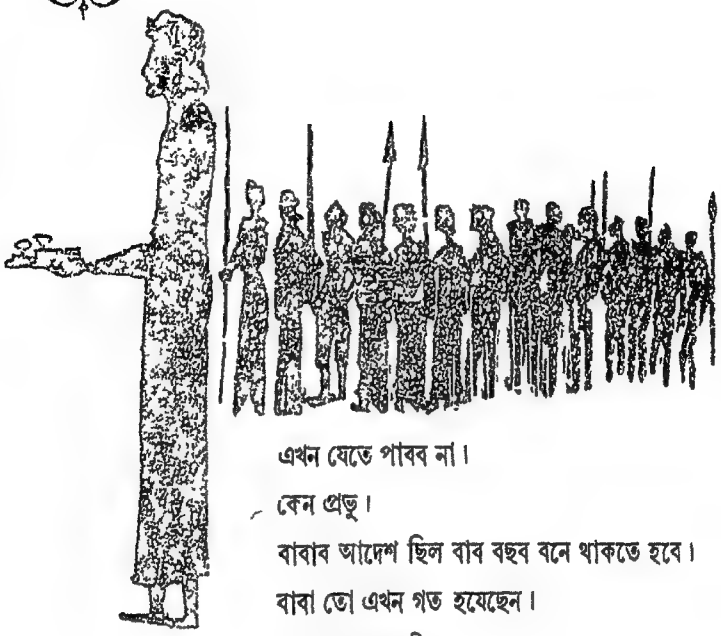

এখন যেতে পারব না।

কেন প্রভু।

বাবার আদেশ ছিল বার বছর বনে থাকতে হবে।

বাবা তো এখন গত হয়েছেন।

আদেশ অলঙ্ঘ্যনীয়।

কবে যাবেন তাহলে?

তিন বছর পরে।

ততদিন কে রাজ্য চালাবে?

ভরতকুমার।

ভরতকুমার এ প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'না দাদা, আমি পারব না।' তখন রামপণ্ডিত বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে আমার এই পাদুকা নিয়ে যাও, এই পাদুকাই রাজ্য চালাবে।'

এরপর ভরত রাম পণ্ডিত, লক্ষ্মণ কুমার ও সীতার পাদুকা নিয়ে দেশের উদ্দেশে রওনা হলেন। সঙ্গে চলল সেই চতুরঙ্গ সেনা-বাহিনী আর অমাত্যদের দল।

রামের পাদুকাই সেই তিন বছর বারাণসীতে রাজত্ব করল। কোন বিবাদের মীমাংসায় ভুল হলে দুটি পাদুকায় সংঘর্ষ হতো। বিচার ন্যায়সম্মত হলে পাদুকাদুটি স্থির থাকত।

তিন বছর পরে রাম পণ্ডিত ফিরে এলেন। তখন সীতা দেবীকে প্রধানা মহিষী করে রাম পণ্ডিতের অভিষেক উদযাপন করা হল। এরপর তিনি ষোল হাজার বছর যথাধর্ম রাজ্য শাসন করেন। তারপর রাম পণ্ডিত দেবগণের সঙ্গে মিলিত হলেন।

সুপারগ জাতক

পুরাকালে ভৃগুরাষ্ট্র নামে একটি রাজ্য ছিল। সেখানে ভৃগুকচ্ছ নামে এক বন্দর ছিল। বন্দরে যে কজন সমুদ্র-অভিযান বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে সেরা, বোধিসত্ত্ব তাঁর ছেলে হয়ে জন্মালেন।

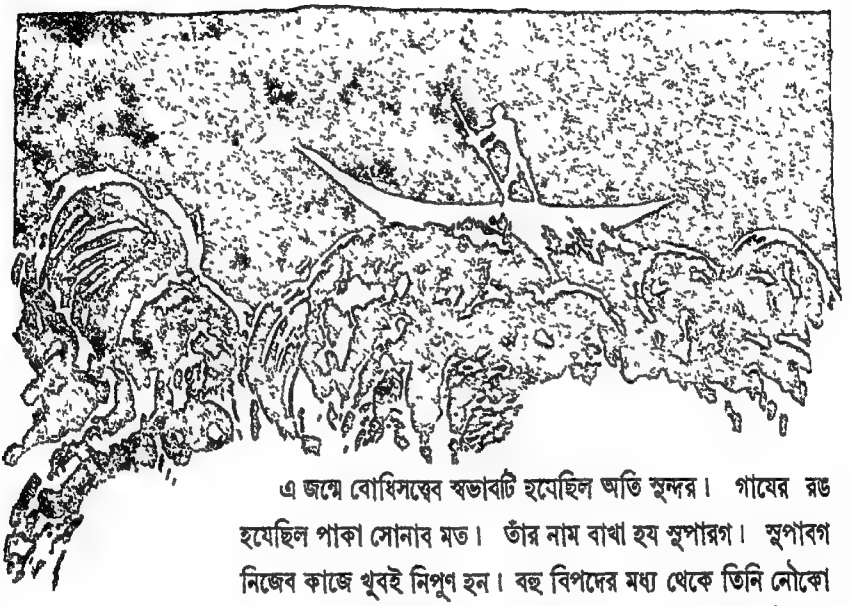

এ জন্মে বোধিসত্ত্বের স্বভাবটি হয়েছিল অতি সুন্দর। গায়ের রঙ হয়েছিল পাকা সোনার মত। তাঁর নাম রাখা হয় সুপারগ। সুপারগ নিজের কাজে খুবই নিপুণ হন। বহু বিপদের মধ্য থেকে তিনি নৌকো উদ্ধার করে এনেছেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হত সুপারগ যে নৌকোয় থাকেন, সেই নৌকোর কোন ভয় নেই।

এভাবে দিন যেতে লাগল। পরে একবার নৌ-যাত্রায় সমুদ্রের নোনা জলের প্রচণ্ড আঘাত লাগে তাঁর চোখে। সেই আঘাতে সুপারগ চোখদুটি খোয়ালেন। তারপর থেকে তিনি নৌ-যাত্রায় ক্ষান্তি দিলেন। মনে মনে ভাবলেন, 'রাজার কাছে যাই, রাজা নিশ্চয়ই আমাকে একটা যোগ্য কাজ দেবেন।'

সুপারগকে রাজার পছন্দ হল। রাজা তাঁকে বললেন, 'তুমি আমার এখানে যেসব জিনিস কেনা হয় তার দাম ঠিক করে দেবে।' সুপারগ সেই কাজ করতে লাগলেন। সেরা হাতি, রথ, মণি-মাণিক্য ইত্যাদির দাম সুপারগ ঠিক করে দিতেন।

একদিন কয়েকজন লোক রাজার মঙ্গলহস্তী করার জন্য একটি হাতিকে নিয়ে এল। হাতিটিকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলে সুপারগ হাতির শরীরে হাত বুলিয়ে বললেন, 'এই হাতিকে মঙ্গলহস্তী করা যায় না। এর পেছনের পা দুটো ছোট। জন্মানো মাত্র এর মা একে পিঠে নেয় নি। মাটিতে পড়ে এর পেছনের পা দুটো ছোট হয়ে গেছে।' হাতি বিক্রি করতে এসেছিল যারা, তাদের জিজ্ঞেস করা হল, 'কি হে, আমাদের পণ্ডিত যা বলেছেন তা কি ঠিক?'

হ্যাঁ প্রভু, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

রাজা এ ঘটনার বিবরণ শুনে পণ্ডিতকে আট টাকা পুরস্কার দিলেন।

কিছুদিন পরে আবার একদল লোক একটা ঘোড়া নিয়ে এল। কুলক্ষণা হিসাবে তারা ঘোড়াটাকে বেচতে চায়। রাজা তাদেরও সুপারগের কাছে পাঠালেন। সুপারগ ঘোড়ার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'এ ঘোড়াকে মঙ্গলাশ্ব করা যায় না।'

ব্যাপারী॥ কেন?

সুপারগ॥ এ যেদিন জন্মেছে সেদিনই এর মা মারা গেছে।

ব্যাপারী ॥ তাতে কি ?

সুপারগ ॥ মার দুধ না পাওয়ায় এর ভালোমত পুষ্টি হয় নি।

এবারের ঘটনা জেনে রাজা আরও খুশি। তিনি আবার সুপারগকে আট টাকা পুরস্কার দিলেন।

এর কিছুদিন পরে একখানা রথ আনা হল সুপারগের সামনে।

পণ্ডিত, দেখুনতো।

কি ?

এই রথটি রাজার মঙ্গল রথ হবে।

সুপারগ রথের গায়ে হাত রাখলেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। বললেন, 'রাজার রথ কখনও পোকায় কাটা কাঠ দিয়ে হতে পারে না। এই রথ বানানো হয়েছে পোকায় কাটা কাঠে।' রাজা শুনলেন, পরখ করে দেখলেন কথাটা সত্যি। রাজা এবারও তাঁকে আট টাকা পুরস্কার দিলেন।

কিছুদিন পরে কয়েকজন ব্যাপারী রাজার জন্য একটি কম্বল নিয়ে এল। কম্বলটা অসম্ভব দামী এবং দেখতেও চমৎকার। সুপারগ কম্বলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'কম্বলটায় খুঁত আছে। রাজার যোগ্য নয় এ কম্বল।' অনুসন্ধান করে দেখা গেল কম্বলটার একটা জায়গা ইঁদুরে কেটেছে। রাজা খুব খুশি হলেন। কিন্তু সুপারগকে আট টাকা পুরস্কারই দিলেন।

সুপারগ তখন মনে মনে ভাবলেন, 'এমন অদ্ভুত সব কাজ দেখেও রাজা দেওয়ার সময় মোটে আট টাকা পুরস্কারই দিচ্ছেন। এত কম টাকা লোকে নাপিতকে দেয়। তাহলে আমার এই রাজাকে সেবা করে লাভ কি ? তার চেয়ে বরং নিজের বাড়িতেই ফিরে যাই।'

বোধিসত্ত্ব তারপর ভৃগুকচ্ছে আবার ফিরে এলেন। কিছুদিন পরে সেখানকার ব্যাপারীরা নৌকো সাজিয়ে বাণিজ্যে যাওয়ার জন্য তৈরি হল। কিন্তু নৌকোর হাল ধরার মত যোগ্য লোক তাঁরা খুঁজে পেল না। তখন তাদের অনেকেই সুপারগের কথা বলল। সুপারগ সব শুনলেন।

কিন্তু আমি যে চোখদুটো খুইয়েছি।

তাহলেও আপনার মত হাল ধরার লোক মিলবে না।

আমার বয়স হয়েছে।

তাতে কিছু এসে যায় না।

ব্যাপারীদের কোন মতেই ফেরাতে পারলেন না তিনি। বাধ্য হয়েই রাজি হতে হল। নৌকো প্রথম সাতদিন বেশ তরতর গেল, তারপর বিপদ শুরু হল। ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক ঝড় নৌকোটি নিয়ে লোফালুফি শুরু করে দিল। ছ মাস এভাবে কাটল।

তারপর নৌকো ক্ষুরশাল নামক সমুদ্রে পড়ল। মানুষের মত সাপের মত ভীষণাকার মাছ সেই সমুদ্র তোলপাড় করছে। বোধিসত্ত্ব জানতেন, ওটা হল হীরক সমুদ্র। কিন্তু ব্যাপারীদের বললেন, 'ওটা খুবই বিপজ্জনক জায়গা, তাড়াতাড়ি এই সমুদ্র পেরিয়ে চল।' এদিকে জলে দড়ি নামিয়ে গোপনে কিছু হীরে তুলে নিলেন। তিনি ভেবেছিলেন এই ব্যাপারীরা হীরার খোঁজ পেলে নৌকোয় এত হীরা তুলবে যে নৌকো ডুবে যাবে।

একইভাবে নৌকো সুবর্ণ সমুদ্র, রজত সমুদ্র ও মণি সমুদ্রে পড়ল। প্রত্যেক বারেই বোধিসত্ত্ব ওদের ভয় পাওয়ালেন। আর নিজে গোপনে কিছুটা করে রত্ন তুলে নিলেন।

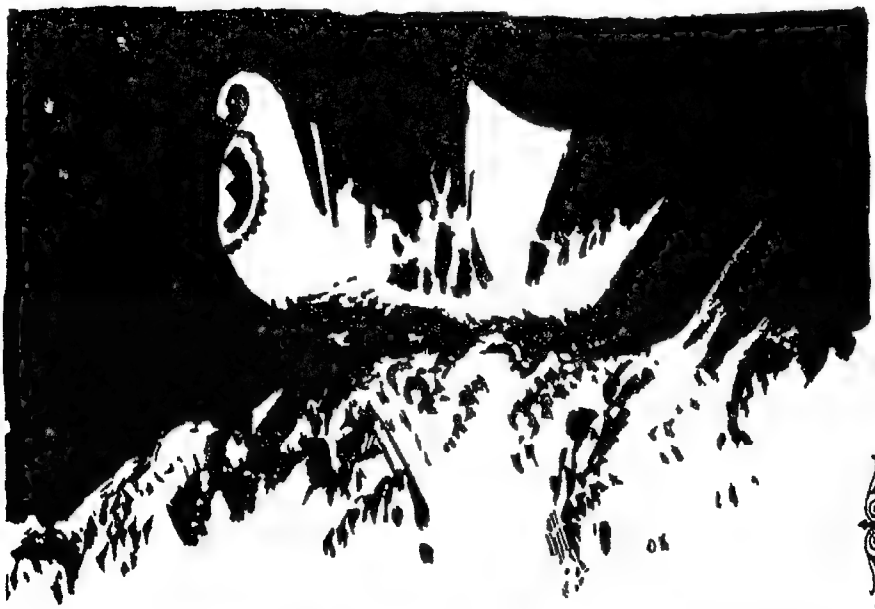

একেবারে শেষে নৌকো এক বিপজ্জনক সমুদ্রে এল। সেখান থেকে কেউ কোন দিন ফিরতে পারে না। সুপারগ তখন ব্যাপারী ও নাবিকদের বললেন, 'আমাকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে হালের কাছে বসিয়ে দাও।'

তারা তাই করল। বোধিসত্ত্ব তখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, 'কোনদিন প্রাণী হত্যা করিনি। প্রভু, আমাদের নির্বিঘ্নে দেশে পৌঁছে দাও।'

পালে যেন বাতাস লাগল। নৌকো তরতর করে ভৃগুকচ্ছে ফিরে এল।

বোধিসত্ত্ব সকলের মধ্যে সমান ভাগে ধনরাশি ভাগ করে দিলেন। ব্যাপারী আর মাঝিদের বললেন, 'এতে তোমাদের সারাজীবন কেটে যাবে। আর কখনও সমুদ্রে যেও না।'

ভদ্রশাল জাতক

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত যথাধর্ম রাজ্য শাসন করতেন। নিয়মিত পুণ্যকর্মে কখনও শিথিলতা দেখাননি।

যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন জম্বুদ্বীপের বেশির ভাগ রাজাই

সুন্দর প্রাসাদে থাকতেন। এইসব প্রাসাদের অনেকই স্তম্ভের ওপর নির্মিত। ব্রহ্মদত্ত ভাবলেন, 'সব রাজাই অনেক স্তম্ভের ওপর প্রাসাদ বানিয়েছেন। আমি এমন প্রাসাদ বানাব যা এদের থেকে আলাদা।' তিনি ঠিক করলেন মাত্র একটি স্তম্ভের ওপর প্রাসাদ গড়বেন।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। তিনি রাজ্যের সেরা ছুতোর আর রাজমিস্ত্রিদের ডাকিয়ে আনলেন। তাদের নির্দেশ দিলেন এক স্তম্ভের একটি প্রাসাদ বানাতে। কারিগররা রাজাকে প্রণাম করে চলে গেল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমস্ত বনভূমি চষে ফেলেও তারা এমন একটি গাছ পেল না যা পুরু, সোজা উঠে গেছে এবং শক্ত। তারা বিষণ্ণ মনে রাজার কাছে ফিরে এল

কি হল?

মহারাজ, ও রকম গাছ নেই।

ভাল করে খুঁজে দেখ।

শেষকালে তারা রাজার বাগানে এক সুবিশাল শাল বৃক্ষ দেখতে পেল। এই গাছটি আগাগোড়া যেমন সোজা উঠে গেছে, তেমনি শক্তপোক্ত। এখন সমস্যা হল ওই প্রাচীন গাছটি বৃক্ষ দেবতা হিসেবে পুজো পেয়ে আসছে। কারিগররা গাছটিকে কাটতে সাহস করল না। তারা রাজার কাছে ফিরে গিয়ে বলল, 'মহারাজ, এরকম একটি গাছ পাওয়া গেছে।'

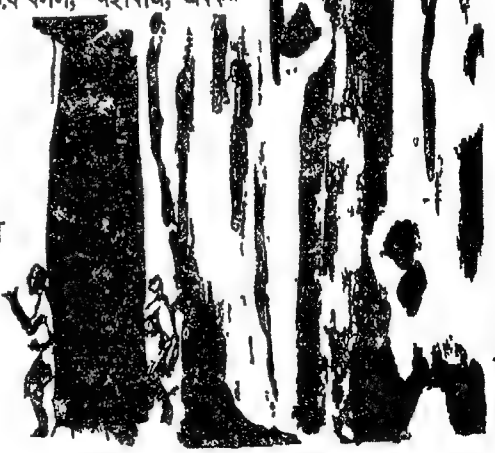

তাহলে কেটে আন।

একটা সমস্যা আছে।

কি?

এই গাছটা আছে আপনারই বাগানে

ঠিক আছে, কেটে ফেল।

কিন্তু মহারাজ· ··

অত কিন্তু কিন্তু করছ কেন?

মহারাজ, ও গাছটি বৃক্ষদেবতা।

তোমরা চিন্তা কোরো না। কেটে ফেল।

কারিগররা প্রথমে সেই মঙ্গল বৃক্ষের পুজো করল। প্রদীপ জ্বেলে দিল গাছের তলায়, তারপর মন্ত্রপাঠ করার মত বলল, 'সাতদিন পরে এসে এই গাছটিকে আমরা কাটব। রাজা স্বয়ং গাছটিকে কাটার অনুমতি দিয়েছেন। আমাদের মিনতি, বৃক্ষ দেবতা অন্য কোন গাছে

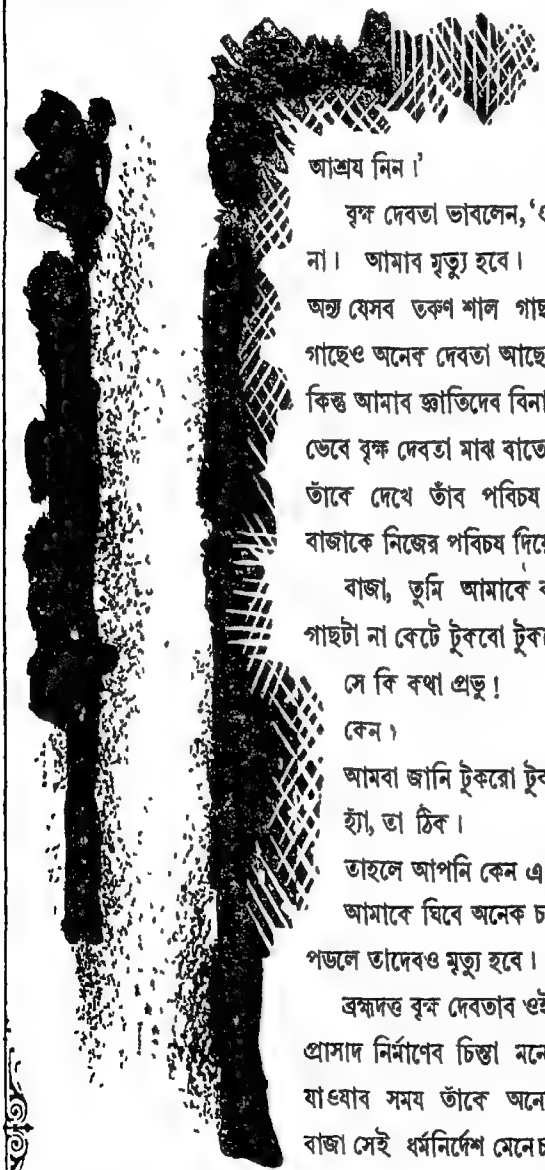

আশ্রয় নিন।'

বৃক্ষ দেবতা ভাবলেন, 'ওরা গাছ কাটলে আমি স্থির থাকতে পারব না। আমার মৃত্যু হবে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা আমাকে ঘিরে অন্য যেসব তরুণ শাল গাছ আছে, তারাও ধ্বংস হবে। ঐ সব গাছেও অনেক দেবতা আছেন। আমি নিজে মারা যাই ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার জ্ঞাতিদের বিনাশ যে করে হোক আটকাতে হবে।' এই ভেবে বৃক্ষ দেবতা মাঝ রাতে দেবসাজে রাজাকে দেখা দিলেন। রাজা তাঁকে দেখে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। বৃক্ষ দেবতা তখন রাজাকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন :

রাজা, তুমি আমাকে কাটতে চাও কাট, তবে একবারে গোটা গাছটা না কেটে টুকরো টুকরো করে কাট।

সে কি কথা প্রভু!

কেন?

আমরা জানি টুকরো টুকরো করে কাটলে যন্ত্রণা বাড়ে।

হ্যাঁ, তা ঠিক।

তাহলে আপনি কেন এ রকম আদেশ করছেন?

আমাকে ঘিরে অনেক চারা গাছ আছে, আমি একেবারে মাটিতে পড়লে তাদেরও মৃত্যু হবে।

ব্রহ্মদত্ত বৃক্ষ দেবতার ওই জ্ঞাতি-প্রীতি দেখে মুগ্ধ হলেন। শখের প্রাসাদ নির্মাণের চিন্তা মনে থেকে তাড়িয়ে দিলেন। বৃক্ষদেবতা যাওয়ার সময় তাঁকে অনেক ধর্মকথা শুনিয়েছিলেন। বাকি জীবন রাজা সেই ধর্মনির্দেশ মেনে চললেন। একদিন আয়ুক্ষয় করে, তিনি যেমন কাজ করেছেন সারা জীবন, সেই রকম ফল লাভের উদ্দেশ্যে দেহত্যাগ করলেন।

সমুদ্রবাণিজ জাতক

বারাণসী নগরের কাছে ছুতোরদের একটি গ্রাম ছিল। বেশ বড় সেই গ্রাম। ঐ গ্রামে এক হাজার ঘর ছুতোর থাকত।

এই গ্রামের ছুতোরদের একটা মারাত্মক দোষ ছিল। তারা গেরস্থের কাজ করে দেবে বলে আগাম টাকা নিত। কিন্তু ভুলেও কোনদিন কোন কাজ করত না। এর ফলে আশপাশের গ্রামের মানুষ তাদের ওপর বেশ খাপ্পা ছিল। দেখলেই গাল দিত, কাজ

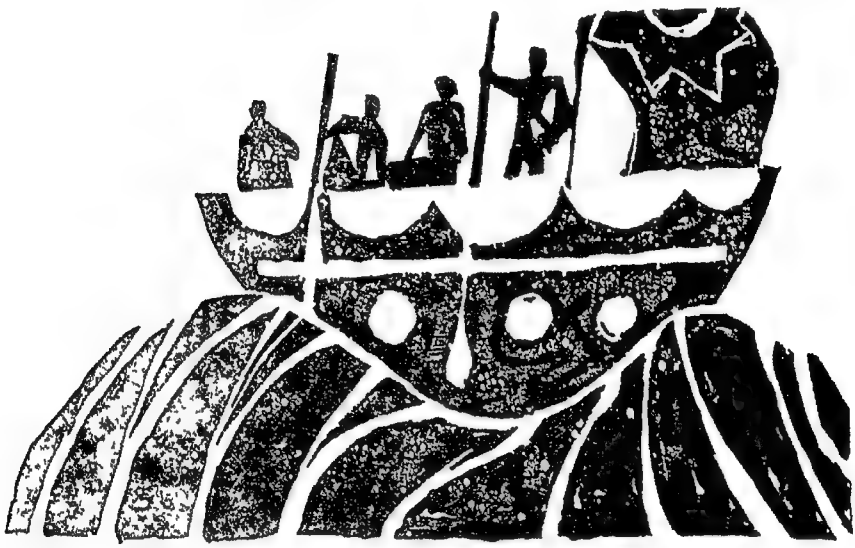

করতে গেলেও বাধা দিত। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে তাদের পক্ষে ওখানে থাকাই কঠিন হয়ে উঠল।

তখন তারা ঠিক করল, 'একটা বড় নৌকো বানিয়ে তাতে চেপে আমরা দূরদেশে চলে যাব।' এই ভেবে বনে গিয়ে তারা গাছ কেটে আনল। সকলে মিলে বেশ বড় একখানা নৌকো বানাল। নৌকোটা গ্রাম থেকে বেশ দূরে লুকিয়ে রাখল। মাঝ রাতে লুকিয়ে পরিবার-বর্গকে এনে নৌকোয় তুলল। তারপর ভিন দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল।

দিনকয়েক পরে নৌকো মাঝসমুদ্রে পড়ল। তারপর বাতাসের বেগে এদিক সেদিক যেতে লাগল। শেষে এক দ্বীপে এসে নৌকো ঠেকল।

দ্বীপটি ফুলে ফলে ভরা। পৃথিবীতে যত রকম ফল ও শস্য হয় প্রায় সমস্তই সেখানে আপনি ধরেছে। ছুতোররা ভাবল, 'আমরা যদি এখানে ডেরা বেঁধে থাকি তাহলে খাওয়া-পড়ার চিন্তা থাকে না। খাটাখাটনির কোন দরকার পড়ে না।'

এর আগে নৌকো ডুবে যাওয়ায় আর একজন লোক ভাসতে ভাসতে ঐ দ্বীপে এসে উঠেছিল। সে শালি চালের ভাত, আখ, কলা, আম, নারকেল খেয়ে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। সে সেই দ্বীপে একা থাকত। পরণে কোন জামাকাপড় ছিল না। চুলদাড়ি খুব বেড়ে গিয়েছিল।

ছুতোররা ভাবল, 'একবার দেখা দরকার দ্বীপে কোন রাক্ষস আছে কিনা। তাহলে যে সবাই মারা পড়ব।' এভাবে তারা দ্বীপটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। তখন আগে আসা লোকটি মনের আনন্দে এক জায়গায় বসে গান করছিল। ছুতোররা তাকে দেখে ভাবল, এ নির্ঘাৎ যক্ষ। তখন তারা তাকে তীর মারার জন্য প্রস্তুত হল। ইতিমধ্যে লোকটিও তাদের দেখে ফেলেছে। সে তাদের কাছে মিনতি করে বলল, 'মেরো না, আমিও তোমাদের মত মানুষ। নৌকোডুবি হওয়ায় এখানে এসে পড়েছি।' ছুতোররা কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে চাইল না। লোকটি অনেক অনুনয়-বিনয় করার পর তারা তাকে রেহাই দিল।

নৌকোডুবি হওয়া লোকটি তাদের বলল, 'দেখ, এই দ্বীপে সবই ভাল। এটা দেবতাদের খেলার জায়গা। শুধু একটা ব্যাপারে সাবধান থেকো। এখানে মলমূত্র ত্যাগ করলে সব সময় বালিতে গর্ত করে চাপা দিয়ে দেবে। নাহলে বিপদ হবে।'

এই ছুতোরদের মধ্যে দুজন দলপতি ছিল। দুজনের নেতৃত্বে দু দল ছুতোর চলত। একজন দলপতি বোকা, পেটুক। অপর জন বুদ্ধিমান, সংযমী। ঐ দ্বীপে সুখে বসবাস করতে করতে একদিন ছুতোররা ভাবল, 'আমরা এখানে বেশ আরামেই আছি। তবে একটা দুঃখ থেকে গেল। এখানে আসা অবধি সুরা পান করা হয় নি।'

তারপর তারা আখের রস থেকে সুস্বাদু সুরা তৈরি করল। সকলে মিলে আকণ্ঠ সেই সুরা পান করে মত্ত হল। মত্ত অবস্থায় তারা দ্বীপের এখানে সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করল। বালি দিয়ে সেসব

ঢেকে দেওয়ার কথা তাদের আর মনে রইল না।

দেবতারা যখন দেখলেন তাঁদের খেলার জায়গা দূষিত করা হয়েছে, তখন তাঁরা ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধ হলেন। ঠিক করা হল পাঁচদিন পরে পূর্ণিমায় সমুদ্র উচ্ছ্বাস হবে। বিশাল ঢেউ দ্বীপটি ভাসিয়ে দেবে। তাতেই তাঁদের খেলার জায়গাটি আবার পরিষ্কার হয়ে যাবে।

দেবতাদের মধ্যে একজন খুব দয়ালু ছিলেন। তিনি ভাবলেন, 'অনর্থক এতগুলো প্রাণ নষ্ট হবে।' এই ভেবে তিনি ছুতোরদের দেখা দিয়ে বললেন, 'পূর্ণিমায় এই দ্বীপে বানভাসি হবে, তোমরা বাঁচতে চাইলে পালাও।' দেবতাদের মধ্যে একজন ছিলেন খুব নিষ্ঠুর। তিনি এ কথা টের পেয়েই ছুতোরদের দেখা দিলেন, 'এখানে কি একজন দেবতা এসে তোমাদের দ্বীপ ছেড়ে যেতে বলেছেন। তিনি নিষ্ঠুর, তোমাদের তাড়াতে চাইছেন, তোমরা ওঁর কথা শুনো না। আনন্দে থাক।'

দুই দেবতার মত নিয়ে ছুতোরদের দুই দলপতির মধ্যে বিবাদ দেখা দিল। বুদ্ধিমান, সংযমী দলপতি নিজের লোকজনকে নিয়ে নৌকো ছেড়ে দিলেন পূর্ণিমার আগের দিন। পেটুক আর বোকা দলপতি তখন ভাবছে, 'ও বোকা, তাই এই স্বর্গ ছেড়ে চলে গেল।'

পরের দিন সাত তাল গাছ সমান উঁচু ঢেউ দ্বীপটিতে আছড়ে পড়ল। ছুতোররা সেই প্রবল জল-উচ্ছ্বাসে খড়কুটোর মত ভেসে গেল।

লালসা জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের দুটি ছেলে ছিল। রাজা বড় ছেলেকে যুবরাজ ও ছোট ছেলেকে সেনাপতি করলেন। ব্রহ্মদত্তের মৃত্যুর পর

অমাত্যরা বড় ছেলেকে রাজপদে অভিষেক করানোর সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করলেন। কিন্তু বড় ছেলে বললেন, 'দেখুন, আমি রাজা হতে চাই না, আপনারা আমার ছোট ভাইকে রাজা করুন।' অমাত্যরা বললেন, 'প্রভু, আপনি বড়, আপনারই রাজা হওয়া উচিত।' অমাত্যরা একই অনুরোধ বার বার করলেও তিনি রাজি হলেন না।

ফলে শেষ পর্যন্ত ছোট ভাই রাজা হলেন। তখন বড় ভাই বললেন, 'আমি যুবরাজও থাকতে চাই না।' অমাত্যরা বললেন, 'ঠিক আছে।' কিন্তু বড় ছেলের ত্যাগ আর থামতে চায় না। এরপর তিনি বললেন, 'আমার ধনসম্পত্তির দরকার নেই।'

কিন্তু যুবরাজ—

কোন কিন্তু নয়।

ঠিক আছে, তবে আপনি এখানেই আরামে থাকুন।

না।

সে কি কথা!

আমি এখানে থাকব না।

কেন যুবরাজ?

এখানে আমার কোন কাজ নেই।

এরপর তিনি বারাণসী ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন। ঘুরতে ঘুরতে বারাণসী রাজার সীমানার কাছাকাছি এক গ্রামে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে আশ্রয় নিলেন।

এখানে তিনি ব্যবসায়ীর অর্থে জীবন যাপন করতেন না। নিজের হাতে কাজকর্ম করে যে টাকা রোজগার করতেন, সেই টাকাতেই তাঁর চলত। আস্তে আস্তে গ্রামের লোক এবং আশপাশের গ্রামের লোকেরা জানতে পারল, ইনি রাজপুত্র। তখন থেকে তারা তাঁকে কাজ করতে দিত না। রাজাকে যেরকম উপহার পাঠান হয় তেমনভাবে নানা রকম উপহার পাঠাতে লাগল তাঁকে।

কিছুদিন পরে সেই গ্রামে রাজার আমিন এল। আমিন এসে জমিজায়গা মাপতে শুরু করল। এরপর কবের বোঝা বাড়বে।

প্রভু, রক্ষা করুন।

কি হয়েছে?

আমরা আপনার সেবা করি।

সে তো ঠিকই।

আপনিও আমাদের জন্য কিছু করুন।

কি করতে বল?

রাজা তো আপনার ভাই?

হ্যাঁ।

তাঁকে একখানা চিঠি লিখে দিন।

এরপর রাজপুত্র ছোট ভাইকে একখানা চিঠি লিখে জানালেন, 'ভাই, সীমানার গ্রামের লোকেরা খুব গরীব, আমি অনুরোধ করছি তুমি তাদের খাজনা মাফ করে দাও। একেবারে তুলে দাও। আর কখনও খাজনা নিও না।' ছোট ভাই দাদার কথামত খাজনা তুলে দিলেন।

এর ফলে আশপাশের বেশ কিছু গ্রাম ও শহরের মানুষ এসে রাজপুত্রকে ধরল, 'মহারাজ, আপনিই আমাদের রাজা। আপনি আমাদের কর মাপ করিয়ে দিন। তারপর থেকে আমরা আপনাকে কর দেব।'

রাজপুত্র তাই করলেন। এর ফলে রাজপুত্রের অনেক টাকা-পয়সা হল। সম্মানও বৃদ্ধি পেল। শুধু যে তিনি ধনসম্পত্তি পেলেন, সম্মান পেলেন, তাই নয়, মনে মনে তাঁর অর্থ ও ক্ষমতার লালসা হু হু করতে বাড়তে লাগল।

রাজপুত্র ঐসব গ্রামের যুবরাজ হতে চাইলেন। ভাইকে সেই মর্মে চিঠি দিলেন। ভাই তাঁকে যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা করলেন। কিন্তু তাঁর তৃষ্ণা এতেও থামল না। একদিন তিনি গ্রামের লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে রাজত্ব অধিকার করার জন্য রাজধানীর দিকে রওনা হলেন। রাজধানীতে পৌঁছে ভাইকে খবর পাঠালেন, 'হয় আমাকে রাজ্য দাও, না হয় যুদ্ধ কর।'

ছোট ভাই ভাবলেন, 'দাদা তো বোকার হদ্দ। রাজা হওয়ার সময় নিজে ইচ্ছে করে রাজা হল না। এদিকে এখন যুদ্ধ করে রাজ্য নেবে বলছে। আমি যদি যুদ্ধ করে মেরে ফেলি, লোকে আমাকেই দুর্নাম দেবে। তার চেয়ে রাজ্য দিয়ে দেওয়াই ভাল।' এই ভেবে রাজা ভাইকে জানালেন, 'দাদা, যুদ্ধের কোন দরকার নেই, আপনি এসে রাজত্ব গ্রহণ করুন।'

বড় রাজকুমার রাজা হওয়ার পর ছোট ভাইকে একেবারে তাড়িয়ে দিলেন না। তিনি ভাইকে বললেন, 'তুমি উপরাজ হও।' এভাবে দিন যেতে লাগল। কিন্তু রাজার তৃষ্ণা দিন দিন বেড়েই চলল।

দেবরাজ শক্র একদিন ভাবলেন, 'মর্ত্যে কে বাবা-মার সেবা করে, কে দানধ্যান করে, কে লালসা তৃষ্ণায় পীড়িত, দেখা দরকার।' দেবরাজ দেখলেন বারাণসীরাজের তৃষ্ণার কোন অন্ত নেই। এই মূর্খ বারাণসীর রাজত্ব পেয়েও মনে মনে তৃপ্ত নয়, একে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

দেবরাজ ব্রাহ্মণের বেশে রাজার প্রাসাদের সামনে এলেন। প্রহরীকে বললেন, 'যাও, রাজাকে গিয়ে বল, একজন লোক দেখা করতে চায়। তিনি নানা রকম কৌশল জানেন।'

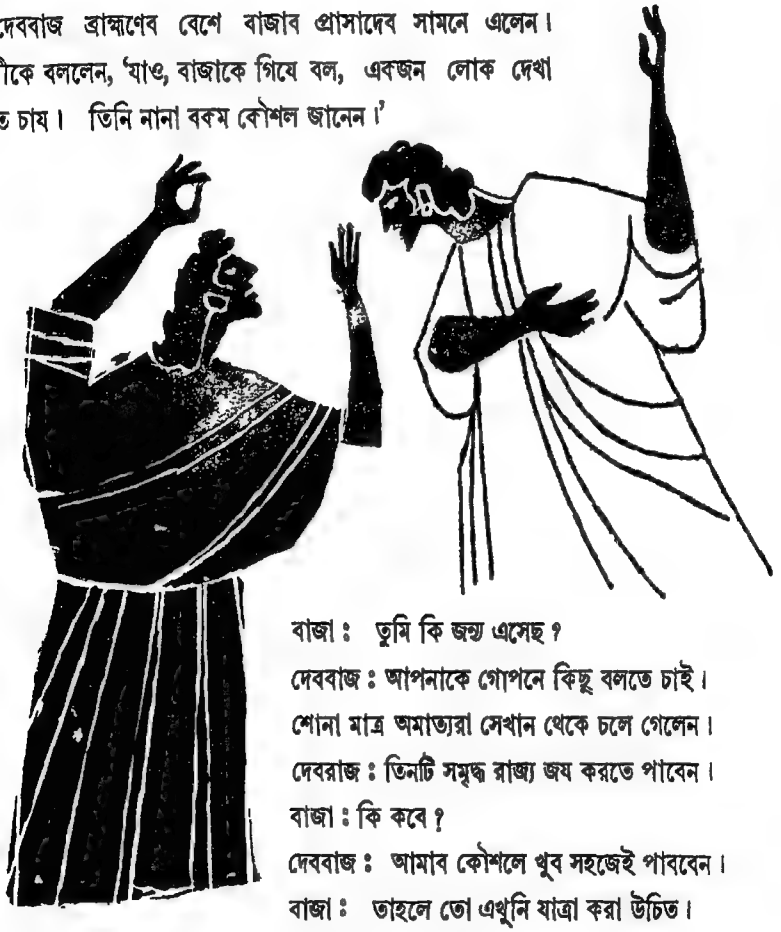

রাজা : তুমি কি জন্য এসেছ?

দেবরাজ : আপনাকে গোপনে কিছু বলতে চাই।

শোনা মাত্র অমাত্যরা সেখান থেকে চলে গেলেন।

দেবরাজ : তিনটি সমৃদ্ধ রাজ্য জয় করতে পারেন।

রাজা : কি করে?

দেবরাজ : আমার কৌশলে খুব সহজেই পারবেন।

রাজা : তাহলে তো এখুনি যাত্রা করা উচিত।

দেবরাজ : হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা শক্রর সামনে এমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন যে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলেন, আগন্তুক কে, কি তার পরিচয়। শক্রও ঐরকম পরামর্শ দিয়ে চলে যান।

তারপর রাজা অমাত্যদের ডেকে বললেন, 'একজন লোক এসেছিল। সে বলে গেছে তিনটে রাজ্য আমরা জয় করতে পারি। এক্ষুনি ভেরি বাজিয়ে তাকে ডেকে পাঠাও। দেরি করো না, তাহলে রাজ্যগুলো জয় করা যাবে না। অন্য রাজা সেই রাজ্য জয় করে নেবে।'

মহারাজ সেই লোকটির আদরযত্ন করেছিলেন কি?

না হে।

তিনি কোথায় থাকেন জেনেছিলেন কি?

না, তা-ও জিজ্ঞেস করা হয় নি।

অমাত্যরা অনেক খোঁজ করেও সেই লোকটিকে খুঁজে পেল না। এর ফলে রাজা খুব বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। প্রায় হাতের ফাঁক দিয়ে তিনটে রাজ্য চলে গেল। কিছুতেই তিনি এ দুঃখ ভুলতে পারছিলেন না। মনে মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'লোকটাকে যত্নআত্তি করা হল না, হয়ত সে রাগ করেই চলে গেছে।'

দিনরাত এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে রাজার শরীর ভেঙ্গে পড়ল। রাজার শরীরে যেন আগুন লেগেছে। এমন জ্বালা তিনি কখনও অনুভব করেন নি। ফলে পেটের গোলযোগ দেখা দিল। রাজা রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হলেন। বারাণসীর বৈদ্যরা রাজার চিকিৎসা করতে পারল না। রোগ ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল।

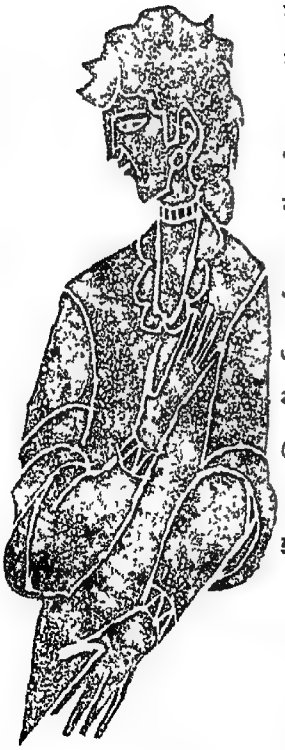

বোধিসত্ত্ব তখন নানা সাজে সুসজ্জিত হয়ে বাবা-মার কাছে ফিরে আসছিলেন। রাস্তায় শুনতে পেলেন বারাণসীরাজের কঠিন ব্যাধির কথা। ভাবলেন, রাজার চিকিৎসা করে তবে বাড়ি যাবেন।

বোধিসত্ত্ব রাজদরবারে গেলেন, রাজা তাঁকে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বড় বড় কবিরাজ বৈদ্য হার মানল, আর তুমি তো কচি ছেলে। ওরে, এঁকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দে।' রাজার আদেশ শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমি বৈদ্য গিরির জন্য পয়সা চাই না, ওষুধের দামটুকু পেলেই খুশি হব।'

বোধিসত্ত্ব নাছোড়বান্দা হওয়ায় রাজাকে চিকিৎসায় রাজি হতে হল।

মহারাজ, এ রোগের কারণ কি?

তা জেনে তোমার কি হবে বাপু?

কারণ না জানলে বৈদ্য চিকিৎসা করতে পারে না।

মহারাজ তখন পূর্ব ইতিহাস খুলে বললেন। সেই তিনটি রাজা ও আগের লোকটি, কিছুই বাদ গেল না। শেষে দুঃখ প্রকাশও করলেন। বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, শোক করলে কি ঐ রাজ্য তিনটি পাবেন?' রাজা বললেন, 'না, তা পাব না।'

তাহলে শোক ত্যাগ করুন।

বোধিসত্ত্ব তারপর সহজ উদাহরণে রাজার লালসা দূর করার চেষ্টা করলেন।

'মহারাজ, চারটি রাজ্যের রাজা হলেও একসঙ্গে বারটি থালা থেকে খাবার খেতে পারতেন না। সুতরাং আপনার মূল ব্যাধি লালসা। সম্পত্তি লালসা ত্যাগ করুন। সুস্থ হয়ে যাবেন।'

কিছুদিন পর রাজা সত্যি সুস্থ হলেন। এও বুঝলেন বৈদ্য তাঁকে জ্ঞানের ওষুধ দিয়েই ব্যাধিমুক্ত করলেন।

মহাকৃষ্ণ জাতক

দেবরাজ শক্র একবার দেখলেন স্বর্গে আর নতুন দেবপুত্র আসছেন না। মানুষ সুকর্ম করলে দেবপুত্র হয়। দেবপুত্র যখন জন্মাচ্ছে না তখন নিশ্চয়ই মানুষেরা অধম পথে চলেছে। দেবরাজ নিজের শক্তি-বলে তখন মর্ত্যের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা স্বধর্ম ত্যাগ করেছে। তাঁরা নানারকম কুকর্ম করছে। সাধারণ মানুষ যেসব পাপে ডুবে থাকে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা সেইরকম পাপে ডুবে আছে।

দেবরাজ তখন দেবতা মাতলিকে এক ঘোর কালো রঙের ভীষণ দর্শন কুকুরে পরিণত করলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে মর্ত্যে নেমে এলেন। দেবরাজের অভিসন্ধি হল, 'মর্ত্যবাসীকে ভয় পাওয়াতে হবে, তারপর তাদের ধর্মশিক্ষা দেব।'

দেবরাজের কুকুরসহ ঐ ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে সবাই ভয়ে পালাতে লাগল। কুকুর এমন বীভৎসভাবে চিৎকার করতে লাগল যে সেই মহাশব্দে মর্ত্য কাঁপতে লাগল।

রাজা নিজে মন শক্ত করে শক্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ভয়ঙ্কর কুকুর এখানে কি চায়?' দেবরাজ বললেন, 'খেতে চায়।' রাজা

প্রথমে রাজপুরীর খাবার কুকুরকে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে সেই খাবার খেয়ে ফেলে কুকুর আবার হুঙ্কার দিল। রাজা তখন পরিচারক ও অমাত্যদের খাবার কুকুরকে দেওয়ালেন। এভাবে কুকুর ক্রমে ক্রমে সব খাবার খেয়ে ফেলল।

রাজা তখন সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই কুকুরটি কি কাউকে শাস্তি দিতে চায়?' দেবরাজ বললেন, 'হ্যাঁ, ও অধার্মিককে শাস্তি দিতেই এসেছে।' তারপর তিনি আত্মপ্রকাশ করে বললেন, 'আমি দেবরাজ শক্র।'

দেবরাজ তখন প্রজাদের ধর্মশিক্ষা দিলেন। রাজাও তারপর দান-ধ্যানে মন দিলেন।

ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরাও ফিরে পেলেন তাঁদের অতীত জীবনের সম্মান।

মহাপদ্ম জাতক

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের প্রধানা মহিষীর বড় ছেলে হয়ে জন্মান। বোধিসত্ত্বের মুখখানি পদ্মফুলের মত সুন্দর হয়েছিল বলে তার নাম হয়েছিল মহাপদ্ম। বয়সকালে তিনি সর্ববিদ্যায় নিপুণ হলেন। সেই সময় তাঁর মা দেহ রাখেন। মহাপদ্মের মার স্থানে রাজা অন্য এক স্ত্রীকে প্রধানা মহিষী করলেন। আর মহাপদ্মকে করলেন যুবরাজ।

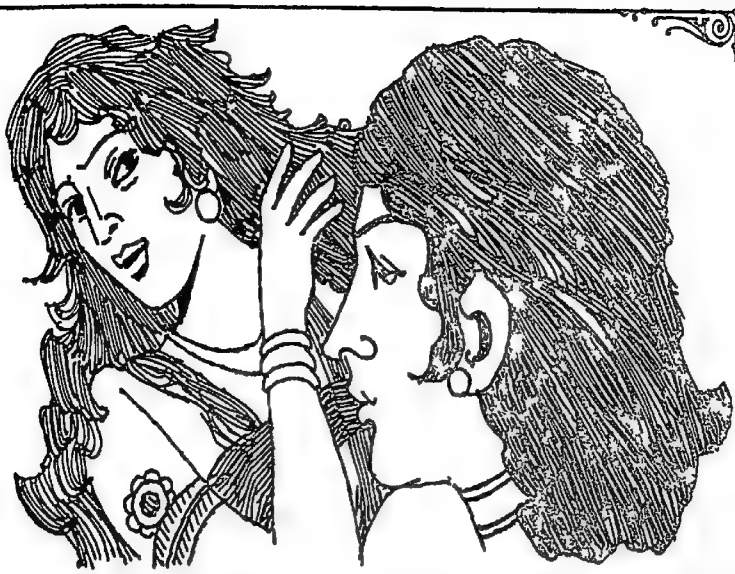

কিছুদিন পর রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলের প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। রাজা বিদ্রোহ দমন করতে যাওয়ার সময় প্রধানা মহিষীকে বললেন, 'তুমি এখানেই থাক, আমি বিদ্রোহ দমন করতে যাচ্ছি।'

না প্রভু।

কেন?

আপনাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না।

যুদ্ধক্ষেত্রে গেলে কষ্ট পাবে।

এভাবে প্রধানা মহিষীকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজা তাঁকে বললেন, 'আমি পদ্ম কুমারকে বলে যাচ্ছি সে তোমার সুবিধে-অসুবিধের ওপর নজর রাখবে।' পদ্ম কুমারকে তিনি ঐ নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

রাজা সীমান্ত বিদ্রোহ দমন করলেন। সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে রাজধানীতে ফিরে আসছেন। বোধিসত্ত্ব বাবার ফিরে আসার খবর পেয়ে রাজধানী সাজিয়ে তুললেন। তারপর রাজভবনের জন্য পাহারার সুব্যবস্থা করে বাবার সঙ্গে দেখা করতে চললেন।

ঐ সময় প্রধানা মহিষী জানলা দিয়ে বোধিসত্ত্বের যুবরাজ-সাজ আর সুন্দর দেহশ্রী দেখে এ কথা ভুলে গেলেন তিনি সম্পর্কে পদ্ম-কুমারের মা হন। ভাবলেন, রাজার বয়স হয়েছে, আমি রাজার চেয়ে অনেক ছোট, পদ্মকুমার আর আমি প্রায় সমবয়সী। যদি পদ্ম-কুমারের সঙ্গে আমার প্রণয় থাকে, তাহলে রাজার মৃত্যু হলে আমি পদ্মকুমারের প্রধানা মহিষী হতে পারব।

পদ্মকুমার বিদায় নিতে এলে রাণী বোধিসত্ত্বের হাত ধরে এমন আচরণ করতে লাগলেন-যা খুবই বিসদৃশ। মহাপদ্ম তখন রাণীকে বললেন, 'আপনি আমার মা। আমি আপনাকে সেই চোখেই দেখি, দয়া করে আমাকে যেতে দিন।' রাণী তখন হিংসায় বললেন, 'তুমি আমাকে অপমান করলে। এর ফল পাবে।'

মহাপদ্ম চলে গেলে রাণী মলিন কাপড় পড়ে, চুল এলোমেলো করে দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়লেন। রাজা ফিরে এসে জানতে চাইলেন, 'কি হয়েছে তোমার?' রাণী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'মহাপদ্ম আমাকে অপমান করেছে।'

রাজা সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন, 'পদ্মকুমারকে বেঁধে নিয়ে এস।'

রাজার সৈন্যরা মহাপদ্মকে শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলল। এই দৃশ্য দেখে রাজ্যের সব মানুষ, সভাসদ ও অমাত্যরা বিলাপ করতে লাগলেন। রাজার অন্তঃপুরচারিণীরাও দুঃখে কাতর হল। কিন্তু রাজা কারও শুনলেন না। মহাপদ্ম বললেন, 'মহারাজ আমি নিরপরাধ, শুধু এইটুকু বলতে পারি।' অমাত্যরা বললেন, 'একজনের মুখের কথা বিচার করবেন না রাজা। ন্যায়বিচারে যত্নবান হোন।'

রাজা কারও কথায় কান দিলেন না। হুকুম হল, মহাপদ্মকে হাত-পা বেঁধে রাজ্যের সুউচ্চ পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হবে।

সৈন্যরা যাতে ফাঁকি না দেয় সেজন্য রাজা নিজে তাদের সঙ্গে গেলেন। মহাপদ্মকে পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হল। মহাপদ্ম যখন নিচে পড়ছেন, শুনতে পেলেন পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলছেন, 'মহাপদ্ম, তোমার কোন ভয় নেই।'

মহাপদ্মকে তিনি দু হাতে কোলে টেনে নিলেন। তারপর নাগ-রাজ তাঁকে নাগপুরীতে নিয়ে রাখলেন। তাঁকে অর্ধেক রাজত্ব দিলেন। সেখানে মহাপদ্ম এক বছর রাজত্ব করলেন। তারপর আবার পৃথিবীতে ফিরে এলেন নাগরাজের অনুমতি নিয়ে। হিমালয় অঞ্চলে প্রব্রজ্যা নিয়ে ধ্যান করতে লাগলেন। অচিরেই তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করলেন।

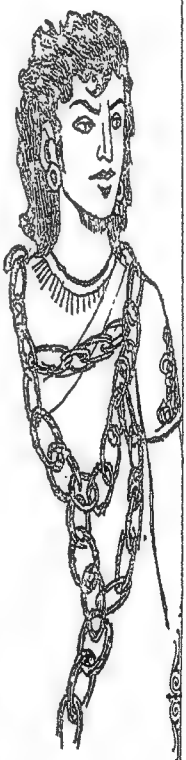

একদিন বারাণসীর এক কাঠুরে হিমালয়ে মহাপদ্মকে দেখতে পেল। সে মহাপদ্মকে জিজ্ঞেস করল, 'মহামান্য, আপনি কি পদ্ম-কুমার?' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'হ্যাঁ।'

কাঠুরের মুখে খবর পেয়ে বারাণসীরাজ এলেন ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। মহাপদ্ম তাঁকে বললেন: 'বাবা, বিষয়সুখ এখন আমার কাছে বিষের তুল্য। আপনিই রাজ্য শাসন করুন। ন্যায়-ধর্ম পালনে চলুন, দান-ধ্যান করুন।'

আম্র জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে একবার তাঁর পুরোহিতরা কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। একে একে সকলেই মারা যেতে লাগলেন। পুরোহিতকুলে একটি ছোট ছেলে ছিল। সে কোনমতে পালিয়ে যেতে পারে। ফলে ঐ সংক্রামক রোগের হাত থেকে বেঁচে যায়।

বালকটি ঘুরতে ঘুরতে তক্ষশিলায় গেল। সেখানে আচার্যের কাছে শিষ্যত্ব নিল। বেশ কিছুদিন আচার্যের কাছে নানা বিষয়ে পড়াশুনো করল। তারপর একদিন বেদ শেষ করে দেশভ্রমণ করার জন্য রওনা হল।

দেশভ্রমণ করতে করতে বালকটি সীমান্তের একটি গ্রামে এসে উপস্থিত হল। ঐ গ্রামের পাশেই ছিল চণ্ডাল গ্রাম। বোধিসত্ত্ব তখন চণ্ডালকুলে জন্ম নিয়েছেন। থাকেন ঐ চণ্ডাল গ্রামটিতে।

বোধিসত্ত্ব চণ্ডালকুলে জন্মেও সুপণ্ডিত হয়েছিলেন। তিনি একটি আশ্চর্য মন্ত্র জানতেন। সেই মন্ত্রবলে অকালে আম গাছে পাকা আম ফলাতে পারতেন। রোজ বনে গিয়ে অকালে পাকা আম ফলাতেন, তারপর সেই আম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

ব্রাহ্মণকুমার বোধিসত্ত্বের কাছে অকালের ফল দেখে অনুমান করল, 'এই লোকটি নিশ্চয়ই মন্ত্র জানে, মন্ত্রবলে ছাড়া অন্য কোন ভাবে রোজ সকালে এত পাকা আম পাওয়া সম্ভব নয়।' ব্রাহ্মণ কুমার মনে মনে ঠিক করল, যে ভাবেই হোক এই চণ্ডালের মন জয় করতে হবে। আর তার কাছ থেকে মন্ত্র শিখে নিতে হবে।

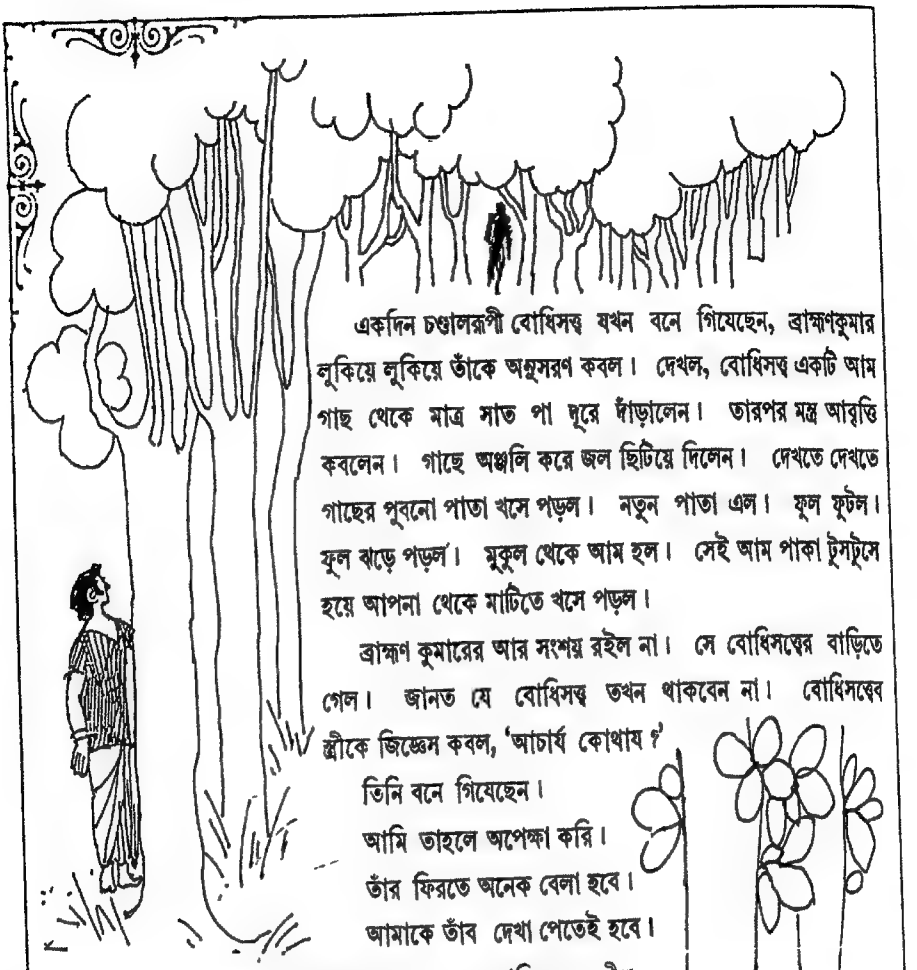

একদিন চণ্ডালরূপী বোধিসত্ত্ব যখন বনে গিয়েছেন, ব্রাহ্মণকুমার লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে অনুসরণ করল। দেখল, বোধিসত্ত্ব একটি আম গাছ থেকে মাত্র সাত পা দূরে দাঁড়ালেন। তারপর মন্ত্র আবৃত্তি করলেন। গাছে অঞ্জলি করে জল ছিটিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে গাছের পুরনো পাতা খসে পড়ল। নতুন পাতা এল। ফুল ফুটল। ফুল ঝড়ে পড়ল। মুকুল থেকে আম হল। সেই আম পাকা টুসটুসে হয়ে আপনা থেকে মাটিতে খসে পড়ল।

ব্রাহ্মণ কুমারের আর সংশয় রইল না। সে বোধিসত্ত্বের বাড়িতে গেল। জানত যে বোধিসত্ত্ব তখন থাকবেন না। বোধিসত্ত্বের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, 'আচার্য কোথায়?'

তিনি বনে গিয়েছেন।

আমি তাহলে অপেক্ষা করি।

তাঁর ফিরতে অনেক বেলা হবে।

আমাকে তাঁর দেখা পেতেই হবে।

ব্রাহ্মণ কুমার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে দেখে বোধিসত্ত্বের স্ত্রীর একটু মায়া হল। বোধিসত্ত্ব ফিরে এসে দেখলেন ব্রাহ্মণ কুমার দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর স্ত্রী তাঁকে একান্তে বললেন, 'বেচারা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।' শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ও মন্ত্র শেখার জন্য এসেছে। তবে লোকটা অসৎ চরিত্রের। মন্ত্র শিখেও রাখতে পারবে না।'

ব্রাহ্মণ কুমার বোধিসত্ত্বের কাছে থেকে গেল। সাংসারিক কাজ-কর্মে সে বোধিসত্ত্বের স্ত্রীকে সাহায্য করতে লাগল। বনে গিয়ে কাঠ কেটে আনত। বোধিসত্ত্ব ফিরলে তাঁর হাত-মুখ ধোয়ার জল এনে দিত। একদিন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'বাবা, একখানা আসন নিয়ে এস, পা-টা রাখি।' ব্রাহ্মণ কুমার কোথাও আসন খুঁজে পেল না। তখন সে নিজের উরু মেলে দিয়ে বলল, 'প্রভু, এখানে পা রাখুন।' এই অবস্থায় সে সারা রাত কাটাল।

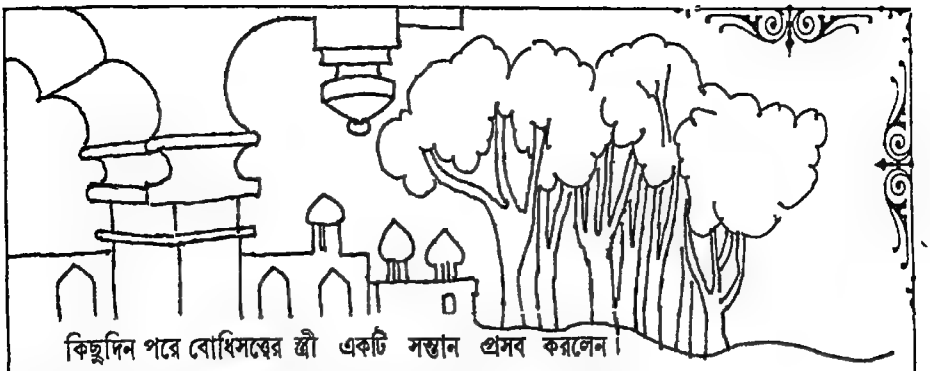

কিছুদিন পরে বোধিসত্ত্বের স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করলেন। ব্রাহ্মণকুমাব তখন প্রসূতির সেবাযত্নে মনোযোগ দিল। সাধারণত ধাইবা যেসব কাজ কবে থাকে,সে সবই সে নিজেব হাতে করল।

ফলে বোধিসত্ত্বের স্ত্রী বললেন, 'প্রভু, এ লোকটা অনেক কাজ কবেছে। এবাব আপনার উচিত ওকে মন্ত্রটি শিখিযে দেওয়া।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'হ্যাঁ, আমাবও তাই মনে হচ্ছে। এ যদি মন্ত্র ধবে বাখতে না পাবে তাহলে আমাব কি।'

বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুমারকে মন্ত্র শিক্ষা দিলেন।

তাবপব বললেন, 'দেখ, কোনদিন যদি কেউ গুরুব নাম জিজ্ঞেস কবে মিথ্যে কথা বলো না। তাহলে মন্ত্র ভুলে যাবে।'

ব্রাহ্মণকুমাব বোধিসত্ত্বেব কাছে মন্ত্র শিখে অকালের পাকা আম বিক্রি কবতে বাজাব লোকজনদেব কাছে এল। তাবা আমগুলো কিনে নিল। এভাবে চলতে লাগল। 'রাজা একদিন কর্মচাবীদেব জিজ্ঞেস কবলেন, 'এত সুন্দব অকালেব ফল কে নিযে আসছে?'

একটা লোক প্রভু।

তাকে একদিন আমাব কাছে নিযে এস।

যে আজ্ঞা।

ব্রাহ্মণকুমাবকে বাজার কাছে আনা হলে রাজা তাকে বাজ ভৃত্যেব চাকবি দিলেন। তারপব একদিন তাকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'আচ্ছা, এই অকালের ফলগুলো কি তুমি যক্ষদের কাছ থেকে পাও?'

না, প্রভু।

তাহলে মন্ত্রের জোবে পাও কি?

হ্যাঁ।

আমাকে একদিন মন্ত্র গুণ দেখাও।

দেখাব প্রভু।

পরে একদিন রাজার বাগানে ব্রাহ্মণকুমার সকলের সামনে মন্ত্রের গুণ দেখাল। দেখে সবাই মোহিত হয়ে গেল। রাজা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে ব্রাহ্মণ কুমারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এই মন্ত্র কার কাছে শিখলে?' ব্রাহ্মণ কুমার ভাবল, রাজাকে চণ্ডালের কথা বললে উনি অবজ্ঞা করবেন, বরং নামজাদা এক পণ্ডিতের নাম করা যাক।' এই ভেবে ব্রাহ্মণকুমার মিথ্যে একটা নাম বলল।

কিছুদিন পরে বাগানে বসে রাজার ইচ্ছে হল আম খাবার। তিনি ব্রাহ্মণ কুমারকে ডাকিয়ে বললেন, 'আম খাওয়াতে পার?' 'নিশ্চয়ই মহারাজ' বলে সে আমগাছের সামনে গেল। কিন্তু মন্ত্র উচ্চারন করতে গিয়ে দেখে কিছুই মনে পড়ছে না। রাজাকে বোঝাবার জন্য বলল, 'মহারাজ, আজ তিথিযোগ নেই।' রাজা লক্ষ্য করেছিলেন, ব্রাহ্মণ কুমার মন্ত্র বলতে পারছিল না। ফলে তিনি এই তিথির কথা বিশ্বাস করলেন না, 'ওসব কথা তো আগে বল নি।'

রাজাদের ক্রোধের কথা ব্রাহ্মণ কুমার জানত। ফলে সে আর মিথ্যে না বলে রাজার পা ধরে বলল, 'প্রভু, আমি ঘোরতর পাপ করেছি। আমার গুরু চণ্ডাল। আমি আপনার কাছে মিথ্যে বলেছিলাম। সেই পাপে মন্ত্র আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।'

রাজার রাগ এতে আর বেড়ে গেল। এমন আশ্চর্য সম্পদ ধরে রাখতে পারে না যে মূর্খ তাকে আর নিজের কাছে রাখলেন না, তাড়িয়ে দিলেন।

স্পন্দন জাতক

অতীতে বারাণসী নগরের বাইরের দিকে ছুতোরদের একটি গ্রাম ছিল। সেখানে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ব্রাহ্মণও ছুতোরদের সঙ্গে থেকে ছুতোরের কাজ করতেন। বন থেকে কাঠ কেটে এনে রথ বানিয়ে বিক্রি করাই ছিল ব্রাহ্মণের কাজ।

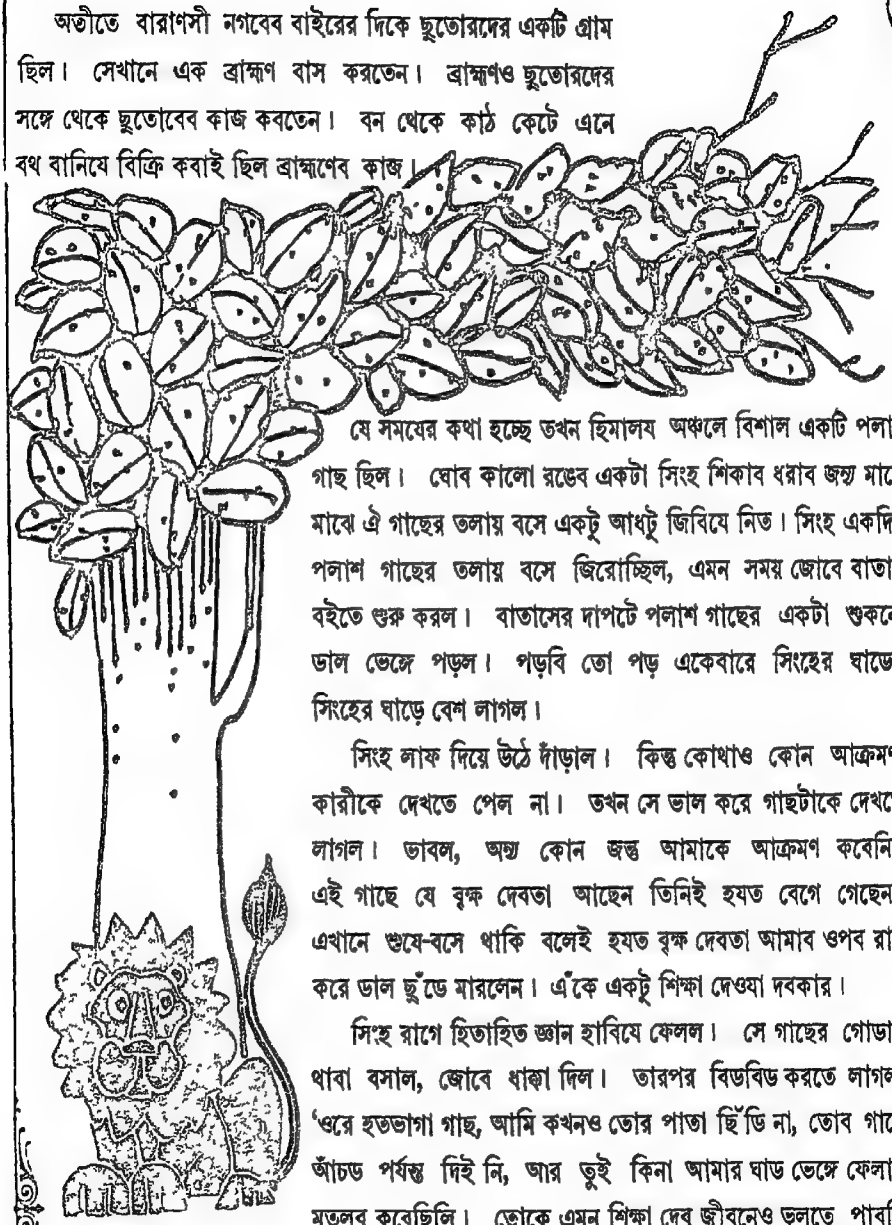

যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন হিমালয় অঞ্চলে বিশাল একটি পলাশ গাছ ছিল। ঘোর কালো রঙের একটা সিংহ শিকার ধরার জন্য মাঝে মাঝে ঐ গাছের তলায় বসে একটু আধটু জিরিয়ে নিত। সিংহ একদিন পলাশ গাছের তলায় বসে জিরোচ্ছিল, এমন সময় জোরে বাতাস বইতে শুরু করল। বাতাসের দাপটে পলাশ গাছের একটা শুকনো ডাল ভেঙ্গে পড়ল। পড়বি তো পড় একেবারে সিংহের ঘাড়ে। সিংহের ঘাড়ে বেশ লাগল।

সিংহ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু কোথাও কোন আক্রমণকারীকে দেখতে পেল না। তখন সে ভাল করে গাছটাকে দেখতে লাগল। ভাবল, অন্য কোন জন্তু আমাকে আক্রমণ করেনি। এই গাছে যে বৃক্ষ দেবতা আছেন তিনিই হয়ত রেগে গেছেন। এখানে শুয়ে-বসে থাকি বলেই হয়ত বৃক্ষ দেবতা আমার ওপর রাগ করে ডাল ছুঁড়ে মারলেন। এঁকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

সিংহ রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। সে গাছের গোড়ায় থাবা বসাল, জোরে ধাক্কা দিল। তারপর বিড়বিড় করতে লাগল, 'ওরে হতভাগা গাছ, আমি কখনও তোর পাতা ছিঁড়ি না, তোর গায়ে আঁচড় পর্যন্ত দিই নি, আর তুই কিনা আমার ঘাড় ভেঙ্গে ফেলার মতলব করেছিলি। তোকে এমন শিক্ষা দেব জীবনেও ভুলতে পারবি না। তোকে যদি শেকড়শুদ্ধ উপড়ে না ফেলেছি তাহলে তুই আমার নামে কুকুর পুষিস।'

সিংহ গাছটাকে জব্দ করার ইচ্ছায় আশপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঠিক তখন সেই ছুতোর ব্রাহ্মণ সঙ্গে দু-তিনজন লোক নিয়ে বনে ঢুকল। ব্রাহ্মণ রথ এসেছিলেন। রথটাকে দূরে রেখে কুঠার হাতে নিয়ে তিনি বনের ভেতরে ঢুকলেন। কালো সিংহ ব্রাহ্মণকে দেখে ভাবল, 'আজ গাছটাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া যাবে।' সিংহ গিয়ে পলাশ গাছের তলায় দাঁড়াল। ব্রাহ্মণ পলাশ গাছের দিকে না তাকিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। সিংহ ভাবল, 'এঁকে ডেকে কথা বলি।'

ওহে ব্রাহ্মণ, কি কাঠ কাটতে এ বনে এসেছ?

সিংহের মুখে মানুষের ভাষা শুনে ব্রাহ্মণ তো অবাক। ভাবলেন, 'নিশ্চয়ই এই কালো সিংহটা জানে রথের জন্য কি ধরনের কাঠ সব চেয়ে ভাল হবে।' এই কথা ভেবে ব্রাহ্মণ সিংহকে জিজ্ঞেস করল, 'ভাই সিংহ, তুমি বনের রাজা, সারাটা বন তোমার নখদর্পণে। বল তো, রথ বানানোর কাঠ কোন্ জায়গায় গেলে পাব?'

শাল, খয়ের এসব কাঠের নাম শুনেছ?

নিশ্চয়ই।

সকলের ধারণা ঐ সব ভাল কাঠে রথ হয়।

হ্যাঁ, তাই তো শুনেছি।

এর চেয়েও ভাল কাঠ আছে।

কিন্তু কোথায় পাব সে কাঠ?

পলাশের কাঠই সেরা।

সেটা কোথায় পাব?

আমি যে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছি সেটাই পলাশ গাছ।

একথা বলে সিংহ চলে গেল। ছুতোরবাবু গাছ কাটতে আরম্ভ করে দিল। বৃক্ষ দেবতা তখন মনে মনে ভাবছেন, 'এই সিংহটার কোন ক্ষতি আমি করি নি। তবু ও আমাকে শেষ করার ষড়যন্ত্র করে গেল। ঠিক আছে, আমি নিজে তো মরবই, কিন্তু একেও ছেড়ে দেব না।'

বৃক্ষ দেবতা তখন কাঠুরে সেজে ছুতোরের কাছে গেলেন।

ও ভাই ছুতোর, বেশ জবরদ গাছ পেয়েছ দেখছি।

হ্যাঁ ভাই, তা পেয়েছি।

ও গাছের কাঠ দিয়ে কি বানাবে?

রথ।

এ গাছেব কাঠে বথ বানানো যায কে বলল ?

কালো সিংহ।

ঠিক কথাই বলেছে, তবে যদি কালো সিংহের গলাব নবম চামডা এই বথেব চাকায লাগাও তাহলে চাকাও খুব মজবুত হবে।

ছুতোবরা বলল, 'সে সিংহকে এখন পাই কোথায় ?' কাঠুরে-রূপী বৃক্ষ দেবতা বললেন, 'একটু এগোলেই দেখতে পাবে। গাছটা তো আর উডে যাবে না। গাছ কাটা বন্ধ রেখে আগে সিংহটাকে জবাই কর।'

নিজেব দুষ্টু বুদ্ধিব জন্য শেষ পর্যন্ত কালো সিংহ ছুতোরদেব হাতে প্রাণ দিতে বাধ্য হল।

জবনহংস জাতক

এক

বারাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তেব আমলে বোধিসত্ত্ব একবার হাঁস হয়ে জন্মান। ন হাজাব হাঁসেব তিনি দলপতি হন। থাকতেন চিত্রকুট পাহাডে। একদিন হাঁসের দল এক সরোবরে শ্যাওলা খেয়ে বারাণসী নগরেব ওপর দিযে ফিরে চলেছে চিত্রকুটে। এক সঙ্গে অত হাঁসের মন্দ গতিতে উডে যাওযায মনে হচ্ছিল যেন বাবাণসীর মাথার ওপর হীরেব মাদুব বিছিযে দেওযা হযেছে।

বাবাণসীরাজেব নজব এই হাঁসেব দলেব মধ্যে বোধিসত্ত্বকে আবিষ্কার করে ফেলল। তিনি অমাত্যদের বললেন, 'মনে হচ্ছে মাঝখানেব হাঁসটি নিশ্চযই আমার মত একজন বাজা।'

তিনি ভাবলেন হাঁসেব বাজাব সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবেন। সেজন্য বাদকদেব বাজনা বাজাতে বললেন। নিজে ফুলের মালা হাতে নিযে এগিযে এলেন। বাজাব এই অভ্যর্থনা দেখে বোধিসত্ত্ব সঙ্গী হাঁসদেব দিকে তাকালেন।

বাজা কি বলছেন ?

বাজা আপনাব সঙ্গে বন্ধুত্ব কবতে চান।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ প্রভু।

চল, তাহলে নামি।

বোধিসত্ত্ব বাবাণসীবাজেব বন্ধুত্ব স্বীকাব কবে সদলবলে উড়ে দুই গেলেন।

একবাব বোধিসত্ত্বেব ছোট ভাই দুটি হাঁসেব মধ্যে এক অদ্ভুত ইচ্ছা প্রকট হযে উঠল। তাবা বোধিসত্ত্বকে বলল, 'দাদা, আমরা সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিযে উডতে চাই।'

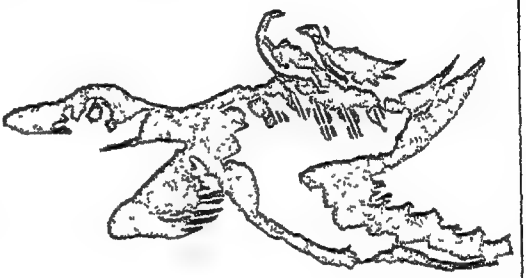

তোমবা এই ইচ্ছেটা ত্যাগ কর।

কেন দাদা ?

সূর্যের গতিব সঙ্গে পারবে না।

তবু ভাইরা বারবাব তাঁব অনুমতি চাইতে লাগল। পবপর তিনবারই তিনি তাদেব বাবণ করলেন, 'এ সাধ ভযঙ্কব, এতে তোমাদের প্রাণ পর্যন্ত হাবাতে হতে পাবে।'

কচি হাঁসেবা নিজেদের শক্তিব দৌড জানত না। তাবা খুব একগুঁযে হযে ঠিক করল, 'পবের দিন ভোরে সূর্য উঠতে শুরু করলেই আমবাও উড়তে শুরু করব। তাবপর দেখা যাক।'

ভোরবেলা বোধিসত্ত্ব ওদেব দেখতে পেলেন না। অন্যান্য হাঁসদেব জিজ্ঞেস করে জানতে পাবলেন ওরা যুগন্দর পাহাড়ে বসে আছে। সূর্য উঠলেই উড়তে শুরু কববে। বোধিসত্ত্ব মনে মনে ভাবলেন, ওরা তো সূর্যেব সঙ্গে পাববে না, মাঝখান থেকে মাবা পড়বে। যেভাবে হোক ওদের বাঁচাতে হবে।'

সূর্য ওঠামাত্র হাঁসেবা উড়তে শুরু কবল। পেছন পেছন বোধিসত্ত্বও উড়ে চলেছেন। সবচেযে ছোটটি সারা সকাল উড়ে ক্লান্ত হযে পড়ল। তাব ডানা অবশ হযে এল। সে বোধিসত্ত্বকে জানাল, 'দাদা, আব পারছি না।'

ভয় নেই।

পারছি না দাদা।

তুমি আমার পিঠে বস

তারপর তিনি ছোট ভাইদের একটিকে যুগন্দর পাহাড়ে নামিয়ে রেখে এলেন।

আবার চিত্রকূট থেকে বাতাসের বেগে উড়ে এসে আরেক ভাইয়ের সঙ্গ নিলেন। দুপুর পর্যন্ত সে উড়ে চলল। কিন্তু তারপর সে-ও কাহিল হয়ে পড়ল। ইশারা করে দাদাকে জানাল, আর পারছে না। সঙ্গে সঙ্গে বোধিসত্ত্ব তাকেও পিঠে করে এনে চিত্রকূটে পৌঁছে দিলেন।

দুবার এভাবে উড়ে বোধিসত্ত্বের মধ্যেও প্রতিযোগিতার মনোভাব দেখা দিল। ভাবলেন, 'আমার বেগ বাতাসের মত, আমিই সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দেব।' এই ভেবে তিনি আবার উড়তে শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যের কাছাকাছি চলে এলেন।

এভাবে তিনি একবার সূর্যের আগে, একবার সূর্যের পেছনে উড়তে লাগলেন। উড়তে উড়তে হঠাৎ তাঁর মনে হল, 'শুধুশুধু আমি কেন এই প্রতিযোগিতায় নামলাম। আমার বুদ্ধি নষ্ট হচ্ছে।' এই ভেবে তিনি ওড়ার বেগ কমাতে লাগলেন। আস্তে আস্তে বারাণসীতে নেমে এলেন।

তিন

বারাণসীরাজ বোধিসত্ত্বকে আসতে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। বোধিসত্ত্বের বসার জন্য সোনার পিঁড়ি আনলেন। তাঁকে মহা সমাদরে বসতে দিলেন।

রাজা বোধিসত্ত্বের ডানায় পুষ্টিকর তেল মালিশ করে দিলেন। সোনার থালায় মধু ও ফল দিলেন। তারপর মধুর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'বন্ধু, তুমি এখন কোথা থেকে আসছ?'

বোধিসত্ত্ব তখন রাজাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। রাজা সব শুনে বললেন, 'বন্ধু, সূর্যের সঙ্গে তোমার প্রতিযোগিতা দেখতে আমার খুব ইচ্ছে করছে।'

সেই বেগ দেখানো যায় না মহারাজ।
তাহলে সে রকম কিছু একটা দেখাও।
তা দেখাতে পারি।
দেখাও বন্ধু।
আপনি তীরন্দাজদের ডাকুন।

রাজা তীরন্দাজদের মধ্যে চার জন শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজকে বেছে নিলেন। বোধিসত্ত্বের নির্দেশে রাজবাড়ির আঙিনায় গর্ত করে একটা স্তম্ভ বানানো হল। বোধিসত্ত্ব ঐ স্তম্ভের ওপর বসে বললেন, 'আমার গলায় একটা ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হক। এখন এইবার তীর ছুঁড়বে তীরন্দাজরা। ওদের তীর মাটিতে পড়ার আগেই শূন্য থেকে আমি সেগুলো তুলে এনে এখানে ফেলে দেব। কিন্তু আমার যাওয়া-আসার মধ্যে সময়ের তফাৎ এত কম হবে যে আপনারা আমাকে উড়তে দেখতে পাবেন না। ঘণ্টার শব্দ শুনে বুঝতে পারবেন।'

তীরন্দাজ তীর ছুঁড়ল। সবাই অবাক হয়ে দেখল বোধিসত্ত্ব ঐ স্তম্ভের ওপরই আছেন। অথচ তীরগুলো এনে দিলেন। রাজা তখন অবাক হয়ে বললেন, 'বন্ধু, তোমার বেগের চেয়ে আরো দ্রুত কোন বেগ আছে কি?'

আছে মহারাজ।

কি বেগ?

মৃত্যুর বেগই সবচেয়ে দ্রুত।

এরপর বোধিসত্ত্ব রাজাকে জীবনের অনিত্যতা বিষয়ে অনেক মূল্যবান কথা বললেন। রাজাকে ন্যায়পথে চলার পরামর্শ দিয়ে চিত্রকূটে ফিরে গেলেন।

কালিঙ্গবোধি জাতক

অতীতে কলিঙ্গ রাজ্যে দন্তপুর নগরে কলিঙ্গ নামে এক রাজা ছিলেন। কলিঙ্গ রাজার দুটি ছেলে: মহাকালিঙ্গ ও খুল্লকালিঙ্গ। জোতিষীরা গণনা করে বলেছিলেন যে ছোট ভাই খুল্লকালিঙ্গের ছেলে রাজচক্রবর্তী হবেন। আর বড় ভাই মহাকালিঙ্গ কলিঙ্গের মৃত্যুর পর রাজা হবেন। জ্যোতিষীরা আরও বলেছিলেন: খুল্লকালিঙ্গ তপস্বী হবেন।

কলিঙ্গের দেহান্ত হলে মহাকালিঙ্গ রাজা হলেন। খুল্লকালিঙ্গ হলেন যুবরাজ। খুল্লকালিঙ্গ জানতেন তাঁর ছেলে রাজচক্রবর্তী হবে। সেজন্য তিনি বেশ গর্বিত ছিলেন। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের এই গর্ব সহ্য করতে না পেরে অমাত্যকে আদেশ দিলেন, 'খুল্লকালিঙ্গকে গ্রেপ্তার কর।'

অমাত্য খুল্লকালিঙ্গকে ভালবাসত। সে তাঁকে জানিয়ে দিল, 'রাজা আপনাকে বন্দী করার ষড়যন্ত্র করছেন।' খুল্লকালিঙ্গ এ কথা শোনামাত্র দেশত্যাগ করলেন। যাওয়ার আগে অমাত্যকে নিজের শীলমোহর দেখিয়ে বলে রাখলেন, 'এগুলো দেখে রাখ, আমার ছেলে এসে এই চিহ্ন দেখালে তাকে রাজা কোরো।' তারপর তিনি ঘুরতে ঘুরতে বনের কাছে একটি সুন্দর জায়গায় আশ্রম বানালেন। তপস্যা করে দিন কাটাতে লাগলেন।

এদিকে মদ্র রাজ্যের শাকল নগরে মদ্ররাজার একটি মেয়ে হয়েছিল। এই মেয়েটির সম্পর্কেও জ্যোতিষীরা বলেছিলেন, 'এর ছেলে রাজচক্রবর্তী হবে।' জম্বুদ্বীপের রাজারা যখন শুনলেন মদ্র রাজার মেয়ের ছেলে রাজচক্রবর্তী হবে, তখন তাঁরা সবাই ছুটে এলেন মদ্র রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে।

মদ্ররাজা দেখলেন, মহা বিপদ। মেয়ে একটি, অথচ তাকে বিয়ে করতে চাইছে অনেক শক্তিশালী রাজা। এঁদের কারো সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে অন্যরা যুদ্ধ করবে। মেয়েকে বাঁচাতে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই ঠিক হবে। এই ঠিক করে তিনি স্ত্রী-কন্যার হাত ধরে মদ্র

রাজ্য ছেড়ে বনে চলে গেলেন। খুল্লকালিঙ্গের আশ্রমের কাছে তিনিও আশ্রম তৈরি করলেন। তবে খুল্লকালিঙ্গের আশ্রম ছিল পাহাড়ের নিচে, মদ্র রাজার আশ্রম ছিল পাহাড়ের ওপরে।

মদ্ররাজা ও তাঁর স্ত্রী যখন ফলমূল যোগাড়ের জন্য বনের গভীরে ঢুকতেন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন না। কারণ গভীর অরণ্যে অনেক হিংস্র জন্তু আছে। মেয়েকে তাঁরা আশ্রমেই রেখে যেতেন। বাবা-মা চলে গেলে মেয়েটি বনের ফুল তুলে মালা গাঁথত। নদীর তীরে ফুলে ফলে ভরা একটি আম গাছ ছিল। সে ঐ গাছে বসে খেলা করত। মালা গাঁথত। একদিন মদ্ররাজার মেয়ে একটি মালা গেঁথে জলে ফেলে দিল।

মালাটি ভাসতে ভাসতে নিচের দিকে চলল। তখন খুল্লকালিঙ্গ নদীতে স্নান করছিলেন। মালাটি ভাসতে ভাসতে তাঁর কাছে এল। তিনি মালা দেখে বুঝলেন, 'এ মালা যে গেঁথেছে সে তরুণী।' খুল্লকালিঙ্গের ইচ্ছে হল তরুণীকে দেখার। তিনি নদীর স্রোতের উল্টো মুখে চললেন। পাহাড়ের কাছে এসে মদ্ররাজার মেয়ের সঙ্গে দেখা হল।

দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হল। খুল্লকালিঙ্গ মেয়েটিকে নিজের কাহিনী সব খুলে বললেন। বাবা-মা ফিরলে মদ্ররাজার মেয়ে তাঁদের সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললেন। মদ্ররাজা তখন ঠিক করলেন এই কুমারের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন।

বিয়ের পর তাঁরা বনেই থাকেন। যথাসময়ে তাঁদের একটি ছেলে হল। ছেলেটি সর্ববিদ্যায় পণ্ডিত হল। তপস্যাবলও অর্জন করল। তখন খুল্লকালিঙ্গ তাকে শীলমোহর দিয়ে বললেন, 'কলিঙ্গ রাজ্যে যাও, আমি গুনে দেখছি দাদা গত হয়েছেন, তুমি সেখানে গিয়ে এই শীলমোহর দেখিয়ে রাজা হও।'

খুল্লকালিঙ্গের ছেলে তপস্যাবলে আকাশপথে কলিঙ্গ রাজ্যে গেলেন। সেই অমাত্যের সঙ্গে দেখা করলেন এবং রাজা হলেন। জ্যোতিষীর গণনা সম্পূর্ণ মিলে গেল। খুল্লকালিঙ্গের ছেলে রাজ-চক্রবর্তী হলেন।

পরে রাজচক্রবর্তী কলিঙ্গকুমার বনে গিয়ে বাবা-মা-কেও ফিরিয়ে আনলেন। ন্যায়ধর্ম অনুসারে রাজ্য শাসন করে কালক্ষয় হলে যথাসময়ে দেহ রাখলেন। তার আগেই তাঁর বাবা-মা গত হয়েছেন।

অকীর্তি জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার এক ধনবান ব্রাহ্মণকুলে জন্মালেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয় অকীর্তি। অকীর্তি যখন সবে হাঁটতে শিখেছেন সে সময় তাঁর এক বোন জন্মায়। বোনের নাম রাখা হল যশোবতী।

একসময় অকীর্তি ষোল বছর বয়সে পা দিলেন। তখন তিনি তক্ষশিলায় সর্ববিদ্যা শিখে বাড়িতে ফিরে এলেন। এরপর তাঁর বাবা গত হলেন। কিছুদিন পরে মা-ও দেহ রাখলেন। বাবা-মার শেষ কাজ সেরে ফেলার পর তিনি ধন-সম্পত্তির খোঁজ নিতে লাগলেন। তাঁর চারপাশে তখন আত্মীয়স্বজনরা বলে চলেছেন—

তোমার বাবা এত সম্পত্তি করেন।

পিতামহ এত সম্পত্তি রেখে যান।

প্রপিতামহ রেখে গেছেন এত সম্পত্তি।

তোমার মাতামহও রেখে গেছেন বিপুল সম্পত্তি।

বারবার একই কথা শুনতে শুনতে অকীর্তিকুমারের মনে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দিল: ১. এখানে দেখছি কেবল ধনসম্পত্তিই রয়েছে, যাঁরা এসব উপার্জন করলেন তাঁরা কোথায়? ২ যদি তাঁরা এত ধন ফেলে রেখে যেতে বাধ্য হয়ে থাকেন আমিই কি ঐ ধনরাশি নিজের কাছে

রাখতে পারব ? ৩. নাকি আমাকেও একদিন বাধ্য হয়ে ওসব ছেড়ে চলে যেতে হবে ?

এইসব ভেবে সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি জন্মাল। যক্ষের মত ধন আগলে বসে থাকার কোন কারণ দেখতে পেলেন না। অকীর্তি তখন তাঁর বোন যশোবতীকে ডেকে বললেন—

বোন, তুমি এই সম্পত্তি রক্ষা কর।

আর আপনি কি করবেন ?

আমি সম্পত্তি ত্যাগ করব।

তারপর ?

তপস্যা করব।

আপনি যদি তাই করেন তাহলে আমিও আপনার সঙ্গেই থাকব।

অকীর্তি তখন রাজার কাছে দানের অনুমতি চাইলেন। তারপর ধনভাণ্ডার খুলে দু হাতে দান করতে লাগলেন। ধন তবু ফুরোয় না। তখন অকীর্তিকুমার ভাবলেন, 'রোজই আমার আয়ু কমে আসছে, অথচ ধন ফুরোচ্ছে না।'

অকীর্তিকুমার তখন তাঁর বাড়ির সব দরজা খুলে দিলেন। ঘোষণা করে দিলেন, 'আমি সমস্ত সম্পত্তি দান করলাম। যার খুশি নিয়ে যাক।' আত্মীয়রা অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু অকীর্তির মত বদলানো গেল না। বোনের হাত ধরে তিনি বারাণসী গমন করলেন।

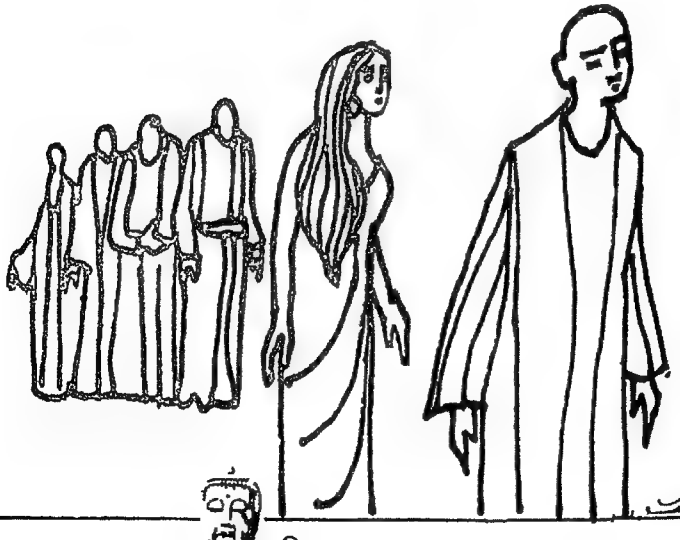

বারাণসী থেকে কয়েক যোজন দূরে অকীর্তি এক আশ্রম গড়লেন। সেখানে বোনের সঙ্গে থাকতে লাগলেন। তাঁর শিষ্টাচার এবং ধর্ম পালন দেখে লোকজন উৎসাহিত হল। অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব নিয়ে আশ্রমে থাকতে শুরু করল। তারা অকীর্তিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত।

ওদিকে তিনি এতে মনে মনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, 'আমার উচিত একা থাকা।' পাছে লোকজন টের পায়, সেজন্য মাঝরাতে বোনের হাত ধরে অকীর্তি আবার যাত্রা শুরু করলেন।

এখান থেকে গেলেন দ্রাবিড় রাজ্যে। কিন্তু তাতে অবস্থা কিছুই বদলাল না। সেখানেও অনেক শিষ্য ও অনুচর জুটে গেল। আবার উপহার আসতে শুরু করল। এতে বিরক্ত হয়ে বোধিসত্ত্ব এবার বোনকেও না জানিয়ে দ্রাবিড় রাজ্য ত্যাগ করলেন। কাযাদ্বীপের কাছে মহি নামে এক দ্বীপ ছিল, এবার গেলেন সেখানে। বিশাল এক গাছের তলায় বসে ধ্যান করতে লাগলেন।

অকীর্তি ঐ গাছের তলা থেকে মুহূর্তের জন্যও নড়েন না। ফলমূল যোগাড়ের চেষ্টা করেন না। দিবারাত্র ধ্যান করছেন। খাচ্ছেন ঐ গাছের পাতা সিদ্ধ করে।

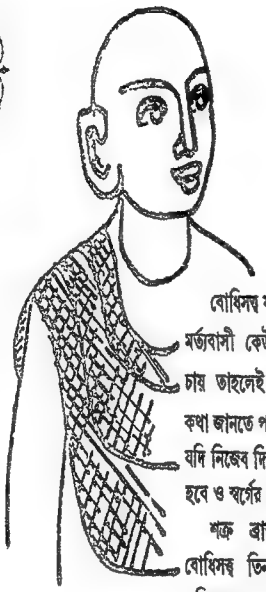

বোধিসত্ত্ব যখন তপস্যায় মগ্ন, তখন শক্রর আসন টলে উঠল। মর্ত্যবাসী কেউ নিজের পুণ্যকর্ম দিয়ে যদি স্বর্গের শক্রত্ব পদ পেতে চায় তাহলেই এ রকম ঘটে থাকে। শক্র ধ্যানবলে বোধিসত্ত্বের কথা জানতে পারলেন। ভাবলেন, ওঁর কাছে ভিক্ষা পাত্র নিয়ে গেলে যদি নিজের দিনান্তের পাতা সেদ্ধ আমাকে দিয়ে দেয়, তাহলেই বুঝতে হবে ও স্বর্গের দেবতা হতে চাইছে।

শক্র ব্রাহ্মণবেশে এসে পরপর তিনবার ভিক্ষা চাইলেন। বোধিসত্ত্ব তিনবারই তাঁকে নিজের দিনান্তের খাবার দিয়ে দিলেন। পরিণামে শূন্য থালা পড়ে রইল শুধু। শক্র মুগ্ধ হয়ে গেলেন এই নবীন তপস্বীর মোহমুক্তি দেখে। তিনি তাঁকে প্রকৃত জ্ঞানের পথ বলে দিলেন।

রুরু জাতক

এক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে এক ধনবান ব্যবসায়ীর একটি ছেলে জন্মায়। ব্যবসায়ী ছেলে পেয়ে খুব খুশি। নিজের অগাধ টাকা আছে, ছেলের ছেলে, তার ছেলেরও ঐ সম্পত্তিতে ভাল ভাবেই দিন কেটে যাবে ভেবে ব্যবসায়ী ছেলেকে লেখাপড়া শিখতে পাঠাল না। কেননা এতে ছেলের খুব কষ্ট হবে। সুতরাং ছেলে আমোদ প্রমোদেই দিন কাটাতে লাগল। একদিন ব্যবসায়ী মারা গেল।

বাবার মৃত্যুর পর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ছেলেটি সব টাকা উড়িয়ে দিল। তারপর ধার করতে শুরু করল। ধারে তার গলা অবধি ডুবে গেল। নিজেকে এরকম অসম্মানজনক অবস্থায় দেখে সে খুবই মনোকষ্ট পেল। রোজ লোক এসে টাকার জন্য কথা শুনিয়ে যাচ্ছে। শেষে সে ঠিক করল আত্মহত্যা করবে। এই ভেবে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীর জলে ভেসে যেতে যেতে সে মৃত্যুভয়ে আর্তনাদ করতে লাগল।

বোধিসত্ত্ব তখন রুরু মৃগ বংশে জন্ম নিয়েছেন। তাঁর সর্বাঙ্গ সোনার মত। সঙ্গে কয়েক হাজার হরিণ সব সময় ঘুরছে। মানুষের আর্ত চিৎকার শুনে তাঁর মায়া হল। তিনি লোকটাকে বাঁচালেন। সে তো সোনার হরিণের প্রতি কৃতজ্ঞতার বন্যা বইয়ে দিতে লাগল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব তাঁকে বললেন, 'ভাই, এত ভাল ভাল কথা বলার দরকার নেই। আমি তোমাকে বারাণসীতে ছেড়ে আসছি, তবে তুমি সোনার হরিণের ঘটনাটা কাউকে বোলো না। টাকার লোভেও কখনও আমার ঠিকানা কাউকে জানাবে না।'

দুই

বারাণসীরাজের মহিষী আগের রাতে স্বপ্ন দেখেছেন এক সোনার হরিণ তাঁকে ধর্মকথা শোনাচ্ছে। রাণী ভাবলেন, 'পৃথিবীতে যদি সোনার হরিণ না থাকত আমিও স্বপ্নে তা দেখতাম না। নিশ্চয়ই সোনার হরিণ আছে।' তখন তিনি রাজাকে বললেন, 'হয় সোনার হরিণ এনে আমাকে ধর্মকথা শোনান, নইলে আমি এ জীবন রাখব

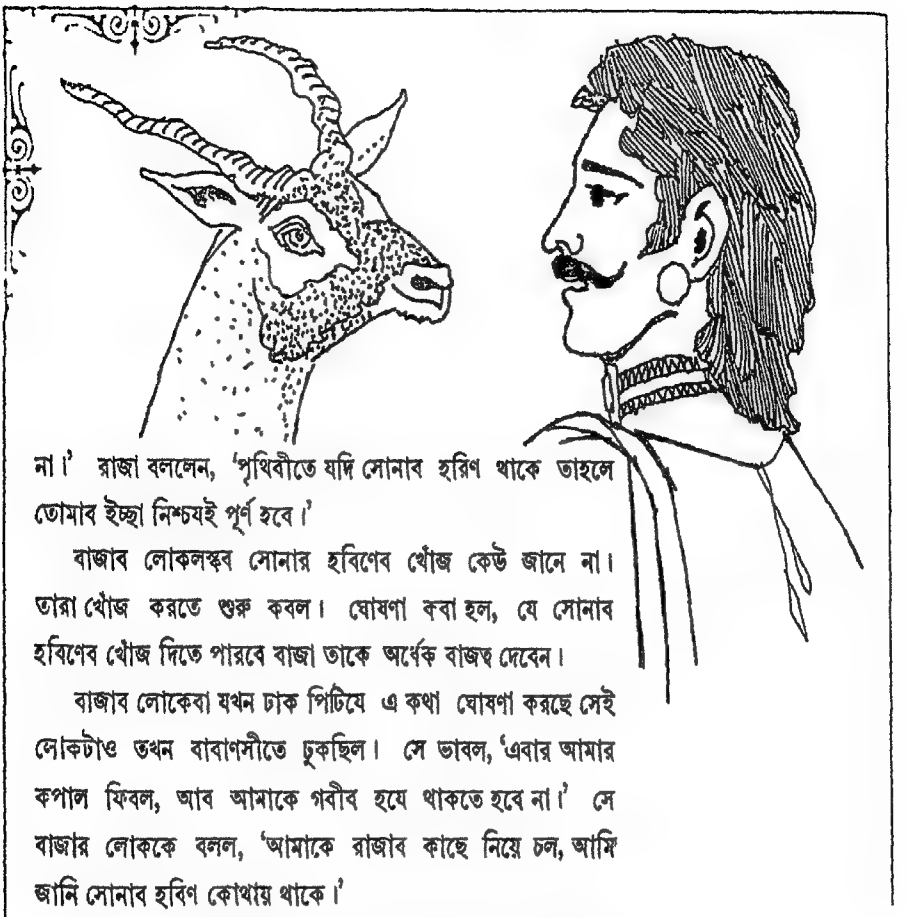

না।' রাজা বললেন, 'পৃথিবীতে যদি সোনার হরিণ থাকে তাহলে তোমার ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।'

রাজার লোকলস্কর সোনার হরিণের খোঁজ কেউ জানে না। তারা খোঁজ করতে শুরু করল। ঘোষণা করা হল, যে সোনার হরিণের খোঁজ দিতে পারবে রাজা তাকে অর্ধেক রাজত্ব দেবেন।

রাজার লোকেরা যখন ঢাক পিটিয়ে এ কথা ঘোষণা করছে সেই লোকটাও তখন বারাণসীতে ঢুকছিল। সে ভাবল, 'এবার আমার কপাল ফিরল, আর আমাকে গরীব হয়ে থাকতে হবে না।' সে রাজার লোককে বলল, 'আমাকে রাজার কাছে নিয়ে চল, আমি জানি সোনার হরিণ কোথায় থাকে।'

এরপর রাজা সৈন্যসামন্ত নিয়ে সোনার হরিণের বন ঘিরে ফেললেন। লোভী লোকটাকেও সঙ্গে এলেন। সে জায়গাটা দেখিয়ে দিল। সৈন্যরা তা ঘিরে ফেলল।

সোনার হরিণরূপী বোধিসত্ত্ব পড়লেন মহা বিপদে। রাজার কাছে যাওয়াটাই ভাল। নইলে সৈন্যদের হাতে প্রাণ দিতে হবে। ঝড়ের বেগে তিনি রাজার সামনে এলেন, 'মহারাজ, আপনি আমার খোঁজ কি ভাবে পেলেন?' রাজা তখন লোকটাকে দেখিয়ে দিলেন। তাকে দেখে বোধিসত্ত্বের সব কথা মনে পড়ে গেল। তিনি তখন মানুষের ভাষাতেই মানুষের অনেক নিন্দা করলেন। রাজাও জানতে পারলেন সোনার হরিণ লোকটাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সেই লোকই তাকে ধরিয়ে দিচ্ছে দেখে রাজা খুবই বিরক্ত হলেন, বললেন, 'ওকে এখানে শেষ করব।'

বোধিসত্ত্বই লোকটাকে বাঁচিয়ে দিলেন। বললেন, 'ও যে মিত্রদ্রোহ, সে তো দেখাই যাচ্ছে। মেরে আর কি হবে।'

তারপর রাজাকে ও রাণীকে অনেক ধর্মকথা শোনালেন, সর্ব জীবে দয়া করতে বললেন।

শরভমৃগ জাতক

অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব হরিণকুলে জন্ম নেন। হরিণদের মধ্যে শরভকুলে তাঁর জন্ম হয়।

রাজা শিকার করতে খুব ভালবাসতেন। সকলেই জানে রাজারা

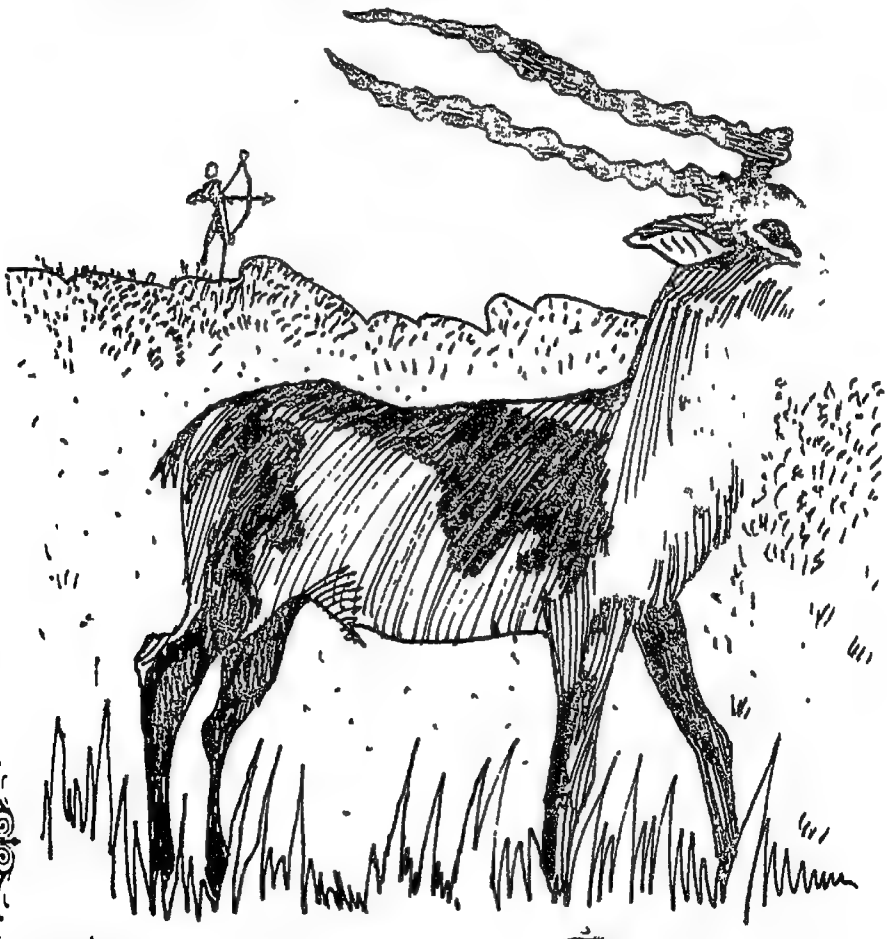

হরিণের মাংস খুব ভালবাসে। ব্রহ্মদত্তের তো কথাই নেই। তাছাড়া ব্রহ্মদত্তের শরীরে ছিল অসুরের মত শক্তি। তিনি মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করতেন না।

একবার বনে শিকার করতে গিয়ে তিনি অনুচরদের বললেন, 'যার পাশ দিয়ে হরিণ পালিয়ে যাবে তাকে উচিত শিক্ষা পেতে হবে।' অনুচররা ভয় পেয়ে গেল। তখন তারা ঠিক করল যেভাবে হোক নিজেদের বাঁচতে হবে। ওই ভেবে রাজাকে বনের এক জায়গায় রেখে হরিণের আস্তানার চারপাশ নিজেরা ঘিরে দাঁড়াল। তারপর তুমুল শব্দ শুরু করে দিল।

ঐ আস্তানায় তখন শরভ মৃগরূপী বোধিসত্ত্ব ছিলেন। তিনি দেখলেন সামনে দিয়ে পালানোর রাস্তা বন্ধ। রাজার লোকেরা সেখানে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে তীর-ধনুক। অথচ সামনের দিকটা একেবারে ফাঁকা। সেখানে পাহারা দিচ্ছে মাত্র একজন, আর তিনি হলেন রাজা। শরভ তখন প্রচণ্ড গতিতে রাজার দিকে ছুটলেন। হঠাৎ চোখে একমুঠো বালি ছুঁড়ে দিলে যা হয় রাজার হল সেই অবস্থা। শরভ অনায়াসে রাজাকে ডিঙ্গিয়ে চলে গেলেন। তারপর মটকা মেরে পড়ে রইলেন। রাজা ভাবলেন, আমি যে তীর ছুঁড়েছি তাতেই শরভ মারা পড়েছে। তিনি চিৎকার করে সঙ্গীদের ডাকলেন, 'শরভকে মেরে ফেলেছি, দেখে যাও।'

সঙ্গীরা তখন বেষ্টনী ভেঙ্গে এগিয়ে আসতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে শরভ উঠে তাদের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে গেলেন। রাজার অনুচররা তখন রাজাকে নানারকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগল। রাজা সেসব সহ্য করতে না পেরে খড়্গ হাতে শরভকে ধরতে বনের মধ্যে ছুটলেন।

শরভ গভীর বনে ঢুকলেন, রাজাও তার পিছু পিছু ছুটে চললেন। কিছুদূর যাওয়ার পর শরভ সামনে পচা জলের গন্ধ পেলেন। ওখানে কোন ব্যাধ মাটিতে গর্ত করে ফাঁদ পেতে রেখেছিল। গর্তটি লতাপাতা দিয়ে বুঁজিয়ে রেখেছিল। ফলে বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল কোথাও কোন গর্ত নেই। শরভ বিপদ বুঝে একদিকে সরে গেলেন। কিন্তু রাজা না বুঝে সেই গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন। পচা জলে হাবুডুবু খেতে লাগলেন।

এতে শবভের মায়া হল। রাজা তাকে হত্যা করতে এসেছিলেন জেনেও তিনি এভাবে জীবের মৃত্যু সহ্য করতে পারলেন না। গর্তের সামনে এসে বললেন, 'ভয় নেই রাজা, আমি আপনার প্রাণ রক্ষা করব।' রাজাকে গর্তের ওপর থেকে তুলে নিজের পিঠে বসালেন। তারপর রাজাকে সৈন্য সামন্তের কাছে নিয়ে যাবার জন্য তাঁকে নিয়ে ছুটলেন। সৈন্যদের থেকে কিছু দূরে তিনি রাজাকে পিঠ থেকে নামালেন। তারপর রাজাকে পঞ্চশীলে দীক্ষা দিলেন।

রাজা এখন শবভকে ছাড়তে চান না। তিনি শবভকে বারাণসীতে নিয়ে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু শবভ তাতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'মহারাজ, শীল পালন করলেই আমি আনন্দিত হব। আপনি আপনার প্রজাদের মধ্যে শীলব্রত প্রচার করুন।' এই বলে শবভ বনের মধ্যে চলে গেলেন।

সেবার মৃগয়া থেকে ফিরে এসে রাজা রাজ্যময় শীল ব্রত প্রচার করলেন। কিন্তু শবভরূপী বোধিসত্ত্ব রাজার যে উপকার করেছে সে কথা তিনি কাউকে জানালেন না।

একদিন ভোরে রাজা ঘুম থেকে উঠে উদাস গান গাইছিলেন। পুরোহিত তখন রাজার দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি রাজার গান শুনে বুঝতে পারলেন শবভ মৃগ রাজার কি উপকার করেছে। উদাস গান শেষ হতে পুরোহিত দরজায় টোকা দিলেন। রাজা ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

পুরোহিত তারপর রাজার শোওয়ার ঘরে ঢুকে রাজাকে হুবহু বলে গেলেন মৃগয়ায় গিয়ে রাজার কি হয়েছিল। শবভ মৃগ কিভাবে তাঁকে রক্ষা করেছে। এ কথা শুনে রাজা স্তম্ভিত।

'আপনি কি করে জানলেন?'

'আপনার গান শুনে।'

রাজা পুরোহিতের বুদ্ধি দেখে তাঁকে অনেক টাকাপয়সা দান করলেন। এরপর থেকে রাজা নিয়মিত দান ব্রত পালনও শুরু করলেন। রাজার লোকেরাও ক্রমাগত আরও বেশি করে গুণগান করতে লাগল।

ওদিকে দেবরাজ শক্র স্বর্গে রোজই নতুন নতুন দেব ও দেবকন্যা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝলেন, শরভ মৃগ রাজাকে নরক থেকে উদ্ধার করে তাঁকে শীলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাজার পৃষ্ঠ-পোষকতা পেয়ে প্রজারাও ধর্মপথে চলেছে, ফলে মৃত্যুর পর তারা স্বর্গের বাসিন্দা হচ্ছে। দেবরাজ শক্র তখন ঠিক করলেন, রাজার চরিত্র পরীক্ষা করতে হবে।

রাজা তখন লক্ষ্য ভেদ করতে গেছেন। শক্র নিজের মায়া প্রভাবে লক্ষ্য আর রাজার ধনুকের মাঝখানে শরভ মৃগের মূর্তি তৈরি করলেন। শরভকে দেখে রাজা আর তীর ছুঁড়লেন না। শক্র তখন রাজপুরোহিতের শরীরে ঢুকে তাঁকে দিয়ে বলালেন, 'রাজা, তুমি তীর ধনুকে লাগিয়ে ছুঁড়তে ইতস্তত করছ কেন,এ তো ক্ষত্রিয়ের কাজ নয়। তীর ছুঁড়ে তুমি শরভকে হত্যা কর।' রাজা বললেন, 'প্রাণ থাকতে আমি শরভকে বধ করতে পারব না। তার জন্য যদি নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে হয় আমি রাজি আছি।'

এরপর শক্র পুরোহিতের শরীর থেকে বেরিয়ে এলেন। স্বমূর্তিতে রাজার সামনে আত্মপ্রকাশ করলেন। রাজাকে ধর্ম উপদেশ দিয়ে তিনি স্বর্গে ফিরে গেলেন।

শালিকেদার জাতক

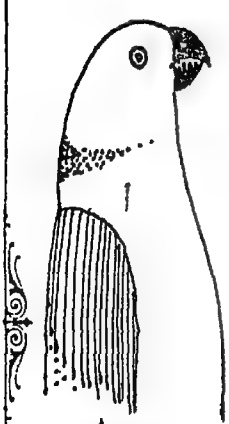

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব একবার শুক পাখি হয়ে জন্মান। তাঁর বাবা ছিলেন শুকরাজ। বোধিসত্ত্ব বড় হলে শুকরাজ বললেন, 'বাবা, আমি বুড়ো হয়েছি। এখন থেকে তুমিই শুকদের রাজা। সকলের রক্ষণা-বেক্ষণ আজ থেকে তোমার কাজ।'

পরের দিন থেকে বোধিসত্ত্ব তাঁর বাবা-মাকে আর খাবারের খোঁজে যেতে দিতেন না। নিজে শুকদের সঙ্গে উড়ে গিয়ে হিমালয়ে চলে যেতেন। সেখানে গিয়ে পেট ভরে শালি খেতেন। তারপর ফিরে আসার সময় বোধিসত্ত্ব তাঁর বাবা-মার জন্য কিছু শালি মুখে করে নিয়ে আসতেন।

এভাবে দিন যেতে লাগল। একদিন শুকেরা বোধিসত্ত্বকে বলল, 'প্রভু, আগে মগধ রাজ্যে কত শালি জন্মাত। এখন যদি সেসব শালি পাওয়া যায় তাহলে আমাদের আর রোজ হিমালয় পাড়ি দিতে হয় না।' শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'বেশ তো, তোমরা খুঁজে দেখ, মাঠে আগের মত শালি জন্মাচ্ছে কিনা। জন্মালে আমরা সেখানে গিয়েই শালি খাব।'

শুক পাখির দল সারা মগধ রাজ্য ঘুরে দেখতে লাগল। খোঁজ করতে করতে তারা শালিন্দিক গ্রামে হাজির হল।

শালিন্দিক গ্রামটি ছিল ব্রাহ্মণের গ্রাম। অতীতে সেখানে শালিন্দিকবাসী কৌশিকগোত্রজ নামে এক ব্রাহ্মণ প্রায় আট একর পরিমাণ জমিতে ধান বুনেছিলেন। যখন অনেক ফসল হল তখন তিনি বিভিন্ন লোককে নিযুক্ত করলেন ক্ষেতে পাহারা দেওয়ার জন্য। এর মধ্যে একজন সেখানে কুটির বানিয়ে থাকত। শুকপাখিরা যেখানে থাকত এই ক্ষেতটি তার কাছেই। এত কাছেই শালি ধানের ক্ষেত রয়েছে, অথচ তারা এতদিন তারা খোঁজ পায় নি জেনে শুকেরা খুব অবাক হল। যাই হোক, তারা ঐ লোকটির ক্ষেতে নেমে পেট ভরে শালি খেল। তারপর দু-চার গাছা শীষ মুখে করে নিয়ে গেল বোধিসত্ত্বকে দেখাবে বলে।

এরপর থেকে শুকেরা রোজ সেখানে এসে শালি খেতে শুরু করল। যাওয়ার সময় বোধিসত্ত্ব মা-বাবার জন্য কয়েকটি শালির শীষ ঠোঁটে নিয়ে চলে যেতেন। পাহারাদার লোকটি যখন অনেক চেষ্টা করেও শুকদের তাড়াতে পারল না, তখন সে ভয় পেয়ে গেল। শস্যহানির ক্ষতিপূরণ হিসেবে ব্রাহ্মণ যদি তার কাছে টাকা চেয়ে বসেন তাহলে সে কি করবে ভেবে কুলকিনারা পেল না। চিন্তিত মনে সে একদিন জমির মালিক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা করল।

প্রভু, শুকপাখি ক্ষেত ধ্বংস করছে।

সামলাতে পারছ না ?

না প্রভু।

লোকটি ব্রাহ্মণকে বলল, 'প্রভু, এদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে শক্তিশালী শুকটি চলে যাওয়ার সময় রোজই এক আঁটি ধান ঠোঁটে করে নিয়ে যায়।' ব্রাহ্মণ শুকরূপী বোধিসত্ত্বের কাণ্ড শুনে একটু অবাকই হলেন। তিনি লোকটাকে বললেন, 'এক কাজ কর। ঘোড়ার লোম দিয়ে ফাঁদ পেতে রাখ। যেভাবে হোক বড় শুকটিকে ধরে আন।'

পরের দিন যখন শুকেরা ক্ষেতে এসেছে তার আগেই পাহারাদার ফাঁদ পেতে রেখেছে। বোধিসত্ত্ব সেখানেই এসে প্রথমে বসলেন যেখানে ফাঁদটি পাতা হয়েছিল। ফলে বোধিসত্ত্ব ক্ষেতে এসে বসা মাত্র ফাঁদে আটকা পড়লেন। কিন্তু ভাবলেন, 'এখন যদি চিৎকার করি, তাহলে অন্য সব শুকেরা ভয়ে আর খেতে পারবে না। ওদের খাওয়া শেষ হোক, তারপর চিৎকার করব।' যখন সকলের খাওয়া শেষ হল

তখন বোধিসত্ত্ব চিৎকার করে জানালেন, 'আমি ফাঁদে পড়েছি।' কিন্তু সেই চিৎকার শুনে অন্য সব শুক স্বার্থপরের মত উড়ে চলে গেল।

পাহারাদার বোধিসত্ত্বের চিৎকার এবং শুকদের উড়ে যাওয়া দেখে বুঝল, বড় শুকটাই ফাঁদে পড়েছে, ব্রাহ্মণ খুশি হবেন। সে তখন ফাঁদের কাছে গিয়ে বোধিসত্ত্বকে ফাঁদ থেকে বের করে তাঁর পা-দুটি বেঁধে নিল, তারপর তাঁকে নিয়ে ব্রাহ্মণের কাছে দিয়ে দিল।

ব্রাহ্মণ সস্নেহে শুককে কোলে বসিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন :

'খিদে সকলেরই আছে, কিন্তু তোমার কি সকলের থেকে বেশি ?'

'না মহাশয়।'

'তাহলে রোজ ফিরে যাওয়ার সময় আমার শালি নিয়ে যাও কেন ?'

'ধার শোধ করি, ধার দিই, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করি।'

'তোমার ধার শোধের ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দাও।'

'বাচ্চা শুক আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের খেতে দিই। মা-বাবাকে খেতে দেওয়াটা ধার শোধ করা।'

বোধিসত্ত্বের সঙ্গে কথা বলে ব্রাহ্মণ বুঝলেন, এ পাখি সামান্য নয়। তিনি তাকে ঐ শালি ক্ষেতের অধিকার দিলেন। আর অনুরোধ করলেন, 'আপনি মাঝে মাঝে এসে আমার সঙ্গে একটু ধর্মকথা আলোচনা করে যাবেন। যান, আপনি মুক্ত।' বোধিসত্ত্ব ফিরে এলে তাঁর বাবা-মার মুখে হাসি ফুটল। তাঁরা জানতে চাইলেন, 'কি ভাবে তুমি মুক্ত হলে বাছা।' বোধিসত্ত্ব তখন তাঁদের সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন।

মহোৎক্রোশ জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে একদল লোক যাযাবরের মত বসবাস করত। তারা যখন যেখানে অনেক মাংস পাওয়া যেত, তখন সেখানে গিয়ে ডেরা বাঁধত। একবার তারা এক জায়গায় এসে ডেরা বাঁধল। যেখানে তারা গ্রামের পত্তন করল তার কাছেই একটি হ্রদ ছিল। তারা আশপাশের বন থেকে পশুপাখি শিকার করে আনত।

ঐ হ্রদের ডানদিকে থাকত এক বাজ পাখি। উত্তর দিকে থাকত এক বাজ পক্ষিনী। পূবদিকে থাকত এক শিকারী পাখি। মাঝখানের

দ্বীপে থাকত এক কচ্ছপ। আর ছিল পশুরাজ সিংহ।

রাজপাখি একদিন রাজ পক্ষিনীকে গিয়ে বলল, 'তুমি আমার স্ত্রী হও।' পক্ষিনী তখন রাজকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কোন বন্ধু আছে কি?'

'না।'

'বন্ধু থাকা খুব দরকার।'

'কোথায় পাব?'

'কেন, এখানেই তো শিকারী পাখি, কচ্ছপ, সিংহ আছে।'

'ঠিক আছে, ওদের সঙ্গে মিতালি পাতাব।'

রাজ পাখি যখন শুনল যে বিপদে বন্ধুই একমাত্র ভরসা এবং সংসার পাতার আগে এ রকম বন্ধু খুবই দরকার, তখন সে বনের ঐ সব প্রাণীর সঙ্গে ভাব করে ফেলল। তারপর তারা বিয়ে করে হ্রদের তীরে সেই গাছে বাস করতে লাগল। তাদের গুটিকয় শাবক জন্মাল।

শাবকদের তখনও ডানা গজায় নি, এমন সময় একদিন সেই শিকারী লোকগুলো ঐ বনে ঢুকল। সারা বন ঘুরেও তারা কিছু শিকার পাবল না। রাতের দিকে ক্লান্ত হয়ে রাজপাখি দম্পতি যে গাছে বাস করে সেই গাছের গুঁড়িতে তারা হেলান দিয়ে বসে পড়ল।

সেখানে মশারা তাদের ওপর এমন হামলা চালাল যে ওরা অস্থির হয়ে উঠল। তারা আগুন জ্বালাল মশা তাড়াতে। এতে মশা কমল। ওদিকে ধোঁয়া ওপরে পাক দিয়ে উঠতে লাগল। ধোঁয়ায় রাজের ছানাদের খুব কষ্ট হল। তারা চিৎকার করতে লাগল।

'আরে, আরে, এ গাছে পাখি আছে।'

'চল, আগুন জ্বেলে পাখি ধরি।'

'পাখির মাংস খাই।'

'পেটে খিদেয় আগুন জ্বলছে।'

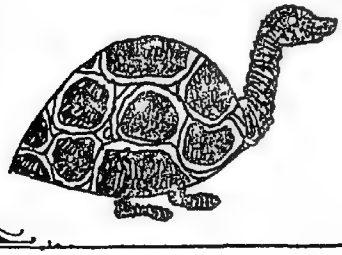

সত্যি সত্যি তারা মশাল জ্বেলে গাছে ওঠার ষড়যন্ত্র করল। তখন রাজ পক্ষিনী তার স্বামীকে বলল, 'ছানাদের বাঁচাতে হলে এক্ষুনি আমাদের বন্ধু শিকারী পাখিকে খবর দাও।' শিকারী পাখি বন্ধুর বিপদে সাহায্য করতে ছুটে এল। সে হ্রদ থেকে যত পারল জল মুখে করে নিল। যেই প্রথম লোকটা মশাল জ্বেলে গাছে উঠল সে জল ছিটিয়ে তার মশাল নিভিয়ে দিল। তখন লোকগুলো বলল, 'দাঁড়া, গাছের ছানা দুটোকে তো খাবই, তোকেও ছাড়ছি না।' কিন্তু তারা যতবার মশাল জ্বালে শিকারী পাখি ততবারই তাদের আগুন নিভিয়ে দেয়।

এভাবে মাঝ রাত পর্যন্ত চলল। আগুনের তাপ লেগে শিকারী পাখির লোম পুড়ে গেল। বেচারা কাহিল হয়ে পড়ল। যদিও বন্ধুকে রক্ষা করার জন্য তার চেষ্টায় কোন শিথিলতা দেখা গেল না। রাজ পক্ষিনী তখন স্বামীকে বলল, 'প্রভু, শিকারী পাখি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তুমি কচ্ছপ রাজকে খবর দাও।'

রাজ তখন শিকারী পাখিকে গিয়ে বলল, 'বন্ধু, তুমি আমার জন্য বন্ধুত্বের স্বার্থে অনেক করেছ। কিন্তু এখন তোমার যত্ন করা দরকার। মশালের আগুনে তুমি পুড়ে যাচ্ছ। তুমি এবার ক্ষান্ত হও, তাতে যদি আমার ছানারা মরে মরুক।'

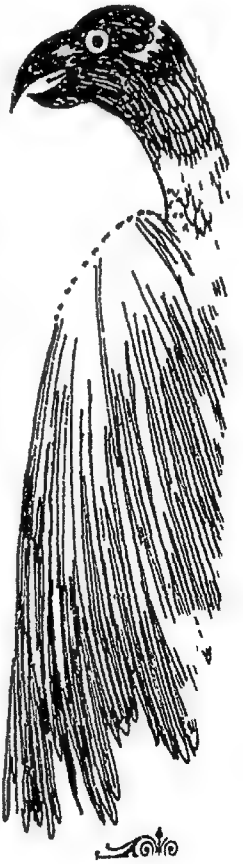

শিকারী পাখি তা শুনে বলল, 'তুমি যাই বল না কেন ভাই, তোমার ছানাকে বাঁচাতে গিয়ে যদি আমার প্রাণ যায় সে-ও ভাল, তবু আমি নিজেকে বাঁচানোর জন্য এই মহৎ কাজে অবহেলা করতে পারব না।' রাজ তখন তাকে খুব অনুরোধ করে বলল, 'বেশ ভাই, তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও অন্তত।'

তারপর রাজ গেল কচ্ছপের কাছে। কচ্ছপ সমস্ত ঘটনা শুনে বলল, 'নিশ্চয়ই যাব। বন্ধুকে রক্ষা করার জন্য যা করা দরকার সবই করব।' কচ্ছপ যখন এই কথা বলছে তখন তার ছেলে এসে বলল, 'আমি সব শুনেছি। আপনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। ছেলের কাজ হল পিতৃসত্য রক্ষা করা। আপনি থাকুন, আমি যাচ্ছি।' কচ্ছপ বলল, 'দেখ বাবা, তোমার শরীর আমার মত বড় নয়। তোমাকে দেখে লোকগুলো ভয় পাবে না। এ কাজ তুমি পারবে না। আমাকেই করতে দাও।'

কচ্ছপ তারপর প্রথমেই হ্রদে গিয়ে পড়ল। সেখান থেকে জল কাছা নিয়ে এসে মশালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মশাল নিভে গেল। কচ্ছপ তারপর খোলের ভেতর ঢুকে স্থির হয়ে বসে রইল। লোকগুলো বলল, 'ধর কচ্ছপটাকে, এটাকে মেরেই আগে মাংস খাই।' লতাপাতা ছিঁড়ে তারা কচ্ছপকে বাঁধল। কিন্তু সকলে এক জোট হয়েও কচ্ছপকে নড়াতে পারল না। উল্টে কচ্ছপ তাদের দুজনকে নিয়ে জলে ফেলল। জলে-কাদায় হাবুডুবু খেয়ে লোকগুলো

কাহিল হয়ে পড়ল।

তারপর তারা বলাবলি করতে লাগল, 'দেখ ভাই, শিকারী পাখিটা বারবার আমাদের মশাল নিভিয়ে দিয়েছে। এখন কচ্ছপটা আমাদের এমন জল কাদা খাওয়াল যে পেট ফুলে গেছে। এস, এখন চুপচাপ বসে থাকি, আগুন জ্বেলে হাত-পা সেঁকে নিই। ভোর হলে তখন বাজের ছানাগুলোকে ধরা যাবে।'

বাজের স্ত্রী এ কথা শুনে তার স্বামীকে বলল, 'এরা আমার ছেলে-দের শেষ না করে যাবে না। তুমি পশুরাজ সিংহকে খবর দাও।'

সিংহ বাজকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'এমন অসময়ে তুমি!'

'বিপদে পড়েছি প্রভু। তুমি আমাদের রাজা, রক্ষাকর্তা।'

'নিশ্চয়ই রক্ষা করব, বল কি বিপদ।'

বাজ পাখি তখন যা যা ঘটেছে সবই সিংহকে জানাল। সিংহ তখন বিপুল বিক্রমে সেই লোকগুলোকে লক্ষ্য করে ছুটে চলল। এইবার তারা বিপদে পড়ল। প্রাণ বাঁচাতে সঙ্গে সঙ্গে যে যেদিক পারে ছুটে পালাল। কচ্ছপ, বাজ আর শিকারী পাখি সিংহকে প্রণাম করল। সিংহ তাদের ভালভাবে থাকতে বলে চলে গেল। তখন বাজের স্ত্রী তার ছানাদের বলল, 'আজ তোরা প্রাণে বাঁচলি বাবার বন্ধুদের সাহায্যে।'

বিস জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার এক ধনবান ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে জন্মান। বোধিসত্ত্বের নাম রাখা হল মহাকাঞ্চন কুমার। কাঞ্চনকুমারের যখন এক বছর বয়স পূর্ণ হল তখন ব্রাহ্মণের আরেকটি ছেলে জন্মায়। তার নাম রাখা হল উপকাঞ্চন কুমার। এভাবে ব্রাহ্মণের সাতটি ছেলে আর একটি মেয়ে জন্মাল। মেয়েটি সব থেকে ছোট। তার নাম রাখা হল কাঞ্চন দেবী।

মহাকাঞ্চন কুমার যথাসময়ে তক্ষশিলায় গেলেন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে। একদিন সেখান থেকে সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়ে ফিরে এলেন। তখন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ভাবলেন, 'বাবা-মা হিসেবে আমাদের কর্তব্য এখন ছেলের সংসার পেতে দেওয়া।' তাঁরা মহাকাঞ্চন কুমারকে ডেকে বললেন, 'দেখ বাছা, আমরা ঘটক লাগিয়েছি। আমাদের সমান

জাতি ও কুল থেকে সুলক্ষণা কন্যার খোঁজ করে তোমার বিয়ে দিতে চাই।'

মহাকাঞ্চন কুমার বললেন, 'সংসার করার ইচ্ছে আমার একটুও নেই। পার্থিব জিনিস আমার কাছে কারাগারের মত বাধা, মলভূমির মত ঘেন্নার। আপনাদের তো ছেলের অভাব নেই। অন্য কোন ছেলের বিয়ে দিন।' তারপর মহাকাঞ্চন কুমারের ভাইয়েরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'দাদা, তুমি কেন রাজি হচ্ছ না?' মহাকাঞ্চন কুমার তখন তাদের ধর্মকথা শোনালেন। শুনে তারাও আকৃষ্ট হল। ঠিক করল তারাও বিয়ে করবে না। কাঞ্চনদেবীও ঠিক করল বিয়ে করবে না।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীব বযস হযেছিল। একদিন তাঁবা দেহ বাখলেন। মহাকাঞ্চন পণ্ডিত বাবা-মাব পাবলৌকিক কাজ শেষ কবলেন। ধনসম্পত্তি দবিদ্রদেব মধ্যে দান কবে দিলেন। তাবপব ভাই-বোনকে সঙ্গে নিযে হিমবন্ত প্রদেশে চললেন। সেখানে পদ্ম সবোববেব তীবে অতি সুন্দব একটি আশ্রম স্থাপন কবে প্রব্রজ্যা নিলেন। বনেব ফলমূল খেযেই তখন তাঁবা প্রাণ ধাবণ কবতেন। বনে ফল খোঁজাব সময একেক জন একেক দিকে যেতেন এবং চিৎকাব কবে ডেকে বলতেন, কি কি পাওযা গেল। এব ফলে বনেব মধ্যে যেন বাজাব বসে যেত হৈ চৈ-তে।

আচার্য মহাকাঞ্চন একদিন ভাবলেন, এটা ঠিক হচ্ছে না। ধনসম্পত্তি বিষয ত্যাগ কবে এসে বনেব ফল নিযে যদি এত উত্তেজনা দেখা দেয তাহলে সবই পণ্ড হযেছে। এবাব থেকে আমি একা ফলেব খোঁজে যাব। ভাইদেব ডেকে বললেন, কিন্তু ভাইরা বাজি হল না।

'আচার্য, আমবা আপনাব আশ্রযে আছি।'

'তাতে কি?'

'আপনাব তপস্যায যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য...'

'সেজন্য কি কবতে চাও?'

'ফলেব খোঁজে আমবা যাব, আপনি আব কাঞ্চন দেবী আশ্রমেই থাকবেন।'

এবপব থেকে এই ব্যবস্থা চলতে লাগল। ভাইযেবা পালা কবে ফলমূল সংগ্রহ কবে আনে, তাবপব প্রত্যেকেব মধ্যে ভাগ কবে দেওযা হয। ফল এনেও ডাকাডাকি কবা চলত না। একটা পাথবেব ওপব

ফলগুলো সমান ভাগে ভাগ কবে ঘণ্টা বাজিযে দেওযা হতো। তারপ যে যাব কুটির থেকে বেবিয়ে এসে নিজেব ভাগটা নিযে চলে যেত।

এই তপস্বীদেব পুণ্য কর্মেব জোবে শক্রর আসন টলে উঠল শক্র তখন ভাবলেন, একবাব পবীক্ষা কবে দেখতে হয এই ৩ । বী। মধ্যে সত্যি সত্যি লোভলালসা আছে কিনা। শক্র তখন ত অলৌকিক ক্ষমতা কাজে লাগিযে মহাকাঞ্চন কুমাবেব ভাগ পব প তিনদিন নিযে চলে গেলেন।

মহাকাঞ্চন কুমার প্রথম দিন নিজের ভাগ না দেখে ভেবেছিলেন, 'হয়ত ভুলে গেছে আমার ভাগটা রাখতে।' দ্বিতীয় দিনে ভাবলেন, 'হয়ত আমি কোন দোষ করেছি, সে জন্য আমাব ভাগ রাখেনি।' তৃতীয় দিনে তাঁব মনে হল, 'যদি আমাব দোষের জন্যই আমার ভাগ না বেখে থাকে তাহলে জানা দরকাব আমি কি দোষ করেছি। তাব পব ক্ষমা চাইতে হবে।' এই ভেবে তিনি ঘণ্টা বাজালেন। তখন ভাইয়েরা এবং কাঞ্চন দেবী সবাই এল। মহাকাঞ্চন কুমার জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা ভাই, আজ থেকে তিন দিন আগে কে ফল এনেছিল?' একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি।'

'তুমি কি আমার ভাগ বেখেছিলে?'

'হ্যাঁ আচার্য।'

এভাবে তিনি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে যে যে ফল এনেছিল তাদেব সঙ্গে কথা বললেন। তাবা সবাই এক বাক্যে বলল, 'হ্যাঁ প্রভু, আমবা তো আপনাব ভাগ রেখেছি।'

মহাকাঞ্চন কুমাব তখন বললেন, 'দেখ, তিন দিনই আমি আমাব ভাগ পাই নি। কিন্তু তাব চেয়েও বড় কথা, বিষয়-আশয় ত্যাগ কবে এসেও যদি আমাদেব কারো মধ্যে এবকম লোভ থেকে থাকে তাহলে খুবই ভয়ের ব্যাপার।'

তখন ভাইরা ঠিক করল তাবা প্রতিজ্ঞা করে বলবে, তারা ফল চুরি করেনি। সব ভাই একে একে প্রতিজ্ঞা করতে লাগল। প্রত্যেকেবই প্রতিজ্ঞার বিষয় এক: 'এ কাজ যে করেছে তাব মন বিষয়মুখী হোক, সে রাজকার্য ভোগ করুক। সে ক্ষমতাশালী হোক। অগণিত মানুষের দ্বারা পূজিত হোক।' ভাইদের প্রতিজ্ঞা শেষ হলে মহাকাঞ্চন কুমার ভাবলেন, তাঁরও প্রতিজ্ঞা করা উচিত, নইলে কেউ ভাবতে পাবে, নিজের ভাগ পাইনি বলে থা বলছি। মহাকাঞ্চন কুমাব প্রতিজ্ঞা কবলেন, 'ফল পেযে যদি কেউ পাইনি বলে থাকে তাহলে সে যেন বাকি জীবন বিষয়-সমুদ্রে ডুবে থাকে।'

শক্র অদৃশ্য থেকে এঁদেব কথাবার্তা শুনছিলেন। তিনি আর নিজেকে ধবে রাখতে পাবলেন না। মহাকাঞ্চন কুমারকে এসে জিজ্ঞেস কবলেন, 'সকলে যা পেতে চায় আপনারা তাকে ঘৃণ্য ভাবছেন কেন?' মহাকাঞ্চন কুমার বললেন, 'বিষয হল প্রকৃত বিষ, এই বিষের হাত থেকে উদ্ধাব পাওয়া কঠিন।'

শক্র তখন খুশি হয়ে তিনদিনের অপহৃত ফল মহাকাঞ্চন কুমারকে ফেরৎ দিয়ে বললেন, 'ঋষি, চরিত্র পরীক্ষা করার জন্য আমি আপনাদের ফল চুরি করেছিলাম।' শুনে মহাকাঞ্চন কুমার বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার তো রসিকতার সম্পর্ক নয়। কেন এমন করলেন?'

শক্র তখন ভয় পেয়ে মহাকাঞ্চন কুমারকে ক্রোধসংবরণ করতে বললেন। বোধিসত্ত্বও শক্রকে ক্ষমা করলেন। ঋষিরা তপস্যায় আয়ু ক্ষয় করে একদিন দেবলোকে যাত্রা করলেন।

চিত্র সম্ভূত জাতক

পুরাকালে উজ্জয়িনী নগরে অবন্তী মহারাজ নামে এক রাজা ছিলেন। তখন উজ্জয়িনীর বাইরে চণ্ডালদের একটি গ্রাম ছিল। বোধিসত্ত্ব একবার ঐ গ্রামে চণ্ডাল বংশে জন্ম নেন। বোধিসত্ত্বের নাম হল চিত্র। বোধিসত্ত্বের এক ভাই হল, তার নাম রাখা হল সম্ভূত।

দু ভাই একদিন উজ্জয়িনী নগরে খেলা করছিলেন। তখন এক পুরোহিত আর এক ব্যবসায়ীর মেয়ে স্নান করতে যাচ্ছিল। তারা দু ভাইয়ের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করল, 'এরা কারা?'

'এরা চণ্ডালের ছেলে।'

'যা দেখতে নেই তাই দেখলাম। চল, চল।'

পুরোহিত আর ব্যবসায়ীর মেয়ের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। স্নান করতে গিয়ে রোজ যেমন সঙ্গীদের বখশিস দেয় সেদিন আর তেমন দিল না। ফলে সঙ্গীদের খুব রাগ হল চণ্ডাল ছেলেদুটোর ওপর। ফেরার পথে তারা চিত্র আর সম্ভূতকে ধরে খুব মারল।

চিত্র আর সম্ভূত তখন প্রতিজ্ঞা করলেন তাঁরা চণ্ডাল বংশে জন্মেছেন এ কথা লুকিয়ে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বেদ শিখবেন। দু ভাই চলে গেলেন তক্ষশিলায়। সেখানে গিয়ে তাঁরা এক আচার্যের কাছে লেখাপড়া শিখতে শুরু করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আচার্য দেখলেন, এঁদের দুজনের বেশ মেধা আছে।

একদিন আচার্য শরীর খারাপ বলে এক ব্রাহ্মণ ভোজনে যেতে পারলেন না। তখন তিনি চিত্র আর সম্ভূতকে বললেন, 'তোমরা আমার হয়ে শিষ্যদের নিয়ে নেমন্তন্ন বাড়িতে যাও। নিজেরা আহার শেষ করে, আমার জন্য যা দেবে নিয়ে এস।'

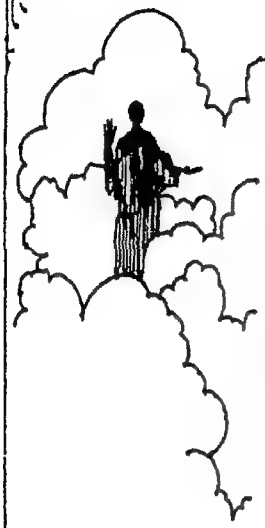

চিত্র-সম্ভূত শিষ্যদের নিয়ে চললেন। গৃহস্থ আসন পেতে সবাইকে খেতে দিল। পায়েসটা ছিল খুব গরম। চিত্র আর সম্ভূত তড়িঘড়ি খেতে গিয়ে মুখ পুড়িয়ে ফেললেন। তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে চণ্ডাল ভাষায় কি সব বলাবলি করলেন। অন্য শিষ্যরা ভাবল, 'এঁরা কি ভাষায় কথা বলছেন?'

পরে খোঁজ করে দেখল এটা চণ্ডাল ভাষা। তখন তাদের বুঝতে বাকি রইল না এরা চণ্ডাল। শিষ্যরা খুব রেগে গেল। তারা দু ভাইকে বেত মারতে শুরু করল। তখন ঐ গ্রামেরই এক ভদ্রলোক কোন মতে দু ভাইকে বাঁচালেন। তারপর তাঁদের বললেন, 'তোমরা বনে গিয়ে তপস্যা কর।'

দু ভাই বনে গিয়ে তপস্যা শুরু করলেন। তপস্যা করতে করতে সেখানেই তাঁরা দেহ রাখলেন। তারপর ছবার পশু পাখি হয়ে জন্মালেন। সেই সময়েও কিন্তু তাঁরা সহোদর ভাই হিসেবেই জন্মেছেন। এরপর একজন জন্মান রাজপরিবারে, আরেকজন পুরোহিত পরিবারে।

বোধিসত্ত্ব, অর্থাৎ চিত্র জন্মেছিলেন পুরোহিত পরিবারে। তিনি বয়সকালে প্রব্রজ্যা নিলেন। এদিকে সম্ভূত রাজবংশের ছেলে হয়ে রাজা হলেন। সম্ভূতের আগের দু-এক জন্মের কথা মনে ছিল। কিন্তু চিত্রের মনে ছিল সব কটি জন্মের কথা। একদিন চিত্র ভাবলেন, যাই, ভাইকে গিয়ে প্রব্রজ্যা নিতে বলি। তারপর ভাবলেন, না' বয়স না হলে ওর মধ্যে বিষয়-বৈরাগ্য আনা যাবে না।

সম্ভূতের ছেলেরা যখন বড় হয়েছে তখন একদিন চিত্র আকাশ-পথে এসে সম্ভূতকে দেখা দিলেন। সম্ভূত চিত্রকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন। চিত্র তাঁকে বললেন, 'তোমার বিষয়-সুখের চেয়ে তপস্যার সুখ অনেক গভীর।' আস্তে আস্তে সম্ভূত বুঝতে পারলেন ধর্মই একমাত্র আশ্রয়। তিনি ছেলেদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে ঋষি প্রব্রজ্যা নিলেন।

শিবি জাতক

অতীতে শিবি রাজ্যে শিবি নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁর ছেলে হয়ে জন্মান। তখন তাঁর নাম রাখা হয় শিবি-কুমার। বয়সকালে তিনি তক্ষশিলায় এক আচার্যের কাছে বেদ এবং শাস্ত্র শেখেন।

শিক্ষা শেষ করে শিবিকুমার দেশে ফিরলেন। শিবিরাজা ছেলেকে যুবরাজ করলেন। এর কিছুদিন পরে শিবি রাজা দেহ রাখলেন। শিবিকুমার রাজা হলেন। রাজা হয়ে শিবিকুমার যথাধর্ম রাজ্যশাসন করতেন। প্রচুর দান ধ্যান করতেন। তিনি ছটি দানশালা তৈরি করেন। সেখান থেকে রোজ দান করতেন।

একদিন পূর্ণিমায় শিবিকুমার নিজের দান কর্ম নিয়ে ভাবছিলেন। ভাবতে গিয়ে দেখলেন, 'যত রকম বস্তু হয় সবই আমি দান করেছি। আমি দান করিনি এমন কোন বস্তু তো দেখতেই পাচ্ছি না। বাইরের বস্তু দান করে আমি আর সুখ পাচ্ছি না। আজ যদি কেউ এসে আমার হৃদয়-মাংস চায় তাহলে তাকে তাই দান করব। বা কেউ যদি এসে আমাকে বলে তার বাড়িতে গিয়ে দাসের কাজ করতে হবে, তাহলে রাজবেশ ছেড়ে আমি তার সঙ্গে চলে যাব দাসত্ব করতে। কিংবা কেউ যদি আমার রক্ত চায় শরীরের সব রক্ত তাকে দিয়ে দেব। যদি চোখ দুটো চায় তাহলে তাই দেব।'

এইসব ভেবে শিবিকুমার ভাল করে স্নান করলেন। তারপর রাজকীয় ভোজন শেষ করে দানশালায় গিয়ে বসলেন।

এদিকে দেবরাজ শক্র নিজের শক্তিবলে যখন জানতে পারলেন শিবিকুমার আজ ভয়ঙ্কর দানের সংকল্প করেছেন, তখন তিনি শিবি-কুমারকে পরীক্ষার জন্য অন্ধ ব্রাহ্মণ সেজে রাজা যে রাস্তা দিয়ে যাবেন সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। শিবিকুমার যখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন শক্র বললেন, 'মহারাজের জয় হোক।' শিবিকুমার কিছুদূর গিয়ে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠাকুর, আপনি কি বললেন?'

রাজা, আমি অন্ধ।

খুবই দুঃখের কথা।

আপনার দুটি চোখ আছে।

তা আছে ঠাকুর।

চোখদুটি আমরা ভাগ করে নিলে দুজনেই দেখতে পাই।

রাজা ভাবলেন এখানে চক্ষু দান করা ঠিক হবে না। তিনি ব্রাহ্মণকে নিয়ে অন্তঃপুরে গেলেন। এদিকে রাজ্যময় খবর ছড়িয়ে পড়ল শিবিকুমার নিজের চোখ এক অন্ধ ব্রাহ্মণকে দান করবেন আজ। মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজার অমাত্য, রাণী সবাই ছুটে এলেন। রাজাকে নিরস্ত করার জন্য তাঁরা খুব চেষ্টা করলেন।

কেন আপনি চোখ দান করছেন?

কোন কিছু পাবার আশায় নয়।

তাহলে কিসের আশায়?

দানের ধর্মে।

রাজার চিকিৎসক সীবক এলেন। তিনি রাজাকে ক্ষান্ত করার জন্য পদ্মফুলে ওষুধ লাগিয়ে রাজার চোখের সামনে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখে স্খলন শুরু হল। রাজা চিৎকার করে উঠলেন। সীবক বললেন, 'মহারাজ, আপনি যদি আদেশ করেন তাহলে এখনও আপনার চোখ বাঁচান যায়।' রাজা বললেন, 'না, তুমি তাড়াতাড়ি চোখ তুলে দাও।'

রাজা একে একে দুটি চোখই ব্রাহ্মণরূপী শক্রকে দিলেন। কিছু দিন পরে রাজার মনে হল, 'অন্ধ হয়ে আর রাজ্যে কি দরকার। আমি প্রব্রজ্যা নেব।' মন্ত্রী তাঁকে পালকিতে করে রাজার বাগানের পাশে রেখে এলেন। সেখানে এসে রাজা নিজের দানের কথা ভাবতে লাগলেন। তখন শক্রর আসন নড়ে উঠল।

রাজা ভাবছিলেন 'অন্ধ হয়ে কি লাভ!' শক্র এসে রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি অন্ধ হয়েছেন বলেই কি মরতে চাইছেন?' রাজা বললেন, 'হ্যাঁ।'

শক্র তখন বললেন, 'আপনার দান বলেই আপনার চোখদুটি আগের মত হয়ে যাবে।' আর বাস্তবে তাই হল। শিবিকুমার চক্ষুষ্মান হয়ে আবার নিজের রাজত্বে ফিরে এলেন। যথাধর্ম রাজ্য শাসন করে, আয়ুক্ষয় করে দেবকুলে যোগ দিলেন।

শক্তিগুল্ম জাতক

পুরাকালে পাঞ্চাল নগরে পাঞ্চাল নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন এক পাহাড়ী এলাকায় শিমূল গাছে শুক পাখি হয়ে জন্ম নিলেন। তাঁর একটি সহোদর ভাইও ছিল।

পাহাড়ী এলাকার পাশেই চোরদের একটা গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের উল্টো দিকে ছিল ঋষিদের একটি গ্রাম। একবার প্রবল ঝড় দেখা দিল। ঝড়ের দাপটে বোধিসত্ত্ব ও তাঁর ভাই দুজন ছিটকে পড়লেন। ভাই গিয়ে পড়ল চোরদের গ্রামে, আর বোধিসত্ত্ব ছিটকে পড়লেন ঋষিদের গ্রামে।

পাঞ্চালরাজ একবার মৃগয়া করতে এসে ঐ পাহাড়ী এলাকায় পথ হারিয়ে ফেললেন। তারপর ক্লান্ত হয়ে গাছে শুয়ে পড়লেন। সারথি রথ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। চোর গ্রামে যে শুক পাখিটি ছিল সে রাজাকে ঐ অবস্থায় দেখে একজন চোরকে ডেকে রাজাকে খুন করার পরামর্শ দেয়। বলে, 'একে মেরে কাপড় চোপড় কেড়ে নাও।' চোর এসে যখন দেখল রাজা শুয়ে আছেন সে শুককে খুব বকতে লাগল। শুকও তার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিল।

দুজনের কলহে রাজার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সব শুনে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। রাজা উঠে নগরের দিকে ফিরতে লাগলেন। রাস্তায় পড়ল ঋষিদের গ্রাম। তখন একজনও ঋষি নেই।

ঋষি গ্রামের রাজার শুক রাজাকে ডেকে বলল, 'হে অতিথি, গ্রামে এখন এমন কেউ নেই যে আপনাকে আদর যত্ন করে বসায়। আপনি নিজেই শীতল জল নিয়ে পান করুন। অমুক জায়গায় ফল আছে, আপনি আহার করুন।'

রাজা এই শুককে প্রথম শুকের কথা বললেন, 'তার স্বভাব চোরের মত।' ঋষি গ্রামের শুক তখন বললেন, 'আমরা দুজনে ভাই।' তারপর তিনি ঝড়ের কথা, দুজনের দু জায়গায় বেড়ে ওঠার কথা জানিয়ে বললেন, 'সঙ্গ দোষেই এটা হয়েছে। সেজন্য লোকে বলে, সৎ-সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ-সঙ্গে নরকবাস।'

সৌমনস্য জাতক

পুরাকালে কুরুরাজ্যে উত্তর পাঞ্চাল নগরে বেণু নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। একদিন মহারক্ষিত নামে এক সিদ্ধ তপস্বী তাঁর

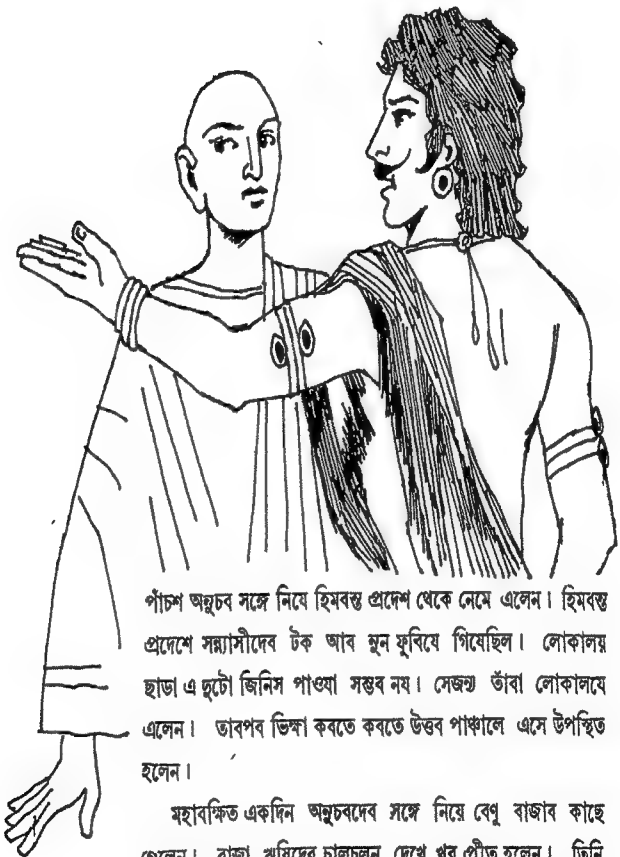

পাঁচশ অনুচর সঙ্গে নিয়ে হিমবন্ত প্রদেশ থেকে নেমে এলেন। হিমবন্ত প্রদেশে সন্ন্যাসীদের টক আর নুন ফুরিয়ে গিয়েছিল। লোকালয় ছাড়া এ দুটো জিনিস পাওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য তাঁরা লোকালয়ে এলেন। তারপর ভিক্ষা করতে করতে উত্তর পাঞ্চালে এসে উপস্থিত হলেন।

মহারক্ষিত একদিন অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে বেণু রাজার কাছে গেলেন। রাজা ঋষিদের চালচলন দেখে খুব প্রীত হলেন। তিনি তাঁদের যথেষ্ট সম্মান দেখালেন। যত্নআত্তি করলেন। তারপর বললেন, 'প্রভু। আপনারা আমার বাগানে থাকুন, আমি কুটির বানিয়ে দিচ্ছি।'

তপস্বীরা তারপর থেকে রাজার বাগানে থাকতে শুরু করলেন। রাজবাড়িতে যেতেন আহার করতে। বেণু রাজার কোন সন্তান নেই। রাজা মনে মনে চাইতেন তাঁর একটি ছেলে হোক। কিন্তু তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয় নি।

এভাবে গোটা বর্ষাকাল কেটে গেল। মহারক্ষিত ভাবলেন, 'রাজার আশ্রয়ে অনেকদিন থাকা হল। বর্ষাও কেটে গেছে। এখন হিমবন্ত প্রদেশ খুব সুন্দর হয়ে উঠেছে। এবার ফিরে যাই।'

তিনি রাজার কাছে গেলেন। রাজ-অনুমতি চাইলেন। বললেন, 'এবার আশ্রমে ফিরতে চাই, রাজা অনুমতি দিন।' রাজা তখন আবার তাঁদের খুব সম্মান দেখালেন। বহু উপহার দিলেন। নগর থেকে বেরিয়ে মহারক্ষিত দুপুরে রাজপথ ছেড়ে বনের মধ্যে ঢুকলেন। বিশাল এক গাছের তলায় অনুচরদের নিয়ে বসে পড়লেন একটু জিরিয়ে নিতে।

তখন ঋষিরা বলাবলি করতে লাগল :

রাজার বড় দুঃখ।

হ্যাঁ।

রাজার কোন ছেলে নেই।

ছেলে না জন্মালে বংশরক্ষা হবে না।

সত্যি, রাজার একটা ছেলে হলে বড় ভাল হতো।

ঋষিদের কথাবার্তা শুনে মহারক্ষিত ভাবতে লাগলেন, 'দেখা যাক, রাজার কোন ছেলেপিলে হবে কিনা।' ধ্যানবলে তিনি দেখলেন, রাজার একটি ছেলে হবে। তখন ঋষিদের ডেকে বললেন, 'তোমরা

নিশ্চিন্ত থাক, আজ সকালেই এক দেবপুত্র রাজার প্রধান মহিষীর গর্ভে প্রবেশ করেছেন।'

ঋষিদের মধ্যে একজন ছিল ভণ্ড। সে ভাবল, 'আমি আর ফিরে যাব না। বরং রাজাকে গিয়ে এই খবর দেব। তারপর রাজার কুলগুরু হব।' যখন যাওয়ার সময় হল ভণ্ড তখন বলল, 'আমি পরে যাচ্ছি, আপনারা আগে যান।'

কেন, কি হল?

আমার শরীর খারাপ।

কই, আগে তো বল নি!

এখন হঠাৎ কেমন লাগছে যেন।

মহারক্ষিত নিজের শক্তিবলে ভণ্ড তপস্বীর মনোবাসনা বুঝতে পারলেন। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে কিছু বললেন না। অন্য তপস্বীদের বললেন, 'তাহলে চল, আমরা রওনা দিই, উনি সুস্থ হলে আসবেন।'

ঋষিরা চলে যেতেই ভণ্ড রাজার কাছে গেল। রাজাকে এই সুসংবাদ দিয়ে সে বলল, 'আমি ঋষি বলে এ কথা জানার পর ভাবলাম আপনাকে বলে যাই। আপনি যাতে রাণীকে সাবধানে রাখতে পারেন। এখন আমি যাই, ঋষিরা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন।'

রাজা ভণ্ডকে যেতে দিলেন না। তাকে বাগানে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। ভণ্ডর সব রকম আরামের ব্যবস্থা করলেন। সে-ও রাজার আশ্রয়ে সুখে থাকতে লাগল।

যথাসময়ে রাজমহিষীর ছেলে হল। এই ছেলে আর কেউ নয়, স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্বর যখন সাত বছর বয়স, তখন রাজা একদিন বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করতে সীমান্তে গেলেন। বোধিসত্ত্ব বেড়াতে এসে ভণ্ড তপস্বীর দেখা পেলেন।

ভণ্ড তপস্বী রাজার আশ্রয়ে থেকে যাবতীয় চাষ করত। সেই-সব সবজি সে রাজারের দোকানদারদের কাছে বিক্রি করে টাকা জমাত। বোধিসত্ত্ব দেখলেন ভণ্ড তপস্বী খুরপি হাতে তরকারির ক্ষেত সামলাচ্ছে। বোধিসত্ত্বের নাম রাখা হয়েছিল সৌমনস্য কুমার। ভণ্ড যখন দেখল কুমার এসেছেন, সে খুরপি নামিয়ে এল। সৌমনস্য কুমার ভণ্ডকে দেখে বলল, 'ওহে গেরস্থ, তুমি কি করছ?'

এ কথা শুনে ভণ্ড খুব রেগে গেল। সে তখন ভাবল, 'ও ছেলে এখনই আমার সঙ্গে শত্রুতা করছে, বড় হয়ে না জানি কত কি করবে।' ভণ্ড তখন নিজের কুটির লণ্ডভণ্ড করল। তারপর মলিনভাবে বিছানায় শুয়ে রইল।

যুদ্ধ জয় করে ফেরার পথে রাজা ভণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কুটিরের হাল দেখে রাজা অবাক হলেন। তারপর তপস্বীর করুণ মূর্তি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে প্রভু?'

'কুমার অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে এসে আমার কুটির ভেঙ্গে দিয়ে গেছে।'

'আজ কুমারের একদিন কি আমার একদিন।'

রাজা ঘাতককে বললেন, 'কুমারের কাটা মুণ্ডু নিয়ে এসে তপস্বীর পায়ে উপহার দাও।' ঘাতক গিয়ে কুমারকে বলল, 'প্রভু, পালান, রাজা আপনার মাথা কাটতে হুকুম দিয়েছেন।'

এক কাজ করতে পারবে?

কি কুমার?

আমাকে জ্যান্ত অবস্থায় রাজার কাছে নিয়ে চল।

কেন?

কুমারকে নিয়ে আসা হলে রাজাকে কুমার জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার অপরাধ কি সেটা আগে বলুন। তারপর আপনি নিজের হাতে আমার মাথা কাটুন।' রাজা বললেন, 'তুমি তপস্বীর অনিষ্ট করেছ।' কুমার বললেন, 'না, আমি কোন অনিষ্ট করিনি। আমি শুধু ওঁকে গৃহী বলেছি। তা যে ক্ষেতে চাষ করে, তরকারি বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে, তাকে কি আপনি ব্রাহ্মণ বা তপস্বী বলবেন?'

রাজা তখন খোঁজ করে দেখলেন, সত্যি ভণ্ডর কুটিরে টাকা সঞ্চিত আছে। রাজারের দোকানদাররাও এসে বলে গেল, 'হ্যাঁ প্রভু, উনি আমাদের কাছে তরিতরকারি বিক্রি করেন।' রাজা ভণ্ড তপস্বীকে দূর করে দিলেন। কুমারকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

কিন্তু কুমারের মনে ততক্ষণে সংশয় দেখা দিয়েছে। তিনি ভাবছেন 'এই মূর্খ রাজার ছেলে হয়ে বেঁচে থাকাটাই কঠিন।' তিনি অতি অল্প বয়সে ঋষি প্রব্রজ্যা নিলেন।

চাম্পেয় জাতক

অতীতে অঙ্গ ও মগধ রাজ্যে মগধ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। দুই রাজ্যের মাঝখানে ছিল চম্পা নদী। ঐ নদীতে ছিল নাগদের রাজত্ব। বোধিসত্ত্ব তখন খুব গরীব ঘরে জন্মেছিলেন। একদিন তিনি চম্পানদীর তীরে নাগ রাজাকে বিহার করতে দেখেন। নাগরাজের সম্পত্তি দেখে তাঁর একান্ত ইচ্ছা হল ঐ সম্পত্তি লাভের। বোধিসত্ত্ব এই বাসনা নিয়ে তপস্যা শুরু করলেন। একদিন নাগরাজ চম্পায় মারা গেলেন। বোধিসত্ত্ব তার কিছুদিন পরে মারা গেলেন।

আকাঙ্ক্ষা ও তপস্যার জোরে তিনি নাগকুলে জন্ম নিলেন। নাগরাজ হলেন। আরাম এবং বিলাসে তাঁর দিন কাটতে লাগল। কিন্তু তাঁর মনে সুখ নেই। তিনি এখন বিষয়সুখ চান না। পেতে চান মহাজ্ঞান। সেজন্য পোষধব্রত শুরু করলেন। নাগরাজের রাণী ওঁকে অনাহারে থাকতে দিতে চান না। সেজন্য তিনি লোকালয়ে চলে যেতেন পোষধের দিনে।

নাগবাজ ভাবতেন, 'যদি কেউ আমাকে নেবে আমাব চামডা কাজে লাগায তো লাগাক, বাধা দেব না।' কিন্তু নগরবাসীরা তাঁকে দেবজ্ঞানে পুজো দিতে লাগল। একদিন এক সাপুড়ে তাঁকে ধরতে এল।

নাগরাজা বুঝলেন তিনি যদি সাপুড়েব দিকে তাকান তাহলেই সাপুডে উগ্র বিষে মাবা যাবে। সেজন্য তিনি বাধা দিলেন না। সাপুড়ে তাকে বেঁধে নিযে চলে গেল। বিষদাঁত উপডে ফেলল। খুব নির্যাতন কবল। নাগবাজ মুখ বুঁজে সব সহ্য কবতে লাগলেন। সাপুডেব জন্য তিনি খেলা দেখাতেন। সাপুড়ে অনেক টাকা আয কবতে লাগল।

নাগবাজাব মহিষী দীর্ঘকাল নাগবাজকে না দেখে তাঁব খোঁজে লোকালযে এলেন মানবশবীব ধাবণ কবেন। আকাশপথে ঘুবতে লাগলেন। তখন বোধিসত্ত্বকে নিযে সাপুডে বাবাণসীবাজেব দববাবে খেলা দেখাচ্ছে। হঠাৎ বোধিসত্ত্ব আকাশপথে স্ত্রী সুমনাকে দেখে লজ্জায সাপুডেব ঝুডিব মধ্যে ঢুকে পডলেন। রাজাও আকাশেব দিকে তাকিযে সুমনাব আশ্চর্য সুন্দর মূর্তি দেখলেন। বাজা সুমনার পবিচয

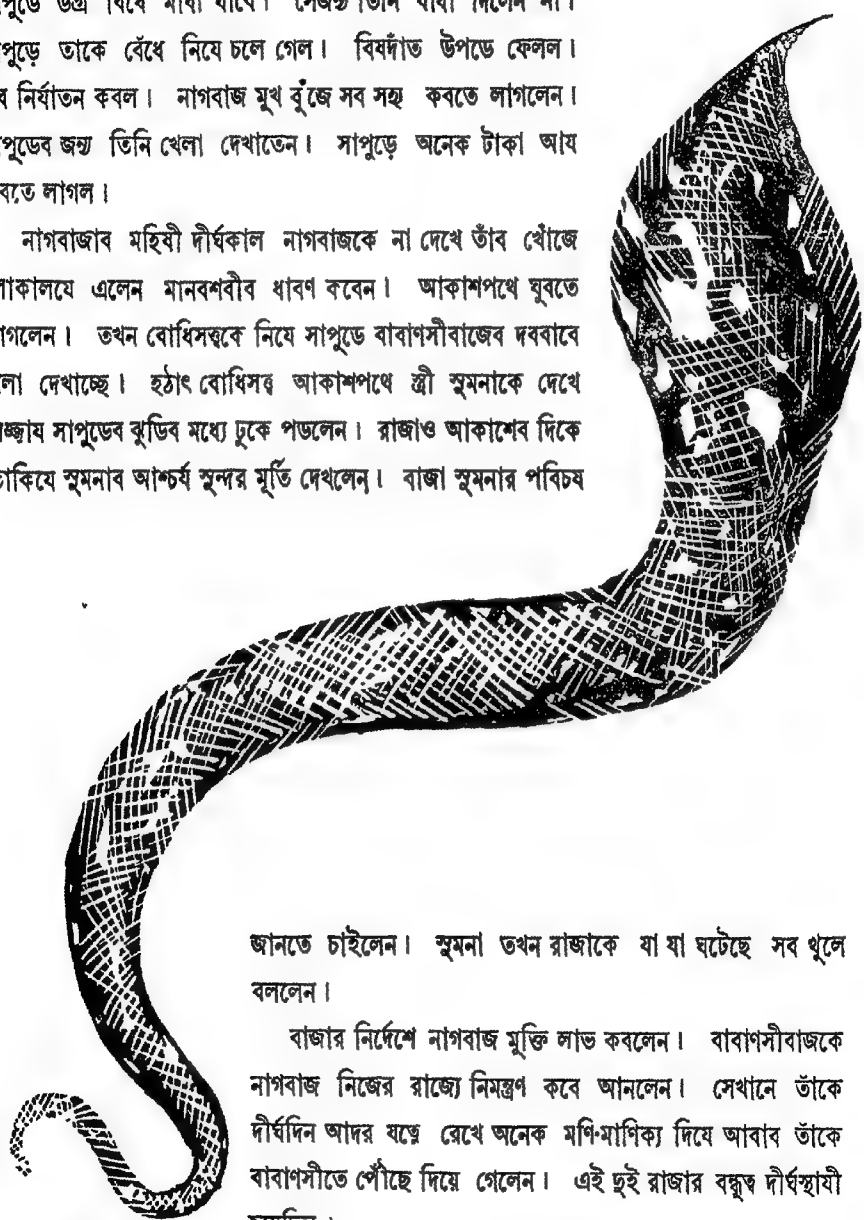

জানতে চাইলেন। সুমনা তখন রাজাকে যা যা ঘটেছে সব খুলে বললেন।

বাজার নির্দেশে নাগবাজ মুক্তি লাভ কবলেন। বাবাণসীবাজকে নাগবাজ নিজের রাজ্যে নিমন্ত্রণ কবে আনলেন। সেখানে তাঁকে দীর্ঘদিন আদর যত্নে রেখে অনেক মণি-মাণিক্য দিযে আবাব তাঁকে বাবাণসীতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এই দুই রাজার বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থাযী হযেছিল।

কুম্ভ জাতক

বারাণসীর রাজা তখন ব্রহ্মদত্ত। তাঁর আমলে কাশ্মীর রাজ্যে সুর নামে এক ব্যক্তি বসবাস করত। সুরের কাজ ছিল বনে বনে ঘুরে বেড়ানো। জীবিকার দায়েই তাকে এত শাস্তি পোয়াতে হতো। একবার সে হিমালয় প্রদেশের বনে ঢুকল। উদ্দেশ্য, দুর্লভ কিছু সংগ্রহ করা। এমন কিছু যা বিক্রি করে সে মোটা রোজগার করতে পারে।

হিমালয়ে তখন একটি আশ্চর্য গাছ ছিল। গাছটির গুঁড়ি দারুণ মোটা। গুঁড়িটা একমানুষ সমান উঁচু। তারপর সেখান থেকে তিন-তিনটে ডাল বেরিয়েছে। ডাল তিনটি যেখান থেকে বেরিয়েছে সেখানে বিশাল গামলার মত একটা খোঁদল ছিল। তাকে বলা হতো কোটর। গাছটির চারদিক ঘিরে ছিল হরতুকি, আমলকি আর মরিচ লতার গাছ। ঐসব গাছের পাকা ফলগুলো এসে জমা হতো এই গাছের কোটরে। বেশ খানিকটা দূরে শালি ধানের ক্ষেত। পাখিরা শালি ধান ঠোঁটে করে নিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় সেই ধানও এসে পড়ত এই কোটরে। বিশাল এই শস্যাগারটি বর্ষাকালে জলে ভরে যেত। জলে-রোদে ঐ শস্যসম্ভার পচে গেলে কোটরের জল হয়ে উঠত রক্তবর্ণ।

গ্রীষ্মের খরতাপে তৃষ্ণার্ত পাখির দল ঐ কোটরের জলে ঠোঁট ভেজাতে গিয়ে খুব নাকাল হতো। তৃষ্ণা মিটত ঠিকই, কিন্তু তারপর তারা নেশায় মাতাল হয়ে গাছটির আশেপাশে শুয়ে পড়ত। ঘুমে তলিয়ে যেত। পাখি, ভল্লুক, বানর থেকে শুরু করে বুনো মোরগ পর্যন্ত সবারই এক দশা হতো। নেশা না কাটা পর্যন্ত তাদের ওখানেই পড়ে থাকতে হতো।

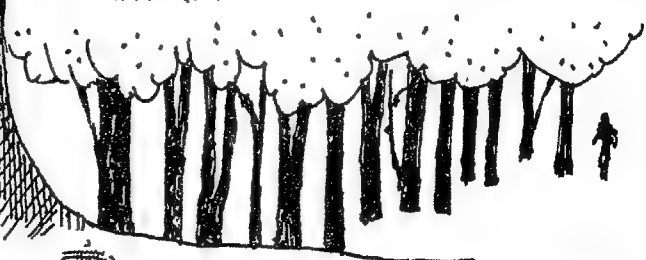

ঘুরতে ঘুরতে সুর এসে ঐ গাছটির তলায় থেমেছিল। ইচ্ছে ছিল একটু জিরিয়ে নেওয়া। কিন্তু চোখের সামনে এসব দৃশ্য দেখার পর ঐ কোটরটির জল সম্পর্কে তার অদম্য কৌতূহল জাগল। জলটা বিষাক্ত হলে এসব পাখি আর উঠে দাঁড়াতে পারত না। সুতরাং সে ঠিক করল খেয়ে দেখবে।

জল মুখে দেওয়া মাত্র সুরও নেশায় আক্রান্ত হল। খিদেও চরমে উঠল। তখন সে মাংস খাবে ঠিক করল। গাছের তলা থেকে ঘুমন্ত কয়েকটা টিয়াপাখিকে তুলে নিল। বেশ করে আগুনে ঝলসে নিয়ে টিয়াপাখির মাংস খেল। এত আমোদ সে জীবনে কখনও পায় নি। ফলে ঐ গাছটি ছেড়ে নড়তে পারল না। কয়েকদিন সেই পাহাড়েই রয়ে গেল। দিনগুলো পালকের মত উড়ে গেল।

অত্যাশ্চর্য সেই গাছের কাছাকাছি এক তপস্বী থাকতেন। সুরের হঠাৎ সেই তপস্বীর কথা মনে পড়ে গেল। এর আগে যখন সে হিমালয়ে এসেছে তখনও সে বরুণ নামের ঐ তপস্বীর সঙ্গে দেখা করত। এমন চমৎকার পানীয়টি আবিষ্কার করার পর সুরের মনে হল, তপস্বী বরুণকে এই পানীয় খাওয়াতে হবে। নিশ্চয় তাঁর খুব ভাল লাগবে। এসব সাত-পাঁচ ভেবে সুর বাঁশের মগে করে বেশ খানিকটা পানীয় নিয়ে বরুণের কাছে গেল। তারপর দুজনে মিলে গভীর আনন্দে ঐ পানীয় আর মাংস খেল। সুর আর বরুণই যেহেতু ওই পানীয় প্রথম পান করে সেজন্য পানীয়টির নাম হল বারুণী ও সুরা।

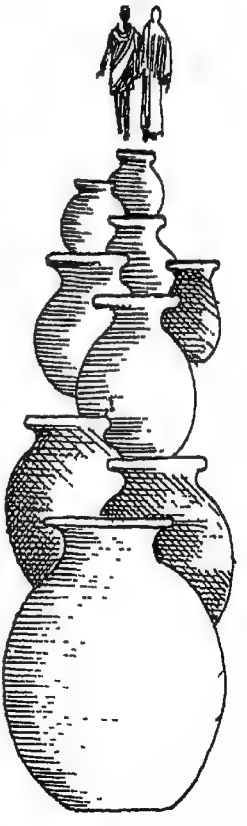

বেশ কয়েকদিন দুজনে পানাহারে মত্ত থাকার পর সুর আর বরুণ ঠিক করল, এই আশ্চর্য পানীয়ের শক্তি একবার লোকদের দেখাতে হবে। বড় বড় বাঁশের পাত্র তৈরি করে তাতে ঐ লাল জল ভরে নিল তারা। তারপর বাঁকে করে সেই পানীয় নিয়ে তারা শহরের দিকে রওনা দিল। শহরে পৌঁছেই তারা রটিয়ে দিল ভিনদেশী দুই শুঁড়িওয়ালা এসেছে। তাদের মত অত চমৎকার সুরা বানানোর কৌশল আর কেউ জানে না।

এক কান দু কান হয়ে রাজার কাছেও এই বার্তা পৌঁছে গেল। রাজা হুকুম দিলেন, এক্ষুনি তাদের রাজসভায় নিয়ে এস।

সুরা পান করে রাজাও মুগ্ধ। পাত্র-মিত্র, সভাসদগণ, রাজার

পেযাদা থেকে বাগানের মালী পর্যন্ত সবাই ঐ সোমবস পান করে মত্ত হযে গেল।

কিছুদিনেব মধ্যেই সুব আব বরুণেব ভাঁড়াব খালি হয়ে গেল। তখন দুজনে যুক্তি কবল, 'দেখ, বারবাব তো আর বনে গিয়ে সুবা আনা সম্ভব নয। তার চেযে এক কাজ কবা যাক। আমরা ঐ গাছেব ছাল আর যা যা দিযে বসটা তৈরি হয় সেসব ফুটিয়ে নিজেরাই মদ বানাই।' এরপব তারা খেটেখুটে নিজেবাই অঢেল পরিমাণে সুবা তৈবি করল। সেই সুরা গাছের কোটবে জমা লাল জলের মতই চমৎকার হল। শহরময তাদেব নিয়ে সোরগোল পড়ে গেল। বাজ্যের লোকের তখন সুরা পান করা ছাডা আর কোন কাজ বইল না। রাজা রাজ্যশাসন ভুলে গেলেন, কৃষক ভুলে গেল চাষের কাজ। কামারের চুল্লী গেল নিভে। কুমোবেব চাকার ঘোবাও বন্ধ হযে গেল। সুবার গন্ধও আকাশে সেই সঙ্গে ছড়িযে গেল।

দুই বন্ধু তখন ঐ সম্পদ ছেডে আবার বাস্তা ধবল। এবাব তারা হাঁটতে হাঁটতে এল সাতেক নগরে। সেখানেও কেনাবেচা হল। তারপর এল শ্রাবস্তী নগবে। তখন আর এক ফোঁটা মদও নেই। শ্রাবস্তীর বাজা তখন সর্বমিত্র। তিনি তাদেব জিজ্ঞেস করলেন, 'সব তো বুঝলাম, তোমরা এখন কি চাও বল দেখি।'

'চালেব গুঁড়ো।'

'আর?'

'মবিচ ও অন্যান্য ফল।'

'আর কি?'

'পাঁচশটি কলসী।'

রাজার ততক্ষণে অন্য কৌতূহল জেগে উঠেছে। তিনি হুকুম দিলেন, 'বিদেশীরা যা যা চাইছে দিয়ে দাও।' সুর আর বরুণ পাঁচশ কলসী সুরা বানিয়ে ফেলল। যাতে কেউ সুরা চুরি করে পান করতে না পারে সেজন্য প্রতিটি কলসীর সঙ্গে একটা করে বেড়ালকে বেঁধে রাখা হল। কলসীর সুরা পচে গেঁজে উঠল। ফেনা উথলে পড়তে লাগল। সুরার নদীর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে বেড়ালগুলো কলসীর গা থেকে সমস্ত ফেনা চেটে খেয়ে ফেলল। তাতে তাদের এমন নেশা হল যে বেড়ালগুলো মড়ার মত ঘুমোতে লাগল। বেড়ালগুলো এমন ভাবে ঢলে পড়েছিল যে ইঁদুরের পাল এসে তাদের লেজ আর কান কামড়াতে লাগল। রাজার সেপাই এই কাণ্ড দেখে ভাবল, 'নিশ্চয়ই এতে বিষ আছে।' তারা রাজাকে গিয়ে জানাল, 'মহারাজ, ঐ লোক-দুটো আমাদের মারার জন্য বিষ বানিয়েছিল। তা খেয়ে বেড়ালগুলো মরে গেছে।' রাজা গেলেন ভয়ঙ্কর রেগে। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন, 'ওদের শূলে চড়াও।' হতভাগ্য বরুণ এবং সুর কিন্তু শূলে চড়েও চিৎকার করতে লাগল, 'আমাদের সুরা দাও, মধু দাও।'

দুজনের প্রাণদণ্ড দেওয়ার পর রাজা পেয়াদাদের বললেন, 'যাও, এবার কলসীগুলো ভেঙ্গে ফেল।' পেয়াদারা কলসী ভাঙ্গতে গিয়ে নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। বেড়ালগুলোর ততক্ষণে নেশা কেটে গেছে। পেয়াদারা এসে রাজাকে খবর দিল, 'মহারাজ! বেড়ালগুলো বেঁচে আছে। খুশিতে ডগমগ করছে।' রাজা বুঝলেন বেচারারা তাহলে মদই বানিয়েছিল, বিষ নয়। ভাবলেন, 'বেশ জাঁকজমক করে ঐ মদ খেতে হবে।' বিশাল মণ্ডপ বানানো হল। রাজা সর্বমিত্র স্বয়ং বসলেন দুধের মত পালঙ্কে। সভাসদরা চারদিকে ঘিরে বসলেন। রাজা আদেশ করলেন, 'এবার সুরা নিয়ে এস।'

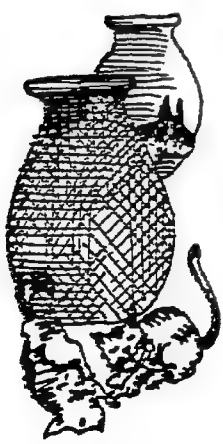

রাজা সর্বমিত্র যখন সুরা পান করতে থাকেন স্বর্গে তখন দেবরাজ ইন্দ্র চিন্তা করছিলেন পৃথিবীতে এখন ন্যায়বান ব্যক্তি কে আছেন? চিন্তা করামাত্র তাঁর মানসচক্ষে রাজা সর্বমিত্রের মুখ ভেসে উঠল। ইন্দ্র দেখলেন সর্বনাশ। রাজা সুরার চুমুক দিলে শ্রাবস্তী নগর তলিয়ে যাবে। তিনি রাজার সুরাপান বন্ধ করার জন্য একটি আশ্চর্য কৌশল বের করলেন।

এক হাতে সুরাপূর্ণ একটি কলসী নিয়ে তিনি আকাশপথে সর্বমিত্রের সামনে আবির্ভূত হলেন। হঠাৎ শূন্যে ঐ কলসীসমেত ইন্দ্রকে স্থির থাকতে দেখে সর্বমিত্র খুবই বিস্মিত হলেন। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তখন এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন :

'আমার হাতের এই কলসীটি কে কিনবেন বলুন। আমার হাতের এই কলসীটি কিনে নিন। এতে আছে অমৃত রস। যাকে সুরা বলা হয়। সুরার গুণ শুনলে আপনারা মুগ্ধ হয়ে যাবেন। এর অসাধ্য কোন কাজ নেই।'

সর্বমিত্র ॥ কে আপনি ব্রাহ্মণ? আপনার শরীর থেকে আশ্চর্য জ্যোতি বেরিয়ে আসছে। যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কোন্ আশ্চর্য উপায়ে আপনি আকাশে স্থির হয়ে আছেন? দেবতা ছাড়া এমন ক্ষমতা আর কারও আছে বলে মনে হয় না। আর আপনি কেনই বা আমাদের ঐ কলসীটি কিনতে বলছেন? এই কলসীতে কি আছে দয়া করে বলুন।

ইন্দ্র ॥ শোন রাজা, এই কলসীতে ঘি-ও নেই, তেল-ও নেই। এমন কি মধু কিংবা গুড়-ও নেই। এতে আছে একরকম রস। কলসীটি রসের আধার। এই কলসীর রস পান করলে মানুষ যা নয় তাই হয়ে ওঠে। তার চাল চলন বদলে যায়। নিজের ওপর তার কোন বশ থাকে না। তার পা নড়তে থাকে। গ্রামের শেষে দুর্গন্ধ ও আবর্জনার স্তূপের মধ্যে পড়ে সে হাবুডুবু খায়। উন্মাদের মত যা পায় তাই খায়। শরীর ও মনের ওপর নিজের বশ না থাকায় তারা নাগা সন্ন্যাসীর মত উদোম হয়ে যায়। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকে। অসময়ে অচেতন হয়ে ঘুমোতে থাকে। এমনভাবে হাত পা ছুঁড়তে থাকে যেন তারা কলের পুতুল।

মানুষের ব্যথাজ্ঞান লোপ পায়। তাদের শরীর থেকে মাংস কেটে নিলেও তারা অনুভব করতে পারে না। সুরা পানের ফলে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত ভোগ করতে হয়। মানুষের মুখের লাগাম থাকে না। তারা তখন অকথা-কুকথা বলে। নিজেদের মনে করে সর্বেসর্বা। ত্রিলোকেশ্বর। কত যে সর্বনাশের জন্ম দিতে পারে এই সুরা তা বলে শেষ করার নয়।

নিজের পৈতৃক সম্পত্তি, পারিবারিক সম্মান, বংশগত কৌলিন্য সবই এতে লোপ পায়। ইতর জন্তুর মত তারা ঝগড়া মারামারি করে। কোন কাজ করতে যাওয়ার পথে সুরাপান করলে তারা সেই কাজের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। মহিলারা সুরা পান করলে মান-সম্মান হারায়। গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। হাজার প্রলোভনেও যে মিথ্যা কথা বলে না, সুরা তাকে দিয়ে হাজারটা মিথ্যে বলিয়ে দিতে পারে। ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের ভেদরেখা মুছে যায়। তারা একসঙ্গে শুয়োরের পালের মত গাদাগাদি করে থাকে। এতে শরীর ধ্বংস হয়। আপনার নিশ্চয় মনে আছে, মহাভারতে মুষলপর্বের সূচনা হয়েছিল এই সুরাপান থেকেই। যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। এমনকি অসুররা যে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হল সে-ও তো সুরার জন্যই। শোন রাজা, সুরার গুণাগুণ সবই তোমাকে বললাম। এবার তুমি কলসীটি কিনে নাও। প্রাণ ভরে খাও। আনন্দ কর।

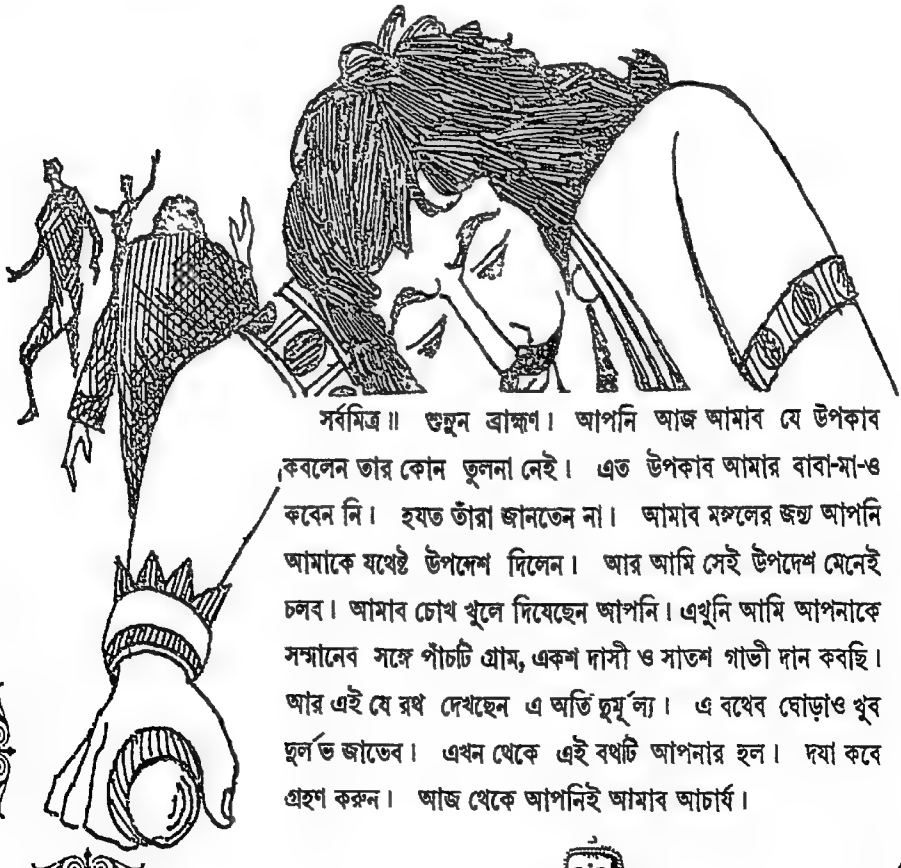

সর্বমিত্র॥ শুনুন ব্রাহ্মণ। আপনি আজ আমার যে উপকার করলেন তার কোন তুলনা নেই। এত উপকার আমার বাবা-মা-ও করেন নি। হয়ত তাঁরা জানতেন না। আমার মঙ্গলের জন্য আপনি আমাকে যথেষ্ট উপদেশ দিলেন। আর আমি সেই উপদেশ মেনেই চলব। আমার চোখ খুলে দিয়েছেন আপনি। এখুনি আমি আপনাকে সম্মানের সঙ্গে পাঁচটি গ্রাম, একশ দাসী ও সাতশ গাভী দান করছি। আর এই যে রথ দেখছেন এ অতি দুর্মূল্য। এ রথের ঘোড়াও খুব দুর্লভ জাতের। এখন থেকে এই রথটি আপনার হল। দয়া করে গ্রহণ করুন। আজ থেকে আপনিই আমার আচার্য।

ইন্দ্র ॥ আমি ব্রাহ্মণ নই রাজা। আমি দেবরাজ ইন্দ্র। তোমার গ্রাম, দাসী ও গাভী তোমারই থাক। প্রিয় রথটিও নিজের কাছেই রাখ। ধর্মে মতি রেখ। শীল পালন কর। দেহ নশ্বর। দেহহীন হলে তুমি স্বর্গে স্থান পাবে।

রাজাকে আরও অনেক ধর্মকথা ও উপদেশ দিয়ে ইন্দ্র ফিরে গেলেন। রাজা সঙ্গে সঙ্গে পেয়াদাদের বললেন, 'কলসীগুলো এক্ষুনি ভেঙ্গে ফেল।' এরপর থেকে সর্বমিত্র আগের মতই দানধ্যানে ও প্রজাপালনে ডুবে রইলেন। দিন যেতে লাগল। রাজা আয়ু ক্ষয় করার পর স্বর্গে স্থায়ী আসন পেলেন। শ্রাবস্তীতে সুরা প্রবেশ করতে পারল না। কিন্তু জম্বুদ্বীপে সুরাপানের অভ্যাস ক্রমেই ভীষণ হয়ে উঠতে লাগল।

মহাকপি জাতক

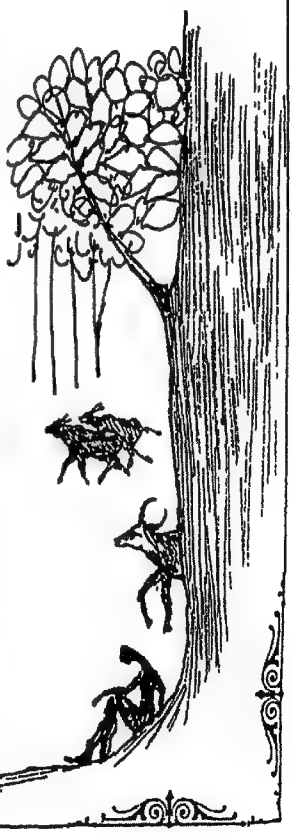

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে কাশী গ্রামটিতে বহু কৃষক বসবাস করত। কাশীগ্রামের এক ব্রাহ্মণ কৃষক একদিন মাঠে কাজ করতে করতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি তখন গোরুগুলোকে চড়ে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দিলেন। এমনিতে লাঙলের কাজ সারা হয়েছে। বেচারা গোরুগুলোও হাঁফিয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণ গোরুগুলোকে চরতে দিয়ে নিজে এক গাছের ছায়ায় জিরিয়ে নিতে লাগলেন।

খানিক বাদে উঠে আবার ক্ষেতে নামলেন। শুরু হল কোদালের কাজ। এক মনে কাজ করে চলেছেন। সময়ও বয়ে যাচ্ছে দ্রুত। এক সময় সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত গোরুগুলোর ফেরার নামগন্ধ নেই। ব্রাহ্মণ পড়লেন মহা বিপদে। এদিকে সেদিনের মত কাজ শেষ। ঘরে ফিরতে হবে। ব্রাহ্মণ কি আর করেন, গোরুর খোঁজ-তালাশ শুরু করলেন। কিন্তু যতদূর যাচ্ছিলেন ততদূরের মধ্যে কোথাও তাদের লেজগাছাও দেখতে পেলেন না।

এদিকে গোরুগুলো ততক্ষণে গভীর বনে ঢুকে পড়েছে। ব্রাহ্মণ খুঁজতে খুঁজতে চললেন। বনের পর বন পেরিয়ে হাজির হলেন হিমালয়ের গহন বনে। সেখানে ঘন বনে পথ হারিয়ে ফেললেন। আর হাঁটতেও পারছেন না। বনের পথ কাঁটা আর ঝোপে ভরা। শরীরও ভেঙ্গে আসছে। এভাবে পর পর সাত দিন কেটে গেল। আহার নিদ্রাহীন অবস্থায় পাগলের মত ঘুরতে ঘুরতে তিনি একটা গাব গাছের কাছে এলেন। গাছে উঠে পাকা গাব ফল খেয়ে খিদে মেটাবার ইচ্ছা করলেন। দুর্বল শরীর, টাল সামলাতে পারলেন না। পা ফসকে পড়ে গেলেন ষাট হাত নিচে, এক গহ্বরের মধ্যে। গহ্বরটিতে বছরের পর বছর তালপাতা পড়েছে। জল জমেছে। সেসব পচে সে এক মহা নরক। ব্রাহ্মণ মনে মনে প্রমাদ গুনলেন। আর নিস্তার নেই। এখান থেকে তাঁর মুক্তির কোন আশা নেই। এই গহন বনে কে-ই বা তাঁকে মুক্ত করতে আসবে। এসব ভাবতে ভাবতে মৃতপ্রায় অবস্থায় একে একে দশ দিন কেটে গেল।

ঠিক সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব বানর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, নাম মহাসত্ত্ব। হিমবন্ত প্রদেশই তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র। দুর্গম বন বলে কোন কিছু জানতেন না। অরণ্যময় তাঁর ছিল অবাধ গতি। একদিন আহারের খোঁজ করতে করতে বোধিসত্ত্ব সেই নগরের কাছে এসে পড়লেন। খুব লম্বা একটা গাছের মাথার চড়ে দোল খেতে খেতে তিনি হঠাৎই ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেন। বুঝতে পারলেন, বেচারা বিপদে পড়েছে। তখন ভাবলেন, 'এঁকে যদি আমি মুক্ত না করি তাহলে এখানেই বেচারা শেষ নিঃশ্বাস ফেলবে। যেভাবেই হোক মানুষটাকে বাঁচাতে হবে।'

মহাসত্ত্বের পক্ষেও কাজটা খুব সহজ ছিল না। কি করে তিনি মানুষটাকে কাঁধে করে আনেন, ভেবে কুল পেলেন না। শেষে ঠিক করলেন, 'আগে ভারি পাথর তোলা অভ্যাস করি।' অসম্ভব কষ্ট করে তিনি কাঁধে পাথর তোলার চেষ্টা করে গেলেন। অনেকবারের চেষ্টায়

সফল হওয়ার পর মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করতে এগিয়ে গেলেন। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে তাঁকে রক্ষা করলেন।

মুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ দেখলেন বানরটা তাঁকে কাঁধ থেকে নামিয়েই ক্লান্তিতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে বললেন, 'তুমি আমাকে পাহারা দাও, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।' ব্রাহ্মণ বানরকে ঘুমোতে দেখে ভাবলেন, 'এটাকে শেষ করে ফেললেই তো হয়, কে এখন বাঁদরকে পাহারা দেবে?' ভাবি একটা পাথর তুলে তিনি মহাসত্ত্বের দিকে ছুঁড়লেন। মহাসত্ত্বের মাথার একপাশে পাথরটা লাগতেই তিনি জেগে উঠলেন। এক লাফে গাছের মাথায় চড়ে বসলেন। সেখান থেকে বললেন, 'শয়তান, আমি তোকে প্রাণে বাঁচালাম, আর তুই আমাকেই খুন করতে যাচ্ছিলি। তোকে উচিত শাস্তি দিতে হবে।' তারপরই কি যেন ভেবে বললেন, 'না, তোকে আমি কোন শাস্তি দেব না। চল, তোকে রাস্তা দেখাচ্ছি বনের বাইরে যাওয়ার। তবে আমি গাছে-গাছেই যাব।' মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণের থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে তাঁকে পথ দেখিয়ে বনের বাইরে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

বানররূপী বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে কিছু না বললেও, মহাপাপের ফল ফলল কয়েকদিনের মধ্যেই। ব্রাহ্মণের কুষ্ঠ হল। শরীর ক্ষয়ে যেতে লাগল। ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রেতের মত হয়ে গেল। একটানা সাত বছর তাঁর দুর্ভোগ চলল। তারপর একদিন ঘুরতে ঘুরতে ব্রাহ্মণ বারাণসীরাজের বাগানে ঢুকে পড়লেন। সেদিন ছিল পুণ্য তিথি। বারাণসীরাজ বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি ব্রাহ্মণকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

কি পাপে তোমার এই অবস্থা হল?
অবধ্যকে বধ করেছ?
কেন এত কষ্ট পাচ্ছ?
কি অন্যায় করেছ?

ব্রাহ্মণ তখন যা-যা ঘটেছিল সব কথাই বারাণসীরাজকে খুলে বললেন। নিজের পাপ ঢাকা দেওয়ার কোন চেষ্টা করলেন না। শেষে বললেন, 'আমাকে পথ দেখানো শেষ করে সেই মহান বানরটি এক হ্রদে নেমে ক্ষতস্থান ধুয়েছিল। সে চলে যেতে তেষ্টায় আমি

কষ্ট পাচ্ছিলাম। জল খেতে হ্রদে নামলাম। সঙ্গে সঙ্গে যেন সর্বাঙ্গে আগুন লাগল। যেখানে যেখানে হ্রদের জল লেগেছিল, সেইসব জায়গায়

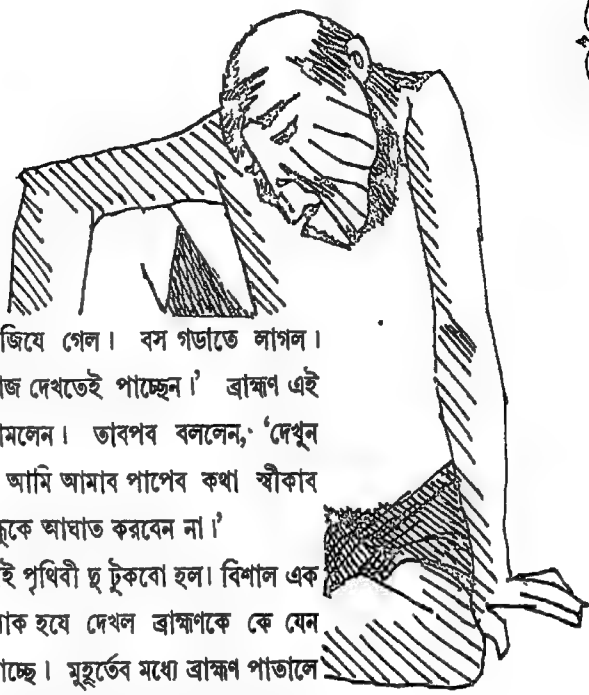

দেখতে দেখতে বিস্তর ফোড়া গজিয়ে গেল। রস গড়াতে লাগল। এই হল শুরু, তারপর তো মহারাজ দেখতেই পাচ্ছেন।' ব্রাহ্মণ এই পর্যন্ত বলে দম নেওয়ার জন্য থামলেন। তারপর বললেন, 'দেখুন মহারাজ, এত মানুষের সামনে আমি আমার পাপের কথা স্বীকার করলাম। আপনারাও কখন বন্ধুকে আঘাত করবেন না।'

ব্রাহ্মণের কথা ফুরোনো মাত্রই পৃথিবী দু টুকরো হল। বিশাল এক গহ্বর দেখা গেল। সবাই অবাক হয়ে দেখল ব্রাহ্মণকে কে যেন সেই গহ্বরের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে ব্রাহ্মণ পাতালে তলিয়ে গেলেন। রাজাও সভাসদদের নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন।

সম্ভব জাতক

প্রাচীন ভারতে কুরু নামে একটি রাজ্য ছিল। কুরু রাজ্যের ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে ধনঞ্জয় কৌরব নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। কৌরবার প্রধান পুরোহিত এবং উপদেষ্টার নাম ছিল শুচিরত। রাজা একদিন স্থির করলেন মহাজ্ঞানী প্রধান পুরোহিতের কাছে নিজের মনের আকাঙ্ক্ষার কথা জানাবেন। তাঁর উপদেশ শুনবেন।

মনে মনে এ কথা স্থির করার পর একদিন তিনি শুচিরতকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে তাঁকে সুসজ্জিত আসনে বসতে আহ্বান জানালেন। নিজে নিচে বসলেন। তারপর রাজা কৌরব শুচিরতকে জিজ্ঞেস করলেন:

'আমি রাজ্য লাভ করেছি। ক্ষমতা লাভ করেছি। তবু অতৃপ্তির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছি না। ভাববেন না আমি কোন বিষয়সুখের লালসায় অতৃপ্ত। মান্যবর, আমার আকাঙ্ক্ষা গভীর। আমি মহতী কিছু প্রার্থনা করছি। ধর্মের শক্তিতে নিজেকে মহৎ করে তোলাই আমার বাসনা। আমি জানি রাজার চরিত্রে এমন সব দুর্লভ গুণের সমাবেশ ঘটা আবশ্যক যা থেকে প্রজারাও শিখতে পারে। তারা উন্নত হতে পারে। আমি চাই সেইসব গুণে মহীয়ান হয়ে উঠতে, যাতে কি দেব, কি যক্ষ, কি মানব সকলেরই প্রশংসা লাভ করতে পারি। আমার দুর্ভাগ্য আমি জানি না, কোন্ খানে, কি উপায়ে সেই সৌভাগ্য অর্জন করা সম্ভব। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি

আপনি আমাকে সেই শিক্ষা দিন।'

এমন গূঢ় প্রশ্ন সকলে করতে জানেন না। আর এর উত্তরও সকলের জানা নেই। সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানীরাই এ বিষয়ে সচেতন। এরকম মানুষের দৃষ্টান্ত হতে পারেন একমাত্র বোধিসত্ত্ব। তিনিই সর্বজ্ঞানী। রাজা সব কিছু জানতে চান, কিন্তু সব কিছুর উত্তর তিনি জানতে পারেন না। শুচিরত তো আর বোধিসত্ত্ব নন। ফলে তিনি কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, 'রাজা, ওসব প্রশ্নের উত্তর আমারও অজানা। পৃথিবীতে খুব কম লোকই এ বিষয়ে জানেন। আমি যতদূর জানি ধর্মপ্রাণ বিদুরের কাছেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব।'

শুচিরতের জবাব শুনে রাজা বললেন, 'ব্রাহ্মণ, আপনি যদি সত্যিই জানেন যে মহাজ্ঞানী বিদুর এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারবেন তাহলে এক্ষুনি তাঁকে গিয়ে বলুন। আমি এ প্রশ্নের উত্তর জানতে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে আছি।' এই বলে রাজা বিদুরের প্রণামী হিসেবে পনেরটি মোহর শুচিরতের হাতে দিলেন।

রাজার কাছ থেকে প্রচুর যৌতুক ও সিপাই সান্ত্রী নিয়ে শুচিরত বিদুরের উদ্দেশে রওনা হলেন। শুচিরত কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে সোজা বারাণসী গেলেন না। তিনি পথের মাঝখানে নানা জায়গায় পণ্ডিতদের আখড়ায় একজন সর্বজ্ঞানীর খোঁজ করতে করতে চললেন। তবে প্রত্যেকবারই তাঁকে হতাশ হতে হল। এমন একজন পণ্ডিতেরও দেখা পাওয়া গেল না। গোটা জম্বুদ্বীপ এভাবে চষে ফেলার পরও প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না। শেষকালে তিনি বারাণসীতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে নিজের থাকার একটা আস্তানা যোগাড় করে সোজা চলে গেলেন বিদুরের বাড়িতে। একেবারে ভোর না হতেই। যেতেই বিদুর তাঁকে সমাদর করে বসালেন। শুচিরত দেখলেন বিদুর তখন খেতে বসেছেন। এখানে বলে রাখা দরকার, বিদুর আর শুচিরত ছেলেবেলায় একই আচার্যের কাছে একসঙ্গে পড়েছেন। তাঁরা বাল্যবন্ধু।

বিদুর ॥ কি মনে করে এতদিন পরে এলে?

শুচিরত ॥ যুধিষ্ঠিরের বংশের এক রাজা, কৌরবা আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।

বিদুর ॥ কেন বল তো?

শুচিরত ॥ তিনি অর্থ আর ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ জানতে চান।

বিদুর ॥ কঠিন প্রশ্ন। জানই তো, আমি আদালতে কাজ করি। ভাবার সময় পর্যন্ত নেই। এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে ভাবতে হবে। কিন্তু আমার হাতে সে সময় নেই। তুমি এক কাজ কর, আমার ছেলে ভদ্রকারের কাছে যাও। সে আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী। আমার ধারণা, সে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।

বেচারা শুচিরত! তাঁকে আবার রওনা হতে হল ভদ্রকারের খোঁজে। শুচিরত যখন ভদ্রকারের বাড়িতে গেলেন তিনি তখন প্রাতরাশ সেরে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছিলেন। ভদ্রকার জানতে চাইলেন, 'মহাশয়ের আগমনের হেতু·'। শুচিরত তখন বিদুরকে যা যা বলেছেন ভদ্রকারকেও সেসব কথা আবার বললেন।

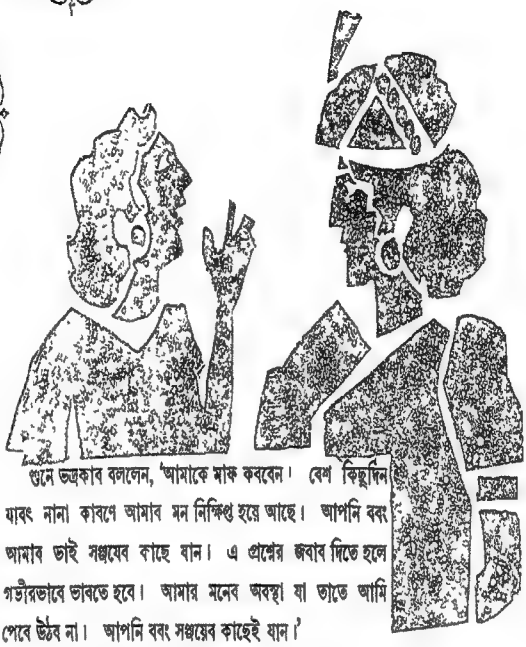

শুনে ভদ্রকার বললেন, 'আমাকে মাফ করবেন। বেশ কিছুদিন যাবৎ নানা কারণে আমার মন নিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। আপনি বরং আমার ভাই সঞ্জয়ের কাছে যান। এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে গভীরভাবে ভাবতে হবে। আমার মনের অবস্থা যা তাতে আমি পেরে উঠব না। আপনি বরং সঞ্জয়ের কাছেই যান।'

সঞ্জয়ের বাড়িতে গিয়ে দেখলেন সেখানকার অবস্থাও ভদ্রকারের বাড়ির মতই। অতিথি ও বন্ধুসমাগমে সঞ্জয়ের গৃহ পরিপূর্ণ। সঞ্জয় বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত। সঞ্জয়ের মন-মেজাজও ভাল নেই। মনঃসংযোগ করাই তাঁর পক্ষে তখন বেশ দুরূহ ব্যাপার। যাই হোক সঞ্জয় বললেন, 'আপনি এক কাজ করুন, আমার সাত বছরের ভাই সম্ভবকুমারের কাছে যান।'

শুচিব্রত এতে বেজায় অবাক হলেন। বাবা-দাদারা যে প্রশ্নের জবাব দিতে পারছেন না, রথী-মহারথীরা যে প্রশ্নের অর্থ পান না, সেই প্রশ্নের জবাব দেবে সাত বছরের এক বালক! সঞ্জয় শুচিব্রতের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, 'আপনি কোন সংশয় রাখবেন না। সম্ভবকুমারের বয়স দিয়ে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা বোঝার চেষ্টা করবেন না। যদি কেউ পারে, তাহলে সে-ই পারবে।'

শুচিব্রত তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় পাব তাঁকে?'

সঞ্জয় বললেন, 'ঐ যে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করছে, ফর্সা মত ঐ ছেলেটা।'

শুচিবত কাছে যেতে বালক সম্ভবকুমাব বললেন, 'মহাশযেব জন্য আমি কি কবতে পাবি?'

'আমাব একটি প্রশ্ন আছে, জম্বুদ্বীপে কেউই তাব উত্তব দিতে পাবে নি।'

'বেশ মহাশয়, আপনি জিজ্ঞেস করুন। বুদ্ধেব লীলায আমি উত্তব দিচ্ছি।'

'অর্থ কি, আব ধর্ম-ই বা কি?'

সম্ভবকুমাব তখন মধুব স্বরে অর্থ ও ধর্মেব ব্যাখ্যা শুরু কবলেন। তাঁর কণ্ঠস্বব বাব যোজন অবধি ছডিযে পডল। বাবাণসীনগবেব সর্বত্র শোনা যেতে লাগল সেই সুমধুব স্বব। বাজা, উপবাজ ও মান্য জনেবা ছুটে এলেন সম্ভবকুমাবেব কাছে।

সম্ভবকুমাব বললেন—

১। যুধিষ্ঠিব বংশেব তোমাব বাজাকে বল, তিনি যেন ভাল কাজ কখনও ফেলে না বাখেন। আজ আব কাল-কে যেন সমান মনে না কবেন। বর্তমানকে অবহেলা কবে যেন ভবিষ্যতেব জন্য কাজ তুলে না বাখেন।

২। বাজা যখন জিজ্ঞেস কববেন তাঁকে বলবে, এই হচ্ছে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। মূর্খেব মত তিনি যেন অধর্ম ও কুকর্মেব পেছনে না ছোটেন।

৩। কুকর্মে ডুবে থেকে তিনি যেন নিজেব বিনাশ না ঘটান। শুধু যে নিজেই কুকর্ম থেকে দূবে থাকবেন তাই নয, কাউকে কখনও কুপথে চলাব পরামর্শ বা প্রবোচনাও দেবেন না। যেসব ব্যক্তি বা বস্তুতে অনর্থ ঘটতে পাবে, তাদেব সঙ্গে সম্পর্ক চুকিযে ফেলতে হবে।

৪। এভাবে সযত্নে ও সতর্কতার সঙ্গে নিজেব কাজ যিনি কবতে পারেন, সেই বাজাব বিকাশ ঘটে। শুক্লপক্ষে চাঁদেব আবির্ভাবেব মতই রাজার অভ্যুদযও অনিবার্য হযে থাকে।

৫। এমন কি তাঁর মৃত্যু ঘটলেও জ্ঞানীরা তাঁকে নিজেদেব প্রাণের মতই ভালবাসেন। বন্ধুবা তাঁব মহিমা কীর্তন কবতে থাকেন। দেহ ক্ষয হলে সে ব্যক্তিব স্বর্গলাভ ঘটে।

এই ব্যাখ্যা শুনে সমবেত জনসাধারণ, রাজা, উপরাজ ও সভাসদগণ 'সাধু! সাধু!' বলে উঠলেন। সবাই দুর্মূল্য অলঙ্কার ও বস্ত্র দান করলেন ঐ বালককে। এভাবে সকলে মিলে যা দান করলেন তার মোট পরিমাণ হল এক কোটি টাকা। তাছাড়া রাজা নিজেও সম্ভব-কুমারকে প্রচুর ধনরত্ন দিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে শুচিব্রত রাজা কৌরব্যকে সবিস্তারে অর্থ ও ধর্ম সম্বন্ধে সব কথা বললেন। তারপর থেকে রাজা ধর্মপথে অটল রইলেন। মৃত্যুর পরে তাঁর স্বর্গলাভ ঘটে।

ষড়দন্ত জাতক

১

হিমবন্ত প্রদেশে ষড়দন্ত নামে একটি হ্রদ ছিল। ঐ হ্রদের পাশেই বসবাস করত এক হস্তী যূথ। বোধিসত্ত্ব এই হাতির পালে জন্মেছিলেন। তাঁর পিতাই তখন ঐ হস্তীযূথের দলপতি। দলটি নেহাৎ ছোট নয়। একসঙ্গে আট হাজার হাতি থাকত।

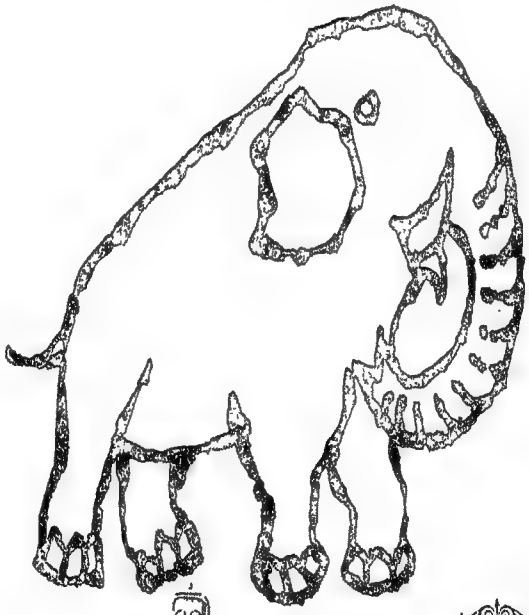

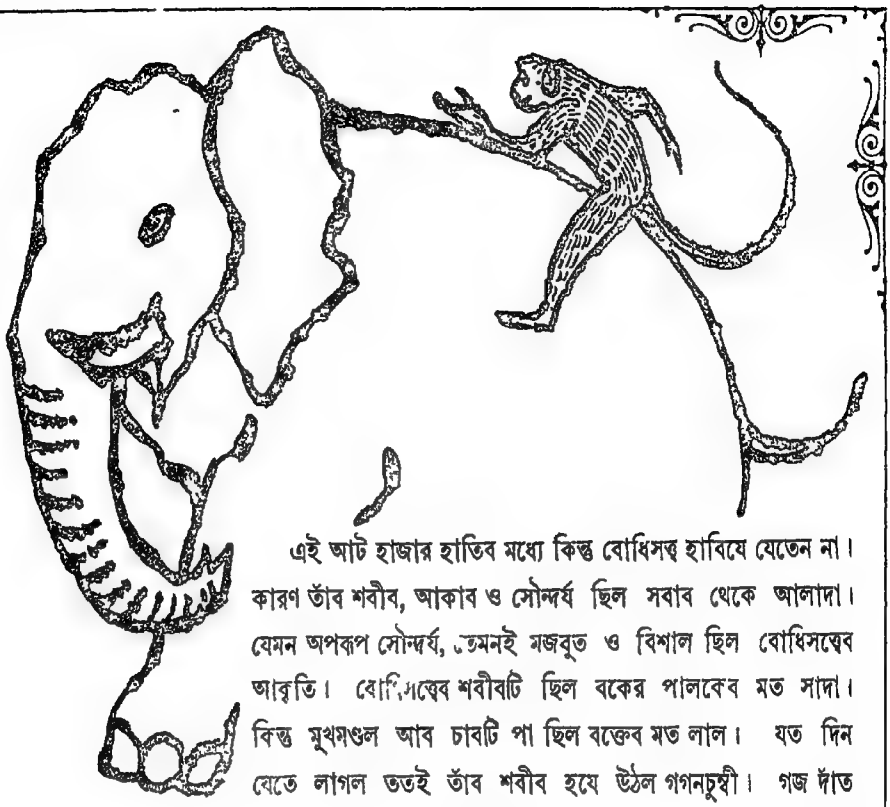

এই আট হাজার হাতির মধ্যে কিন্তু বোধিসত্ত্ব হারিয়ে যেতেন না। কারণ তাঁর শরীর, আকার ও সৌন্দর্য ছিল সবার থেকে আলাদা। যেমন অপরূপ সৌন্দর্য, তেমনই মজবুত ও বিশাল ছিল বোধিসত্ত্বের আকৃতি। বোধিসত্ত্বের শরীরটি ছিল বকের পালকের মত সাদা। কিন্তু মুখমণ্ডল আর চারটি পা ছিল রক্তের মত লাল। যত দিন যেতে লাগল ততই তাঁর শরীর হয়ে উঠল গগনচুম্বী। গজ দাঁত দুটির আকার ছিল এত বিশাল যে কল্পনা করা যায় না। ত্রিশ হাত লম্বা আর পনের হাত চওড়া। শুঁড়টি ছিল আটান্ন হাত লম্বা।

এ তো গেল আকারের দিক। এ ছাড়া তাঁর দাঁত থেকে সব সময় বহুবর্ণরঞ্জিত রশ্মি বিচ্ছুরিত হতো। বয়সকালে বোধিসত্ত্বই এই আট হাজার হাতির দলপতি হলেন। দলপতি হিসেবে বোধিসত্ত্বের যোগ্যতাও ছিল অসীম। সকলের সুখ শান্তির প্রতি তার দৃষ্টি সর্বদা সজাগ থাকত। বোধিসত্ত্বের দুই স্ত্রী। খুল্লসুভদ্রা আর মহাসুভদ্রা। বিশাল এই দল ও নিজের পত্নীদের সঙ্গে তিনি কাঞ্চন গুহায় বসবাস করতেন।

সে অরণ্যের কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। পাখি-পাখালি, হরিণ, খরগোশ সকলেই সেখানে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করে। আর এই অভয়ারণ্যের মাঝখানেই ছিল ষড়দন্ত হ্রদটি। হ্রদটিও অরণ্যের মতই বিশাল। তার জল টলটল করছে আয়নার মত। হিমবন্ত প্রদেশের প্রাণীরা সেখানে জল খেতে আসে। আর আশপাশে

বিশ্রাম করে।

হ্রদের মাঝখানটিতে আটচল্লিশ যোজন জায়গা ফাঁকা থাকত। সেখানে কোন লতাগুল্ম বা গাছগাছালি নেই। নেই কোন জলজ উদ্ভিদ। হ্রদটির মাঝখানে আছে শালুক বন। শালুক বনটি ঘিরে রেখেছে নীল পদ্মের একটি বন। নীল পদ্মকে আবার বলয়ের মত ঘিরে রেখেছে পদ্ম ও কুমুদে ঢাকা বন। যোজন যোজন ধরে চলেছে এই বন। এমন কি সেখানেও শেষ নয়। অগভীর জলে আবার ছিল রক্তকমল অরণ্য। একেবারে কিনার দিয়ে চলে গেছে বুনো ফুলের দীর্ঘ গাছের সারি। এইসব ফুলগাছের মধ্যে সুগন্ধি ফুলগাছ যেমন ছিল, তেমনি গন্ধহীন ফুলের গাছও ছিল অঢেল। ফুলের পর ছিল নানা ফলের গাছের একটি বলয়। কলা বন। আম-কাঁঠাল-তেঁতুল গাছ। এর বাইরে নানা গাছের মিশ্র জঙ্গল। বেণুবনও একটি ছিল। তবে তা ছিল বাইরে।

বেণুবন পেরোলেই পর্বতের এলাকা। পর্বতের পর পর্বত। এই সব পর্বতের নামও খুব বিচিত্র। ক্ষুদ্র কৃষ্ণ, মহাকৃষ্ণ, উদক, চণ্ডপার্শ্ব, সূর্য পার্শ্ব, সুবর্ণপার্শ্ব ইত্যাদি। আঠাশ ক্রোশ উঁচু ও সুদীর্ঘ সুবর্ণপার্শ্ব পর্বতটি ষড়দন্ত হ্রদকে প্রহরীর মত ঘিরে রেখেছিল। পর্বতটির একপাশের রঙ ছিল স্বর্ণাভ। সূর্যের আলো পড়লে সেদিকটা সুবর্ণময় মনে হতো।

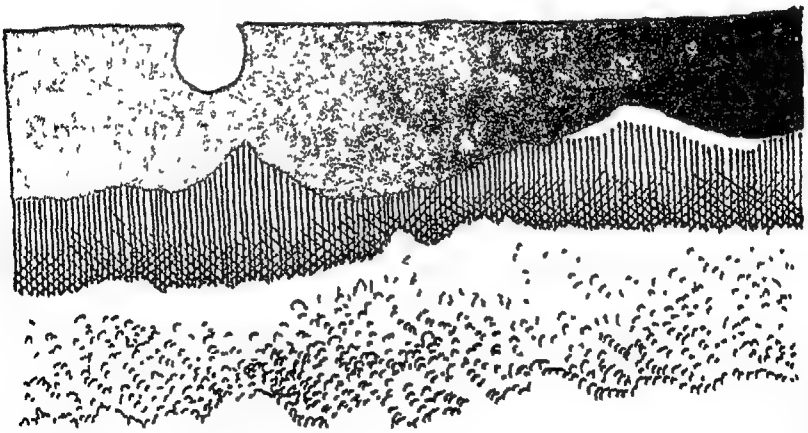

শত পাহাড় ঘেরা এই হ্রদের পূবে ছিল একটি প্রাচীন বট গাছ। বিশাল তার আকৃতি। অজস্র তার ঝুরি। গুঁড়ির আয়তনই ছিল আঠাশ ক্রোশ। আর এত ডালপালা যে, সবকিছু সমেত সে নিজেই ছোটখাট এক অরণ্য। কারণ তার ডালপালা ছিল আট হাজারেরও বেশি। হ্রদের একপাশে সে ছিল স্বতন্ত্র এক প্রহরী।

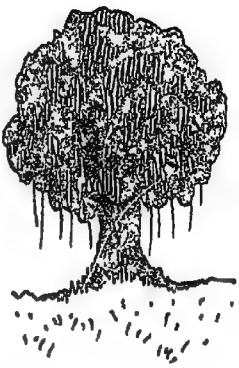

কাঞ্চন গুহার অবস্থান হ্রদের পশ্চিমে। এই বিশাল বটগাছের ঠিক উল্টো দিকে। এই অলৌকিক বনে ছিলেন এক নাগরাজ। তাঁর নাম ষড়দন্ত। আর হ্রদের নাম ঐ নাগরাজের নাম অনুসারেই হয়েছে। ষড়দন্ত নাগরাজের অধীনে ছিল আট হাজার বহুবর্ণরঞ্জিত ও নানাবিধ দৈর্ঘ্যের সর্পরাজি। নাগরাজ বর্ষাকালে বাস করতেন কাঞ্চনগুহায়। গ্রীষ্মকালে তিনি থাকতেন ঐ প্রাচীন বটের কোটরে। আট হাজার সাপ সমেত নাগরাজ গরমকালে গাছের কোটরে আশ্রয় নিতেন ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য। কারণ হ্রদের বুক থেকে তখন যে শীতল বাতাস উঠে আসত তাতে প্রাণ জুড়িয়ে যেত।

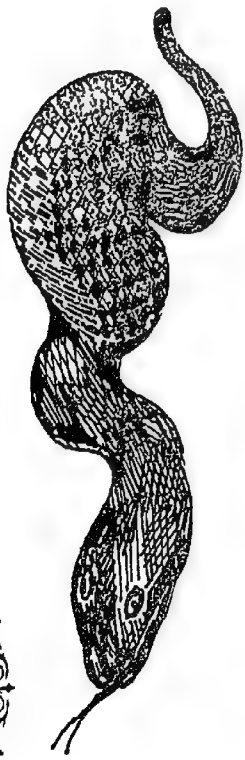

২

হাতিদের দলপতির কাছে একদিন খবর এল, বসন্ত এসেছে। হ্রদের তীরের ফুলগাছগুলো জেগে উঠেছে। সেই গন্ধে গোটা এলাকা ম-ম করছে। বসন্ত ঋতুতে হ্রদের এই এলাকায় ঘুরে বেড়াতে হাতিরা বেজায় পছন্দ করত। গজরাজ বোধিসত্ত্ব আর বিলম্ব না করে তাঁর যূথ নিয়ে চললেন হ্রদের দিকে। হ্রদের তীরে খেলতে খেলতে গজরাজ কাঁধ দিয়ে এক প্রাচীন শালগাছে ধাক্কা দিলেন। ঐ শালগাছটি ছিল অজস্র পিঁপড়ের আশ্রয়। ধাক্কা খাওয়া শালগাছটি থেকে অসংখ্য শুকনো পাতা আর পিঁপড়ের দল এসে বোধিসত্ত্বের পিঠে পড়ল।

তখন মহাসুভদ্রা বোধিসত্ত্বের বাঁ-পাশে থাকায় তার শরীরে পড়ল ফুলের রেণু। কিন্তু খুল্লসুভদ্রা ছিল তাঁর ডানপাশে। যেজন্য তার শরীরে কেবল শুকনো ডাল আর পাতা ঝরে পড়ল। এতে খুল্ল-সুভদ্রার বেজায় হিংসে হল। সে ভাবল, 'গজরাজ আমাকে ভালবাসেন না। ভালবাসেন শুধু সুভদ্রাকে। অথচ আমিও তাঁর পত্নী। না, এর প্রতিশোধ নিতেই হবে।' খুল্লসুভদ্রা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল,

'গজবাজকে শিক্ষা দিতে হবে, এমন বিপদে ফেলতে হবে, যাতে হাড়ে হাড়ে টের পান।'

এর কিছুদিন পরের ঘটনা। গজরাজ একদিন তাঁর দলবল নিয়ে জলে নেমেছেন। স্নান করছেন। শুঁড় দিয়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন। হাতির দল তাঁর সেবা করতে লাগল। ফুল-সাজে তাঁকে সাজিয়ে দিল। বাজার সমাদর করে চলল। এভাবে অনেকক্ষণ জলকেলির পর গজরাজ ডাঙায় উঠে এলেন। তখন অন্যান্য হাতিরা জলকেলি শুরু করল। কিছুক্ষণ পরে একটি হাতি বিশাল একটি পদ্মফুল পেল। সে শুঁড়ে করে সেই বিশাল ফুলটি এনে গজরাজকে উপহার দিল। গজরাজ সঙ্গে সঙ্গে ফুলটি সুভদ্রাকে দিয়ে দিলেন। কারণ সেটাই নিয়ম। সুভদ্রা তাঁর অগ্রজ মহিষী। কিন্তু খুল্লসুভদ্রার পুরনো রাগ এতে আরও বহুগুণ বেড়ে গেল। সে মনে মনে ভাবতে লাগল, 'ইস, কত বড় ফুল। গজরাজ কিনা এ ফুলটা সুভদ্রাকে দিয়ে দিলেন। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে তিনি সুভদ্রাকেই ভালবাসেন। ঠিক আছে, আমিও খুল্লসুভদ্রা, কি করে মহা সুভদ্রাকে জব্দ করতে হয় আমার

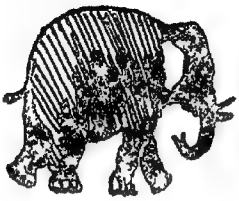

ভাল করেই জানা আছে।' গজরাজের ওপর খুল্লসুভদ্রার রাগ আরও বহুগুণ বেড়ে গেল।

একদিন গজরাজ পদ্মমধু মেশানো নানারকম ফলমূল হাতির দলের মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছিলেন। খুল্লসুভদ্রাও তার নিজের ভাগ পেল। নিজের ভাগটি হাতে নিয়ে সে ভাবল, 'আমি যদি কোন কামনা করে আমার ভাগের ফল সবাইকে দান করি তাহলে নিশ্চয়ই আমার সেই কামনা-ও পূর্ণ হবে।' এই ভেবে খুল্লসুভদ্রা তার ভাগের ফল অন্যান্য হাতিদের একটুকরো একটুকরো করে দান করল। তারপর মনে মনে প্রার্থনা করল: 'আগামী জন্মে আমি যেন মদ্ররাজ বংশে জন্মাই। বারাণসীরাজের প্রধানা মহিষী হতে পারি। তাহলে রাজাকে বলে আমি হিমবন্ত প্রদেশে ব্যাধ পাঠাব। সে গজরাজকে ধরে নিয়ে আসবে। তখন আমি গজরাজকে হত্যা করাব। তাঁর দাঁতদুটো উপড়ে নেব।'

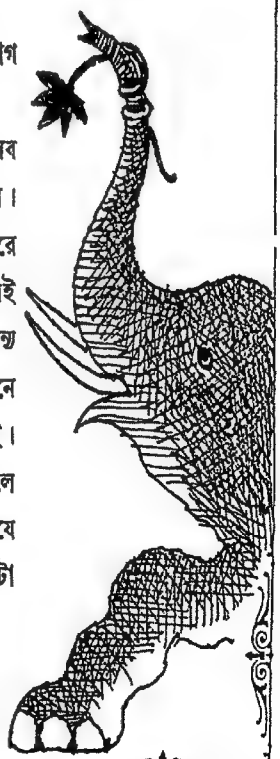

খুল্লসুভদ্রা তারপর থেকে প্রতিদিনই এই অনাহার এবং দানব্রত চালিয়ে যেতে লাগল। দিনে দিনে তার শরীর শুকিয়ে এল। চলচ্ছক্তিও রইল না। একদিন তার শীর্ণ শরীর আর প্রাণ ধরে রাখতে পারল না। খুল্লসুভদ্রার মৃত্যু হল।

৩

মৃত্যুকালীন কামনা অনুসারে খুল্লসুভদ্রা মদ্ররাজ বংশে জন্মাল। তার নাম হল সুভদ্রা। প্রতিদিন চাঁদের কলার মতই সুভদ্রা বেড়ে উঠতে লাগল। তার রূপ লাবণ্যের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়তে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। সুভদ্রা বড় হতে মদ্ররাজ মেয়ের জন্য যথাযোগ্য পাত্রের খোঁজ শুরু করলেন। এদেশ সেদেশ ঘুরেও মনোমত পাত্র পাওয়া গেল না। তারপর পাত্র হিসেবে বারাণসীরাজার কথা তাঁর মনে এল। বারাণসীরাজও সুভদ্রার রূপলাবণ্যের খ্যাতি শুনেছিলেন। ফলে তাঁর দিক থেকেও এই বিবাহে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গেল। মদ্ররাজও মনের মত পাত্র পেয়ে বেজায় খুশি হলেন।

রাজকীয় জাঁকজমকের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে হয়ে গেল। সুভদ্রা যে কেবল রূপলাবণ্যে অসামান্যা তাই নয়, বারাণসীরাজ তার গুণেরও অনেক প্রমাণ পেলেন। বারাণসীরাজের ছিল ষোল হাজার মহিষী। কিন্তু সুভদ্রা অনুভব করলেন, রাজা এই ষোল হাজার মহিষীর মধ্যে তাঁকেই সব থেকে বেশি ভালবাসছেন। এতে সুভদ্রার খুশির সীমা রইল না। এমন এক খুশির দিনেই পূর্বজন্মের সমস্ত কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা। অনাহার ব্রতের কথা।

সুভদ্রা একদিন ভাবল, 'এজন্মের মত আমার সুখ-সম্পদের আশা মিটেছে। এখন পূর্বজন্মের প্রতিজ্ঞা পূরণই আমার একমাত্র কাজ। এবার রাজার কাছে গজরাজের কথা বলতে হবে। যে করে হোক, তাকে ধরে আনতে হবে।' এই ভেবে সে সারা শরীরে তেল মেখে, মলিন ও ছেঁড়া কাপড় পরে শুয়ে পড়ল। দরজায় খিল পড়ল। এ সবই রাণীর শোক-দুঃখের লক্ষণ। যথাসময়ে রাজার কানে কথাটা গেল। হন্তদন্ত হয়ে তিনি ছুটে চলেন। দরজায় টোকা দিলেন। সুভদ্রা বিষণ্ণ মুখে দরজা খুলে দিল।

কি হয়েছে তোমার ?

তেমন কিছু নয়।

আমাব কাছে গোপন কোবো না।

আমি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি।

কিসেব স্বপ্ন ?

দেখুন মহাবাজ, আপনার কাজ নেই সে স্বপ্নেব কথা শুনে···

ও কথা বোলো না।

এভাবে বাজার কৌতূহল ক্রমাগত বাড়িয়ে চলল সে। শেষে বাজাকে এই কথা বলিয়ে নিতে পাবল, 'তোমাব কোন বাসনাই আমি অপূর্ণ বাখব না।' এবাব সুভদ্রা সুনিশ্চিত হল, গজবাজেব ওপর প্রতিশোধ নিতে পাববে।

সুভদ্রা বলল—'মহাবাজ আমাব স্বপ্নেব কথা আপনাকে বলব। তবে তাব আগে আপনি বাজ্যের সব ব্যাধকে ডেকে পাঠান। তাবা এলে, তাদেব সামনেই আমি সব কথা খুলে বলব।'

বাবাণসীবাজ সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জাবি কবলেন। দেখতে দেখতে দলে দলে ব্যাধ আসতে লাগল। কাশীবাজ্যেব তিনশ যোজনেব মধ্যে যত ব্যাধ ছিল সবাই হাজিব হল। তাবা কেউ খালি হাতে আসে নি। সঙ্গে এনেছে রাজাব জন্য নানাবকম উপহাব। সব মিলে তাদেব সংখ্যা দাঁড়াল ছ হাজাব। বাজা সুভদ্রাকে ডেকে বললেন :

'বাণী, ব্যাধরা সবাই এসেছে। এদের সম্পর্কে তোমাকে বলি, আমার আজ্ঞা পূরণ কবতে এরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। অবণ্য এদের নখদর্পণে। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই এবা অরণ্যের দুর্গম অঞ্চলে কাটিয়েছে। অরণ্যেব কোথায কি আছে সবই ওবা নিখুঁত জানে। তুমি তোমার বাসনাব কথা অনায়াসে এদের বলতে পাব।'

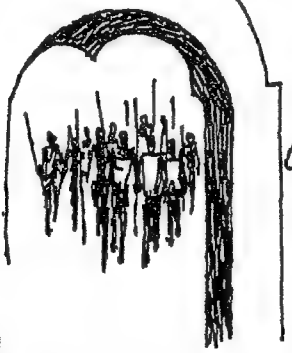

সুভদ্রা ব্যাধদের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'ওহে ব্যাধের দল, আমি ছ-দাঁতওয়ালা একটি হাতি স্বপ্নে দেখেছি। স্বপ্নে তার দাঁত দেখা অবধি আমার মন আকুল হয়ে আছে দাঁতগুলোর জন্য। ঐ দাঁত না পেলে আমার জীবনই বৃথা। তোমরা আমাকে ঐ দাঁত এনে দাও। নইলে আমি দুঃখে মরে যাব।'

ব্যাধের দল ছ-দাঁতওয়ালা হাতির কথা কস্মিন কালে শোনেনি। তারা অবাক। হাতির ছ'টা দাঁত, এ কখনো হয়? ভিড়ের মধ্য থেকে এক ব্যাধ জিজ্ঞেস করল, 'হাতিটা কোথায় থাকে তা না জানলে কি করে তাকে ধরব। এরকম হাতির কথা তো আমরা কখনও শুনিনি।' অন্যেরাও এ রকম নানা সংশয়ের কথা বলতে লাগল। শুধু একজন নির্বিকারভাবে সব শুনে যেতে লাগল।

সুভদ্রা ভিড়ের মধ্যে একজন যোগ্য ব্যাধ খুঁজতে লাগল। তার চোখ ভিড়ের ওপর দিয়ে সরে যেতে লাগল। এমন সময় সবচেয়ে লম্বা সুবিশাল শরীরের কুৎসিত দর্শন এক ব্যাধকে তার মনে ধরল। সে যেমন লম্বা, তার শরীরটিও সেরকম বিশাল। যেন একটি ছোটখাট পর্বত। বিশাল থামের মত দুটি পা। বিস্তীর্ণ পাহাড়ের গায়ের মত তার বুক। কুৎসিত মুখটি গোঁফদাড়িতে ঢাকা। হলদে বীভৎস দাঁত। এর নাম শোনোত্তর। শোনোত্তর এর আগের জন্মে ছিল বোধিসত্ত্বের শত্রু।

সুভদ্রা শোনোত্তরকে দেখে খুবই খুশি হল। তার মনে হল, পারলে এই লোকটাই পারবে। সুভদ্রা মহারাজকে বলল, 'প্রভু, আমার মনে হচ্ছে এই শোনোত্তরই পারবে। আপনি অনুমতি দিলে আমি ওর সঙ্গে একটু গোপনে কথা বলি।' রাজা বললেন, 'নিশ্চয়ই।' সুভদ্রা তখন শোনোত্তরকে সঙ্গে নিয়ে রাজপ্রাসাদের ছাতে উঠল।

প্রাসাদের ছাত থেকে উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা আর তার চূড়াগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। তখন মাঝ দুপুর। সূর্যের আলোয় পাহাড়ের চূড়াগুলো ঝলমল করছে। শোনোত্তরকে দেখিয়ে সুভদ্রা বলল, 'ঐ যে পাহাড়ের চূড়া দেখছ, তোমাকে যেতে হবে এই পথ দিয়ে

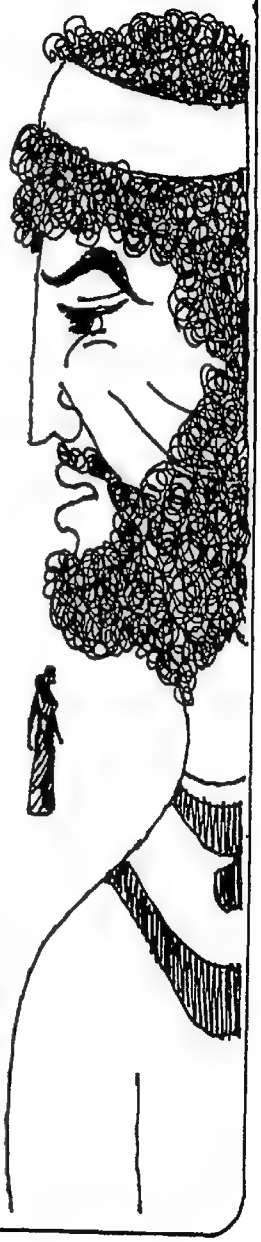

সোজা উত্তরে। পথে সাত পাহাড় পড়বে। ওদের মধ্যে এক পাহাড়ের চূড়ো দেখে মনে হবে সোনায় মোড়া। সেখানে দেবতারা থাকেন। তুমি ঐ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে নিচের দিকে তাকাবে। তখন তোমার চোখে পড়বে এক অকল্পনীয় বিশাল বটগাছ। আট হাজার ডালপালা সমেত ঐ গাছটির দিকে তাকালে মনে হবে যেন সেখানে নরকের রাস্তা বাসা বেঁধেছে। তুমি সোজা চলে যাবে ঐ গাছের কাছে। এবার ভাল করে শোন, ঐ গাছের কাছেই তুমি দেখতে পাবে ছ-টি দাঁতওয়ালা বিশাল এক শ্বেতহস্তীকে। এই হাতিটি আট হাজার হাতির রাজা। আট হাজার হাতি এর সেবায় নিযুক্ত। ওদের অবহেলা কোরো না। ঐ হাতিগুলো সাংঘাতিক। তারা নিঃশ্বাস ফেললেই শয়ে-শয়ে মানুষ মারা পড়বে। তাছাড়া বাতাস শুঁকেই তারা বিপদের আঁচ পেয়ে যায়। আর একবার বিপদের গন্ধ পেলেই তারা ভয়াবহ হয়ে ওঠে।'

'রাণীমা!'

'কি, ভয় করছে?'

'আপনার তো ধনরত্নের অভাব নেই।'

'তবুও ঐ গজদাঁত আমার চাই।'

'বেশ।'

'তুমিই পারবে, ভয়কে জয় কর।'

সুভদ্রা ব্যাধকে ধনরত্নের খুব লোভ দেখাল। গরিব ব্যাধ সেই লোভ এড়াতে পারল না। তাছাড়া সে অস্বীকার করলে তাকে কয়েদ করা হতো। সুতরাং রাজি হতেই হল। সুভদ্রা তাকে বলল, 'তুমি সাতদিন পরে এস, এর মধ্যে তোমার অভিযানের জন্য যা যা দরকার সব কিছুই আমি তৈরি করে রাখব। এস, এখন তোমাকে জায়গাটা আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিই।'

৪

ব্যাধ চলে যাওযাব পব সুভদ্রা কামাব আব চামাবদেব ডেকে পাঠাল। কামাবদেব আদেশ দিল নানাবকম কোদাল গাঁইতি বানানোর জন্য। চামাবদেব বলা হল, বিশাল এক চামডার থলে বানাতে। থলেটা এমন হবে যাতে খুব ভারি জিনিসও তাতে অনাযাসে বযে নিযে যাওযা যায। বাঁশেব ঝোপ কেটেফেলার প্রচুব যন্ত্র, শাবল, কাস্তে, কোদাল তৈবি কবানো হল। চামডাব থলেও তৈবি হল।

সাত দিন পরে শোনোত্তব এল। সে যাওযাব জন্য একেবারে তৈবি হযে এসেছে। সুভদ্রা তাকে প্রচুব অস্ত্রশস্ত্র আব খাবার দাবাব দিল। সেসব ঐ চামডাব থলেতে পুবে ব্যাধ থলেটা হাতে তুলে নিল। সুভদ্রাকে প্রণাম করে শোনোত্তর রওনা হল।

গ্রামেব পর গ্রাম, শহরেব পব শহব, অবণ্যের পব অরণ্য উজিযে শোনোত্তর হিমবন্ত প্রদেশে এল। রথ সেখান থেকে ফিবে গেল। কেননা এব পব পথেব শেষ। তাকে এখন শুধুই অবণ্যের মধ্য দিযে যেতে হবে। মাইলেব পর মাইল উজিযে ঐ গভীব অন্ধকাব বন পেবিযে সে চলতে লাগল। বনেব কাঁটায তাব পা ক্ষত বিক্ষত, এদিকে পথের শেষ নেই। পা আব চলে না। নিশ্ছিদ্র সেই বন। সাপ পর্যন্ত সেই ঠাসা জঙ্গল ভেদ কবে যেতে পাববে না। শোনোত্তব তখন বাঁশঝোপেব ডাল ধবে, গাছেব ঝুরি ধবে দোল খেতে খেতে শূন্য পথে এগিযে চলল। সামনে এবার এক জঙ্গলাকীর্ণ জলাশয।

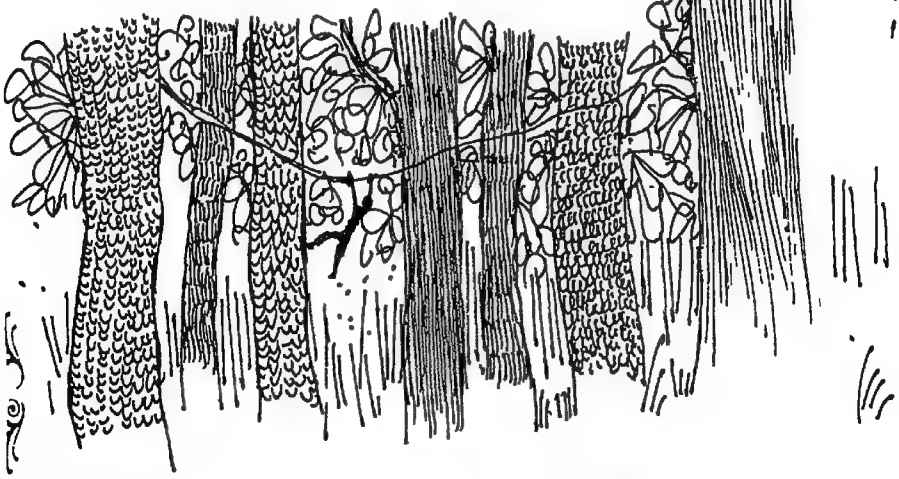

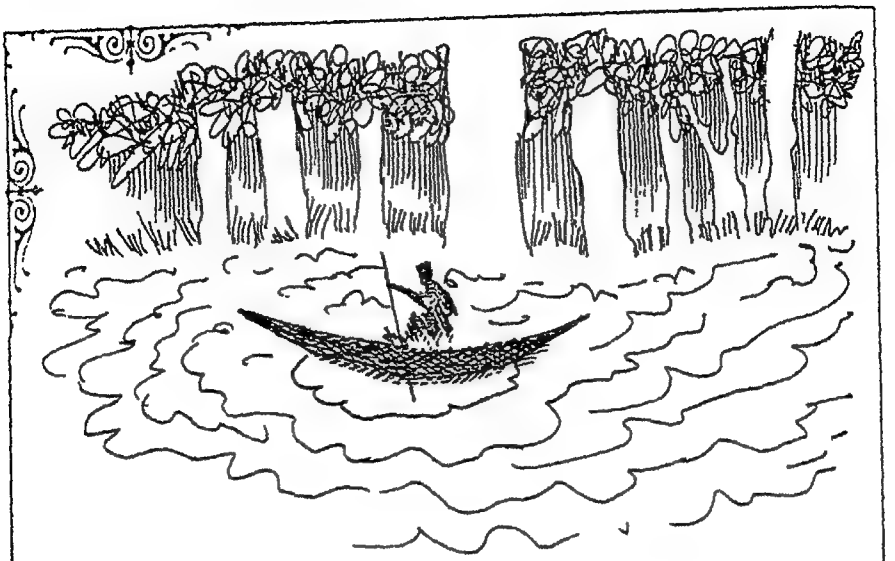

এবাব উপায়? শোনোত্তব শুধু বলশালী নয়, যথেষ্ট চতুরও। তৎক্ষণাৎ বাঁশ কেটে একটি ডোঙা বানাল। সেই ডোঙা বেযে ঐ জলাশয় পেরিয়ে গেল। এভাবে একদিন পাহাড়টিব কোলে এসে পৌঁছল। সুভদ্রা তাকে ত্রিশূলের মত কিছু অস্ত্র দিয়েছিল। আগে সে জানত না এগুলো কোন কাজে লাগবে, গাঁইতিগুলো দিযেই বা কি হবে। এবাব থলে হাতড়ে সেসব বেব কবতে গিয়ে বুঝল, এ সবেব সাহায্যেই পাহাড়ে উঠতে হবে। ত্রিশূলে চামড়াব দড়ি বেঁধে সে পাহাড়ের খাঁজে ছুঁড়ে মারল। তাবপব দড়ি ধরে ধবে পাহাড়েব মাথায উঠে এল এক সময়। পাহাড়ে ওঠার পর সে থলে থেকে চামড়াব ছাতা বেব কবল। সেই ছাতাব সাহায্যে শূন্যে ভেসে ভেসে সে পাহাড় থেকে নিচে নেমে এল। একে একে সাতটি পাহাড় এভাবে পেবিযে গেল।

এবার সেই বিশাল জলাশয। জলাশয়েব এক পাশে বিশাল বট গাছটি-ও দেখা গেল। ব্যাধ বুঝল ছ-দাঁতওয়ালা শাদা হাতি এই গাছেব কাছেই থাকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করাব পর সে নিজেব চোখেই তাকে দেখতে গেল। সত্যি আট হাজার হাতিব পাল ঘিবে আছে ঐ মহা বলশালী গজবাজকে। নিজেব গায়েব জোর আর শক্তি-ও কম নয। তবু সে ভয় পেল। হাতিদেব বিশাল-বিশাল চেহারা, বিরাট দাঁত শোনোত্তবকে বেজায় ঘাবড়ে দিযেছে।

শোনোত্তরের ফেরার পথ নেই। গজরাজের দাঁত তাকে নিতেই হবে। নাহলে রাজরোষে পড়তে হবে। তাছাড়া কাজ সাঙ্গ হলে শোনোত্তরের দারিদ্র্যও ঘুচে যাবে। সে অপেক্ষা করতে লাগল। নজর রাখতে লাগল গজরাজের যাতায়াতের রাস্তার দিকে। গজরাজের যাতায়াতের পথটি যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি দুর্গম। শোনোত্তর সুযোগের অপেক্ষায় আছে। এভাবে সাত বছর, সাত মাস, সাত দিন কেটে গেল।

ইতিমধ্যে শোনোত্তর একটা মতলব ঠিক করে ফেলেছে। একটি বিশাল গর্ত খুঁড়ল সে। ঠিক করল নিজে ঐ গর্তে লুকিয়ে থাকবে। তারপর গোপন জায়গা থেকে তীর ছুঁড়ে গজরাজকে হত্যা করতে হবে।

একদিন গজরাজ চলেছেন হ্রদের দিকে। শোনোত্তরের তীর এসে তাঁর শরীরে বিদ্ধ হল। এই অভ্যর্থনায় আহত হয়ে গজরাজ ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করলেন। তাতে সাত পাহাড় টলে উঠল। গজরাজ তখন উন্মাদের মত শত্রুর খোঁজে ছুটছেন। হঠাৎ-ই তাঁর নজর গেল গর্তের দিকে। সেখানে গৈরিক বসন পরা সন্ন্যাসীর বেশে ব্যাধকে দেখতে পেলেন।

তুমি মহাপাতক।
কেন সন্ন্যাসীর পোশাক পড়েছ?
আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি?
কেন আমাকে মারলে?
বল পাপী।

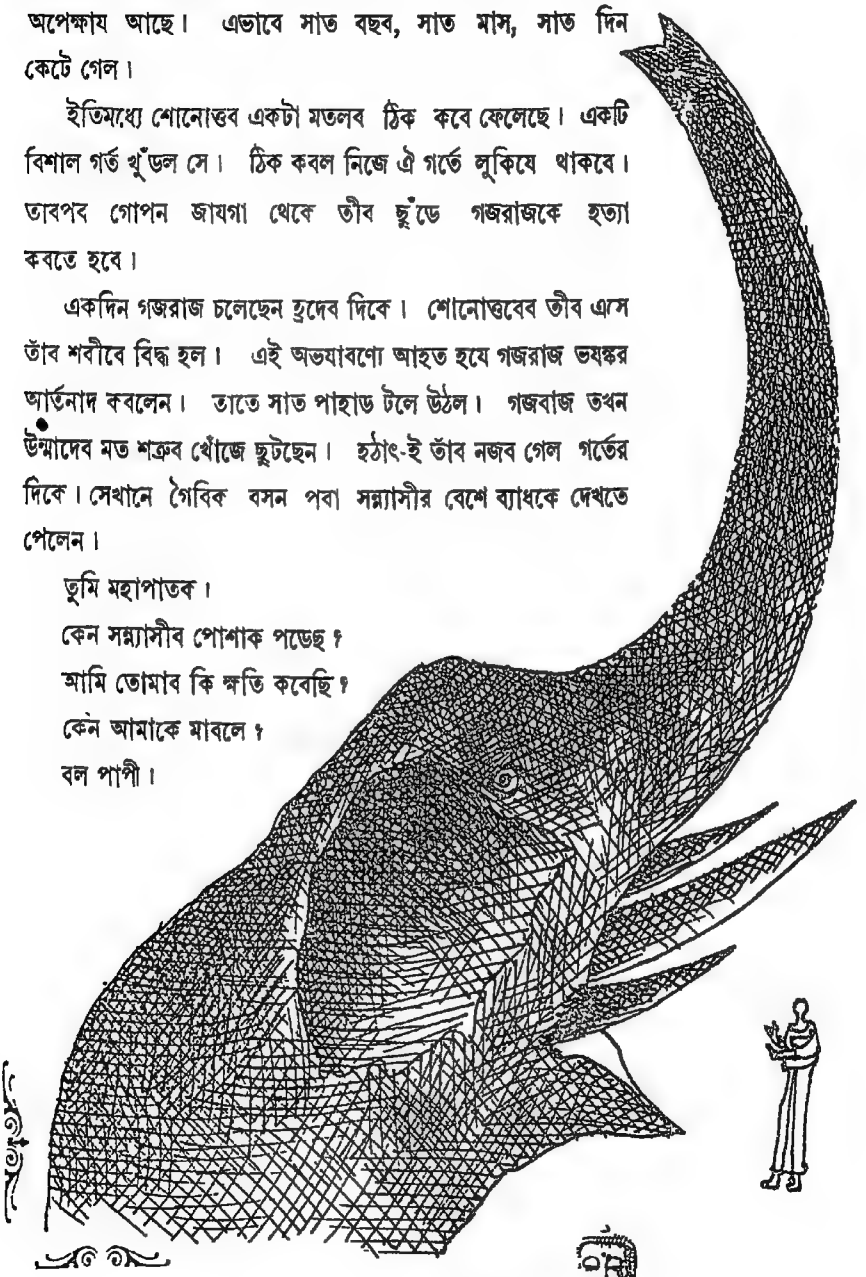

ব্যাধ তখন ঐ বিশালাকার গজরাজকে বিনীতভাবে জানাল—'আমার অপরাধ নেবেন না। কাশীরাজের প্রধানা মহিষী আপনার দাঁত আনতে আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনিই আমাকে আপনার গোপন বাসের সন্ধান দিয়েছেন।'

বোধিসত্ত্ব মুহূর্তের মধ্যে অনুভব করতে পারলেন কে তখন কাশীরাজের প্রধানা মহিষী। আর কেনই বা সে এসব করেছে। ব্যাধকে বললেন, 'দেখ, যদি তোমার শুধু দাঁতের দরকার হতো তাহলে আমাকে বলতে পারতে। আমার বাবা-ঠাকুর্দার দাঁত কোথায় আছে আমি জানি। সেসবই আমি তোমাকে দিতে পারতাম। তুমি অনর্থক আমাকে হত্যা করলে। যা হবার তা হয়েছে। এখন তুমি

আমার দাঁত কেটে নিতে পার। রাণীকে গিয়ে বোলো গজরাজ মারা গেছে, এই তাঁর দাঁত।'

গজরাজের অনুমতি পেয়ে ব্যাধ তাঁর দাঁত কাটতে চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ করাত চালিয়েও সে একটুও কাটতে পারল না। তখন গজরাজ বললেন, 'করাতটা আমার শুঁড়ের কাছে নিয়ে এসো। এরপর সেই শীলবান গজরাজ নিজেই নিজের দাঁত কেটে ফেললেন। ব্যাধ দাঁত নিয়ে চলল। হাতির পাল এসে ঘিরে দাঁড়াল তাদের প্রভুকে। তাঁকে নিয়ে চলল পূর্বপুরুষদের সমাধিক্ষেত্রের দিকে।

ওদিকে জন্ম-জন্মান্তর পর্যন্ত পুষে রাখা রাগ ও হিংসা সত্ত্বেও সুভদ্রা যখন গজরাজের দাঁত পেলেন সঙ্গে সঙ্গে দুঃখে-শোকে তার ও অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল। দাঁত দেখে পূর্ব জন্মের স্বামীর দাঁত বলে চিনতে তার ভুল হয় নি। সে ভেবেছিল, গজরাজকে একটু বিপদে ফেলবে। সুভদ্রা স্বপ্নেও ভাবেনি এই ব্যাধ মহান গজরাজকে সত্যি হত্যা করতে পারবে। শোকে-দুঃখে সুভদ্রার জীবনও অকালে শুকিয়ে গেল।

গণ্ডাতিন্দু জাতক

সে অনেককাল আগের কথা। ভারতবর্ষে তখন কাম্পিলা নামে এক রাজ্য ছিল। কাম্পিল্য রাজ্যের উত্তর পঞ্চাল নগরে পঞ্চাল নামে এক রাজা ছিলেন। অত্যাচারী রাজা হিসেবে তাঁর তুলনা মেলা ভার। নিষ্ঠুর পঞ্চালের অত্যাচারে প্রজাদের জীবন ওষ্ঠাগত। যেমন রাজা, ঠিক তেমনি তার মন্ত্রীকুল। পাহাড়ের মত খাজনার বোঝা। নির্দয় রাজার হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রজারা দেশ ছাড়ল। তারা বনে বনে ঘুরে বেড়াত।

প্রজারা নগর ছেড়ে চলে গেলে তাদের বাস্তু জমিতে আগাছা জন্মাল। ঝোপে-জঙ্গলে-বনে উত্তর পঞ্চালের গ্রামগুলি হয়ে উঠল জনশূন্য এক অরণ্য। বেচারা প্রজারা ঘরে ফেরার চেষ্টা করলে রাজার পেয়াদারা তাদের ওপর এমন অত্যাচার করত যে তারা বাধ্য হতো আবার পালিয়ে যেতে। অনাহারে, অত্যাচারে রোজই মানুষ মারা যেত। দিনের বেলায় পর্যন্ত গ্রামগুলোয় শিয়াল ডাকতে শুরু করল।

বাস্তু ভিটের টান বড় সাংঘাতিক। এত কষ্ট ও অত্যাচার সত্ত্বেও রাতের দিকে প্রজারা নিঃসাড়ে গ্রামে ফিরে আসত। দিনের আলো ফোটার আগেই আবার তারা উধাও হয়ে যেত। এর মধ্যে কেউ

কেউ দস্যুদেব হাতে পড়ত। তাদেব সর্বস্ব লুট করে নিত দস্যুর দল। অসহায় প্রজারা দস্যুদেব কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইত। দস্যুদেব রক্ত-লিপ্সা ছিল সাংঘাতিক। অসহায় প্রজাবা দলে দলে তাদের হাতে প্রাণ দিত। দস্যুদের হাত থেকে কোন ক্রমে যারা বেঁচে যেত, তাদেব আবার প্রাণ দিতে হত রাজার পেযাদাদের হাতে।

যে সময়েব কথা বলা হচ্ছে, বোধিসত্ত্ব তখন বৃক্ষদেবতা হিসেবে জন্ম নিয়েছেন। একটি সুবিশাল গাব গাছে ছিল তাঁব অধিষ্ঠান। অত্যাচারী বাজা সামান্য ধর্ম-ভীরু ছিলেন। বৃক্ষ দেবতারূপী বোধি-সত্ত্বকে তিনি প্রতি বছব পুজো করতেন। পুজোর জন্য বছরে এক হাজার টাকা ববাদ্দ ছিল। বোধিসত্ত্ব বৃক্ষ দেবতা হিসাবে সেই পুজো গ্রহণ কবতেন। কিন্তু রাজাব সমস্ত অপরাধকে তিনি ক্ষমা করে দিতেন তা নয। রাজাব অত্যাচারের বহব তাঁব জানা ছিল। সবই দেখতেন। সবই বুঝতেন। বোধিসত্ত্ব একদিন মনে মনে ভাবলেন, 'বাজা ধর্মভীরু হযেও অত্যাচাবী। তাব বুদ্ধিব দোষ ও নৃশংসতায গোটা বাজ্য ডুবতে বসেছে। কিছু একটা কবা দরকার। এমন কিছু কি কবা যায না, যাতে রাজার মনটা ভাল দিকে টেনে আনা যায?'

বাজা যেহেতু বোধিসত্ত্বের উপাসক, সুতরাং তাঁর তো একটা দায়িত্বও আছে। এই ভেবে একদিন তিনি সশরীরে রাজাকে দেখা দিলেন। গভীর রাতে তিনি রাজার শিয়রে উপস্থিত হলেন। রাজা দেখলেন এক দীর্ঘদেহী পুরুষ তাঁব মাথাব সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর শরীর অনন্ত সূর্যকিরণে ঝলমল করছে। রাজা প্রথমে ভয়ে শিউরে উঠলেন, 'কে এই দীর্ঘদেহী পুরুষ? ইনি কি দেবতা? না কি যমদূত?' মনে জোর এনে বাজা নিজেব ঘোব কাটালেন। কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হে রাজপুরুষ,আপনি কে? দেব? দানব? না কি যক্ষ? দযা করে নিজের পরিচয দিন। আব কেনই বা এমন অসময়ে আপনি আমাকে দেখা দিলেন?'

বোধিসত্ত্ব শান্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, 'শোন হে রাজা। আমার নাম তিন্দুক। আমি সেই গাছের দেবতা, যে গাছটিকে তুমি প্রতি বছর পুজো করে থাক। তুমি আমার উপাসক। সেজন্য তোমার মঙ্গল দেখা আমার কর্তব্য। আমি আজ এসেছি তোমাকে কিছু সদুপদেশ দিতে।'

রাজা বৃক্ষ দেবতাকে মান্য করতেন। হয়ত নিজের অধর্ম আচরণের ব্যাপারটাও কিছুটা টের পেতেন। ফলে মনে মনে শঙ্কিত হলেন। বৃক্ষ দেবতাকে প্রণাম করে বললেন :

'বলুন প্রভু, আমি আপনার উপদেশ শুনতে আগ্রহী।'

'রাজা,তোমার প্রজাকুল কি শান্তিতে আছে?'

রাজা নিরুত্তর।

বৃক্ষ দেবতা আবার বললেন,'তুমি জান তারা শান্তিতে নেই।'

'হ্যাঁ,জানি প্রভু।

'তোমার অত্যাচারেই তাদের জীবন আজ বিপন্ন।'

'হয়ত আপনি ঠিকই বলছেন।'

'এতে তোমারই রাজ্য নষ্ট হবে।'

'এখন আমার কি কর্তব্য তাই বলুন।'

'যে অন্যায় তুমি করেছ তাতে পরলোকেও শান্তি পাবো না।'

'দয়া করে বলুন আমার কি করা উচিত।'

বৃক্ষদেবতারূপী বোধিসত্ত্ব তখন রাজাকে একে একে সৎ পরামর্শ দিতে লাগলেন, 'দেখ রাজা, কর্ম অনুসারে ফল লাভ ঘটে। ইহলোকে তুমি যদি মঙ্গল কাজে রত থাক পরকালে তাহলে অমৃত-ফল লাভ করবে। স্বর্গে তোমার জন্য সংরক্ষিত থাকবে আসন। কিন্তু যদি তা না কর তাহলে মৃত্যু তোমাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করবে। ভেবেচিন্তে কাজ করলে যমপুরীকে তোমার ভয় না করলেও চলবে। কিন্তু যদি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মত্ত হাতির মত চল তোমার পতন অনিবার্য। যাই হোক, আমার মনে হয় তুমি নিজের কাজের ফল সম্পর্কে আদৌ সজাগ নও। তুমি অনুভবই করতে পার না যে প্রজাদের কি সর্বনাশ তুমি করেছ। তারা তোমাকে কি চোখে দেখে, কত নিন্দা করে, কিছুই জান না। তাই আমার প্রথম পরামর্শ হল, তুমি ছদ্মবেশ ধারণ কর। ছদ্মবেশে নিজের রাজ্যে ঘুরে বেড়াও। স্বচক্ষে দেখ কি নরক তুমি রচনা করেছ। তারপর অন্য কথা।' এইমাত্র পরামর্শ দিয়ে বোধিসত্ত্ব অদৃশ্য হলেন।

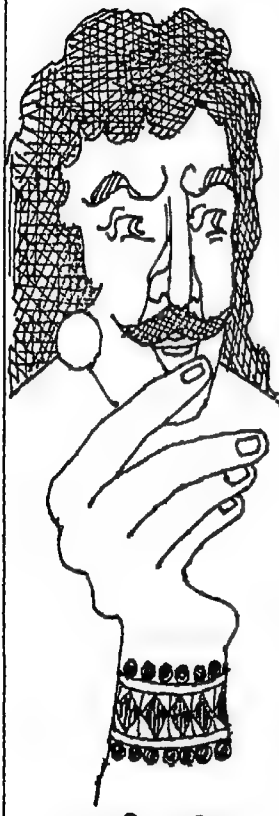

পরের দিন সকালে রাজার প্রথম চিন্তাই হল নিজের অপকর্ম। এতদিন যেন এক দুঃস্বপ্নের ঘোরের মধ্যে দিয়ে চলেছিলেন। গতকাল রাতে বৃক্ষদেবতা স্বয়ং তাঁর সেই ঘোর ভেঙ্গে দিয়েছেন। রাজা স্থির করলেন বৃক্ষদেবতার পরামর্শ অনুসারে তিনি ছদ্মবেশে রাজ্য ভ্রমণে বেরোবেন। পুরোহিতকে ডেকে ভ্রমণের বন্দোবস্ত করা হল। ঠিক হল দুজনে ছদ্মবেশে একসঙ্গে রওনা দেবেন। রাজ্যের ভার মন্ত্রীকে দিয়ে রাজা পরের দিন সকালে পুরোহিতের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

প্রথম দৃশ্য

রাজা কিছুদূর গিয়েছেন, এমন সময় কে যেন যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। রাজা পুরোহিতকে বললেন, 'চলুন, ওদিকে যাই, কি ব্যাপার দেখে আসি।' একটু এগোতেই এক বৃদ্ধ গ্রামবাসীর দেখা পেলেন। তাঁর পা দিয়ে রক্ত পড়ছে। সঙ্গে তাঁর পরিবার। সকলেই কাঁদছে। রোজ ভোরে বাড়িটিতে তালাচাবি দিয়ে তারা বনে চলে যেত। সেপাই আর দস্যুদের হাত থেকে নিজেদের সামান্য হাঁড়িকুড়ি বাঁচাবার জন্য চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রেখেছিল। বৃদ্ধের পায়ে সেই

কাঁটাই ফুঁটে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে বৃদ্ধ অভিশাপ দিচ্ছিলেন, 'আজ আমি যে রকম কাঁটার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি, এদেশের রাজা পঞ্চালও যেন এইরকম কষ্টে ছটফট করে।' শুনে রাজা শিউরে উঠলেন। আসলে কথাটা বৃদ্ধ বলেন নি। বোধিসত্ত্ব তখন ঐ বৃদ্ধের দেহে প্রবেশ করে কথাটা বলান।

রাজা আর পুরোহিত বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে গেলেন। পুরোহিত বৃদ্ধকে বললেন, 'দেখো বাপু, তোমার তো আচ্ছা আক্কেল। কাঁটা বিঁধল নিজের দোষে, খামোকা রাজাকে শাপ দিচ্ছ কেন।'

'দেখ বাপু, রাস্তায় ধাক্কা খেলেও রাজার দোষ দেব।'

'কেন?'

'রাজার সেপাইদের ভয়ে পালাতে গিয়েই আজ আমার এই দশা হয়েছে।'

এরপর বৃদ্ধ রাজার নামে অনেক আ-কথা-কুকথা বললেন। তবে কথাগুলো মিথ্যে নয়। বৃদ্ধের মধ্য থেকে বোধিসত্ত্ব বলে উঠলেন, 'আজ যদি রাজা পাষণ্ড না হতো তাহলে তার সেপাইদের সাধ্য হতো না আমাদের অনিষ্ট করার।'

শুনে রাজার হুঁশ ফিরে এল। পুরোহিতকে বললেন, 'চলুন, ঘরে ফেরা যাক। এখন সবই বুঝতে পারছি।' কিন্তু পুরোহিতের মধ্য থেকে তখন বোধিসত্ত্ব বলে উঠলেন, 'মহারাজ, আরেকটু দেখা যাক।'

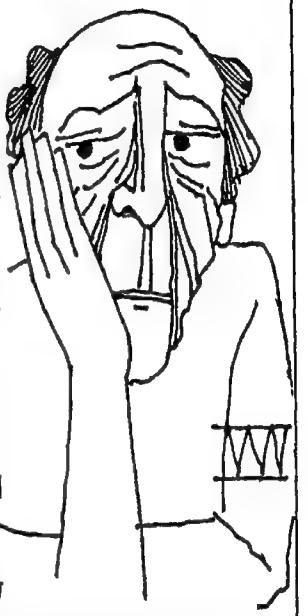

দ্বিতীয় দৃশ্য

আবার তাঁরা পথ চলছেন। কিছুদূর এগোতেই আবার কান্নার পেলেন। শব্দ শুনে তাঁরা এগিয়ে চললেন। হঠাৎ দেখেন একটা তালাবন্ধ বাড়ির সামনে এক বৃদ্ধা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছেন। কাছে যেতে দেখলেন বৃদ্ধা বলছেন, 'যে রাজার রাজ্যে আইবুড়ো মেয়ের বিয়ে হয় না সে রাজা চিতেয় ওঠে না কেন? কেন তাঁর সর্বনাশ হয় না? বংশলোপ হয় না? পঞ্চাল, তুইও আমার মত আগুনে পুড়বি। তুইও এক ফোঁটা শান্তি পাবি না।'

কাঁদছ কেন মা?

তোমরা কে?

আমরা ভিনদেশী পথিক।

আমাদের দেশ ছারখার হয়েছে রাজার অত্যাচারে।

তাই নাকি!

আমার মেয়েদের বিয়ে দেব এমন পাত্র মিলছে না।

কেন?

লোকজন সব সেপাইদের ভয়ে বনে চলে গেছে।

তৃতীয় দৃশ্য

রাস্তায় দেখা গেল এক চাষী রাজার মুণ্ডুপাত করছে। চাষী বুক চাপড়াচ্ছে আর বলছে, 'আমার বলদ যে ভাবে মরল পঞ্চালও যেন সেভাবে মরে।' পুরোহিত এবারও চাষীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই, কি করে তোমার বলদ মরল?' চাষী জবাব দিল, 'লাঙলের খোঁচা খেয়ে।' পুরোহিত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে রাজাকে গাল দিচ্ছ কেন?' চাষী বলল, 'কারণ আছে ভাই। রাজার সেপাই আজ আমার হাঁড়ির ভাত কেড়ে খেয়ে নিয়েছে। পেটে দানা নেই। লাঙল দেওয়ার সময় খেয়ালই করিনি যে গরুটার পেটে খোঁচা লেগেছে। সেই অবস্থায় তাকে দিয়ে লাঙ্গল টানিয়েছে। খিদের জ্বালায় আমার হুঁশ ছিল না। রাজার জন্যই তো এটা হল। নাহলে বলদটা অমন বেঘোরে মরে?'

চতুর্থ দৃশ্য

হাঁটতে হাঁটতে দিন ফুরল। রাতটা এক গ্রামে কাটিয়ে পরের দিন আবার তাঁরা হাঁটতে শুরু করেছেন। রাস্তায় একটা সোরগোল শোনা গেল। এক চাষীকে তার গোরু এমন চাট মেরেছে যে বেচারা যায় যায়। সেও রাজাকে অভিশাপ দিচ্ছিল। কারণ গোরুটা দুষ্ট ঠিকই, কিন্তু সেপাইর ভয়ে তাড়াতাড়ি দুধ দুইতে না গেলে বেচারাকে অমন মোক্ষম চাট খেতে হতো না।

পঞ্চম দৃশ্য

মাইলখানেক আরও দক্ষিণে এগোনর পর রাজা শুনলেন বালকের দল রাজাকে অভিশাপ দিচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, একটি গাভী মারা গেছে। রাজার সেপাইরা ঐ গাভীর বকনা বাছুরটি কেড়ে নিয়ে গেছে। তারা বকনাটাকে কেটে খেয়ে ফেলেছে। সেই দুঃখেই গাভীটি মৃতপ্রায়।

ষষ্ঠ দৃশ্য

আরও কিছুদূর এগোনোর পর দেখা গেল কাকেরা ব্যাঙ ধরে খাচ্ছে। আর ব্যাঙের দল গ্যাঙর-গ্যাঙ গ্যাঙর-গ্যাঙ করে রাজাকে অভিশাপ দিচ্ছে। পুরোহিত এবার উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'এ তো অদ্ভুত কাণ্ড। ও ভাই ব্যাঙের দল। কাক ব্যাঙ ধরে খাচ্ছে তাতে রাজার দোষ কোথায়?'

ব্যাঙের দল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'তুমি মহামূর্খ! রাজার কাজের ফল কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তোমার ধারণা নেই। রাজার অত্যাচারেই আজ গৃহস্থরা বনবাসী হয়েছে। এঁটোকাটা পড়ছে না। কাকদের খাবারের আকাল দেখা দিয়েছে, তবেই না তারা আমাদের ধরে খাচ্ছে।'

পর পর এই ছটি দৃশ্য দেখবার পর রাজা ফিরতে চাইলেন। বোধিসত্ত্বও পুরোহিতের মধ্যে থেকে বাধা দিলেন না। কারণ তিনি ততক্ষণে বুঝছেন রাজা নিজের পাপের ওজন বুঝতে পেরেছেন। আর সত্যিই তাই। এরপর পঞ্চাল রাজা যেন রাতারাতি বদলে গেলেন। দুষ্ট সেপাইরা শাস্তি পেল। গ্রামবাসীরা ফিরে এল গ্রামে। ক্ষেতগুলো আবার সোনালী ধানে ভরে গেল। বৃদ্ধার মেয়েদের বিয়ে হল। দান, ধ্যান ধর্মের পথ প্রশস্ত হল। প্রজারা রাজার গুনগানে পঞ্চমুখ হল।

ত্রিশকুন জাতক

১

বারাণসীর রাজা তখন ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্ত নিঃসন্তান। সন্তানের অভাবে তিনি পীড়িত। দেবতা এবং তপস্বীদের কাছে ধর্ণা দিয়েও কোন সুবিধে হয়নি। সন্তানের আশা বলতে গেলে একরকম ছেড়েই দিয়েছেন। এদিকে রাজকাজেও মন বসাতে পারছেন না। অনুচরদের পরামর্শে একদিন তিনি ভ্রমণে চললেন। সঙ্গে সভাসদগণ।

ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা বাগানে এলেন। রাজার মনে এমনিতেই সুখ নেই, তারপর এতটা পথ হাঁটায় বেশ ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়লেন। বিশাল এক গাছের নিচে জরির কাজ করা চাদর পেতে তিনি ঘুমে ঢলে পড়লেন। ঘুম ভাঙতেই তাঁর চোখে পড়ল গাছের মগডালে চমৎকার একটি পাখির বাসা রয়েছে। রাজা এক অনুচরকে ডেকে বললেন, 'ঐ ডালে উঠতে পারবে?'

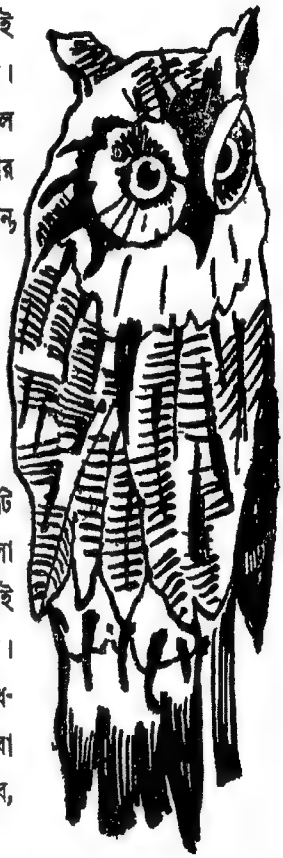

পারব মহারাজ।

যদি ওখানে পাখির ডিম পাও যত্ন করে নিয়ে আসবে।

যে আজ্ঞা মহারাজ।

দেখো তোমার নিঃশ্বাসও যেন ডিমে না লাগে।

পাখির বাসায় ছিল তিনটি ডিম। অনুচর সন্তর্পণে ডিম তিনটি পেড়ে আনল। তারপর একটি বাক্সে তুলো ভরে সেখানে ডিমগুলো আলতো করে রাখা হল। রাজা অনুচরদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ডিমগুলো কিসের বল দেখি?' অনুচররা মাথা চুলকোতে লাগল। কেউ সঠিক জবাব দিতে পারল না। একজন বলল, 'মহারাজ, ব্যাধরাই বলতে পারবে।' তখন রাজ্যের সব ব্যাধকে ডাকা হল। তারা ভাল করে পরখ করে বলল, 'মহারাজ, এর মধ্যে একটা ডিম পেঁচার, একটা শালিকের এবং আরেকটা হল শুক পাখির।

সে কি কথা!

কেন মহারাজ?

তিনজনের ডিম কখনও এক বাসায় থাকে?

হ্যাঁ মহারাজ। কখনও কখনও এরকম হয়।

ব্যাধদের কথা শুনে রাজা মজা পেলেন। ঠিক করলেন এই পাখির বাচ্চাদেরই তিনি সন্তানের মত লালন পালন করবেন। তিন মন্ত্রীর ওপর ভার দেওয়া হল ডিম তিনটি রক্ষণাবেক্ষণের। তাঁদের সতর্ক করে বলে দিলেন, 'মনে রাখবেন এরা সবাই আমার সন্তান। যত্ন করে রাখবেন। ডিম ফোটা মাত্র আমাকে খবর দেবেন।'

২

যথাসময়ে একদিন প্রথম ডিমটি ফুটল। তা থেকে বেরিয়ে এল পেঁচা। খবর পেয়ে রাজা খুশি। পেঁচাটি আবার পুরুষ পাখি হওয়ায় সকলে বলল, 'রাজার ছেলে হয়েছে।' তারপর শালিকের ডিম ফুটল। এ হল মেয়ে পাখি। সুতরাং খবর রটে গেল, 'রাজার একটি কন্যা হয়েছে।' ছেলের নাম রাখা হয়েছিল বিশ্বন্তর। মেয়ের নাম রাখা হল কুন্তলিনী। শুকের ডিম থেকে হল একটি ছেলে পাখি। তার নাম রাখা হল জম্বুক। রাজা এবার মন্ত্রীদের দেদার টাকাকড়ি দিয়ে বললেন, 'তোমরা আমার তিন সন্তানকে সযত্নে পালন করবে।'

রাজার পাখি-ছেলেমেয়েদের ব্যাপার নিয়ে অমাত্যরা খুব হাসাহাসি করতেন। রাজার কানেও একদিন কথাটা গেল। তখন তিনি ভাবলেন, এদের একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। অমাত্যদের ডেকে বললেন, 'দেখ বাপু,আমার পাখি-ছেলেমেয়েদের সামান্য ভেবনা, কদিন পরেই আমি বিশ্বন্তরকে ডেকে পাঠাব। তাকে একটা প্রশ্ন করব। দেখ, সে কেমন উত্তর দেয়।' রাজার হুকুমে দিন কয়েক পরে বিশ্বন্তর সোনার দাঁড়ে চেপে এল।

'পুত্র বিশ্বন্তর,বল তো এ পৃথিবীতে যে রাজা সুখে রাজত্ব করতে চায় তার কি করা উচিত?'

বিশ্বন্তর প্রথমে প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইল। সে বলল, 'মহারাজ, এরকম অনর্থক প্রশ্ন কেন করছেন, সব রাজাই তো সুখে রাজত্ব করতে চায়।' রাজা এতে শান্ত হলেন না। তখন বিশ্বন্তর বলল:

'শুনুন মহারাজ, সে রাজার মিথ্যে কথা বলা চলবে না। ক্রোধ বর্জন করতে হবে। পরিহাসপ্রিয়তা ছাড়তে হবে। রাজাকে শান্ত থাকতে হবে, নইলে তার রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে। অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে রাজা শুধু রাজকার্য করে যাবেন।'

বিশ্বন্তরের উত্তর শোনার পর রাজা সভাসদ ও অমাত্যদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা তো শুনলেন। এখন বলুন দেখি, আমার এই উপযুক্ত পুত্রকে কি কাজ দেওয়া যায়, যা ওর যোগ্য হবে।' সকলেই একবাক্যে বললেন, 'এঁকে সেনাপতির পদ দিন।'

৩

এরপর কিছুদিন কেটে গেল। রাজার ইচ্ছে হল এবার কুন্তলিনীর ক্ষমতা পরখ করেন। রাজার আদরের কুন্তলিনীকে রাজসভায় নিয়ে আসা হল। বিশ্বন্তরকে রাজা যে প্রশ্ন করেছিলেন কুন্তলিনীকেও সেই একই প্রশ্ন করলেন :

'কুন্তলিনী, রাজধর্ম বলতে কি বোঝ?'

এ প্রশ্নে কুন্তলিনী মৃদু হাসল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে বলতে শুরু করল : 'আপনি আমার পিতা। আমার মনে হচ্ছে আপনি আমাকে পরখ করতে চাইছেন। দেখতে চাইছেন পাখি হয়ে মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারি কিনা। এ ধরনের পরীক্ষা করা আপনার পক্ষে শোভা পায় না। তবু আপনি যখন জানতে চাইছেন আমি বলছি। শুনুন মহারাজ, রাজধর্মের মূল কথা হল যা নেই তা লাভ করা। আর যা আছে তা রক্ষা করা। রাজার উচিত এমন সব ব্যক্তিদের অমাত্য পদ দেওয়া যারা ধীরস্থির। মন্ত্রী নির্বাচনের সময় মনে রাখতে হবে রথের কথা। সঠিক সারথির হাতে পড়লে তবেই রথ ঠিকমত ছুটতে পারে। শুনুন রাজা, রাজধর্ম কেবল রাজার নিজের গুণে রক্ষা পায় না। রাজকর্মচারী নির্বাচনে রাজা যদি কোন ভুল করেন তাহলে তা মারাত্মক হয়ে ওঠে। প্রজাদের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। আর একটি কথা, আপনি ভুলেও সুরা পান করবেন না। ভালকে জয়ী করুন, মন্দকে করুন পরাভূত। ত্রিলোকে আপনার জয়ধ্বনি উঠবে।'

কুন্তলিনীর জবাব শুনে রাজা মন্ত্রী ও সভাসদদের বললেন, 'এখন আপনারা বলুন কুন্তলিনীকে কোন্ পদ দেওয়া উচিত?'

'ভাণ্ডারক্ষকের পদ, মহারাজ।'

৪

এ ঘটনার কিছুদিন পরে রাজা তাঁর তৃতীয় সন্তান জম্বুককে পরখ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সাতদিনের মাথায় জম্বুককে নিয়ে আসা হল। বেশ আদর করে রাজসভায় জম্বুককে আসন দেওয়া হল। জম্বুক প্রথমে রাজার কোলে এসে বসল। রাজা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ এভাবে কাটল। রাজা স্থির করলেন জম্বুককে ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করবেন।

জম্বুক, তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।

মহারাজের যেমন ইচ্ছা।

আচ্ছা জম্বুক, প্রকৃত ক্ষমতা কি?

মহারাজের আর কোন প্রশ্ন আছে?

হ্যাঁ। প্রকৃত ক্ষমতাবানই বা কে?

তাহলে শুনুন পিতা··

জম্বুক তারপর বলতে শুরু করলেন, 'দেখুন, এ পৃথিবীতে মহান বলে খ্যাতি যাঁরা পেয়েছেন দেখা গিয়েছে পাঁচ রকম ভাবে এই খ্যাতি তাঁরা অর্জন করেছেন। তবে এই পাঁচ রকমের মধ্যে সেরা হল জ্ঞানের পথ। জ্ঞানই প্রকৃত ক্ষমতা, প্রকৃত শক্তি। এ এমন এক শক্তি যার কাছে আর সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। খ্যাতিমান রাজার শক্তির প্রকৃত উৎস হল প্রজ্ঞা। রাজা যদি প্রজ্ঞাবান না হন তাহলে তাঁর পক্ষে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন অসম্ভব হয়ে পড়ে। একমাত্র প্রজ্ঞাবানই জানেন তিনি কে। ফলে তিনি নিজের প্রতি সঠিক বিচার করতে

পাবেন। মহারাজ, আপনিও প্রজ্ঞাবান হোন। আর যদি কখনও কুকর্ম না করেন তাহলেই আপনার প্রকৃত সুকৃতি নজরে পড়বে।'

জম্বুক ছিলেন মহাসত্ত্ব। এই জন্মে তিনি শকুনকুলে জন্মেছিলেন। প্রজ্ঞার কথা ছাড়াও জম্বুক তাঁর পিতাকে ধর্ম সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। শীলব্রত শেখালেন। বললেন, 'রাজা যেন কোন অবস্থাতেই ধর্মের পথ ত্যাগ না করেন। এমন কি যুদ্ধের মত আপৎকালীন অবস্থাতেও।' জম্বুককে দেওয়া হল মহাসেনাপতির পদ।

এর কিছু দিন পরে আয়ুক্ষয় করে রাজা ইহলোক ত্যাগ করলেন। তখন অমাত্যরা স্থির করলেন, বিচক্ষণ জম্বুককেই রাজপদ দেওয়া উচিত। জম্বুক কিন্তু তাতে রাজি হলেন না। তিনি অমাত্য ও সভাসদদের অনেক সুপরামর্শ দিলেন। রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন কিভাবে করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তর উপদেশ দিলেন। কিভাবে ধর্ম রক্ষা করা যায় সে বিষয়েও অনেক কথা বললেন। তারপর সকলের কাছে বিদায় চাইলেন। বললেন, 'এই ভাবে আপনারাই রাজ্য পরিচালনা করুন, আমি অরণ্যে চলে যেতে চাই। বাকি জীবনটা নির্বিঘ্নে তপস্যা করাই আমার লক্ষ্য।'

শরভঙ্গ জাতক

১

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব একবার তাঁর পুরোহিতের ছেলে হয়ে জন্মান। রাজপুরোহিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। পুত্রের জন্মক্ষণ বিচার করে তিনি গণনা করতে বসলেন। পুত্রের জন্মক্ষণে নক্ষত্রের অবস্থান থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, এই ছেলে বড় হলে সমগ্র জম্বুদ্বীপের সেরা বীর হবে। বিশেষ করে ধনুর্বিদ্যায় সে এত পারঙ্গম হবে যে কেউই তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।

পুরোহিত পুত্রের কোষ্ঠী গণনা করে বাইরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর পেলেন যে পুত্রের জন্মক্ষণে বারাণসীরাজের যেখানে যত অস্ত্র ছিল সব এক আশ্চর্য আলোকে ঝলমল করে উঠেছে। পুরোহিত এ কথা শুনে নিজের গণনা সম্পর্কে আরও সুনিশ্চিত হলেন। তারপর তিনি চললেন রাজ-সন্দর্শনে।

মহারাজের জয় হোক।

আসুন আচার্য।

মহারাজের কি রাতে ভাল ঘুম হয়েছে?

না আচার্য।

কেন মহারাজ?

কি করে হবে, সব অস্ত্র যে ঝলসে উঠল।

মহারাজ কি আতঙ্কিত বোধ করছেন?

কিছুটা।

শান্ত হোন, ভয়ের কোন কারণ নেই।

কেন এমন হল?

আমার পুত্রের জন্য। এক মহাবীর জন্মগ্রহণ করেছেন

আপনি তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে যত্ন নিন।

নিশ্চয়।

বড় হলে ওঁর দায়িত্ব আমার।

পুরোহিত-পুত্ররূপী বোধিসত্ত্বের জন্মের সময় রাজ্যের অস্ত্রাগার ঝলমল করে উঠেছিল বলে এজন্মে বোধিসত্ত্বের নাম রাখা হল জ্যোতিঃপাল। রাজা স্বয়ং জ্যোতিঃপালের দীর্ঘ জীবন কামনা করলেন। খুশি হয়ে ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধনদৌলত দিলেন।

আদর-আহ্লাদের মধ্য দিয়ে জ্যোতিঃপাল চাঁদের ষোলটি কলার মত ক্রমে ক্রমে বিকশিত হতে লাগলেন। বিভিন্ন শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায় তাঁর শিক্ষা চলল পুরোদমে। শিক্ষা হল সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে। এখানেও একটি আশ্চর্য ঘটনা আছে। সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালাভের জন্য জ্যোতিঃপালকে পড়ানো হয়েছিল তক্ষশিলায়। জ্যোতিঃপাল সেখানে আচার্যের কাছে মাত্র এক সপ্তাহ থেকে সব কিছু নিপুণভাবে শিখে ফেললেন। এতে আচার্যও বিস্মিত হলেন। তিনি নিজের অস্ত্র ও উষ্ণীষ জ্যোতিঃপালকে দান করলেন। বললেন, 'এবার তুমিই আমার অর্ধসহস্র ছাত্রকে শিক্ষা দাও।' জ্যোতিঃপাল এই পর্বও দ্রুত

শেষ করে বারাণসীতে ফিরে এলেন। তখন রাজার প্রতিশ্রুতি অনুসারে জ্যোতিঃপালকে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। রাজা দৈনিক এক হাজার টাকা বেতনে জ্যোতিঃপালকে রাখলেন।

জ্যোতিঃপাল একে তরুণ, তার ওপর তাঁর বেতন হাজার টাকা। এতে অমাত্যরা তাঁকে ঈর্ষা করতে শুরু করল। রাজার প্রতিও তারা বিরূপ হল। শেষে তারা দল বেঁধে রাজাকে বলল, 'মহারাজ, জ্যোতিঃপাল যে পরিমাণ বেতন পাচ্ছে সে তা পাওয়ার যোগ্য কিনা তার কি প্রমাণ সে দিয়েছে?' শুনে রাজা পুরোহিতকে জানালেন। পুরোহিত তাঁর ছেলেকে ডেকে বললেন: রাজা তোমার পরীক্ষা নিতে চান।

বেশ, আপনি রাজাকে বলুন রাজ্যের সব ধনুর্বিদদের খবর দিতে।

যথাসময়ে মহড়ার প্রস্তুতি শেষ হল। মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে। একে একে সেখানে উপস্থিত হল রাজ্যের সব ধনুর্বিদ। জ্যোতিঃপাল এলেন সকলের শেষে। জ্যোতিঃপালকে দেখে তো ধনুর্বিদরা অবাক। জ্যোতিঃপালের সঙ্গে কোন ধনুক নেই। তাহলে সে কি করে তীর ছুঁড়বে? সে কি মায়া দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করবে? যাই হোক, তারা সকলে মিলে ঠিক করল; কেউই জ্যোতিঃপালকে তাদের ধনুক ব্যবহার করতে দেবে না। জ্যোতিঃপাল তাঁর গুরুপ্রদত্ত অস্ত্রবাজি লুকিয়ে রেখে শুধুমাত্র তরবারি হাতে এলেন।

মহারাজকে প্রণাম করে জ্যোতিঃপাল ময়দানে একটি বৃত্ত এঁকে দিলেন। তারপর রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আপনার ধনুর্বিদদের মধ্যে অনেকে শব্দ শুনে চুল পর্যন্ত বিদ্ধ করতে পারেন শুনেছি। আপনি তাদের ডাকুন।' রাজার আদেশে বারজন ধনুর্বিদ এগিয়ে এল। জ্যোতিঃপাল তাদের ঐ বৃত্তের মধ্যে যেতে বললেন। তারপর নিজে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসে বললেন, 'মহারাজ, এদের আদেশ করুন আমাকে বিদ্ধ করতে। আমি এদের আঘাত প্রতিহত করব।' ধনুর্বিদরা বলল, 'মহারাজ, আমরা এই তরুণকে বিদ্ধ করতে রাজি নই।' জ্যোতিঃপাল তার জবাবে বললেন, 'অত উদারতা দেখিয়ে লাভ নেই। সত্যি যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে বিদ্ধ কর।' তখন তারা সকলে এক সঙ্গে রেগে উঠল, 'তবে রে পাষণ্ড!' জ্যোতিঃপালের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে এল।

চার তীরন্দাজ প্রত্যেকে চার হাজার করে ষোল হাজারটি তীর ছুঁড়ল। জ্যোতিঃপাল সমস্ত তীর ফিরিয়ে দিলেন। আকাশ বাতাস তাঁর জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল। রাজা সস্নেহে জ্যোতিঃপালকে ডাকলেন।

জ্যোতিঃপাল।

বলুন মহারাজ।

এই বিদ্যার নাম কি?

শর প্রতিবাহন।

তুমি ছাড়া এ বিদ্যা আর কে জানে?

কেউ না মহারাজ।

বেশ, এবার অন্য কোন বিদ্যা দেখাও।

তখন জ্যোতিঃপাল চারজন তীরন্দাজকে চারটি কোণে দাঁড়াতে বললেন। বললেন, 'আমি এক শরে চারজনকেই বিদ্ধ করব। করার পর শরটি আমার কাছে ফিরে আসবে।' খানিক আগে দেখা অলৌকিক কাণ্ডের পর কেউ সামনে দাঁড়াতে সাহস করল না। তখন চার কোণে চারটি কলা গাছ রাখা হল। এক তীরে জ্যোতিঃপাল সেই চারটি কলাগাছকেই বিদ্ধ করলেন। তারপর তীরটি আবার তাঁর কাছে ফিরে এল।

তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল। সমবেত জনমণ্ডলী জ্যোতিঃপালের দিকে নানারকম উপহার ছুঁড়ে দিতে লাগল। দুর্মূল্য পোশাক, অর্থ, ফুলের মালা। রাজা আবার জানতে চাইলেন, 'বৎস, এ কৌশলের নাম কি?'

চক্রবেধ, মহারাজ।

তুমি কি আরো কৌশল জান?

জানি মহারাজ।

তাহলে তা দেখাও।

জ্যোতিঃপাল একে একে বারটি বিভিন্ন ধরনের কৌশল দেখালেন। ওদিকে বেলাও হয়ে যাচ্ছে। রাজা এবং সভাসদরা বেজায় খুশি। জ্যোতিঃপালের নামে জয়ধ্বনি উঠল। রাজা সমবেত জনমণ্ডলীকে জানালেন, 'আজ থেকে জম্বু দ্বীপের এই বীরই আমার প্রধান সেনাপতি হবেন।' রাজা নিজে জ্যোতিঃপালকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা উপহার হিসেবে দিলেন।

জ্যোতিঃপাল অস্ত্রবিদ্যায় এমন অত্যাশ্চর্য পবিচয় দিয়ে যে ধন-, বত্নাদি পেলেন, সে সবই তিনি বিনয়েব সঙ্গে দাতাদেবই ফিরিযে দিলেন। এমন কি বাজাব লক্ষ স্বর্ণমুদ্রাও। তাবপব ঘবে ফিবে এসে দুশ্চিন্তায় পডে গেলেন। সেনাপতিব পদ গ্রহণ কবলে যুদ্ধ-কালীন অবস্থায তাঁকে প্রচুর বক্তপাত ঘটাতে হবে। তাঁব হাতে অনেকে মারা পডবে। বিদ্যুৎ ঝিলিকেব মত তাঁব মনে হল,-'এব চেযে বনবাসী হযে তপস্যা কবা অনেক শ্রেয়ঃ।'

যেমন কথা সেই কাজ। জ্যোতিঃপাল কাউকে কিছু জানালেন না। এমন কি তাঁব পিতা বাজপুরোহিতকেও কিছু বললেন না। এক বস্ত্রে তিনি অরণ্যেব দিকে রওনা হলেন। জ্যোতিঃপাল যখন অবণ্যেব দিকে চলেছেন, দেবরাজ ইন্দ্র তখন তাঁব অভিপ্রায় টেব পেলেন। দেববাজ এই পুণ্যাত্মাকে কিছু উপহার দিতে চাইলেন। তিনি বিশ্বকর্মাকে ডেকে বললেন, 'অরণ্যপথে এঁর জন্য আশ্রম গডে দাও।' দেবতাদের ইচ্ছা মুহূর্তের মধ্যে বাস্তব রূপ পেতে পারে। ফলে জ্যোতিঃপাল অরণ্যে পৌঁছে দেখলেন চমৎকার একটি আশ্রম পবিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। নিজের ক্ষমতাবলে বোধিসত্ত্ব জানতে পারলেন, দেবরাজ ইন্দ্রই তাঁকে এই উপহার দিয়েছেন। জ্যোতিঃ-পাল এই উপহার সানন্দিত চিত্তে গ্রহণ করে তপস্যা শুরু করলেন।

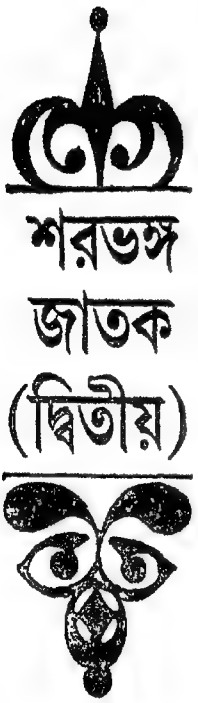

শরভঙ্গ জাতক (দ্বিতীয়)

জ্যোতিঃপালেব খোঁজে বাজা এবং অমাত্যবা দিকে দিকে লোক পাঠালেন। অবশেষে তাঁবা আশ্রমটির খোঁজ পেলেন। বাজপুরোহিত-সহ সকলে এলেন জ্যোতিঃপালের সঙ্গে দেখা কবতে। তিনি তখন আকাশপথে আসীন হলেন। শূন্য থেকে সকলকে ধর্মকথা বললেন। সুমধুব কণ্ঠস্বর, জ্ঞানগম্ভীর কথা শুনে সকলেরই চিত্ত শান্ত হল। তাঁবা জ্যোতিঃপালকে ফিরিযে নিযে যাবাব জন্য পীড়াপীড়ি কবলেন না আব। বরং সকলেই ধর্মপথে এলেন। জ্যোতিঃপালের কথা অনুসারে শীলব্রত গ্রহণ কবলেন। সারা দেশে ধর্মেব আবহাওযা বিবাজ করতে লাগল।

জ্যোতিঃপালের সাত জন প্রধান শিষ্য। তাঁদেব স্থান আবাব পর্যাযক্রমে। দিনে দিনে শিষ্যদেব শিষ্য ও জ্যোতিঃপালেব ভক্তদের ভিড়ে আশ্রম উপচে পড়তে লাগল। তখন তিনি ভিড়

কমাতে আব নিজেব তপস্যাব নির্জনতা বজায রাখতে সাত শিষ্যকে তাদেব শিষ্য-শিষ্যাসহ সাতটি আলাদা আলাদা জায়গায কুটিব বানিযে থাকতে বললেন।

প্রথম শিষ্য যেখানে কুটিব গডেছেন একদিন সেখানে বাজার এক প্রিযপাত্রী এলেন। বাজা তাঁব প্রিযপাত্রীকে ভর্ৎসনা কবে দূব করে দিয়েছিলেন। বাজার অনুচবী ঐ তপস্বীকে দেখে ভাবল, 'এঁকে যদি আমার পাপের বোঝা দিই তাহলে আমি বক্ষা পেতে পারি।' এই ভেবে সে তপস্বীব জটায থুতু ফেলল। আশ্চর্য ব্যাপার, তাবপবই রাজা ঐ অনুচরীকে ডেকে পাঠান। আগেকার চেযে বেশি খাতিব কবতে লাগলেন তাকে। কিছু দিন পরে ঐ রাজাব পুবোহিত রাজাব রোষানলে পডলেন। অনুচবী তখন পুরোহিতকে পরামর্শ দিল, 'আপনি রাজার বাগানেব ঐ তপস্বীর জটায নিজের পাপ ত্যাগ করুন। আপনার মঙ্গল হবে।'

পুরোহিত তাই করলেন। আব সত্যি রাজার মনও বদলে গেল। কিছু দিন পবে শত্রু সৈন্য ঐ রাজ্যটি আক্রমণ করল। রাজা মুষডে পডেছেন। পুরোহিত তখন রাজাকে উপদেশ দিল, 'সন্ন্যাসীর জটায থুতু ফেলুন। তাহলেই বিপদ কেটে যাবে।' রাজা তাঁর সেনাপতি ও পাত্রমিত্রসহ গেলেন তপস্বীর জটায় থুতু ফেলতে। সবাই চলে গেলে সেনাপতি তপস্বীকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'প্রভু, সবাই যে আপনার শরীবে পাপ ত্যাগ করে গেল, এতে তাঁদের কোন ক্ষতি হবে না তো।'

আমি নিজে কোন ক্ষতি কবব না।

তাহলে ?

দেবতারা অসন্তুষ্ট হবেন।

তাতে কি হতে পারে প্রভু ?

এই রাজ্য ছারখার হবে।

সে কি !

তুমি অন্য কোথাও চলে যাও।

সেনাপতি তপস্বীর পরামর্শে নিজের পরিবারসহ অন্য দেশে চলে গেলেন। এদিকে রাজা যুদ্ধে জযলাভ কবলেন ঠিকই, কিন্তু ফেরার সময তাঁর বাহিনীর ওপব বিশাল বিশাল পাহাড ভেঙে পডতে লাগল। এভাবে গোটা রাজ্যটি বিনষ্ট হল। এদিকে জ্যোতিঃপাল সন্ন্যাসেব পর

'শবভঙ্গ' নাম নিয়েছেন। যোগবলে তিনি প্রথম শিষ্যের বিপদের কথা

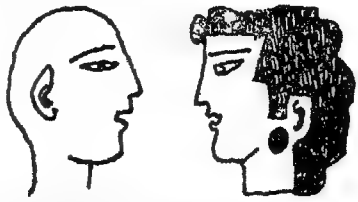

জানলেন। মন্ত্রবলে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন।

সেই প্রবল পর্বতবৃষ্টিতে শুধু এই রাজার নয়, আশপাশের আরও অনেক রাজার রাজ্য নষ্ট হল। তাঁরা ঠিক করলেন, মহাসত্ত্বের কাছে যাবেন। একমাত্র তিনিই বলতে পারবেন, কেন এমন হল। রাজারা যেদিন শরভঙ্গের আশ্রমে এলেন সেই দিন তাঁর প্রথম শিষ্য গত হয়েছেন। ফলে আশ্রমে ছিল গভীর শোকের ছায়া।

শিষ্যর শেষকৃত্য সারতে সকলে তখন গোদাবরীর তীরে এসেছেন। রাজারা কাউকে আশ্রমে না পেয়ে বুঝলেন একমাত্র নদী-তীরে গেলেই তাঁর দেখা পাওয়া যাবে। সকলে মিলে গোদাবরীর তীরে এলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে দেবরাজ ইন্দ্রও রাজার বেশে গোদাবরীতে নেমে এলেন।

শরভঙ্গ ॥ কি আপনাদের প্রশ্ন?

দেবরাজ ॥ কাকে বধ করলে কোন শোক হয় না তপস্বী?

শরভঙ্গ ॥ কপটতা এবং ক্রোধকে।

দেবরাজ ॥ কি ত্যাগ করলে লোকে ধন্য ধন্য করে?

শরভঙ্গ ॥ ঐ একই উত্তর।

দেবরাজ ॥ কার কঠোর ব্যবহার সর্বদা ক্ষমা করা যায়?

শরভঙ্গ ॥ ক্ষমাই ধর্ম। সুতরাং সকলকেই ক্ষমা করা যায়।

দেবরাজ ॥ নিচু জনের কঠোর ব্যবহারও কি ক্ষমা করা যায়?

শরভঙ্গ ॥ দেখুন রাজা, শক্তিমান ও উত্তমের অপরাধ অনেকেই ক্ষমা করেন। কিন্তু নিচু জনের কঠোরতাও যিনি ক্ষমা করতে পারেন তিনিই প্রকৃত সাধু।

দেবরাজ ॥ প্রকৃত সাধু কে?

শরভঙ্গ ॥ যিনি বীতরাগ, যার দ্বেষ নেই, আছে শুধু প্রজ্ঞা, তিনিই প্রকৃত সাধু।

সকলে শরভঙ্গের নামে জয়ধ্বনি দিল।

খুল্লসুতসোম জাতক

পুরাকালে কোন এক সময়ে বারাণসীর নাম ছিল সুদর্শননগর। সেখানে রাজত্ব করতেন ব্রহ্মদত্ত। বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্তের ছেলে হয়ে জন্মালেন। তাঁর নাম রাখা হল সোমকুমার। কারণ বোধিসত্ত্বের দেহলাবণ্য ছিল অসাধারণ। এই সোমকুমার বড় হয়ে সোমরস-প্রিয় হয়ে ওঠেন। সেজন্য তাঁর নাম হয়ে যায় সুতসোম।

যথাসময়ে সুতসোম গেলেন তক্ষশিলায়। সেখানে বিদ্যাচর্চা শেষ করে একদিন তিনি সুদর্শননগরে ফিরেও এলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত তখন তাঁর যোগ্য পুত্রকে অভ্যর্থনা জানালেন শ্বেতচ্ছত্র দিয়ে। এর পর থেকে সুতসোম যথাধর্ম রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। রাজকোষের সম্পদও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। সুতসোমের ষোল হাজার রাণী ছিল। এদের মধ্যে চণ্ডদেবীই ছিলেন প্রধানা।

সুখ-সম্ভোগে দিন যেতে লাগল। ইতিমধ্যে সুতসোমের অনেক সন্তানাদিও হয়েছে। সৌভাগ্যের শিখরে পৌঁছেছেন তিনি। হঠাৎ একদিন তাঁর মনে বৈরাগ্য জন্মাল। সংসারকে মায়াজালে পূর্ণ অসার মনে হল। তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন সন্ন্যাস নেবার জন্য। একদিন তিনি নাপিতকে ডেকে বললেন :

শোন হে, আমার মাথায় একগাছা পাকা চুল দেখলেই বলবে।

যে আজ্ঞা মহারাজ।

এ ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই নাপিত সুতসোমকে বলল, 'মহারাজ, আপনার মাথায় পাকা চুল দেখতে পাচ্ছি।' শুনে সুতসোম বললেন, 'চুলটা ছিঁড়ে আমার হাতে দাও।' নাপিত সোনার সন্না

দিয়ে পাকা চুলটা তুলে সুতসোমের হাতে দিল। সুতসোম সেই পাকা চুলটি হাতে নিয়ে বলে উঠলেন, 'হায়! জরা এসে আমার দখল করে নিল।' চুলটা হাতে নিয়ে তিনি রাজসভায় এলেন। সেখানে সকলেই ছিল। একদৃষ্টে চুলটির দিকে তাকিয়ে থেকে সুতসোম বললেন, 'শুনুন, আমার চুল পাকতে শুরু করেছে। আমি বৃদ্ধ হচ্ছি। এখন থেকে আমি আর রাজ্যভার বহন করতে পারব না। আমি প্রব্রজ্যা নেব স্থির করেছি।'

রাজার মনোভাব দেখে অমাত্যরা খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। এমন ভরা রাজ্যপাট, এসব ছেড়ে কিনা সুতসোম বনবাসী হবেন। তাঁরা সমস্বরে বলে উঠলেন, 'হে রাজা, আপনি এই সঙ্কল্প ত্যাগ করুন। এতে কারও কল্যাণ হবে না। একবার চেয়ে দেখুন, আপনার ষোল হাজার স্ত্রী আছেন। আপনি চলে গেলে তাঁদের কি হবে।'

'তাঁরা নিজেরাই তাঁদের গতি করে নেবেন।'

'কি করে মহারাজ?'

'তাঁরা এখনও নবীন। তাঁদের রূপও আছে, সুতরাং তাঁরা যথাযোগ্য আশ্রয় পেয়ে যাবেন।'

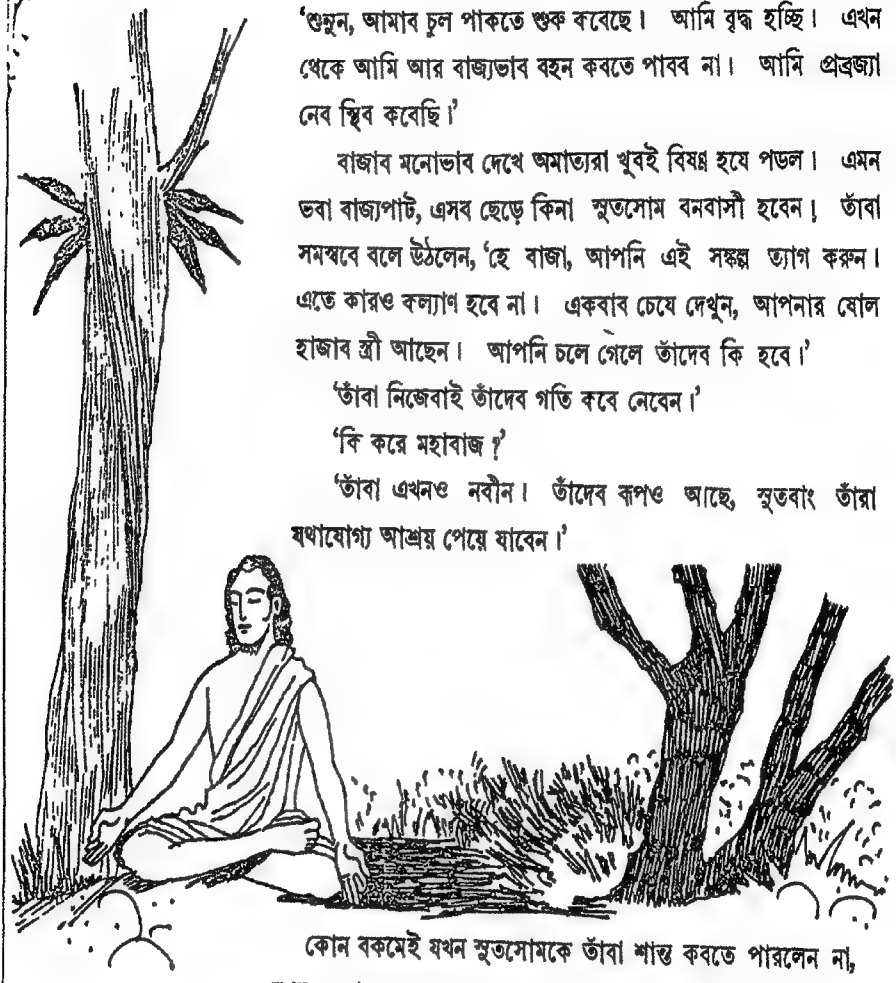

কোন রকমেই যখন সুতসোমকে তাঁরা শান্ত করতে পারলেন না, তখন অমাত্যরা রাজমাতার কাছে গেলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে রাজমাতা দ্রুত ছুটে এলেন।

'বাবা, তুই নাকি প্রব্রজ্যা নিচ্ছিস?'

'হ্যাঁ, মা।'

'তুই আমাকে বৃথাই মা বলে ডাকিস, মিথ্যেই তোকে গর্ভে ধরেছিলাম রে। তুই কিনা বুড়ি মাকে ছেড়ে প্রব্রজ্যা নিচ্ছিস!'

রাজমাতার কান্নার জবাবে সুতসোম 'হ্যাঁ-না' কোন কথাই বললেন না। অমাত্যরা তখন সুতসোমের পিতার কাছে গেলেন। সব শুনে সুতসোমের পিতা এসে বললেন, 'দেখ বাবা, বুড়ো বাপ-মার প্রতি যদি টান না-ও থাকে, নিজের ছেলেমেয়ের কথাটা তো ভাববে। তুমি প্রব্রজ্যা নিলে তাদের কি হবে?'

'দেখ বাবা, অনেকদিন ছেলেমেয়ের সঙ্গে কাটালাম। এখন এসব নিছক মায়া বলে মনে হচ্ছে।'

সুতসোম নানা ধর্মকথার সাহায্যে বোঝাতে চাইলেন সংসার শুধু মায়া। তা চিরস্থায়ী নয়। এই অনিত্যের জন্য জীবনপাত করার কোন অর্থ হয় না। সুতসোমের কথা শুনে তাঁর পিতা আর কোন কথা বলতে পারলেন না। বিষণ্ণচিত্ত বসে রইলেন।

অমাত্যরা এর পরে তাঁর ষোল হাজার পত্নীকে ডেকে আনলেন। আবার কান্নাকাটি, অনুরোধ-উপরোধ চলল। কিন্তু সুতসোমকে তাঁরাও টলাতে পারলেন না। রাজার প্রধানা মহিষী তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, অমাত্যরা তাঁকে ডেকে আনলেন। কিন্তু এতেও কোন ফল হল না। তখন সাত বছরের ছেলেটি এল। সে সুতসোমের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'এবার আপনি যান তো দেখি।' রাজার অন্তর এতে একটু কাতর হয়ে পড়ল। কিন্তু তিনি ধাত্রীকে বললেন, 'রাজপুত্রকে নিয়ে যাও।'

মহাসেনাপতির মনে হল, 'হয়ত মহারাজের মনে হয়েছে রাজ-কোষে যথেষ্ট ধনসম্পদ নেই। সেই দুঃখেই প্রব্রজ্যা নেওয়ার কথা ভাবছেন।' সেনাপতি রাজাকে এসে জানালেন, 'মহারাজ, আপনার রাজকোষে ধনসম্পদের কোন অভাব নেই। তাহলে কেন আপনি বনে গিয়ে অনর্থক কষ্ট করবেন।' এরপর কুলবর্ধন নামে এক বণিক এল। সে এসে বলল, 'মহারাজ, আমার যা অর্থ আছে তা দেবতাদের

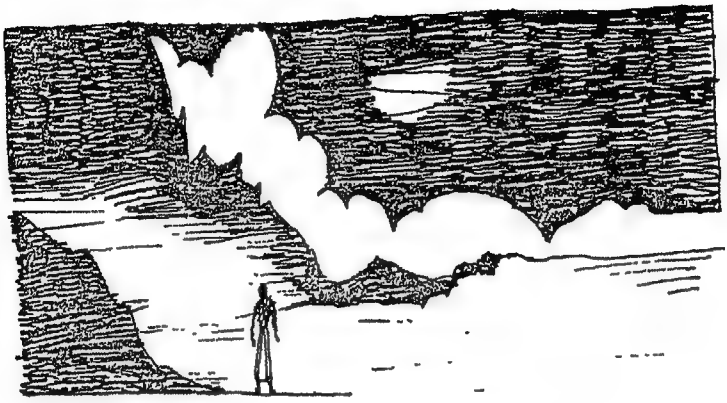

পক্ষেও গোনা সম্ভব নয়। সে সবই আমি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। আপনি প্রব্রজ্যা নেওয়ার ইচ্ছে ত্যাগ করুন।'

এত কাণ্ড করেও সুতসোমকে ধরে রাখা গেল না। তিনি বললেন, 'যা জন্মেছে তা কখনও চিরস্থায়ী হয় না, তার বিনাশ হবেই। যাই হোক, আমি মনস্থির করছি। এখন আর আমি তোমাদের কেউ নই। তোমরা এবার থেকে নিজেদের ইচ্ছেমত রাজ্য চালিও।' এ কথা শুনে নগর-বাসীরা, অমাত্য ও রাজার স্ত্রী-পুত্ররা ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল। তাঁদের গড়াগড়িতে বিশাল ধুলোর ঝড় ওঠে নগর ঢেকে ফেলল। সুতসোম গৃহত্যাগ করলেন।

সুতসোমের গৃহত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাকুল, আত্মীয়বন্ধু ও অমাত্যরা দল বেঁধে চললেন তাঁর খোঁজে। অরণ্য পথে তাঁরা রাজাকে ধরে ফেললেন। তাঁরা সবাই রাজার অনুগামী হলেন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র এই মহতী ব্যাপার দেখে হিমালয়ের কোলে একটি চমৎকার আশ্রম তৈরি করে রাখলেন।

রাজা এবং তাঁর অনুগামীরা ঐ আশ্রমে আশ্রয় নিলেন। আশ্রম-বাসীদের ধর্মচর্চা ও সরল জীবনযাপনের কাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আর তা চুম্বকের মতই সহস্র ধর্মপিপাসু মানুষকে টেনে আনতে লাগল।

কিংছন্দো জাতক

১

সে অনেককাল আগের কথা। বারাণসীর রাজা তখন ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্তের প্রজাপালন ও রাজ্যচালনা বিষয়ে সুনামের কোন অন্ত ছিল না। ঘোরতর সংযমী ও শীলাচারী ছিলেন তিনি।

কিন্তু ব্রহ্মদত্তের এমনই দুর্ভাগ্য যে তাঁর পুরোহিত ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের লোক। পুরোহিত প্রায় সবরকম অন্যায় কাজেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রকাশ্যে ঘুষ খাওয়া, অন্যায় বিচার করা ছাড়াও তিনি লোকের আড়ালে রাজা সম্পর্কে কটু মন্তব্য ও নিন্দা করতেন।

সেদিন ছিল তিথিনক্ষত্র অনুসারে পোষধের দিন। রাজা তাঁর অমাত্যদের ডাকলেন। বললেন, 'আজ পুণ্যলগ্ন। তোমরা আজ পোষধ ব্রত পালন কর।' অমাত্যরা রাজার আদেশ ও পরামর্শ অনুসারে নিষ্ঠার সঙ্গে পোষধ পালন করলেন। কিন্তু পুরোহিত লোভ সামলাতে পারলেন না। তিনি রোজ যা যা করে থাকেন আজও তাই করলেন।

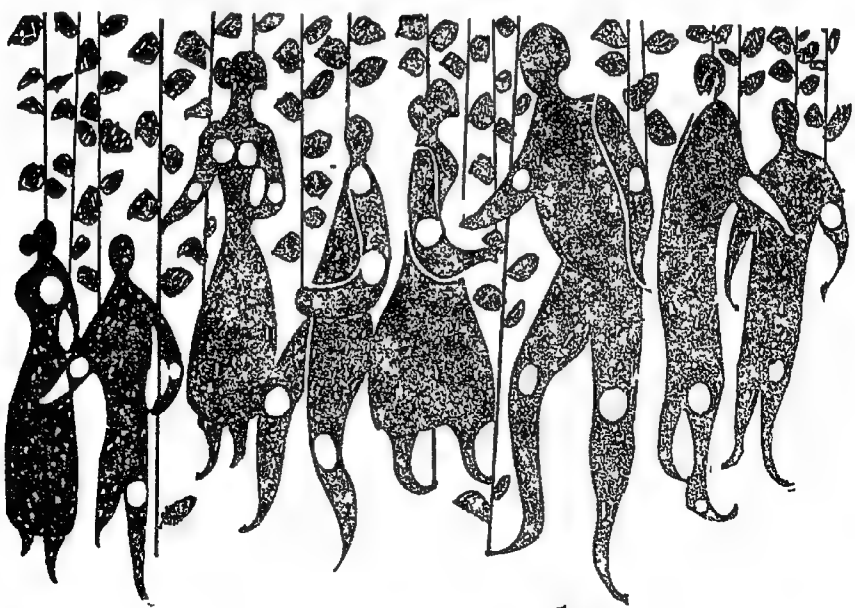

অর্থাৎ ঘুষ নিলেন, অবিচার করে মিথ্যে শাস্তি এবং পুরস্কার দিলেন বিবাদী এবং ফরিয়াদীদের।

এরপর পুরোহিত রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ব্রহ্মদত্ত তখন অমাত্যদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কে কে পোষধ পালন করছেন?' অমাত্যরা সবাই একবাক্যে বললেন, তাঁরা পোষধ রক্ষা করেছেন। রাজা তখন পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচার্য, আপনি পোষধ পালন করেছেন কি?' পুরোহিত বললেন, 'হ্যাঁ।'

মিথ্যে জবাব দিয়ে পুরোহিত প্রাসাদের বাইরে যাচ্ছিলেন। তখন একজন অমাত্য তাঁকে বললেন, 'মহাশয়, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন, আপনি পোষধ পালন করেন নি।' পুরোহিত সামান্য হতচকিত হলেন। পরমুহূর্তে বললেন, 'সকালে সামান্য কিছু খেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু ঘরে গিয়ে আমি হাত-মুখ ধুয়ে ফেলব। রাত হওয়ার আগে মুখে কুটোগাছাও দেব না। এতে অন্তত আধবেলা উপোস করা তো হবে।' পুরোহিত ঘরে ফিরে সত্যিই তাই করলেন।

একদিন পুরোহিত বিচার করতে বসেছেন। বিচারপ্রার্থিনী এক শীলবতী নারী। সে দিনটিও ছিল পোষধের দিন। মহিলা উপবাসী ছিলেন। ওদিকে বিচারের কাজে বেলা বয়ে যেতে লাগল। ক্রমে বিকেল হল। শীলবতী নারী ভাবলেন, রাতে বাড়ি ফিরে পোষধ ভাঙবেন। ঠিক তখন একজন পুরোহিতকে কয়েকটি পাকা আম উপহার দিয়ে গেল। পুরোহিত স্নেহপরবশ হয়ে শীলবতী ঐ নারীকে কয়েকটি আম খেতে দিলেন।

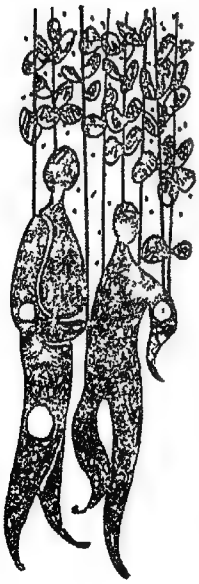

২

যথাসময়ে আয়ুক্ষয় করে পুরোহিত গত হলেন। পরজন্মে তিনি হিমালয়ের পাদদেশে এক আশ্চর্য সুন্দর আমের বনে জন্মগ্রহণ করলেন। শীলবতী নারীর প্রতি তিনি সম্মান দেখিয়েছিলেন। পূর্বজন্মে তাঁকে আম খেতে দিয়েছিলেন বলে এ জন্মে গোটা একটা আমবাগানের অধীশ্বর হলেন। সেদিন আধ বেলা উপোসও করেছিলেন। এজন্য তিনি অর্ধস্বর্গ লাভ করলেন। ঐ আশ্চর্য কাননে প্রতি রাতে তিনি দেবদূতের মত সানন্দে বিচরণ করতেন। কিন্তু রাত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঐশ্বর্য হারিয়ে যেত। তখন আর

তাঁকে ঐরকম লাবণ্যমণ্ডিত তো লাগতই না, উল্টে এক কদাকার চেহারা দেখা দিত। দু হাতে থাকত মাত্র একটি করে আঙুল। ঐ দুটিতে দেখা দিত কোদালের মত বিশাল দুটি নখ। সে তখন নখ দিয়ে নিজের মাংস ছিঁড়ে খেত।

ক্রমে দিন যায়। বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘকাল রাজ্য পরিচালনা ও বিষয়সুখ ভোগ করেছেন। এক সময় সব কিছুতেই তাঁর আগ্রহ কমতে থাকল। কিছুই আর ভাল লাগে না। বিষয় বিষের মত লাগছে। এই ভাব কিছু দিন চলার পর রাজা প্রব্রজ্যা নিলেন। গঙ্গার তীরে একটি কুটির তৈরি করে থাকেন। ধর্ম চিন্তা ছাড়া রাজার আর কোন চিন্তা নেই। একদিন নদীতে স্নান করতে গিয়ে রাজা একটি পাকা আম পেলেন। আমটির আকারও ছিল বেশ বড়। রাজা অনেক দিন ধরে একটু একটু করে শুধু ঐ আমটি খেয়েই বেঁচে থাকলেন। একদিন আমটি ফুরিয়ে গেল। কিন্তু অত চমৎকার একটি ফলের স্বাদ পাওয়ার পর রাজা আর অন্য কিছু মুখে দেওয়ার কথা ভাবতেও পারছেন না।

ভাবলেন, 'নদীর জলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করব। আবার যদি ভেসে আসে। আর যদি না-ও আসে তাহলে নদীতেই দেহত্যাগ করব।'

রাজা পাকা আমের আশায় দিনের পর দিন নদীর তীরে পড়ে আছেন। তাঁর শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। একে একে সাত দিন কেটে গেল। তখন গঙ্গাদেবী রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য স্বমূর্তিতে রাজার সামনে এলেন।

'হে তপস্বী, কেন তুমি এত কষ্ট করছ?'

'দেবী, আমি চমৎকার একটি ফল খেয়েছিলাম, সেই ফলটি আবার পাওয়ার আশায়।'

'দেখ রাজা, তুমি বুদ্ধিমান। বিষয়বন্ধন ছিন্ন করেছ, কিন্তু দেখ, আবার কেমন নতুন বন্ধনে জড়িয়ে পড়ছ।'

দেবী তাঁকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু দেখা গেল রাজা শিশুর মত, কিছুতেই ভবি ভোলে না। গঙ্গাদেবী তখন রাজাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন সেই আশ্চর্য আমের বনে। রাজা আকাশপথে সেই বনে গিয়ে নামলেন।

রাজা সেখানে মনের সুখে আছেন। হঠাৎ রাত্রিবেলা দেখলেন দেবদূতের মত এক ব্যক্তি। তার সঙ্গে অজস্র লোকজন এবং অনুচর। সবাই এক ঘোর আনন্দে মত্ত। রাত পোহালে আবার সেই দেবদূতই হয়ে গেল এক কদাকার জীব। সে নিজে নিজের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে।

পুরোহিত রাজাকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন। সেই রাতেই তিনি রাজার কাছে এগিয়ে এসে নিজের অতীত জন্মের পাপ আর সুকৃতির কথা বললেন। তারপর তিনি যখন জানলেন রাজা পাকা আম খাওয়ার জন্যই এ বনে এসেছেন, তখন বললেন, 'চলুন, আপনাকে আপনার আশ্রমে রেখে আসি। এই আমবাগানের অধীশ্বর আমিই, সুতরাং আমি আপনাকে রোজ আম পাঠাব।'

এর পর থেকে রাজা আম খেয়েই জীবন ধারণ করতেন। তপস্যা করতে করতে আয়ু ফুরিয়ে এল। রাজার দেহান্ত ঘটল। অজস্র পুণ্য-কর্ম তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। সে কারণে তাঁর স্বর্গবাস হয়েছিল।

শোননন্দ জাতক

একসময় বারাণসীর নাম ছিল ব্রহ্মবর্ধন। মনোজ নামে এক রাজা সেখানে রাজত্ব করতেন। তাঁর আমলে ব্রহ্মবর্ধনে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ব্রাহ্মণের ছিল অঢেল সম্পত্তি। শান্তি ছিল না। কারণ তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। একদিন ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নীকে বললেন, 'তুমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যেন আমাদের একটা ছেলে হয়।'

ব্রাহ্মণীর প্রার্থনায় কাতর হয়ে বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মলোক থেকে ব্রাহ্মণীর গর্ভে প্রবেশ করলেন। যথাসময়ে তিনি ব্রাহ্মণীর ছেলে হয়ে জন্মালেন। তাঁর নাম রাখা হল শোনকুমার। বোধিসত্ত্ব যখন হামা দেওয়া ছেড়ে দু পায়ে হাঁটতে শিখছেন ঠিক সেই সময় ব্রহ্মলোক থেকে আরেক দেবতা ব্রাহ্মণীর গর্ভে এলেন। যথাসময়ে দ্বিতীয় ছেলেটিও ভূমিষ্ঠ হল। তার নাম রাখা হল নন্দকুমার।

আচার্যের কাছে দু ভাই লেখাপড়া শিখতে গেলেন। তাঁদের মত মেধাবী ছাত্র আচার্য এর আগে কম দেখেছেন। স্বল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা সর্ববিদ্যায় বিশারদ হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণ এবার তাঁর যুবক পুত্রের বিয়ে দিতে আগ্রহী হলেন। ব্রাহ্মণীকে বললেন, 'দেখ, শোনকুমার বেশ বড় হয়েছে, এবার ওর বিয়ে দিতে চাই।' শুনে ব্রাহ্মণী বললেন, 'নিশ্চয়ই, তবে শোনকে একবার জিজ্ঞেস করে নেওয়া দরকার।' ব্রাহ্মণী শোনকুমারের কাছে প্রস্তাবটি করতে তিনি বললেন, 'মা, গার্হস্থ্যধর্মে আমার মন নেই। যতদিন আপনারা বেঁচে আছেন আপনাদের সেবাযত্ন করব। আপনাদের দেহান্তর হলে আমি প্রব্রজ্যা নেব।'

শোনকুমারের কথা শোনার পর ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দুজনেই বেশ

বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। অনেক তপস্যা করে ছেলে পেয়েছেন তাঁরা। এখন সেই ছেলে যদি বিয়ে না করে প্রব্রজ্যা নিতে চায় এর থেকে দুঃখের আর কি আছে। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, তখন নন্দকুমারকে বললেন, 'বাছা, তোমার দাদা বলছেন বিবাহ করবেন না। তিনি প্রব্রজ্যা নেবেন। সুতরাং তুমি বিবাহ করে গার্হস্থ্য ব্রত নাও।'

'আমাকে মাফ করবেন।'

'কেন বাবা?'

'দাদা যে জিনিস ছুঁড়ে ফেলেছেন আমি তা তুলতে যাব না।'

'তুমি তাহলে কি করবে?'

'আমিও দাদার মতই প্রব্রজ্যা নেব।'

দু ছেলের মুখে একই কথা শুনে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁরা ভাবতে লাগলেন, 'তাহলে এই ধনরাশি, এত সম্পদ দিয়ে কি হবে। বাছারা এই কচি বয়সেই যদি সন্ন্যাস নিতে পারে তাহলে আমরাই বা কেন পারব না।' এই সব ভেবে শোন আর নন্দের বাবা-মা তাঁদের বললেন, 'দেখ, তোমরা যদি প্রব্রজ্যাই নিতে চাও তাহলে আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন দরকার নেই।'

'তা হয় না।'

'কেন?'

'আমরা আপনাদের ফেলে যেতে পারি না।'

'ফেলে যাবে কেন, আমরা সকলেই একসঙ্গে প্রব্রজ্যা নেব।'

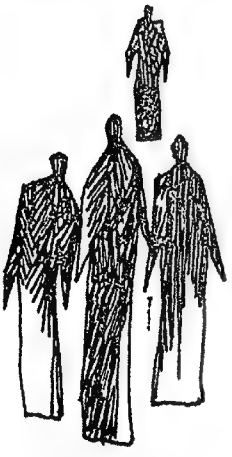

ব্রাহ্মণ তারপর রাজার অনুমতি নিয়ে নিজের সমস্ত ধনসম্পত্তি দান করে দিলেন। দাসদাসীদের মুক্ত করে দিলেন। তারপর চারজন একসঙ্গে ব্রহ্মবর্ধন ছেড়ে হিমবন্ত প্রদেশে এসে আশ্রম গড়লেন। চারজন সেখানে মহানন্দে থাকেন। বাবা-মার জন্য জল তুলে আনা, খাবার জোটানো, তাঁদের জটা পরিষ্কার করে দেওয়া —সব কাজই দু ভাই সমানভাবে করে। এভাবে কিছুদিন গেল।

একদিন নন্দ ভাবলেন, 'দাদার আগেই যদি ফল এনে আমি বাবা-মাকে খাওয়াতে পারি তাহলে আমার বেশি পুণ্য হবে।' এই ভেবে তিনি গাছ থেকে বুনো ফল এনে বাবা-মাকে দিতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী

সেই ফল খেয়েই পোষধ পালন করতেন। শোন দূর থেকে যেসব সুস্বাদু ফল বাবা-মার জন্য নিয়ে আসতেন তাঁরা সেগুলো খেতেন না।

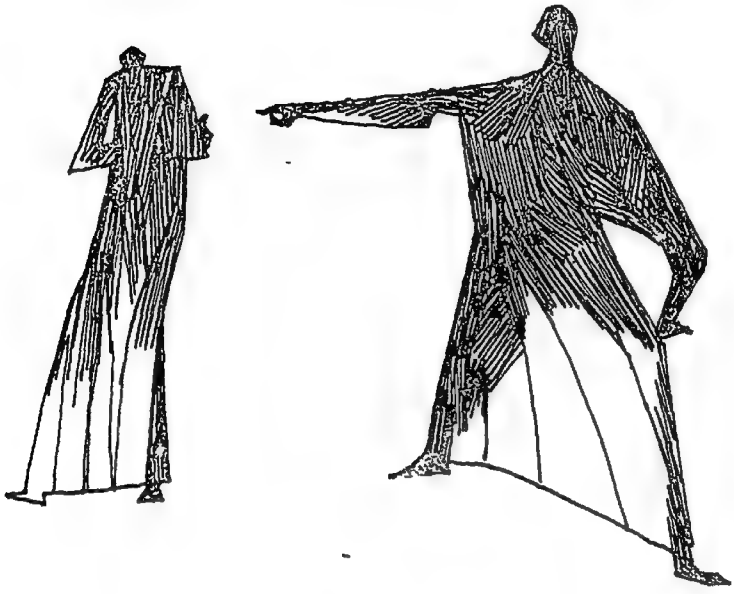

এভাবে পর পর সাতদিন শোনের আনা ফলগুলো নষ্ট হল। শোন দেখলেন, এই বুনো আধপাকা ফল খেতে থাকলে বাবা-মা বেশিদিন বাঁচতেই পারবেন না। তিনি নন্দকে ডেকে বললেন :

নন্দ, এখন থেকে তুমি ফল আনার পর অপেক্ষা করবে।

কেন দাদা ?

দুজনে একসঙ্গে বাবা-মাকে খাওয়াব।

নন্দ কিন্তু দাদার কথা কানেই নিলেন না। একা পুণ্য অর্জনের কামনায় তিনি তখন মত্ত। তখন শোনকুমার মনে মনে ঠিক করলেন, 'নন্দ যখন আমার কথা শুনছে না, অন্যায় করেই চলেছে, তখন ওকে দূর করে দেওয়াই উচিত।' একদিন নন্দকে ডেকে বললেন :

'দেখ ভাই নন্দ, তুমি উপদেশ শুনে চল না, পণ্ডিতদের কথা মান্য কর না। দুজনের মধ্যে আমিই বাবা-মার বড় ছেলে। বাবা-মার সেবা যত্ন আমারই কর্তব্য। এখন থেকে এঁদের রক্ষণাবেক্ষণ আমি একাই করব। তুমি আর এখানে থাকতে পারবে না। এখান থেকে চলে যাও।'

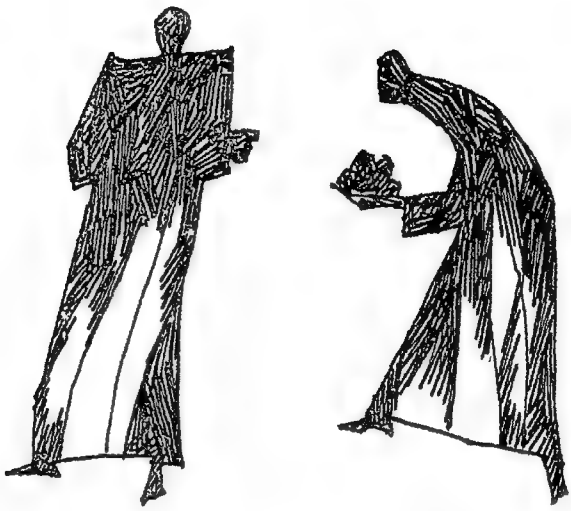

এরপর নন্দ বাবা-মার কাছে গিয়ে জানালেন বড় ভাই কি আদেশ করেছেন। তাবপর নিজের কুটিরে গেলেন। নন্দ নিজেব অপবাধ বুঝতে পেবেছিলেন। মনে মনে খুবই কষ্ট পাছিলেন। এ রকম অবস্থায তপস্যায় বসলেন। সেদিনের তপস্যায় নন্দ সিদ্ধিলাভ করলেন। সিদ্ধিলাভেব পর নন্দ ভাবতে লাগলেন, কি করে দাদার কাছে ক্ষমা পাওয়া যায়। আবার এ-ও ভাবতে লাগলেন, এমন কি কোন ভাবে কি দাদাব কাছে ক্ষমা পাওয়া যায় না যাতে শোন পণ্ডিতের সুনাম দশ দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তখন তাঁর মনে হল, 'যদি জম্বুদ্বীপের বাজাধিবাজ এবং অন্যান্য রাজাদের এনে নিজেব জন্য ক্ষমা চাওয়াতে পাবি তাহলে দু কুলই রক্ষা পায়।'

এই ভেবে তিনি নিজেব অলৌকিক ক্ষমতার বলে আকাশপথে এসে ব্রহ্মবর্ধন নগরেব রাজদ্বারে নামলেন। দুয়াবীকে বললেন, 'যাও, রাজাকে বল, এক তপস্বী আপনার সঙ্গে দেখা কবতে চান।' দুয়াবী গিযে বাজাকে জানাল। বাজা ভাবলেন, 'তপস্বী নিশ্চয়ই আমার কাছে খাবার দাবাব চাইবেন।' এই ভেবে তিনি নন্দকে খাবার পাঠালেন। নন্দ সেই খাবাব ছুঁলেন না। দুযাবীকে বললেন, 'বল, আমি বাজাব সেবা কবতে চাই।' বাজা জবাব পাঠালেন, 'আমাব বহু সেবক আছে।

তপস্বী তাঁর তপস্যার কাজেই রত থাকুন।' তখন নন্দ বললেন, 'রাজাকে গিয়ে বল, আমার অলৌকিক শক্তিতে তোমাদের রাজাকে সমগ্র জম্বুদ্বীপের রাজা করে দেব।'

রাজা এ প্রস্তাব ফেলে দিতে পারলেন না। 'তপস্বীরা অদ্ভুত শক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন শুনেছি। হয়ত ইনি এরকমই একজন শক্তিধর ব্যক্তি।' রাজা এলেন নন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করতে।

আপনি নাকি সমগ্র জম্বুদ্বীপের রাজ্য আমাকে দান করবেন?

হ্যাঁ মহারাজ।

কিভাবে?

ছোট একটা মশা যতটুকু রক্ত পান করে, ততটুকুও রক্তপাত না ঘটিয়ে আমি কাজটি সমাধা করব।

মহারাজাকে নন্দ বললেন, 'অবিলম্বে যাত্রা করতে হবে মহারাজ।' নন্দের কথা বিশ্বাস করে রাজা সেনা সাজিয়ে রওনা হলেন। সেনা-বাহিনীর চলার পথের সমস্ত বাধা নন্দ পণ্ডিত মন্ত্রবলে দূর করলেন। তাদের গায়ে প্রখর সূর্যতাপ লাগল না। বৃষ্টিও তাদের চলার পথ থেকে দূরেই থেকে গেল।

যেতে যেতে কোশল রাজ্য পড়ল। নগরের খানিক দূরে শিবির গড়ে দূতকে পাঠানো হল কোশলরাজের কাছে। দূত বলল, 'হয় যুদ্ধ করুন, না হয় বশ্যতা স্বীকার করুন।' কোশলরাজ সিংহবিক্রমে সৈন্য নিয়ে মনোজের সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধ শুরু হতেই নন্দ একটা কাজ করলেন। যে চামড়ার আসনটিতে তিনি বসে ছিলেন মন্ত্রবলে তা বিশাল করে নিলেন। দু পক্ষের মাঝখানে এভাবে তিনি বসে থাকায় তীরগুলো সব এসে চামড়ায় বিঁধে যেতে লাগল। দু পক্ষের কারও গায়েই তীর লাগছে না। এভাবে দীর্ঘক্ষণ চলার পর দু পক্ষেরই তীর ফুরিয়ে এল। দু পক্ষই ক্লান্ত।

নন্দপণ্ডিত তখন তাঁর চামড়ার আসন সমেত কোশলরাজকে দেখা দিলেন। তাঁকে বললেন, 'মহারাজ, নির্ভয়ে থাকুন। আপনিই আপনার রাজ্যের অধিকারী থাকবেন। রাজা মনোজ আপনার রাজত্ব গ্রহণ করবেন না। আপনি শুধু মৌখিকভাবে তাঁর বশ্যতা মেনে নিন।' কোশলরাজের সম্মত হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। নন্দপণ্ডিত তখন কোশলরাজকে রাজা মনোজের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ, কোশলরাজ আপনার বশ্যতা মেনে নিচ্ছেন। এখন এঁর রাজ্য এঁরই থাকুক।' মনোজও এতে রাজি হলেন।

এভাবে একে একে অঙ্গরাজ্য, মগধ ইত্যাদি জয় করে, সমগ্র জম্বুদ্বীপকে নিজের অধীনে এনে মনোজ সৈন্যসামন্তসহ ব্রহ্মবর্ধনে ফিরে এলেন। যুদ্ধ বিজয়ের পর রাজা মনোজ অন্য সব রাজাদের সঙ্গে পানাহারে মত্ত থাকলেন। নন্দপণ্ডিত ঠিক করলেন, এখন এক সপ্তাহ রাজা মনোজকে দেখা দেবেন না। তিনি একটু আনন্দ-ফূর্তি করে নিন। ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় রাজা মনোজের হঠাৎ মনে হল, 'যে তপস্বীর জন্য আমার এত জয়জয়কার তাঁকেই যে দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় গেলেন তিনি?'

রাজা মনোজ নন্দপণ্ডিতকে স্মরণ করা মাত্র নন্দপণ্ডিতও তা অনুভব করতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আকাশপথে এসে রাজাকে

দেখা দিলেন। মাঝ আকাশে নন্দপণ্ডিত বসে আছেন। রাজা মনোজ ভাবলেন, 'ইনি কি দেবতা না মানব, যক্ষ না কিন্নর? ইনি যদি মানব হন তাহলে জম্বুদ্বীপের আধিপত্য আমি এঁকেই দিয়ে দেব।'

'প্রভু, আপনি কি দেব না মানব?'

'আমি দেবতা নই, আমি তপস্বী।'

'আপনি আমাব অনেক উপকার করেছেন। আমি আপনার হাতে রাজ্য তুলে দিতে চাই।'

'রাজা, রাজ্যে আমার কোন বাসনা নেই। এ রাজ্যের অরণ্যে থাকেন শোন, তিনি আমাব দাদা। আমি শুধু তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তিনি পিতামাতার সেবাতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। আপনাদের সঙ্গে নিযে আমি শোনের কাছে যেতে চাই ক্ষমাপ্রার্থী হিসেবে।'

'আপনি যা বলবেন তাই হবে। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে শোন পণ্ডিতের কাছে যাব।'

নন্দপণ্ডিত বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে যেদিন শোন পণ্ডিতেব আশ্রমের দিকে চলেছেন, সেদিন শোন পণ্ডিতেরও ছোট ভাইযের কথা মনে পড়ছিল। সাত বছর সাত মাস কেটে গেল, নন্দব দেখা নেই। সে এখন কোথায় আছে—এই কথা ভাবা মাত্র শোন পণ্ডিত দেখলেন, রাজা ও রাজসৈন্যদের সঙ্গে নিযে নন্দ আশ্রমের দিকে আসছেন। শোন পণ্ডিত বুঝলেন, নন্দ এই রাজাদের কিছু অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছেন। এখন এই রাজারা ভাবছেন শোন পণ্ডিতের মত এক সামান্য তপস্বী কি করে নন্দপণ্ডিতকে তাড়িয়ে দেন। শোন পণ্ডিত তখন দূরের হ্রদ থেকে জল আনার জন্য আকাশপথে যেতে লাগলেন। রাজা মনোজ তাঁকে দেখলেন। নন্দ শোন পণ্ডিতকে আসতে দেখে লুকিযে পড়লেন। মনোজ তখন শোনেব পরিচয জানতে চাইলেন। তিনি শোনের প্রতি শ্রদ্ধাবান হলেন।

এর পরের অংশ সংক্ষিপ্ত। নন্দ শোনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে বললেন, 'আপনি অনেকদিন বাবা-মার সেবা করেছেন। এবার আপনি আমাকে এ সুযোগ দিন। বাবা-মার সেবাযত্ন করাই স্বর্গে যাওয়ার প্রশস্ত পথ। আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন না।'

এর উত্তরে শোন বললেন, বড় ছেলেরই অধিকার রয়েছে বাবা-মার সেবা করার। ছোটরা বড়দের মান্য করে চলবে এটাই রীতি।' নন্দ তখন নিজের ত্রুটি স্বীকার করলেন। শোনও ভাইকে ক্ষমা করলেন। নন্দ মাকে সেবা করার দায়িত্ব পেলেন। শোন পণ্ডিতের কাঁধে রইল পিতার সেবার দায়িত্ব।

শোনক জাতক

১

মগধরাজ তখন রাজগৃহ নগরে রাজত্ব করেন। মগধরাজের প্রধানা মহিষীর গর্ভে জন্ম নেন বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্বের নাম রাখা হল অরিন্দমকুমার। অরিন্দমকুমারের জন্ম আর পুরোহিতের এক ছেলের জন্ম একই দিনে হয়েছিল। পুরোহিতের ছেলের নাম রাখা হয় শোনকুমার।

অরিন্দমকুমার আর শোনকুমার একসঙ্গে হেসে খেলে বেড়ে উঠতে লাগলেন। যথাসময়ে বিদ্যা শিক্ষার জন্য দুজনে তক্ষশিলায় গেলেন। নিষ্ঠার সঙ্গে আচার্যের কাছে সর্ববিদ্যা শিখলেন। তারপর দুজনে তক্ষশিলা থেকে রওনা দিলেন। নানারকম জাতি-গোষ্ঠীর লোকদের আচার-আচরণ ও লোকচরিত্র জানার জন্য কুমাররা ঘুরতে লাগলেন।

এদেশ সেদেশ ঘুরে এক সময় দুজনে এলেন বারাণসীতে বারাণসীর রাজার বাগানে ঢুকলেন খানিক জিরিয়ে নিতে। পরের দিন সকালবেলায় তাঁরা বারাণসী নগরে ঢুকলেন। সেই দিনটি ছিল এক পুণ্য দিন। বারাণসী নগরের অনেকেই নিজের নিজের বাড়িতে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করেছিলেন। অরিন্দমকুমার ও শোনকুমারকে তারা রাজপথ দিয়ে যেতে দেখল। এই সুন্দর যুবাদের তারা ব্রাহ্মণ বলে ধরে নিয়ে গেল।

কুমারদের বসার জন্য দু রকমের আসন দেওয়া হল। সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা আসনটিতে তারা অরিন্দমকুমারকে বসতে দিল। শোনকে বসতে দেওয়া হল লাল কম্বলে ঢাকা একটি আসনে। শোনকুমার এই লক্ষণ দেখে বুঝতে পারলেন, 'আমার প্রিয় বন্ধু আজ বারাণসীর রাজা হবে, আর আমি হব সেনাপতি।' খাওয়া-দাওয়া সেরে দুজনে আবার সেই রাজ-বাগানে ফিরে গেলেন।

যেদিন এ ঘটনা ঘটে তার ঠিক দু দিন আগে বারাণসীরাজের মৃত্যু হয়েছিল। রাজার কোন ছেলে ছিল না। রাজকুলে কারও পুত্র সন্তান নেই। রাজার অমাত্যরা পুষ্পরথ বানালেন। তারপর সকলে

সমস্বরে বললেন, 'হে রথ, রাজা হওয়ার যোগ্য যিনি,তার কাছে যাও।' রথটি এপথ-সেপথ ঘুরে রাজার বাগানের সামনে থেমে গেল।

অরিন্দমকুমার তখন তাঁর উত্তরীয়টি মাথার তলায় দিয়ে পাথরের ওপর শুয়েছিলেন। শোনকুমার বসেছিলেন বোধিসত্ত্বের পায়ের কাছে। রাজকীয় বাজনা শুনে শোনকুমার বুঝতে পারলেন, 'বন্ধুকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রথ এসে গেছে। রাজা হয়েই আমার প্রিয় বন্ধু আমাকে সেনাপতি করবেন। কিন্তু ঐশ্বর্য নিয়ে আমি কি করব? ক্ষমতা দিয়েই বা কি করব? বরং অরিন্দমকে রথে করে নিয়ে যাওয়ামাত্র আমি এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব। প্রব্রজ্যা নেব।' মনে মনে এসব ভেবে শোনকুমার আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন।

পুষ্প রথ থেকে রাজপুরোহিত নেমে এলেন। বাগানে ঢুকে ঘুমন্ত বোধিসত্ত্বকে দেখে তিনি রাজনদারদের বললেন 'বাজনা বাজাও।' বাজনা শুনে অরিন্দমকুমারের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি উঠে বসলেন। পুরোহিত তখন হাতজোড় করে বললেন, 'প্রভু, রাজলক্ষ্মী আপনাকে বরণ করতে এসেছেন।'

অরিন্দমকুমার ॥ রাজকুলে কি কোন পুরুষ নেই?

পুরোহিত ॥ না প্রভু।

অরিন্দমকুমার ॥ তাহলে আমি রাজি হচ্ছি।

রাজার বাগানেই অভিষেকপর্ব সারা হল। তারপর সবাই বোধিসত্ত্বকে রথে তুলে জয়ধ্বনি দিতে দিতে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল। প্রাসাদে পৌঁছে রাজকীয় সুখে বোধিসত্ত্ব ডুবে গেলেন। বন্ধুর কথা একেবারে ভুলে গেলেন।

এদিকে অরিন্দমকুমার চলে যাওয়ার পর শোন লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এলেন। যে পাথরের ওপর অরিন্দমকুমার শুয়েছিলেন সেখানে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে একটি বিবর্ণ শালপাতা শোনের গায়ে উড়ে এসে পড়ল। শোন শালপাতাটি হাতে তুলে নিয়ে দেখতে লাগলেন। ভাবলেন, এই পাতাটি একদিন কচি ছিল। তখন ওর রঙ ছিল সবুজ। এখন জরায় পাতাটি হলুদ হয়েছে। মানুষের জীবনও ঠিক এই শালপাতাটির মতই। এই ভাবনায় তিনি তলিয়ে গেলেন। তপস্বীরা দীর্ঘদিন তপস্যা করে যে ফল লাভ করেন, শোন গভীরভাবে ভাবতে পারায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তা লাভ করলেন। তার শরীর থেকে গৃহী মানুষের সমস্ত চিহ্ন খসে পড়ল।

বদলে ফুটে উঠতে লাগল প্রকৃত তপস্বীর চিহ্নগুলি। শোন তখন নন্দমূলক গুহার দিকে যাত্রা করলেন।

এই ঘটনার পর চল্লিশটি বছর কেটে গেছে। চল্লিশ বছর পরে হঠাৎ একদিন বোধিসত্ত্বের শোনের কথা মনে পড়ল। তিনি সেই মুহূর্তে বন্ধুকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। কেন এতদিন তিনি শোনকে ভুলে রইলেন। চারদিকে চর পাঠালেন শোনের খোঁজে। একে একে চররা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। রাজা পুরস্কার ঘোষণা করলেন। তারপর মনের দুঃখে শোনকে নিয়ে একটি গান বেঁধে নিয়ে সেই গানটি গাইতে লাগলেন। রাজার অমাত্যরা দেখলেন এটি রাজার প্রিয় গান। রাজার প্রিয় হওয়ার জন্য তাঁরাও সেই গানটি গাইতে শুরু করে দিলেন। প্রজারাও গানটি লিখে নিল। এভাবে সমস্ত বারাণসীতে ওগো বন্ধু শোন' গানটি অহরহ শোনা যেতে লাগল।

২

এভাবে কেটে গেল আর দশটি বছর। মহারাজ অরিন্দম তখন বহু সন্তানের জনক। বড় ছেলের নাম ছিল দীর্ঘায়ুঃকুমার।

এদিকে তপস্বী শোনও একদিন ভাবলেন, 'অরিন্দম বেশ কিছুকাল যাবৎ আমাকে দেখার জন্য আকুল হয়েছে। আমি এবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব। তাঁকে বুঝিয়ে বলব সংসার কত অসার জিনিস। বিষয়সুখ আবর্জনার তুল্য। এভাবে তাঁর জ্ঞানচক্ষু খুলতে সাহায্য করব। তাঁকে প্রব্রজ্যা নেওয়াব।'

এরপর শোন ঋষি আকাশপথে যাত্রা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এসে উপস্থিত হলেন রাজার বাগানে। সেখানে আসন বিছিয়ে বসলেন। তপস্যায় মগ্ন হলেন। পঞ্চচূড়ক নামে এক বালককে তার মা রাজার বাগানে পাঠিয়েছিলেন কাঠ কুড়িয়ে আনতে। পঞ্চচূড়ক রাজার প্রিয় গানটি 'ওগো বন্ধু শোন' গাইতে গাইতে বাগানে ঢুকল। ছেলেটি কাঠ কুড়োতে কুড়োতে বারবার ঐ একই গান গাইছে দেখে শোন জিজ্ঞেস করলেন, 'বাছা, তুমি এই একটা গান ছাড়া আর কোন গান জান না?'

'জানি আচার্য।'

'তাহলে কেন বারবার এই গানটি গাইছ?'

'আমাদের রাজার প্রিয় গান এটি।'

'এ গানের পাল্টা গান জান?'

'না আচার্য।'

'আমি যদি তোমাকে শিখিয়ে দিই তাহলে রাজার সামনে গিয়ে সেটা গাইতে পারবে?'

'পারব।'

'এস, তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি।'

'শুনেছি শোন কোথায় আছে, দেখেছিও তাঁকে' এই গানটি শোন ছেলেটিকে শিখিয়ে দিলেন। ছেলেটি গান শিখে শোন ঋষিকে বলে গেল, 'আচার্য, আমি যতক্ষণ না রাজাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসছি ততক্ষণ আপনি দয়া করে এখানেই থাকবেন।' শোন বললেন, 'তথাস্তু।'

ছেলেটি বাড়িতে ফিরে গিয়ে তার মাকে বলল, 'মা, আমাকে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়ে দাও।' স্নান করে পরিষ্কার জামাকাপড় পরে সে রাজপ্রসাদের কাছে এসে দ্বারীকে বলল, 'আপনি রাজাকে বলুন তাঁর সঙ্গে গান গাইবার জন্য একটি ছেলে বাইরে অপেক্ষা করছে।' রাজা সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চচূড়ককে ডাকিয়ে আনলেন।

'তুমি নাকি আমার সঙ্গে গান করতে চাও?'

'হ্যাঁ মহারাজ।'

'বেশ, গান কর তাহলে।'

'না মহারাজ, আমি এখানে গাইব না।'

'কোথায় গাইবে?'

'আপনি ভেরি বাজিয়ে অনেক লোক আনান।'

রাজা তাই করলেন। তারপর পঞ্চচূড়ককে বললেন, 'এবার গান কর।' পঞ্চচূড়ক বলল, 'মহারাজ, প্রথমে আপনি আপনার গানটি করুন। আমি আর একটা পাল্টা গান গাইব।' রাজা তখন 'ওগো বন্ধু শোন তুমি কোথায় আছ' গানটা গাইলেন। পঞ্চচূড়ক তারপর গান ধরল। রাজা তখন তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কোথায় তাঁকে দেখেছ? কোন্ শহরে, কোন্ বনে?' পঞ্চচূড়ক বলল, 'মহারাজ, এই শহরেই। আপনারই বাগানে তিনি আছেন, চলুন।'

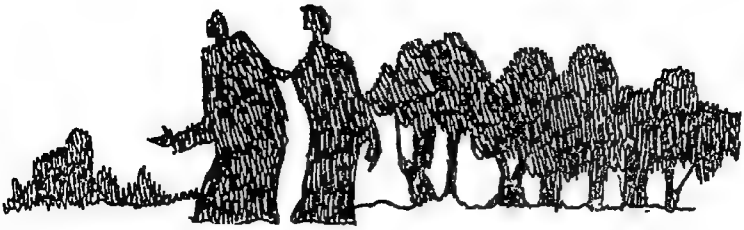

বাগানে এসে রাজা শোনের দীন বেশ শুকনো চেহারা দেখে ভাবলেন, 'শোন বেচারা নেহাতই দুঃখে আছে।' ফলে তিনি অনুকম্পা প্রকাশ করে কথা বলতে লাগলেন। শোন রাজার ভাবভঙ্গি দেখে বুঝলেন, ভোগলালসার মধ্যে থেকে রাজার স্বভাবে বিকৃতি এসেছে। তিনি স্পষ্ট ভাবে রাজাকে বললেন, 'শুনুন রাজন, আমি আপনার কৃপাপ্রার্থী নই।'

শোন বললেন, 'ভোগে গলা অবধি ডুবে থেকে তোমার কাণ্ডজ্ঞানও যেতে বসেছে। তোমার মত যাদের অবস্থা হয় মৃত্যুর পর তাদের নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তুমি এখন থেকেই সতর্ক হও।' তারপর ধর্মকথা ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। শোন ঋষির প্রশান্ত মনের প্রভাব পড়ল রাজার ওপর। শেষে শোন তাঁকে প্রস্তাব দিলেন, 'তোমার এখন প্রব্রজ্যা নেওয়া উচিত।' এই পরামর্শ দান করে শোন আকাশপথে উড়ে চলে গেলেন। রাজার অন্তরাত্মায় ঘটে গেল এক বিরাট পরিবর্তন।

রাজা প্রব্রজ্যা নেবেন স্থির করলেন। অমাত্যরা কেউ সমর্থন করল, কেউ বা আপত্তি জানাল। কিন্তু রাজা অটল রইলেন। দীর্ঘায়ুঃকুমারকে রাজপদে অধিষ্ঠিত হতে বলে তিনি গৃহত্যাগ করলেন।

সম্বুলা জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের স্বস্তিসেন নামে একটি ছেলে ছিল। বড় হলে রাজা তাঁকে যুবরাজ করলেন। স্বস্তিসেনের প্রধানা মহিষী সম্বুলা ছিলেন অসামান্যা রূপবতী। বেশ আমোদ-আনন্দে তাঁদের দিন কাটত।

দুঃখের বিষয় হঠাৎ আকাশ অন্ধকার করে দুর্যোগ নেমে এল স্বস্তিসেন ও সম্বুলার জীবনে। স্বস্তিসেন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলেন। তাঁর শরীর খসে খসে পড়তে লাগল। দুঃখে-বিষাদে স্বস্তিসেন ঠিক করলেন তিনি বনবাসী হবেন। সেখানেই প্রাণত্যাগ করবেন। সম্বুলা তাঁর অনুগামী হতে চাইলেন। স্বস্তিসেন তাঁকে অনেক বোঝালেন। বললেন, তোমার শরীরে আমার মত পচন ধরে নি, কেন তুমি আমার সঙ্গে আসবে।' সম্বুলা জানালেন, 'আপনার সেবা করাই আমার ব্রত। সেই ব্রত পালন করতেই আমি আপনার অনুগামী হব।'

স্বস্তিসেন বাবা-মার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তাঁরা কাঁদতে লাগলেন। সম্বুলাকে সঙ্গে নিয়ে স্বস্তিসেন চললেন অরণ্যের দিকে। ছায়াদায়ী একটি বিশাল গাছের তলায় তাঁরা কুটির বানালেন।

সম্বুলা রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে স্বস্তিসেনের হাত-মুখ ধোয়ার জল এনে দিতেন। দাঁত মাজার জন্য দাঁতন কাঠি যোগাতেন। তারপর তাঁকে কয়েকটি পাকা ফল খাইয়ে কুড়ি, খন্তা প্রভৃতি নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। সারাটা সকাল বনে বনে ঘুরে ফলমূল যোগাড় করতেন। ফিরে আসতেন মাঝ দুপুরে। তখন আরেক দফা স্বস্তিসেনের সেবা করতেন। ঘা-গুলো ধুইয়ে দিতেন। বনৌষধি বেটে ঘায়ের ওপর লাগিয়ে দিতেন। তারপর তাঁকে খাইয়ে নিজে খেয়ে নিতেন। স্বস্তিসেনের সারা গায়ে হাত বুলিয়ে তাঁকে ঘুম পাড়াতেন। নিজে পাশে শুয়ে থাকতেন।

একদিন সম্বুলা ফলমূল যোগাড় করতে বেরিয়ে একটি হ্রদের সামনে এলেন। ভাবলেন, 'স্নান করে নিই।' স্নান সেরে যখন উঠে আসছেন তখন দেখলেন এক কিম্ভূতকিমাকার দৈত্য তাঁর দিকে

এগিয়ে আসছে। সম্বুলা দেখলেন মহা বিপদ। যদি তিনি এই দৈত্যের পেটে যান তাহলে স্বস্তিসেনের দুঃখের শেষ থাকবে না। সম্বুলা দানবের বিকট চেহারা দেখে আতঙ্কিত হয়ে দেবতাদের সাহায্য চাইতে লাগলেন। তাতে স্বর্গে শক্রর আসন টলে উঠল। তিনি বুঝলেন সম্বুলা বিপদে পড়েছেন। শক্র সম্বুলাকে রক্ষা করতে ছুটে এলেন। দানবের মাথার ঠিক ওপরে বজ্র রেখে বললেন, 'সম্বুলার দিকে এক পা এগোলে তোর মাথা দু টুকরো হয়ে যাবে।' তারপর ভাবলেন, 'দৈত্যটা হয়ত এখন সম্বুলাকে ছেড়ে দেবে, কিন্তু পরে সুযোগ পেলেই আবার ধরবে।' এই ভেবে শক্র দৈত্যটাকে শেকলে বেঁধে এক পাহাড়ের গুহায় বন্দী করে রাখলেন। আর সম্বুলাকে বললেন, 'হে শীলবতী নারী, তোমার কোন ভয় নেই, তুমি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

এত সব কাণ্ডের পর সম্বুলার ফিরে আসতে দেরি হয়ে গেল। ফিরে এসে দেখেন স্বস্তিসেন কুটিরে নেই। তাতে তিনি খুবই ভয় পেয়ে গেলেন। 'ঐ জীর্ণ শরীর নিয়ে কোথায় গেলেন স্বস্তিসেন' এইসব ভাবতে লাগলেন। বিলাপ করতে লাগলেন। কিছু পরে স্বস্তিসেন ফিরে এলে সম্বুলা তাঁকে সমস্ত ঘটনাটি খুলে বললেন। স্বস্তিসেন কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করলেন না। তিনি সে কথা প্রকাশও করলেন, 'মেয়েরা কথায় কথায় মিথ্যে কথা বলে। কে জানে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

স্বস্তিসেনের কথায় সম্বুলা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তিনি এক অসম্ভব প্রতিজ্ঞা করে বসলেন: 'যদি আমি সত্যি কথা বলে থাকি, সত্য পথে চলে থাকি, তাহলে এসব সত্যক্রিয়ার জোরে এই মাটির কলসীর জল আমি আপনার শরীরে ঢালব, আর তাতেই আপনার রোগ সেরে যাবে। যদি তা না সারে তাহলে বুঝবেন আমি মিথ্যে বলেছি।' সম্বুলা দেবতাদের স্মরণ করে কলসীর জল স্বস্তিসেনের মাথায় ঢেলে দিলেন। তাঁর সারা শরীর ধুইয়ে দিলেন।

তামার কলসের দাগ যেমন তেঁতুল দিয়ে মাজলেই উঠে যায় ঠিক সেইরকম কাণ্ড ঘটল। স্বস্তিসেনের ঘাগুলো তো মিলিয়ে গেলই, এমন কি ঘায়ের কোন দাগও রইল না। স্বস্তিসেন যেন নতুন জীবন ফিরে পেলেন।

এরপর স্বস্তিসেন আর সম্বুলা বারাণসীর উদ্দেশে রওনা হলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত স্বস্তিসেনের দেহলাবণ্য ফিরে এসেছে দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন। স্বস্তিসেনকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করে প্রব্রজ্যা নিলেন। তবে ব্রহ্মদত্ত অরণ্যে গেলেন না। তিনি রাজবাড়ির বাগানেই কুটির গড়ে নিয়ে থাকতে লাগলেন। সারাদিনে একবার প্রাসাদে আসতেন খেতে।

এদিকে স্বস্তিসেন রাজা হওয়ার পর অতীতের কথা সবই ভুলে গেলেন। বিষয়সুখে তিনি সম্পূর্ণ ডুবে গেলেন। শিকার, গান-বাজনা আর নানারকম স্ফূর্তিতে স্বস্তিসেনের সময় কেটে যায়। সারাদিনে একবারও সম্বুলার খোঁজ নেওয়ার সুযোগ পেতেন না তিনি। দুঃখকষ্টে সম্বুলার মন ভেঙ্গে পড়ল। তাঁর শরীর আর আগের মত রইল না। সোনার মত রঙ ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। পাতলা চামড়ার ওপর দড়িদড়ার মত জেগে উঠল শিরাগুলো।

একদিন তপস্বী ব্রহ্মদত্ত প্রাসাদে এসেছেন, সম্বুলা তাঁকে খেতে দিয়ে তাঁর সামনে বসে আছেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, তোমার কিসের দুঃখ। কে তোমার দুঃখের কারণ আমাকে বল।' সম্বুলা তখন তাঁকে সব খুলে বলে কেঁদে ফেললেন।

এরপর ব্রহ্মদত্ত স্বস্তিসেনকে ডেকে বললেন, 'তুমি যা করে চলেছ, শাস্ত্রে একে মিত্রদ্রোহিতা বলে। মিত্রদ্রোহীকে মৃত্যুর পর নরকবাস করতে হয়। সম্বুলার জন্যই তুমি নবজীবন ফিরে পেয়েছ। সেই সম্বুলা বেঁচে আছে না মরে গেছে তুমি খোঁজও নাও না।' স্বস্তিসেনের হুঁশ ফিরল। একে একে সব কথা তাঁর মনে পড়ল। বাকি জীবন স্বস্তিসেন-সম্বুলা খুব আনন্দের সঙ্গেই কাটালেন।

মহাহংস জাতক

১

পুরাকালে বারাণসীরাজের নাম ছিল সংযম। সংযমের প্রধানা মহিষীর নাম ক্ষেমা। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন বোধিসত্ত্ব জন্ম নিয়েছিলেন হংসকুলে। ন হাজার হাঁসের দলপতি তিনি। ন হাজার হাঁসসমেত চিত্রকূট পর্বতে থাকেন।

একদিন ক্ষেমাদেবী এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন :

সোনার রঙের হাঁসেরা রাজপালঙ্কে বসে আছে। মানুষের ভাষায় তারা কথা বলছে। তাদের গলার স্বর খুবই মিষ্টি। আর কথাগুলোও চমৎকার। সবই ধর্মকথা। শুনতে শুনতে ক্ষেমা বলে উঠলেন, 'সাধু! সাধু!' হঠাৎ সেইসব সোনার হাঁস জানলা দিয়ে উড়ে চলে গেল।

এভাবে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। তার আগে ক্ষেমাদেবী 'ধর, ধর, হাঁসগুলো পালিয়ে যাচ্ছে রে' বলে হাত বাড়িয়ে উঠে বসেছিলেন। দাসীরা তা শুনে হেসে ফেলল, 'এখানে হাঁস কোথায় রাণীমা?'

ক্ষেমাদেবী বুঝলেন এতক্ষণ তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলেও তিনি কিছুতেই মানতে পারলেন যে স্বপ্ন মিথ্যে। ভেবে দেখলেন, 'যা নেই, যা কোনকালে ছিল না, এমন জিনিস তো আমি স্বপ্নে দেখি না। তাহলে কোথাও নিশ্চয়ই সোনার হাঁস আছে যারা ধর্মকথা বলে।' ক্ষেমাদেবী দাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করে অসুস্থতার ভান করে বিছানায় শুয়ে রইলেন। দরজায় খিল পড়ল।

সারাদিনে একবারও দরজা না খোলায় রাজা নিজে এলেন ক্ষেমাদেবীর কাছে। দরজায় টোকা দিতে দাসীরা ভেতর থেকে দরজা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। সংযম রাণীর শিয়রে এসে দাঁড়ালেন। ক্ষেমার মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন।

'কি হয়েছে?'

'কিছু না।'

'গোপন কোরো না ক্ষেমা।'

'সামান্য ব্যাপার মহারাজ।'

'যত সামান্যই হোক তুমি আমাকে বল।'

'সে কথা শুনলে আপনি হাসবেন।'

'তুমি নির্ভয়ে বল।'

'মহারাজ, আমি স্বপ্নে এক সোনার হাঁসকে দেখেছি। সে আমাকে মধুর স্বরে ধর্মকথা শোনাচ্ছিল।'

'বেশ।'

'এখন ঐ হাঁসটির কাছে আমি আবার ধর্মকথা শুনতে চাই। আর তা না পারলে আমার পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব।'

'এ পৃথিবীতে কোথাও যদি ঐ রকম সোনার বরণ হাঁস থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে।'

এরপর রাজা সংযম অমাত্যদের ডেকে ঘটনাটি জানিয়ে পরামর্শ চাইলেন। অমাত্যরা অনেক ভেবে বললেন, 'দেখুন মহারাজ, সোনার হাঁসের কথা আমরা কখনও শুনিনি, দেখা তো দূরের কথা।' রাজা তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'সোনার হাঁসের কথা কে জানতে পারেন বলুন দেখি।' অমাত্যরা তখন বললেন, 'মহারাজ, ব্রাহ্মণরা অনেক সময় অনেক অদ্ভুত জিনিসের খোঁজ রাখেন। আপনি তাঁদের জিজ্ঞেস করুন।'

ব্রাহ্মণদের খবর পাঠানো হল। তাঁরা বললেন, 'হ্যাঁ মহারাজ, বাপঠাকুর্দার মুখে শুনেছি বটে কোন কোন প্রাণীর গায়ের রঙ সোনার মত হয়ে থাকে। এ-ও শুনেছি ধৃতরাষ্ট্রকুলে যেসব হাঁস জন্মায় তারা নাকি ধার্মিক এবং জ্ঞানবান হয়ে থাকে।'

ধৃতরাষ্ট্রকুলের ঐ হাঁসদের কোথায় পাওয়া যাবে সে কথা অবশ্য ব্রাহ্মণরা বলতে পারলেন না। তাঁরা পরামর্শ দিলেন, 'আপনি রাজ্যের সব ব্যাধদের ডেকে খোঁজ নিন। তারা জানলেও জানতে পারে।' ব্যাধদের ডাকা হলে তাদের দলপতি বলল, 'বাপঠাকুর্দার মুখে শুনেছি সোনার হাঁস হয়।'

'কিন্তু তারা থাকে কোথায়?'

'যতদূর জানি হিমবন্ত প্রদেশে।'

'হিমবন্ত প্রদেশের কোথায়?'

'চিত্রকূট পর্বতে।'

'এদের ধরা যায় কিভাবে?'

'তা তো জানি না মহারাজ।'

রাজা আবার ব্রাহ্মণদের পরামর্শ চাইলেন, 'কিভাবে সোনার হাঁসকে ধরা যায়।' ব্রাহ্মণরা বললেন, 'মহারাজ, সোনার হাঁস ধরার জন্য চিত্রকূটে যাওয়ার দরকার নেই। তারা নিজেরাই যাতে বারাণসীতে আসে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।' এই বলে ব্রাহ্মণরা এক অভিনব পরিকল্পনার কথা বললেন।

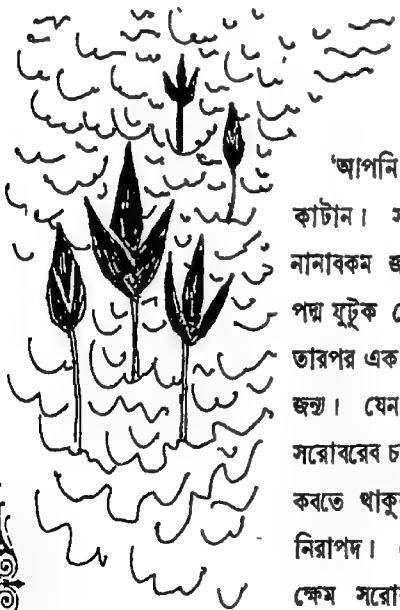

'আপনি বারাণসী নগরের উত্তরদিকে বড়সড় একটি সরোবর কাটান। সরোবরটি জলে টইটম্বুর করে তুলুন। আর সেখানে নানারকম জলজ গাছ-লতা লাগাবারও ব্যবস্থা করুন। পাঁচ রঙের পদ্ম ফুটুক সেই সরোবরে। সরোবরের নাম দিন ক্ষেম-সরোবর। তারপর এক বুদ্ধিমান ব্যাধকে নিযুক্ত করুন সরোবরটি পাহারা দেওয়ার জন্য। যেন কোন লোক ঐ সরোবরের কাছে যেতে না পারে। ঐ সরোবরের চার কোণে সর্বক্ষণ চারজন ঘোষক দাঁড়িয়ে থেকে ঘোষণা করতে থাকুক, এই সরোবর অভয়-সরোবর। এখানে সমস্ত প্রাণীই নিরাপদ। একবার এরকমটি করা হলে অনেক পাখি দূরদূরান্ত থেকে ক্ষেম সরোবরে আসবে। একসময় ধৃতরাষ্ট্র বংশজাত হাঁসরাও আসবে। তখন নরম জাল দিয়ে তাদের ধরতে হবে।'

যথাসময়ে ক্ষেম সরোবর তৈরি হল। রাজা ব্যাধকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন কখন কোন্ জাতের পাখিরা আসছে ব্যাধ যেন সে খবর রাজাকে দিয়ে যায়। সোনার হাঁস আসার খবর যেদিন ব্যাধ আনতে পারবে সেদিন সে অঢেল পুরস্কার পাবে। যে ব্যাধ ক্ষেম সরোবর পাহারা দিত তার নতুন নাম হল ক্ষেম-নিষাদ। ক্ষেম-নিষাদ প্রতিদিন রাজাকে খবর দিয়ে আসত কি পাখি আসছে। পাণ্ডু হাঁস, শ্বেত হাঁস মনঃশিলা হাঁস ইত্যাদি নিয়মিত আসতে লাগল।

পাখিদের মুখে মুখে ঐ সরোবরের খবর ধৃতরাষ্ট্র হাঁসরা পেল। তখন তারা সুমুখ হংসরাজকে বোধিসত্ত্বের কাছে পাঠাল। সুমুখ গিয়ে বোধিসত্ত্বকে বলল, 'প্রভু, আমরা অভয় সরোবরে চরতে যেতে চাই।' বোধিসত্ত্ব বললেন, 'দেখ, মানুষ নানারকম কৌশল খাটায়। আমাদের সুবিধের জন্য তারা কিছু করবে না। নিশ্চয়ই ওরা আমাদের জালে আটকাতে চাইছে। তোমরা ওখানে যেতে চেয়ো না।'

'কিন্তু প্রভু, আমাদের খুবই ইচ্ছে করছে।'

'এতে বিপদ হতে পারে।'

'কেন, অন্য হাঁসরা তো রোজই চরে ফিরে আসছে।'

বোধিসত্ত্ব দেখলেন সুমুখকে যখন বোঝানো গেল না তখন আর উপায় নেই। হাঁসের দল ক্ষেম সরোবরের উদ্দেশে উড়ে চলল।

প্রথম দিন সুবর্ণহংসের দল আসার পরেই ক্ষেম-নিষাদ রাজাকে গিয়ে খবর দিল। রাজা ব্যাধকে প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে বললেন, 'এবার তুমি দেখ, কিভাবে অক্ষত অবস্থায় ওদের একজনকে ধরতে পার। ধরা পড়লে তুমি আরও পুরস্কার পাবে।'

ব্যাধ ফিরে এল। এবার সে ফাঁদ বানিয়ে সাত দিন অপেক্ষা করল। তারপর দেখল এদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর যে হাঁসটি, সে রোজ এসে একই জায়গায় নামে। সেখান থেকেই জলজ-গুল্ম খেতে শুরু করে। ক্ষেম-নিষাদ ঠিক সেই জায়গাটিতেই ফাঁদ পেতে রাখল। বোধিসত্ত্ব পরের দিন এসে জলে নামা মাত্র ফাঁদে পড়লেন। ফাঁদ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁর পায়ের মাংস কেটে গেল শিরা ছিঁড়ে গেল। আরও টানাটানি করলে পা-টি

হারাতে হয়। রাজাদের অঙ্গহানি হওয়া খুবই খারাপ। সেজন্য তিনি চুপ করে রইলেন। আবার, ফাঁদে পড়েছেন বলে যে ডেকে উঠবেন, তা-ও করলেন না। হাঁসের দল তাহলে ভয় পেয়ে উড়ে যাবে। কিন্তু খালি পেটে চিত্রকূট পর্বত পর্যন্ত উড়ে যেতে পারবে না। মাঝপথে সমুদ্রে পড়ে তারা মারা যাবে।

হাঁসের দলের খাওয়া যখন শেষ হওয়ার মুখে, বোধিসত্ত্ব তখন ডেকে উঠলেন। সেই ডাকে বাকি সবাই বুঝল, কেউ একজন ফাঁদে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশাল হাঁসের দল আকাশে উড়ে গেল। তিনটি সারিতে তারা উড়ে চলল চিত্রকূট পাহাড়ের দিকে। সুমুখ দেখলেন, তিনটি সারির কোনটিতেই বোধিসত্ত্ব নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফিরে এলেন বোধিসত্ত্বের কাছে। ক্ষেম-নিষাদ তখন এগিয়ে আসছে ফাঁদের হাঁসটিকে ধরতে। সুমুখ মানুষের ভাষায় ব্যাধের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

'তোমার নাম কি?'

'আমার নাম ক্ষেম-নিষাদ।'

'ক্ষেম, শোন। তুমি যাঁকে ফাঁদে বন্দী করেছ তিনি সামান্য হাঁস নন। ইনি জ্ঞানী, ধার্মিক আর ন হাজার হাঁসের দলপতি।'

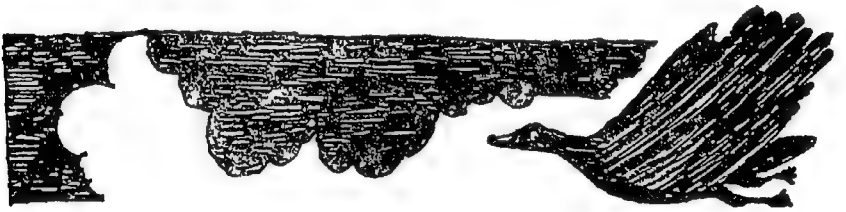

ক্ষেম-নিষাদ হাঁসের কথা শুনে বেশ অবাক হল। বিশেষ করে সুমুখ যখন বলল, 'আমি এঁর সেনাপতি। ওঁকে বন্দী করে যা লাভ করবে, আমাকে বন্দী করতে তার চেয়ে কম কিছু পাবে না। সুতরাং এঁকে ছেড়ে দাও। আমাকে নিয়ে চল।'

ব্যাধের মধ্যে মৈত্রীভাব জেগে উঠল। সে বোধিসত্ত্বের কাটা জায়গা জল দিয়ে ধুয়ে দিতে লাগল। মৈত্রীভাবের গুণে বোধিসত্ত্বের কাটা পায়ের মাংস চামড়া ঠিকমত জুড়ে গেল। ছেঁড়া শিরাও যুক্ত হল। তিনি তার আগের পা-টিই যেন ফিরে পেলেন। আর এ সবই ঘটল ব্যাধের মধ্যে সুমুখ যে মৈত্রীভাব জাগিয়ে তুলেছিল তার গুণে। ব্যাধ হংসরাজকে উড়ে যেতে বলল।

কিন্তু সুমুখ তাতে রাজি নন। তিনি বললেন, 'তুমি আমাদের রাজা আর আমার জন্য দুটি খাঁচা নিয়ে এস। একটি খাঁচায় সাদা ফুল বিছিয়ে দাও। আরেকটিতে বিছিয়ে দাও লাল ফুল। সাদা ফুলের খাঁচাটিতে রাজাকে বসাও, আর লালফুলের খাঁচাটিতে বসাও আমাকে। তারপর রাজার কাছে নিয়ে চল।'

'অমন আদেশ করবেন না।'

'কেন?'

'রাজারা বড় সাংঘাতিক হয়, আপনাদের বধ করবেন তিনি।'

ক্ষেম-নিষাদকে আশ্বস্ত করতে সুমুখ বললেন, 'রাজারা জ্ঞানী হন। আমি ধর্মকথা বলে তাঁর মন বদলে দেব। তাছাড়া তুমি রাজার আদেশে আমার প্রভুকে ধরেছিলে। রাজা খুশি হয়ে তোমাকে ধনরত্ন দিতেন। আমরা তোমার ক্ষতি করতে পারি না।'।

ব্যাধ লতা দিয়ে দুটি খাঁচা বানিয়ে তাতে সুবর্ণ হংসদের রাখল। রাস্তা দিয়ে ব্যাধ চলেছে। ঐ অপূর্ব সুন্দর হাঁসদুটিকে দেখে পথচারীরা চোখ ফেরাতে পারল না। তারাও পিছন পিছন চলল।

দুয়ারী গিয়ে রাজাকে জানাল, 'মহারাজ, ক্ষেম-নিষাদ সোনার হাঁস নিয়ে আসছে।' রাজা তাকে নিয়ে আসতে বললেন। সে আসা মাত্র অমাত্যদের বললেন, 'ব্যাধকে এক্ষুনি পুরস্কার দাও।' তারপর ক্ষেম-নিষাদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কিভাবে এঁদের ধরলে।' ব্যাধ তখন যা যা ঘটেছিল সবই বলল। এমন কি সে যে এঁদের মুক্ত করে

দিয়েছিল সে কথাও গোপন করল না। রাজা তখন সুমুখকে জিজ্ঞেস করলেন :

'নিজের ইচ্ছেতেই যখন এসেছ তখন ভয় পাচ্ছ কেন? কেন তোমার মুখে কথা নেই?'

'আমি মোটেই ভয় পাই নি মহারাজ।'

'ওহে হংস সেনাপতি, ভয় পাওনি বলছ, কিন্তু এখানে তোমাকে রক্ষা করার জন্য তো কেউই নেই।'

'দেখ রাজা, আমরা আকাশচারী। সেজন্য আমাদের রক্ষা করার জন্য সৈন্যবাহিনী লাগে না।'

এভাবে রাজার সঙ্গে সুমুখের কথা যতই এগোতে লাগল রাজা ততই আশ্চর্য বোধ করতে লাগলেন সুমুখের জ্ঞান দেখে। সুমুখ রাজাকে 'মিথ্যাচারী' বলে অভিযোগ করলেন। কেননা ক্ষেম-সরোবরকে অভয় সরোবর হিসাবে ঘোষণা করার পরও সেখানে ফাঁদ পেতে সুমুখ ও মহাসত্ত্বকে ধরা হয়েছে। রাজা বললেন, 'অভয়বাণী এখনও সত্য, কেননা তোমাদের কোন ক্ষতি আমি করব না। হংসরাজ ও তোমার মুখে ধর্মকথা শোনাই আমার রাণীর ইচ্ছে। শুধু সেই ইচ্ছেটুকু তোমরা পূরণ কর।'

এরপর সোনার হাঁসদের অনেক সমাদর করা হল। ক্ষেমাদেবী এবং রাজা তাঁদের মুখে ধর্মকথা শুনলেন। তারপর প্রাসাদের ছাদে উঠে দু হাতে দুজনকে বসিয়ে বললেন, 'পুণ্যাত্মা পাখি, তোমাদের যেখানে প্রাণ চায় তোমরা সেখানে উড়ে যাও।'

সুমুখ ও মহাসত্ত্বের সোনালী ডানা আকাশে পলকের জন্য দেখা গেল। তারপর তাঁরা গিয়ে নামলেন চিত্রকূট পর্বতে। আত্মীয়কুটুম্ব ও বন্ধুরা হংসরাজ এবং তার সেনাপতিকে নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে দেখে জয়ধ্বনি দিল।

জয়দ্বিষ জাতক

পুরাকালে কাম্পিল্য রাজ্যে উত্তর পঞ্চাল নামে একটি নগর ছিল। সেখানে রাজত্ব করতেন পঞ্চাল নামে এক রাজা। পঞ্চাল রাজার প্রধানা মহিষী এক পুত্র প্রসব করেন। পঞ্চাল রাজার ঐ মহিষীর আগের জন্মে এক সতীন ছিল। দুই সতীনে একবার তুমুল ঝগড়া হয়। তখন পঞ্চাল রাজার প্রধানা মহিষীকে তাঁর সতীন

অভিশাপ দিয়েছিল, 'আমি যেন তোর পেটের ছেলেকে আস্ত খেতে পারি।'

ঐ শাপ অনুসারে পরজন্মে সেই সতীন যক্ষী হয়ে জন্মায়। রাণীর ছেলে হয়েছে জানতে পেরে সে আতুরঘরে ঢুকে ছেলেকে চিবিয়ে খেয়ে চলে গেল। রাণী প্রায় পাগল হয়ে গেলেন। এক বছর পরে রাণীর দ্বিতীয় ছেলে হল। এবারও সেই যক্ষী এসে রাণীর ছেলেকে খেয়ে ফেলল। তৃতীয়বার রাজা কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলেন। যক্ষী যখন এবার ছেলেকে নিয়ে পালাচ্ছে তখন সৈন্যরা তাকে তাড়া করল। যক্ষী তখন ছেলেটাকে নিয়ে এক নর্দমার জলে লুকিয়ে রাখল।

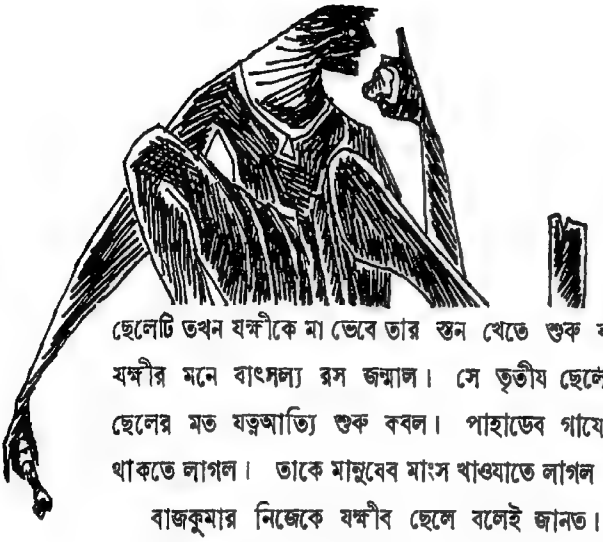

ছেলেটি তখন যক্ষীকে মা ভেবে তার স্তন খেতে শুরু করে। এতে যক্ষীর মনে বাৎসল্য রস জন্মাল। সে তৃতীয় ছেলেটিকে নিজের ছেলের মত যত্নআত্তি শুরু করল। পাহাড়ের গায়ে তাকে নিয়ে থাকতে লাগল। তাকে মানুষের মাংস খাওয়াতে লাগল।

রাজকুমার নিজেকে যক্ষীর ছেলে বলেই জানত। যক্ষীর মত ইচ্ছে করলেই সে রূপ পরিবর্তন করতে পারত না বা অদৃশ্য হতে পারত না। কুমার বড় হওয়ার পর যক্ষী তাকে একটি শিকড় দিল। ঐ শিকড়ের সাহায্যে সে অদৃশ্য হতে পারত। অদৃশ্য হয়ে মানুষের মাংস খেত। ওদিকে যক্ষীর বয়স হয়েছিল। সে মহারাজ বৈশ্রবণের সেবা করতে চলে গেল।

পঞ্চাল-মহিষীর এর পরেও একটি ছেলে জন্মায়। কিন্তু এতদিনে ঐ যক্ষী মারা গেছে। ফলে ঐ ছেলের কোন বিপদ ঘটল না। শত্রু জয় করে সে জন্মেছে, এজন্য তার নাম রাখা হল জয়দ্বিষ। কুমার জয়দ্বিষ যথাসময়ে বিদ্যাশিক্ষা এবং অস্ত্রশিক্ষা শেষ করলেন। রাজা পঞ্চাল তাঁর মাথায় শ্বেতচ্ছত্র ধরার বন্দোবস্ত করলেন। জয়দ্বিষ উত্তর পঞ্চালের রাজা হলেন। রাজা জয়দ্বিষের প্রধানা মহিষীর গর্ভে জন্ম নিলেন বোধিসত্ত্ব। তাঁর নাম রাখা হল অলীনশত্রুকুমার। বয়সকালে অলীনশত্রুকুমারকে যুবরাজ করা হল।

এদিকে যক্ষীর কাছে বড় হওয়া রাজার তৃতীয় ছেলে সেই শিকড় হারিয়ে বসে আছে। ফলে লোকের চোখের আড়ালে গিয়ে সে যে মানুষের মাংস খাবে তার আর উপায় নেই। এখন সে সকলের চোখের সামনেই শ্মশানে গিয়ে মানুষের মাংস খায়। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে লোকজন ভয় পেয়ে গেল। তারা রাজার কাছে এসে

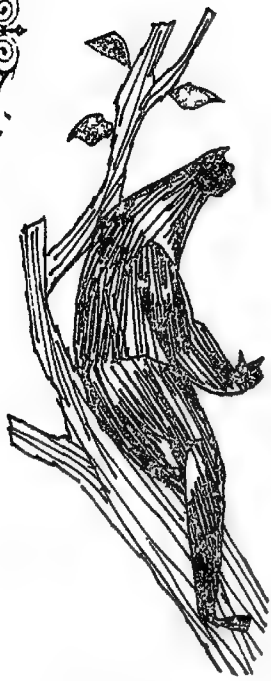

জানাল, 'মহারাজ, মানুষের মত দেখতে এক যক্ষ শ্মশানে এসে মানুষের মাংস খাচ্ছে। তাকে এখুনি না ধরতে পারলে সে নগরে ঢুকে মানুষ মারতে শুরু করবে।' রাজা তক্ষুনি সৈন্য পাঠালেন। সৈন্যরা শ্মশান ঘিরে ফেললে সে ভয়ে চিৎকার করে লাফ দিল। তার চিৎকারে সৈন্যরা গেল বেজায় ঘাবড়ে। যক্ষীর পালিত ছেলে তখন বনে চলে গেল। বনের যেখান দিয়ে রাজপথ গেছে সেখানে এক গাছের ডালে সে চড়ল। গাছের তলা দিয়ে মানুষ যেতে দেখলে ধরে খেত।

যক্ষীপুত্রের পায়ে একবার কাঁটা ফুটল। সে সাতদিন গাছ থেকে নামতে পারল না। সম্পূর্ণ অনাহারে কাটাল। আটদিনের মাথায় রাজা জয়দ্বিষ হরিণ শিকার করে ঐ পথে ফিরছিলেন। সৈন্যসামন্ত অদূরেই ছিল। রাজা গাছটির কাছে আসামাত্র যক্ষপুত্র তাঁকে ধরল। উলঙ্গ ও বিকটাকৃতি নরকপী সেই যক্ষকে দেখে রাজা দিশেহারা হলেন। তিনি তাকে হরিণটি দিতে চাইলেন। যক্ষ রাজি হল না। রাজা তখন বললেন, 'এক ব্রাহ্মণকে পুরস্কার দেব বলে এসেছি। যদি তা হবার আগেই তুমি আমাকে খেয়ে ফেল, তাহলে আমার সত্য রক্ষা হয় না।' এ কথা শুনে যক্ষপুত্র তাঁকে বলল, 'ঠিক আছে, ছেড়ে দিচ্ছি। তবে কাজ শেষ করে কালই ফিরে আসবে।'

প্রাসাদে ফিরে এসে জয়দ্বিষ প্রথমেই নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। ব্রাহ্মণকে অর্থ দান করলেন। তারপর ছেলে অলীনশত্রু-কুমারকে রাজত্ব দিতে চাইলেন। অলীনকুমার তখন জয়দ্বিষকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' জয়দ্বিষ প্রথমে কিছুতেই বলবেন না। অলীনকুমারও রাজা হতে রাজি নন। তিনি বললেন, 'আপনি এখানে থাকলে তাতেই আমার স্বর্গসুখ। আপনি থাকবেন না আর আমি রাজা হব, তা আমি পারব না।'

বাধ্য হয়ে তখন জয়দ্বিষ সবাইকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তখন অলীনশত্রুকুমার স্থির করলেন তিনিই যক্ষের কাছে যাবেন। শুনে রাজা, মন্ত্রী, অমাত্য, পুরোহিত এবং রাজমাতা সকলেই কেঁদে ফেললেন। কিন্তু তাঁকে বাধা দেওয়া গেল না।

অলীনকুমার যখন যক্ষের কাছে গেলেন, যক্ষ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই এখানে কেন এসেছিস? জানিস না কি এই খাদের কাছে যে আসবে সে-ই আমার পেটে যাবে।' অলীনকুমার নির্ভয়ে বললেন,

সেইজন্যই এসেছি। গতকাল তুমি আমার বাবাকে খাবে বলে তাঁকে ধরেছিলে। আজ আমি এসেছি বাবার মুক্তি আদায় করতে। তুমি আমাকে খাও। আমার বাবাকে ছেড়ে দাও।'

যক্ষ এতদিন দেখে আসছে তার ভয়ে সবাই পালায়। আজ অলীনকুমারের মত সাহসী একজনকে দেখে সে একেবারে চমকে গেল। এই সাহসী যুবককে খেতে তার মন চাইল না। তাই সে কুমারকে বলল, 'বেশ, তাই হবে। তুই তাহলে শুকনো ডাল আর পাতা জোগাড় করে এখানে আগুন জ্বাল।' যক্ষ ভেবেছিল, কুমার পালিয়ে যাবার এই মস্ত সুযোগ হাতছাড়া করবে না। কিন্তু দেখা গেল, সে সত্যি সত্যি শুকনো ডালপালা জড়ো করে আগুন জ্বেলেছে। এভাবে অলীনকুমারের আরও পরীক্ষা নিয়ে যক্ষ তাকে রেহাই দিল।

কুমার দেখল, এই যক্ষের সব কিছুই মানুষের মত। তখন তাঁর মনে পড়ে গেল নিজের সেই দাদাদের কথা যাদের যক্ষ নিয়ে গিয়েছিল। ইনিই নিশ্চয়ই তৃতীয় ভাই একথা ভেবে তিনি তাকে বললেন, 'আপনি যক্ষ নন, আপনি সম্পর্কে আমার জ্যাঠামশাই হন।' যক্ষ তা মানতে চায় না। শেষে যক্ষের পরামর্শে এক দিব্যচক্ষু তপস্বীর কাছে তারা গেল। তপস্বী বললেন, কুমারের কথা সত্য। কুমার তখন যক্ষকে অনুরোধ করলেন উত্তর পঞ্চালে ফিরে গিয়ে রাজত্ব করতে। কিন্তু যক্ষ ঐ তপস্বীর কাছেই প্রব্রজ্যা নিলেন।

যক্ষের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে অলীনকুমার ফিরে এলেন। বাবাকে সব খুলে বললেন। বাবা তখন নিজের হারিয়ে যাওয়া দাদাকে রাজত্ব দেওয়ার কথা ভাবলেন। তাঁরা আবার সেই দিব্যাত্মা তপস্বীর কাছে গেলেন। রাজা জয়দ্বিষ দাদাকে কিছুতেই রাজি করাতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'আমি প্রব্রজ্যা নিয়েছি, তোমরাই রাজ্য চালাও।' এরপর এক চমৎকার ব্যবস্থা করা হল। রাজা জয়দ্বিষ কয়েকটি গ্রাম তৈরি করলেন। সেই গ্রামের মধ্যেই তপস্যার জায়গা তৈরি করা হল। জয়দ্বিষের দাদাও সম্মত হলেন সেখানে থেকে তপস্যা করতে।

কুশ জাতক

পুরাকালে মল্লরাজ্যের রাজধানী ছিল কুশাবতী নগর। সেখানে রাজত্ব করতেন ইক্ষ্বাকু রাজা। রাজা ধর্ম অনুসারে রাজ্য শাসন করতেন। কিন্তু দুঃখের কথা, রাজার কোন সন্তান ছিল না। একদিন প্রজারা রাজদ্বারে এসে রাজাকে বলল, 'মহারাজ, রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে যদি আপনার কোন পুত্র সন্তান না জন্মায়। আপনি এক্ষুনি পুত্র প্রার্থনায় যজ্ঞাদি শুরু করুন।' রাজা প্রজাদের পরামর্শে যজ্ঞ শুরু করলেন। তখন দেবরাজ শক্র রাজার প্রধানা মহিষী শীলবতীকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, '.তোমার দুটি সন্তান হবে, একজন প্রজ্ঞাবান কিন্তু কদাকার, অপরজন রূপবান কিন্তু প্রজ্ঞাহীন হবে। এখন তুমি বল, তুমি প্রথমে কাকে চাও?' শীলবতী বললেন, 'আমার প্রথম পুত্র প্রজ্ঞাবান হোক।'

যথাসময়ে শীলবতী এক পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। এই ছেলে আর কেউ নন, স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। তাঁর নাম রাখা হল কুশকুমার। কুশকুমার যখন সবে হাঁটতে শিখেছেন তখন মহিষীর দ্বিতীয় ছেলে ভূমিষ্ঠ হল। তার নাম রাখা হল জয়ম্পতি। কুশকুমার ছিলেন মহা প্রজ্ঞাবান। শিক্ষাগুরু ছাড়াই তিনি সমস্ত শিক্ষা আয়ত্ত করেছিলেন। কুশকুমারের ষোল বছর বয়স পূর্ণ হলে রাজা তাঁকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করতে চাইলেন। অবিবাহিতকে রাজপদ দেওয়া যায় না। সেজন্য কুশকুমারকে বিবাহ দিতে হয়।

রাণী শীলবতীকে তিনি বললেন, 'ছেলের মনের কথা জেনে এস।' কুশকুমার বিয়ের প্রস্তাবে উৎসাহ দেখালেন না। তিনি বললেন, 'আমি বিয়ে করব না। যতদিন আপনারা বেঁচে আছেন আমি আপনাদের সেবা করতে চাই। তারপর প্রব্রজ্যা নেব।' কুশকুমার জানতেন তিনি সুন্দর নন, কোন সুন্দরী নারীকে তিনি বিয়ে করলে তাঁদের সম্পর্ক সুখের হবে না। সেজন্যই তিনি এই পন্থা নিলেন।

কিন্তু পর পর কয়েকবার রাজা একই প্রস্তাব পাঠালেন। তখন কুমার ভাবলেন সরাসরি বাবা-মার কথা অস্বীকার করা ঠিক নয়। তিনি নিজে এক সুবর্ণ নারীমূর্তি গড়লেন। তারপর সেই মূর্তি দেখিয়ে বললেন, 'এরকম কন্যা পেলে তবেই আমি বিয়ে করব।'

অনেক খোঁজাখুঁজির পর মদ্ররাজার কন্যাকে পাওয়া গেল। তাঁর নাম প্রভাবতী। সেই দেবকন্যাতুল্য প্রভাবতী সুবর্ণপ্রতিমার চেয়েও সুন্দর। বিয়ের আগে রাণী শীলবতী একটা কৌশল করলেন। তিনি জানতেন, তাঁর ছেলে সুন্দর নয়। সুতরাং প্রভাবতী হঠাৎ কুশকুমারকে দেখে পছন্দ না-ও করতে পারে। আর একবার মন বিরূপ হলে তা দূর করা কঠিন। সেজন্য তিনি মদ্ররাজকে জানালেন,

'আপনার মেয়েকে বলে দেবেন আমাদের একটি পারিবারিক প্রথা আছে। প্রথম বছর দিনের আলোয় সে স্বামীর মুখ দেখতে পাবে না।'

যথাসময়ে ধূমধাম করে কুশকুমার ও প্রভাবতীর বিয়ে হয়ে গেল। কিছুদিন যাওয়ার পরই কুশকুমার মাকে বলল, 'মা, আমি দিনের বেলায় প্রভাবতীকে দেখতে চাই।' শীলবতী বললেন, 'তাহলে তোমাকে ছদ্মবেশ নিতে হবে।' তখন কুশকুমার একবার ঘোড়ার সহিস, একবার হাতির মাহুত সাজলেন। দুবারই যখন প্রভাবতী কাছে এলেন তখন তিনি তাঁকে ছুঁয়ে দিলেন। প্রভাবতী তাঁর কুরূপ দেখে ভীষণ রেগে যান। এরপর প্রভাবতীও শীলবতীকে একই ইচ্ছা জানালেন। শীলবতী তখন দূর থেকে জয়ম্পদকে দেখালেন। কিন্তু জয়ম্পদের পেছনে ছিলেন কুশকুমার। তিনি রাণীর দিকে হাত নাড়ছিলেন। প্রভাবতী জয়ম্পদকে দেখে যতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন কুশকুমারকে দেখে ততটাই বিরক্ত হলেন। এর কিছুদিন পরে প্রভাবতী সত্য জেনে ফেলেন। তখন তিনি কুশবতী নগর ছেড়ে মদ্ররাজার কাছে ফিরে যেতে চাইলেন। কুশকুমারও এতে বাদ সাধলেন না।

প্রভাবতী চলে যাওয়ায় কুশ রাজা দুঃখে কাতর হয়ে পড়লেন। প্রভাবতী হয়ত তখনও মদ্ররাজার প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছন নি, এমন সময় বোধিসত্ত্ব শীলবতীকে বললেন, 'মা, প্রভাবতীকে ফিরিয়ে আনতে আমি যাচ্ছি। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি রাজ্যশাসন করবে।' শুনে প্রভাবতী বললেন, 'বেশ বাছা যাও, তবে সাবধানে যেও। মনে হয় না সে সহজে তোমাকে গ্রহণ করতে পারবে।'

কুশকুমার পর দিন রওনা হয়ে সেদিনই সন্ধ্যায় শাকল নগরে পৌঁছলেন। প্রথমেই তিনি নিজের পরিচয় গোপন করলেন। রূপের অভাব নিজের গুণ দিয়ে পুষিয়ে নেবেন এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ছদ্মবেশে তিনি কুমোর, মালী, বীণাবাদক ও কারিগর সেজে নানা জিনিস বানালেন। প্রতিটি জিনিসই মদ্ররাজার অন্তঃপুরে গিয়েছিল। প্রভাবতী প্রত্যেকটি জিনিসে নিজের ছবি দেখতে পেয়ে বুঝলেন, এ আর কারও কাজ নয়, কুশকুমারই করেছেন। প্রভাবতী তাই সেসব ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

কুশকুমারও একে একে সেসব বৃত্তি ছেড়ে দিলেন। বুঝলেন ওসবে কাজ হবে না। তখন তিনি রাঁধুনির কাজ নিলেন রাজ বাড়িতে। রান্নার সুখ্যাতিতে মদ্ররাজাও পঞ্চমুখ। কিন্তু প্রভাবতী বুঝলেন, 'এ রামুনঠাকুর আর কেউ নন, স্বয়ং কুশকুমার।' সেজন্য তিনি রাজবাড়ির খাবার খাওয়া ছেড়ে দিলেন। এমন কি যাতায়াতের পথে কুশকুমারের সঙ্গে কয়েকবার দেখা হলে তাঁকে খুব খারাপ ভাষায় নিন্দে করলেন।

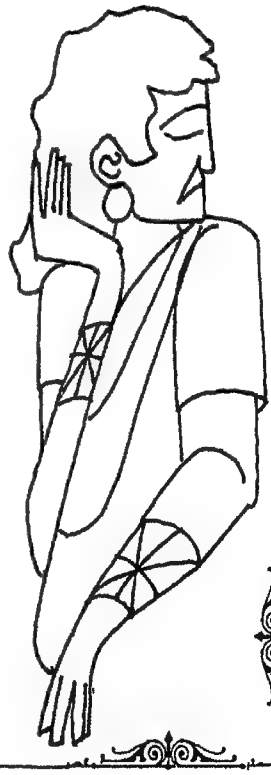

দিন যায়, কুশকুমার দেখলেন কিছুতেই প্রভাবতীর মন জয় করা যাচ্ছে না। তখন তিনি ভাবতে লাগলেন, 'বাবা-মাকে ছেড়ে এতদিন এখানে রইলাম, তাঁদের মনে অত কষ্টই না দিলাম, আর কতদিন থাকব।' কুশকুমারের দুঃখে তখন স্বর্গে শক্রের আসন টলে উঠল। শক্র দেখলেন কুশকুমারের জন্য কিছু করা দরকার। তিনি ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আশপাশের তিনজন রাজার কাছে দূত হয়ে গিয়ে বললেন, 'মদ্ররাজার কন্যা কুশকুমারকে পরিত্যাগ করেছেন। আপনি তাঁর স্বামী হোন।' এই একই কথা তিন রাজাকে বলা হল। কিন্তু রাজারা জানলেন তাঁদের প্রত্যেককে আলাদা করেই বলা হয়েছে। ফলে

প্রত্যেকে সসৈন্যে এলেন মদ্রবাজার সীমান্তে।

মদ্রবাজা খবর পেয়ে খুবই বিচলিত হলেন। ভাবলেন, 'আর উপায় নেই, এবার ধনপ্রাণে বিনষ্ট হব।' মদ্ররাজা প্রভাবতীর ওপর রাগে বিরক্তিতে কাঁপতে লাগলেন। তিনি অমাত্যদের বললেন, 'ঐ এক কন্যাকে তিন রাজার হাতে তো আর দেওয়া যায় না। প্রভাবতী অন্যায় করেছে। কুশকুমারের মত যোগ্য স্বামীকে সে ছেড়ে চলে এসেছে বলেই আজ এই বিপত্তি। প্রভাবতীকে কেটে তিন টুকরো করে ওদের সামনে দিয়ে এস।' প্রভাবতী সব শুনে তাঁর মা-কে বললেন 'মা, কোন চিন্তা কোরো না। আমার স্বামীই আমাকে রক্ষা করবেন।'

প্রভাবতী বন্ধনশালায় গিয়ে কুশকুমারের পা ধরে ক্ষমা চাইলেন। কুশকুমার তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর রাজাকে বললেন, 'আপনি সৈন্য সাজান।' তিনি নিজে একটি হাতির পিঠে উঠলেন। পেছনে বসালেন প্রভাবতীকে। কুশকুমারের যুদ্ধবিক্রমের সামনে রাজারা খড়কুটোর মত ভেসে গেল। কুশকুমার তাদের বন্দী করে নিয়ে এলেন। তারপর তাঁর নির্দেশে মদ্ররাজার অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তাদের বিয়ে দেওয়া হল। কুশকুমারও প্রভাবতীকে নিয়ে ফিরে চললেন নিজের রাজ্যে।

মহাসুতসোম জাতক

কুরুরাজ্যের ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে কৌরব্য নামে এক রাজা ছিলেন। কৌরব্যের প্রধানা মহিষীর গর্ভে বোধিসত্ত্ব জন্ম নেন। বোধিসত্ত্ব এ জন্মে সোমরস খুব ভালবাসতেন। সেজন্য তাঁর নাম হয় সুতসোম।

বয়সকালে সুতসোম তক্ষশিলায় বিদ্যাচর্চা করতে গেলেন। বোধিসত্ত্ব যে আচার্যের কাছে বিদ্যাশিক্ষার জন্য যাচ্ছিলেন, সেই একই আচার্যের কাছে শিক্ষার জন্য কাশীরাজার ছেলে ব্রহ্মদত্তকুমার যাচ্ছিলেন। রাস্তায় তাঁদের দেখা হল। বন্ধুত্বও হল। যতদিন গুরুর কাছে ছিলেন দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। সুতসোম ছিলেন প্রাজ্ঞ, মেধাবী। তিনি ব্রহ্মদত্তকুমারকে শাস্ত্র বুঝতে সাহায্য করতেন। জ্ঞানী এবং শীলবান হিসেবে বোধিসত্ত্বের খুব সুখ্যাতি হল। শাস্ত্র শিক্ষা শেষ করে একসময় ব্রহ্মদত্তকুমার ও সুতসোম

নিজের নিজের রাজত্বে ফিরে চললেন। সুতসোম অঙ্গবিদ্যা জানতেন। এই বিদ্যার দ্বারা তিনি বুঝেছিলেন ব্রহ্মদত্তকুমার মানুষের মধ্যে ত্রাসের কারণ হবেন। ব্রহ্মদত্তকুমারকে তিনি বললেন, 'ভাই, শীলবান থেকো, পোষধ পালন কর।'

ব্রহ্মদত্তকুমার ফিরে এসে বারাণসীর রাজা হলেন। বোধিসত্ত্বের উপদেশ অচিরেই ভুলে গেলেন। ব্রহ্মদত্তকুমার মাংস খেতে এত ভালবাসতেন যে মাংস না থাকলে তাঁর খাওয়াই হতো না। পোষধের দিন উপোষ করা দূরের কথা, তিনি সেদিনও মাংস খেতেন। পোষধের দিন রাজ্যে কোথাও পশুবধ করা হয় না। সেজন্য তাঁর পাচক আগের দিনই মাংস জোগাড় করে রাখত। একবার পোষধের দিন সেই সঞ্চিত মাংস কুকুর খেয়ে ফেলল। পাচক দেখল রাজাকে মাংস ছাড়া ভাত দিলে নিজের গর্দান যাবে। সেজন্য সে ভাগাড় থেকে মরা মানুষের উরুর মাংস কেটে এনে ভাল করে রান্না করল। রাজা সেই মাংস মুখে দেওয়া মাত্র তাঁর সারা শরীর আনন্দে শিহরিত হল। তাঁর শরীরের সাত হাজার রস-নালী কাঁপতে লাগল। তিনি মুহূর্তের মধ্যে টের পেলেন, এ মাংস নরমাংস। কোন এক জন্মে তিনি যক্ষ ছিলেন। তখন প্রচুর মানুষের মাংস খেয়েছিলেন। পাচককে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন :

'এ কিসের মাংস?'

'কেন মহারাজ, রোজ যা খান।'

'বাজে কথা। এ মাংস খুব চমৎকার।'

'রান্নার গুণে হয়েছে।'

'সত্যি কথা বল, নাহলে গর্দান যাবে।'

'মহারাজ, মানুষের মাংস।'

'এবার থেকে এই মাংসই আমাকে দেবে।'

'কোথায় পাব মহারাজ?'

'কেন, কারাগারে কি বন্দী নেই?'

এরপর একে একে কারাগারের বন্দীরা জবাই হতে থাকল। কারাগার জনশূন্য হল। তারপর রাজার পরামর্শে পাচক রাস্তায় হাজার টাকার মাল ফেলে রাখত। যে তাতে হাত দিত তাকে ধরে

এনে জবাই করা হতো। কিছুদিন পরে দেখা গেল কেউই আর মালে হাত দিচ্ছে না। তখন রাজা লুকিয়ে থেকে মানুষ মারা শুরু করলেন। বারাণসীতে দারুণ ত্রাসের সঞ্চার হল। প্রজারা রাজার কাছে বিচার চাইতে এল। রাজা বললেন, 'আমি তো জানি না ঘাতক কে, তাহলে কি করে তাকে ধরব?' প্রজারা রাজার কথায় খুশি হতে পারল না। তারা সেনাপতি কালহস্তীকে গিয়ে ধরল, 'আমাদের ধন-প্রাণ রক্ষা করুন।'

কালহস্তী প্রজাদের আশ্বাস দিলেন। রাতে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলেন। অচিরেই রাজার পাচক এক ঝুড়ি মানুষের মাংসসমেত ধরা পড়ল। কালহস্তীর জেরার মুখে সে সব কথা স্বীকার করল। সেনাপতি, অমাত্য ও সভাসদগণ একযোগে তখন রাজাকে ধরলেন। রাজা পাচকের কথা স্বীকার করলেন। বললেন, 'আমি মানুষের মাংস খেতে ভালবাসি।' সেনাপতি ও অমাত্যরা তাঁকে বহুবার বললেন, 'আপনি এই বীভৎস রুচি ত্যাগ করুন, স্বাভাবিক হোন।' রাজা বললেন, 'তা আমি পারব না।' তখন রাজপরিবারের সবাইকে ডাকা হল। সকলের সামনে রাজাকে রাজ্য ত্যাগ করার আদেশ দেওয়া হল। কালহস্তী বললেন, 'একদিকে আপনার আত্মীয়-পরিজন, এই রাজকীয় ঐশ্বর্য, আরেকদিকে আপনার কুৎসিত বসনা। আরেকবার ভেবে দেখুন মহারাজ।' এতেও রাজার হুঁশ হল না, তিনি বললেন, 'এ দুয়ের মধ্যে আমি নরমাংসই বেছে নিচ্ছি সেনাপতি।' সবাই 'ধিক। ধিক।' করতে লাগল। কালহস্তী তখন রাজাকে কল্যাণপথে আনার জন্য তিনটি গল্প বললেন।

প্রথম গল্প :

অতীতকালে মহাসাগরে ছটি বিশাল আকারের মাছ ছিল। তাদের নাম : আনন্দ, প্রনন্দ, মধ্যবহার, তিমি, তিমিঙ্গিল আর তিমিরপিঙ্গল। ওরা ডুবো পাহাড়ের গা থেকে শ্যাওলা খেয়ে বেঁচে থাকত। আনন্দ থাকত মহাসমুদ্রের একদিকে। রোজ অনেক মাছ তার সঙ্গে দেখা করতে যেত। একদিন তারা ভাবল, 'সব জীবজন্তুরই রাজা আছে, আমাদেরই বা কেন থাকবে না।' এই ভেবে তারা আনন্দকে রাজা করবে ঠিক করল। সকলে একমত হওয়ায় আনন্দ রাজা হল।

এরপর রোজ সকাল-সন্ধ্যায় মাছের দল এসে আনন্দের সঙ্গে দেখা করে যায়। একদিন আনন্দ ডুবো পাহাড়ের শ্যাওলা খাওয়ার সময়ে কি করে যেন একটা মাছ তার মুখে ঢুকে পড়ে। খেতে গিয়ে আনন্দ চমৎকার স্বাদ পেল। তখন জিভ বের করে খাবারটা দেখতে চাইল। মুখ থেকে বের করে দেখল, সে মাছ খেয়ে ফেলেছে। তখন সে ভাবল, 'এতদিন কি ভুলই না করেছি। এত সুস্বাদু জিনিস হাতের সামনে থাকতেও খাইনি। এবার থেকে মাছের দল দেখা করতে এসে যখন ফিরে যাবে, তখন পেছন থেকে নিঃসাড়ে কয়েকটা ধরে খাব।'

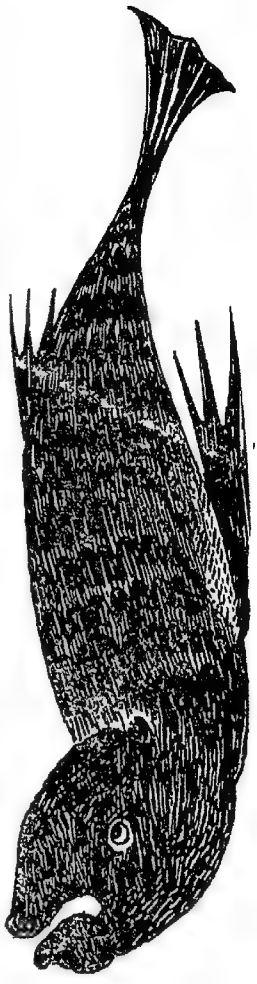

এইরকম ভাবার পর সত্যি সত্যি সে তাই শুরু করল। এদিকে কিছুদিন পরে মাছের দল দেখে, রোজই তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তারা ভাবতে লাগল, ব্যাপারটা কি? তারপর এক বুদ্ধিমান মাছ একদিন আনন্দের কানের পাশে লুকিয়ে থেকে সব দেখে ফেলল। সে জ্ঞাতিদের সাবধান করে দিল। আনন্দেরও মাছ খাওয়া বন্ধ হল। মাছ খেতে না পেয়ে সে খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়ল। মাছ ছাড়া আর কিছু সে খায় না। সেজন্য খিদেয় কাতর হয়ে একদিন এক ডুবো পাহাড় দেখে সে ভাবল, 'ব্যাটারা এখানেই লুকিয়ে আছে। আমি আমার শরীর দিয়ে পাহাড়টাকে জড়িয়ে ধরে রাখব। দেখি ওরা কোনখান দিয়ে পালায়।' এই ভেবে আনন্দ তার বিশাল শরীর দিয়ে পাহাড়টা ঘিরে ফেলল। এতে তার নিজের লেজটা নিজেরই মুখের কাছে চলে এল। নিজের লেজ দেখে সে তখন ভাবল, 'বেশ একটা বড় মাছ দেখছি'। এই বলে সে কামড় দিল। আর রক্তাক্ত হয়ে নিজেই মারা গেল। ঐ বিশালাকার মাছ তখন ছোট মাছ ও অজস্র পোকার খাদ্য হল।

দ্বিতীয় গল্প :

অনেককাল আগে এই বারাণসী নগরেই এক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করত। তাঁরা ছিলেন শীলসম্পন্ন। ব্রাহ্মণের এক ছেলে হল। ছেলেটিও বিদ্যাবুদ্ধি এবং শীলাচারে বংশের ধারা বজায় রাখল। সে মদমাংস কিছুই খেত না। তার বয়সী কিছু যুবক বন্ধু তাকে নিজেদের

দলে টানতে খুব চেষ্টা করল। তাকে বলল, 'চল ভাই, একদিন মদ খাওয়া যাক।' সে বলল, 'না ভাই, আমি মদ ছুঁই না। তোমরা খাও।' তখন তারা বলল, 'আমাদের সঙ্গে যেতে তো কোন আপত্তি নেই তোমার, মদ না হয় না-ই খেলে।' ব্রাহ্মণ যুবক বলল, 'তোমরা মদ খাবে, আমি গিয়ে কি করব?' যুবকের দল বলল, 'তোমার জন্য দুধ আর মধু থাকবে, তুমি তাই খেয়ো।' তখন ব্রাহ্মণ যুবক রাজি হল।

ধূর্ত যুবকের দল এক বাগানে ঢুকে বলাবলি করতে লাগল, 'পদ্মমধু খাব, পদ্মমধু নিয়ে আয়।' ব্রাহ্মণ যুবক জানত না তারা চালাকি করে মদকেই পদ্মমধু বলছে। আগেই একজন এসে পদ্মপাতায় মদের পাত্র রেখে গিয়েছিল। এখন খড় দিয়ে সেই পাত্রের ফুটোর সঙ্গে জুড়ে দিল। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে তারা পদ্মফুলের মাঝখানে খড় বসিয়ে টানছে। ব্রাহ্মণ যুবক ঐভাবে মদ খেয়ে নেশাগ্রস্থ হল। বাড়ি ফিরে এল মত্ত অবস্থায়। এরপর থেকে তার বাবা মদ খেতে বারণ করা সত্ত্বেও সে মদ খেতে লাগল। কিছুতেই সে মদ খাওয়া ছাড়তে পারল না। শীলবান ব্রাহ্মণ পরিবারের কর্তা ছেলের এই দুরাচার সহ্য করলেন না। তিনি তাকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন। ঐ যুবক কম বয়সে নিতান্ত কষ্ট পেয়ে শেষ পর্যন্ত রাস্তায় বেঘোরে মারা গেল।

তৃতীয় গল্প :

স্বজাতির মাংস খেয়ে একবার সোনার হাঁসের দল প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। এই হাঁসের দলকে বলা হতো ধৃতরাষ্ট্র হংস। ধৃতরাষ্ট্র হংসদের মধ্যে একবার বিজাতীয় খাবার খাওয়ার ইচ্ছে প্রবল হয়। তখন তারা পরস্পরের মাংস খেতে শুরু করে। এভাবে তাদের বংশ লোপ পেতে বসেছিল

গল্প তিনটি শেষ করে সেনাপতি কালহস্তী রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, এখনও সময় আছে, আপনি মত ঠিক করুন।'

ততক্ষণে প্রজারা আর নিজেদের ধরে রাখতে পারল না। তারা চিৎকার করে উঠল, 'সেনাপতি মশাই। আপনি খুনী ধরেছেন, এবার শাস্তি দিন। এই নরখাদক রাজাকে আপনি কেন অত বোঝাতে চেষ্টা করছেন?' তবু সেনাপতি আরেকবার রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, শেষবারের মত বলুন আপনার কি ইচ্ছে।' রাজা বললেন,

'আমি নরমাংস খাওয়া ছাড়তে পারব না।'

'তাহলে আপনি এই মুহূর্তে রাজা ত্যাগ করুন।'

'কালহস্তী, আমি চলে যাচ্ছি। তুমি আমাকে একটি খড়্গ দাও, আর ঐ পাচককে আমার সঙ্গে যেতে দাও।'

সেই থেকে রাজা বনের মধ্যে এক গাছে বাসা বেঁধে থেকে বনচারী মানুষ মারতে লাগলেন। পাচক তাঁকে মানুষের মাংস রান্না করে দিত। এভাবে ঐ বনভূমি এক বিভীষিকা হয়ে উঠল। নরমাংস-খাদক রাজার ভীতিপ্রদ গল্প ছড়িয়ে পড়ল দেশদেশান্তরে। একদিন নরখাদক রাজা মানুষ শিকার করতে পারলেন না সেদিন তিনি পাচকটিকেই কেটে রান্না করে খেলেন।

সারা জম্বুদ্বীপে তখন এই ভয়ঙ্কর নরখাদকের কথা শোনা যাচ্ছে। একবার এক ধনী ব্রাহ্মণ অনেক ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে ঐ বন পেরিয়ে যেতে চেষ্টা করল। নরখাদক হঠাৎ তাঁর সামনে লাফ দিয়ে পড়ে বলল, 'আমিই সেই নরখাদক।' তার চিৎকারে ভয় পেয়ে সৈন্যরা যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। নরখাদক ব্রাহ্মণকে পিঠে ফেলে ছুটল। সৈন্যদের মধ্যে একজন খুব সাহসী ছিল। সে নরখাদকের পেছনে তাড়া করে ছুটে গেল। নরখাদকও তখন জোরে ছুটতে লাগল। নরখাদকের পায়ে হঠাৎ একটা বিশাল কাঁটা ফুটে গেল। প্রাণ বাঁচাতে ব্রাহ্মণকে ফেলে রেখে সে পালিয়ে গেল।

নরখাদক তো ফিরে গেল সেই গাছটিতে। পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় দিশেহারা হয়ে সে মনে মনে বৃক্ষদেবতার কাছে মানত করল, 'হে বৃক্ষদেবতা, যদি এক সপ্তাহের মধ্যে আমার পা সেরে যায়, তাহলে আমি একশ একজন ক্ষত্রিয় রাজার গলার রক্তে তোমার গোড়া ধুইয়ে দেব।'

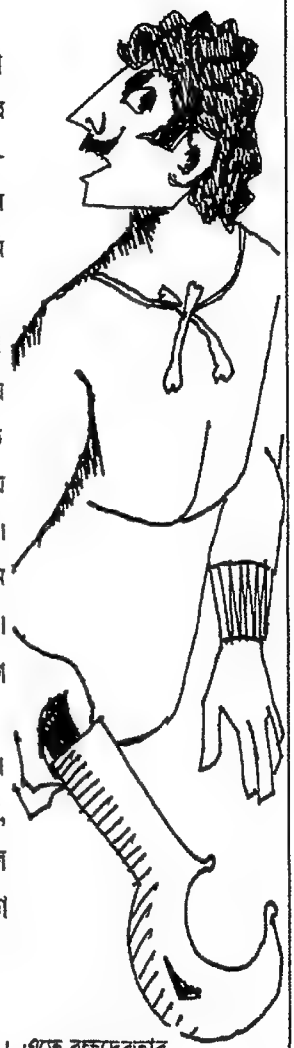

এক সপ্তাহের মধ্যে নরখাদকের ঘা সেরে গেল। এতে বৃক্ষদেবতার কোন হাত ছিল না। কিন্তু নরখাদক তার মানত পূরণ করতে খড়্গ হাতে বেরিয়ে পড়ল। একে একে একশ জন ক্ষত্রিয় রাজাকে ধরে এনে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখল। এই কাণ্ডকারখানা দেখে বৃক্ষদেবতাও ভীত হলেন। বৃক্ষদেবতা তখন দেবরাজ শক্রের কাছে গেলেন।

দেবরাজ শক্র সব শুনে বললেন :

'এই নরখাদককে শান্ত করা আমার অসাধ্য। তবে একজন আছেন, তাঁর নাম সুতসোম। কৌরব্যরাজপুত্র সুতসোমই একে দমন করে বন্দী রাজাদের প্রাণ বাঁচাবেন। ব্রহ্মদত্তকুমারের নরমাংস খাওয়ার অভ্যেস ছাড়িয়ে দেবেন। গোটা জম্বুদ্বীপকে তিনিই এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। তুমি যদি রাজাদের প্রাণ বাঁচাতে চাও তাহলে নরখাদককে গিয়ে বল, সে সুতসোমকে ধরে এনে তারপর যেন বলিদান শুরু করে।'

বৃক্ষদেবতা ফিরে এসে নরখাদককে দেখা দিয়ে বললেন, 'সুতসোমকে না পেলে এ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না।' নরখাদক বলল, 'কোন চিন্তা নেই, এক্ষুনি তাঁকে ধরে আনছি।'

এদিকে সুতসোম তখন অন্য স্থানে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় এক ব্রাহ্মণ তাঁকে পদ্যে রচিত কয়েকটি শাস্ত্রবচন শোনাতে চাইলেন। সুতসোম ব্রাহ্মণকে বললেন, 'আপনি রাজপ্রাসাদে আতিথ্য নিন, আমি ফিরে এসে আপনার শ্লোক শুনব।'

সুতসোম জানতেন না স্নানের ঘাটেই নরখাদকরূপী তাঁর প্রাক্তন বন্ধু ওৎ পেতে রয়েছে। যাই হোক, সহস্র সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে নরখাদক তাঁকে পিঠে ফেলে ছুটতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বনে এসে হাজির হল। সুতসোমকে মাটিতে নামিয়ে নরখাদক জিজ্ঞেস করল, 'তোমার চোখে জল দেখছি। তাহলে মৃত্যুকে তোমার মত পণ্ডিতও ভয় পায়।' সুতসোম বললেন, 'আমি মৃত্যুভয়ে কাঁদছি না। আমার সত্য রক্ষা হল না বলেই কান্না পাচ্ছে।' নরখাদক জিজ্ঞেস করল, 'কিসের সত্য রক্ষা?' সুতসোম তখন স্নান করতে যাওয়ার সময় ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হওয়ার বৃত্তান্তটি বললেন। শ্লোক শুনে তিনি ব্রাহ্মণকে পুরস্কৃত করবেন এই ইচ্ছা ছিল। সেই ইচ্ছাটি তিনি পূর্ণ করতে পারলেন না—এই হচ্ছে সুতসোমের দুঃখের কারণ।

নরখাদক সুতসোমকে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ছেড়ে দিতে রাজি হল। সুতসোমও প্রতিজ্ঞা পালন করে নরখাদকের কাছে ফিরে এলেন। উনি ফিরে আসার পর নরখাদকের খুব ইচ্ছে হল শ্লোকগুলি শোনার। সে বারবার সুতসোমকে মিনতি করল। কিন্তু সুতসোম

তার কৌতূহলের আগুন উসকে দেওয়ার জন্য বারবারই তাকে বললেন, 'তুমি নরখাদক, ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত, ধর্মের বা জ্ঞানের কথা তোমাকে শোনাতে যাব কেন?' নরখাদক যখন ব্যাকুল হয়ে উঠল তখন সুতসোম মধুর কণ্ঠে ধর্মকথা শুরু করলেন। ধর্মকথায় মুগ্ধ হয়ে নরখাদক সুতসোমকে বর দিতে চাইল। সুতসোম বললেন, 'কি লাভ? আমি বর চাইলে পরে তুমি তা দিতে পারবে না।' নরখাদক বলল, 'আমার প্রাণ গেলেও সত্য রক্ষা করব।' শেষে সুতসোম বর চাইতে লাগলেন। রাজাদের প্রাণ ভিক্ষা ও অন্য কিছু বর চাইবার পর তিনি বললেন, 'তুমি নরমাংস ত্যাগ কর।' সুতসোমের এই প্রার্থনায় নরখাদক কেঁদে ফেলল। বলল, 'এ বর তুমি চেয়ো না। এজন্য আমার রাজ্য গেছে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা গেছে, আমি অরণ্যচারী হয়েছি। নরমাংস আমার অতি প্রিয়।'

সুতসোম তখন দীর্ঘক্ষণ ধরে ব্রহ্মদত্তকুমারকে বোঝালেন, 'শ্রেয় আর প্রিয় এ দুয়ের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে বিচক্ষণ মানুষ শ্রেয়র পথে চলেন। যত কষ্টই হোক সেক্ষেত্রে তাঁরা প্রিয়কে বিসর্জন দেন।'

সুতসোমের কথায় নরখাদক সম্মত হল। রাজারা মুক্তি লাভ করলেন। সুতসোম তখন ব্রহ্মদত্তকুমারকে নিয়ে তাঁর নিজের রাজ্যে এলেন। সেনাপতি কালহস্তীকে বললেন, 'তোমাদের রাজাকে আমি পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠা করেছি, এখন তোমরা তাঁকে তাঁর পুরনো গৌরব ফিরিয়ে দাও।' কালহস্তী সেইমত ব্যবস্থা করলেন। সমগ্র জম্বুদ্বীপে শুধু সুতসোমের জয়ধ্বনি শোনা যেতে লাগল।

মূকপঙ্গু জাতক

১

বারাণসীতে তখন রাজত্ব করেন কাশীরাজ। কাশীরাজ ধর্মপরায়ণ। সেই ভাবেই রাজ্য শাসন করেন। রাজ্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নেই। কিন্তু রাজার ষোলশ পত্নীর একজনও কোন সন্তান প্রসব করতে পারেন নি। প্রজারা একদিন রাজার প্রাসাদের সামনে এসে বলল, 'মহারাজ, আপনি ছেলে কামনা করে পুজো-আচ্চা করুন।' রাজার ষোলশ পত্নী পুত্র কামনায় চন্দ্র-সূর্যের পুজো করলেন। এতেও কোন লাভ হল না।

তখন রাজা প্রধানা মহিষী চন্দ্রাদেবীকে ডাকলেন। চন্দ্রাদেবী

মদ্ররাজের কন্যা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শীলবতী। রাজা তাঁকেও বললেন, 'তুমি পুত্র কামনা করে ব্রত পালন কর।' চন্দ্রাদেবী এক পূর্ণিমা তিথিতে পোষধ পালন করলেন। সেইদিন তিনি কঠিন শয্যায় শুলেন। সেখানে শুয়ে তিনি মনে মনে প্রার্থনা করলেন, 'যদি আমি সর্বদা শীলাচার পালন করে থাকি, তাহলে সেই পুণ্যবলে যেন আমার পুত্রসন্তান জন্মায়।'

রাণী চন্দ্রার প্রার্থনায় শক্রের আসন টলে উঠল। তিনি বুঝলেন, শীলবতী রাণী চন্দ্রা পুত্র কামনা করছেন। দেবরাজ তখন দেবলোকে বোধিসত্ত্বকে দেখতে পেলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে বললেন, 'তুমি চন্দ্রার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ কর। তাহলে পৃথিবীতে কল্যাণকর অনেক কাজ করতে পারবে।' বোধিসত্ত্ব তখন পাঁচশ দেবপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মর্ত্যে চললেন। নিজে প্রবেশ করলেন চন্দ্রার গর্ভে। অন্যান্য দেবপুত্রদের প্রবেশ করালেন অমাত্য পত্নীদের গর্ভে।

যথাসময়ে বোধিসত্ত্ব ভূমিষ্ঠ হলেন। এই সংবাদ শোনামাত্র রাজার মধ্যে স্নেহ জেগে উঠল। স্নেহ যেন তাঁর চামড়া-মাংস ভেদ করে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেল। স্নেহবসে রাজা স্নান করে উঠলেন। তিনি তখন জানতে চাইলেন, 'আজ অমাত্যদের কারও বাড়িতে কোন পুত্র জন্মেছে কি।' রাজপুত্রের প্রিয় অনুচর খুঁজে বের করার জন্যই তিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন। যখন শুনলেন পাঁচশটি শিশু জন্মেছে অমাত্যদের ঘরে, তখন তিনি নির্দেশ দিলেন, 'এদের সবাইকে রাজপুত্রের মতই পোশাক-পরিচ্ছদ দাও।' তারপর রাজশিশুকে স্তন দেওয়ার যোগ্য এক ধাত্রীর খোঁজ করতে বললেন। রাজপুত্র তার বুকের দুধ খেয়েই বেড়ে উঠবে।

রাজা ছেলে পেয়ে এত খুশি হয়েছিলেন যে তিনি রাণীকে বর দিতে চাইলেন। রাণী কিন্তু তক্ষুনি কোন বর চাইলেন না। তিনি ভবিষ্যৎ কালের জন্য তা জমা করে রাখলেন। রাজা তখন জ্যোতিষী ডেকে রাজপুত্রের ভবিষ্যৎ জানতে চাইলেন। তাঁর কোন ফাঁড়া বা কোপ আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। জ্যোতিষী বিচার করে বললেন, 'না

মহারাজ, তেমন কিছু দেখছি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি রাজপুত্র অতি শুভলক্ষণসম্পন্ন। ইনি চতুর্মহাদ্বীপে রাজত্ব করার যোগ্য।' রাজপুত্রের জন্মের সময় খুব বৃষ্টি হয়েছিল বলে তাঁর নাম রাখা হল মেঘকুমার।

মেঘকুমারের বয়স একমাস হল। একদিন ধাত্রী এসে তাঁকে রাজার কোলে দিয়ে গেল। রাজা ছেলেকে কোলে বসিয়ে খেলতে দিলেন। এমন সময় রাজার কাছে চারজন চোরকে ধরে আনা হল। রাজা আদেশ দিলেন একজনকে শূলে চড়াতে, একজনকে শেকলে বেঁধে জেলে দিতে, বাকি দুজনকে গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে।

এই ভয়ঙ্কর আদেশ শুনে রাজপুত্র শিউরে উঠলেন। তারপর রাজপুরীর ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে ভাবলেন, 'কেন আমি এখানে এলাম।' ভাবামাত্র বোধিসত্ত্বের পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে গেল। আগের জন্মে তিনি ছিলেন দেবলোকে, তার আগে নরকে, তার আগে ছিলেন বারাণসীরই রাজা। রাজপুত্র বুঝলেন, তিনি যদি এই রাজার প্রাসাদেই জীবন কাটান তাঁকে আবার নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। রাজভবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তখন বোধিসত্ত্বকে দেখা দিয়ে বললেন, 'বাবা, আমি অনেক আগে, কোন এক জন্মে তোমার মা ছিলাম। এখান থেকে যদি মুক্তি চাও তাহলে পঙ্গু না হয়েও পঙ্গুর মত পড়ে থাক।'

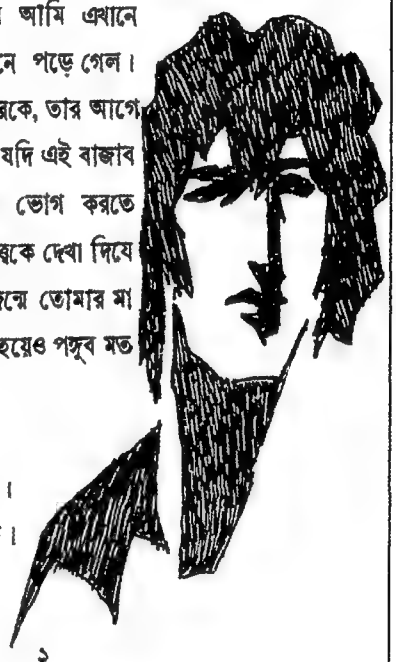

এই বলে তিনি কয়েকটি পদ্ধতির কথা বললেন :

১. কোন কিছুতেই বুদ্ধির লক্ষণ দেখাবে না।
২. জড় পদার্থের মত সব সময় পড়ে থাকবে।
৩. বোবা না হয়েও বোবা হয়ে থাকবে।
৪. কালা না হয়েও কালা সেজে থাকবে।

২

এরপর মেঘকুমার এই পন্থা অনুসারেই চলতে লাগলেন। বাচ্চারা স্তন না পেলে স্তনের জন্য কাঁদে। কিন্তু মেঘকুমার টুঁ শব্দটি করেন না। কিছুদিন এভাবে যাওয়ার পর ধাত্রীরা ভাবল, 'পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ শিশুদের অঙ্গ দেখতে যেমন হয় ও মোটেই সেরকম নয়। একে দেখে তো মনে হয় সুস্থ।' এরপর নানা ভাবে মেঘকুমারকে পরীক্ষা করা হল। মত্ত হাতি, বিষধর সাপ কোন কিছুর ভয়েই

মেঘকুমার এই দলটি ত্যাগ করলেন না। প্রত্যেকবার এরকম পরীক্ষার সময় মেঘকুমার মনে মনে ভাবতেন, 'এখন আমি দলত্যাগ করলে ভবিষ্যতে আমার বিপদ আরও বেড়ে যাবে। রাজকীয় জীবনযাপন মানেই অনেক পাপ কাজ করা। যার ফলে আমাকে আবার নরকে যেতে হবে।' অতীত জীবনে নরকবাসের যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতা হুবহু মনে পড়ে যেত। দেখতে পেতেন, যন্ত্রণায় তাঁর মুখ বেঁকে যাচ্ছে। নরকের ভয়ে মেঘকুমার নিজেকে সামলে রাখতে পারতেন।

এভাবে মেঘকুমারের বয়স ষোল পূর্ণ হল। কিন্তু ষোল বছরের এই তরুণ সম্পূর্ণ জড়ভরত। তাই রাজা একদিন বিরক্ত হয়ে জ্যোতিষীদের ডেকে পাঠালেন।

'কুমারের জন্মের সময় যা বলেছিলেন মনে আছে?'

'মনে আছে মহারাজ।'

'তাহলে আপনারা গণনা করতে জানেন না।'

'জানি মহারাজ।'

'তাহলে মিথ্যে কথা বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ মহারাজ।'

'কেন?'

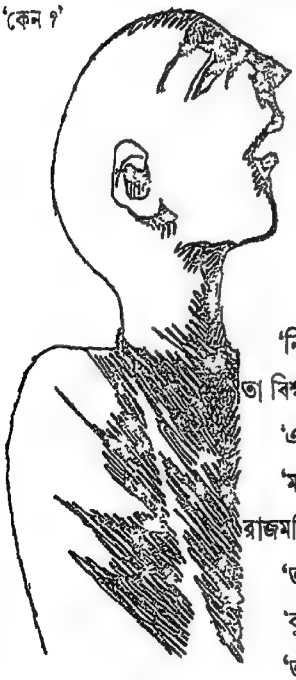

'নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে তখন সত্যি কথা বললে পুত্রস্নেহে আপনি তা বিশ্বাস করতেন না।'

'এখন কি করা উচিত?'

'মহারাজ, প্রাসাদে এই ছেলে থাকলে হয় আপনার না হলে রাজমহিষীর জীবন নিয়ে টানাটানি হবে, কিংবা রাজ্য নষ্ট হবে।'

'তাহলে উপায় কি?'

'কুমারকে হত্যা করুন।'

'তাই হবে।'

চন্দ্রাদেবী রাজার আদেশ শুনে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এলেন। মহারাজের কাছে একটি বর তাঁর প্রাপ্য ছিল। সেই বরের জোরে তিনি সাতদিনের জন্য মেঘকুমারকে রাজা করলেন। একদিন, দুদিন করে সেই সাতটি দিনও কেটে গেল। চন্দ্রাদেবী তখন মেঘকুমারের সামনে বিলাপ করতে লাগলেন। মেঘকুমারের মনও এতে আর্দ্র হল। তিনি ভাবলেন, 'মার ভুল ভেঙ্গে দিই।' পরমুহূর্তে ডাইনির কথা মনে পড়ায় তিনি নিশ্চল জড় পদার্থের মতই রইলেন।

পরের দিন সকাল হতেই সারথি সুন্দর রথ সাজিয়ে রাজকুমারকে নিতে এল। রাজরাণীর কোল থেকে তাকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে

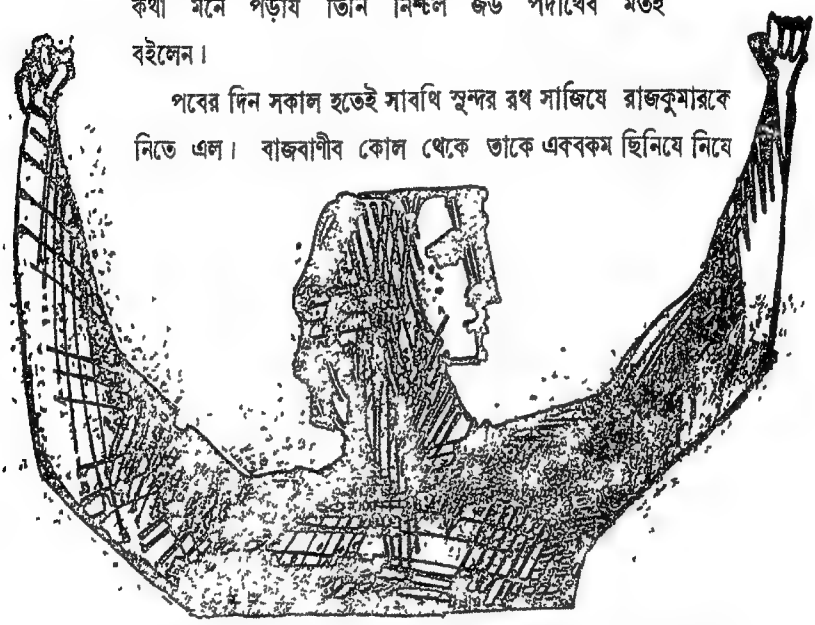

চলে গেল। শ্মশানে পৌঁছে সারথি গর্ত করার জন্য রথ থেকে নামল। মেঘকুমার তখন মনে মনে ভাবলেন, 'এইবার আমাকে আত্মরক্ষা করতে হবে।' কিন্তু তিনি দীর্ঘ ষোল বছর হাত-পা কোন কাজেই লাগান নি। সেজন্যে ভাবলেন, 'আগে দেখে নেওয়া যাক হাত-পা-গুলো অবশ হয়ে গেল নাকি।' এই ভেবে তিনি রথ থেকে নেমে রথটাকে ধরে এক টান দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পর্বতপ্রমাণ রথটি উল্টে পড়ে গেল। মেঘকুমার এবার একটু সাজগোজ করতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবরাজ শক্রের আসন গরম হয়ে উঠল। শক্র বুঝলেন, মেঘকুমার সাজতে চান। আবার এ-ও বুঝলেন মেঘকুমার দিব্য সাজ চাইছেন। শক্রের প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে মেঘকুমারের শরীরে দিব্য

আভরণসমূহ দেখা দিল।

সারথি তখন মাটি খুঁড়ে চলছে। মেঘকুমার সেই গর্তের এক পাশে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। মেঘকুমারের দিব্য সাজ, দেবদূতের মত চেহারা দেখে সারথি প্রায় মূর্ছা যায় আর কি। কুমারের সঙ্গে কথোপকথনে সারথি বারবার প্রশ্ন করতে লাগল, 'কেন তাহলে আপনি জড় সেজে থেকে রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করলেন?'

'রাজ-ঐশ্বর্য আমার কাছে গলিত শব।'

'আশ্চর্য করলেন রাজকুমার।'

'হ্যাঁ। প্রব্রজ্যাই আমার লক্ষ্য।'

'আমাকেও সঙ্গে নিন প্রভু।'

মেঘকুমার দেখলেন, 'সারথিকে এখানে প্রব্রজ্যা দিলে সে আর ফিরে যাবে না। সেক্ষেত্রে সবাই ভাববে আমি তাহলে সত্যিই যক্ষ। আর বাবা-মা-ও এখানে আসবেন না। এই রথ, এত স্বর্ণালঙ্কার সবই নষ্ট হবে।' এজন্যে তিনি সারথিকে বললেন, 'দেখ, প্রব্রজ্যা পেতে হলে অ-ঋণী হতে হয়। রাজাকে রথ আর স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে এস আগে, তারপর প্রব্রজ্যা নাও।' শুনে সারথি ভাবল, উনি যা বললেন তা করতে হলে ওঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেওয়া দরকার, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ইনি ওখানে থাকবেন। তাছাড়া সব শুনে রাজাও হয়ত তাঁর ছেলেকে দেখতে চাইতে পারেন।

'কুমার, আমার একটি প্রার্থনা আছে।'

'বল কি প্রার্থনা।'

আমি রাজাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে থাকবেন।

নিশ্চয়ই থাকব। তুমি রাজাকে গিয়ে আমার কুশল জানাও।

৩

কাশীরাজ পুত্রের কুশলসংবাদ পাওয়া মাত্র তাঁকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। অমাত্যরা চাইলেন সঙ্গে যেতে। অন্তঃপুর-বাসিনীরাও ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এতজনের যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি দরকার। রথ সাজাতে ও দরকারী জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে কেটে গেল পর পর তিনটি দিন। তারপর তাঁরা সকলে নগরী ছেড়ে চললেন সেই শ্মশানের দিকে।

ওদিকে সারথি চলে যেতেই মেঘকুমার প্রব্রজ্যা নিতে আগ্রহী হলেন। শক্র দৈব প্রভাবে সুন্দর পর্ণকুটির তৈরি করেছিলেন। শ্মশানটি মুহূর্তের মধ্যে এক তপোবনে পরিণত হল। মেঘকুমার তপস্যায় বসা মাত্র সিদ্ধিলাভ করলেন। তিনি গাছের পাতা অল্প জলে ফুটিয়ে অমৃত মনে করে খেলেন।

মেঘকুমারের বাবা এসে নবীন তপস্বীর সামনে দাঁড়ালেন। তাঁরা দেখলেন, মেঘকুমার যেন এক জ্যোতির্মণ্ডলী। নিজের ছেলের পা তাঁরা স্পর্শ করলেন। মেঘকুমার সকলকে ধর্মকথা শুনিয়ে প্রব্রজ্যা দিলেন। কাশীরাজ্য পরিত্যক্ত হল। ধনাগারগুলি উন্মুক্ত থাকল। তখন আশপাশের তিনজন রাজা কাশীরাজ্য দখল করতে এসে দৈব প্রভাবে মেঘকুমার কাছে এলেন। তাঁরাও প্রব্রজ্যা নিলেন। এই ধর্মচারিতা এত ব্যাপক হয়েছিল যে কাশীরাজ্যে একজন মদ্যপ মদ খাওয়ার কোন সঙ্গী পেল না। তখন সে-ও এসে প্রব্রজ্যা নিল।

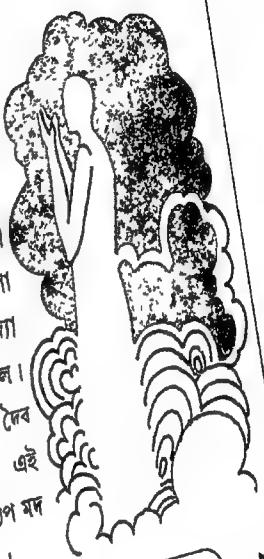

মহাজনক জাতক

১

পুরাকালে মিথিলারাজ্যে রাজত্ব করতেন জনক নামে এক রাজা। জনকরাজের দুটি ছেলে। বড় ছেলে অরিষ্টজনক, ছোট ছেলের নাম পোলজনক। রাজা বড় ছেলেকে যুবরাজ আর ছোট ছেলেকে সেনাপতি করে যথাসময়ে দেহ রাখলেন।

জনকরাজার মৃত্যুর পর অরিষ্টজনক রাজা হলেন। পোলজনক

হলেন যুবরাজ। অরিষ্টজনক খুব কান-পাতলা ছিলেন। যে যা বলত তাই বিশ্বাস করতেন। রাজার এক চাকর বারবার তাঁকে বলতে লাগল, 'মহারাজ, পোলজনক আপনাকে হত্যা করে রাজা হতে চান।' বারবার এই একই কথা শুনে রাজা চাকরের কথা বিশ্বাস করলেন। তিনি পোলজনককে বন্দী করে কারাগারে পাঠালেন। পোলজনক কয়েদখানায় বসে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আমি যদি রাজাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে থাকি তাহলে কয়েদখানার দরজা যেন জীবনে কোনদিন না খোলে। আর আমি যদি নির্দোষ হই তাহলে এই মুহূর্তে কারাগারের দরজা ভেঙ্গে পড়ুক, আমার হাতের শেকল খুলে পড়ুক।'

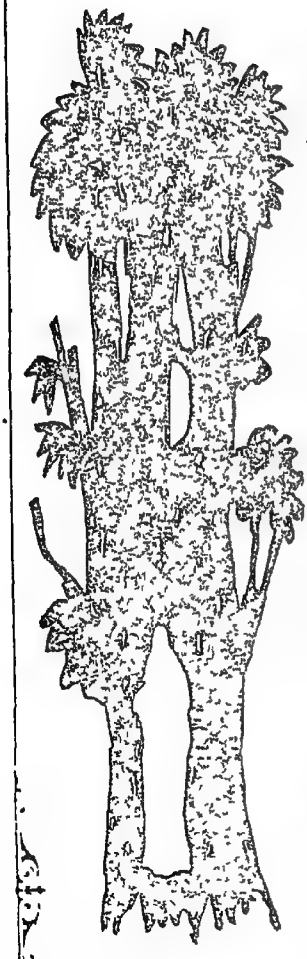

রাজকুমারের প্রতিজ্ঞা অনুসারে কারাগারের পাঁচিল ভেঙ্গে পড়ল। কুমারও নিঃশব্দে নগর ছেড়ে সীমান্তের গ্রামে আশ্রয় নিলেন। গ্রামবাসীরা পোলজনককে চিনত। তারা তাঁর অনেক সেবাযত্ন করল। পরে লোকজন জোগাড় করে পোলজনক মিথিলা রাজ্য আক্রমণ করলেন।

অরিষ্টজনকের সৈন্যরা যুদ্ধ হারতে লাগল। অরিষ্টজনক যুদ্ধে যাওয়ার আগে প্রধানা মহিষীকে ডেকে বললেন, 'আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। যুদ্ধে কে হারবে কে জিতবে বলা কঠিন। আমি হারলে তুমি যেভাবে হোক আমাদের সন্তানকে বাঁচাবে।' তখন প্রধানা মহিষীর গর্ভে রয়েছেন স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। রাজার হেরে যাওয়ার খবর পাওয়া মাত্র রাণী একটা ঝুড়িতে প্রচুর ধনসম্পদ লুকিয়ে নিয়ে এক কাপড়ে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। রাণীকে সাহায্য করতে এলেন স্বয়ং শক্র। তিনি এক অলৌকিক রথে করে রাণীকে রেখে এলেন চম্পানগরে। চম্পানগরের এক বিত্তশালী প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাণীকে নিজের বোন হিসেবে আশ্রয় দিলেন। এভাবে রাণী গর্ভরক্ষা করতে সমর্থ হলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই রাণীর একটি ছেলে জন্মাল। বাবার নাম অনুসারে ছেলের নাম রাখা হল মহাজনক। একটু বড় হয়ে মহাজনক বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে যেতেন। বাচ্চারা তাকে 'ধোপার ছেলে' বলে রাগাত। মহাজনক তখন পিতৃ-পরিচয় জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

শেষ পর্যন্ত রাণী কুমারকে সব কথা খুলে বললেন। কুমারের বয়স তখন ষোল উত্তীর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন শাস্ত্রে ও অস্ত্রবিদ্যায় যথেষ্ট নৈপুণ্য

অর্জন করেছেন। নিজের অতীত বৃত্তান্ত জানার পর কুমারের মধ্যে দুটি স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠল। এক : পিতৃহত্যার প্রতিশোধ, দুই : মিথিলার রাজ্যভার নিজের হাতে নেওয়া। মহাজনক তাঁর মাকে জিজ্ঞেস করলেন :

'মা, তোমার কাছে ব্যবসা করার মত কিছু টাকা হবে?'

'আমার কাছে অনেক ধনরত্ন আছে বাবা। তুমি কি করতে চাও?'

'আমি বাবার রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চাই।'

'আমার কাছে যে পরিমাণ অর্থ আছে তা দিয়ে তুমি সৈন্যবাহিনী গড়তে পারবে।'

'না মা, তুমি অর্ধেক টাকা আমাকে দাও। আমি ব্যবসা করব।'

'সে তো অনেক বিপদের রাস্তা।'

'কিছু ভেবো না, আমি ঐ টাকা অনেক গুণ বাড়িয়ে নিয়ে তা দিয়ে সৈন্যবাহিনী গড়ব।'

কয়েকদিন পরে মার অনুমতি নিয়ে মহাজনককুমার সমুদ্রপথে বাণিজ্য করতে রওনা হলেন।

প্রথম কয়েকদিন নির্বিঘ্নে কাটলেও পরে সমুদ্রে বিশাল ঝড় উঠল। মহাজনকের নৌকো সমুদ্রে হারিয়ে গেল। মাস্তুল ধরে ভাসতে ভাসতে মহাজনক সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করলেন। সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাজনককে মরতে দিতে পারলেন না। কারণ তিনি মাতৃভক্ত। পিতৃঋণ শোধ করতে চলেছেন। মাতৃপিতৃভক্তকে সমুদ্র কখনও গ্রাস করে না। দেবী আকাশপথে কুমারের সামনে এলেন। তাঁর সঙ্গে নানারকম কথা বললেন। তারপর কুমারের ইচ্ছায় তাঁকে মিথিলায় পৌঁছে দিলেন। সমুদ্রে সাতদিন ভেসে থাকার ক্লান্তি দেবীর পদস্পর্শে দূর হল। যখন মিথিলারাজের উদ্যানে তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হল তখন মহাজনকের দেবদূতের মত চেহারা সেই বাগানে ঝলমল করে উঠল।

ওদিকে মিথিলার রাজা পোলজনক একটিমাত্র কন্যা সীবলিকে রেখে মারা গিয়েছেন। মৃত্যুকালে তিনি চারটি শর্ত বলে যান। যে ঐ চারটি শর্ত পূরণ করতে সমর্থ হবে সে-ই মিথিলার রাজা এবং সীবলির স্বামী হবে। শর্তগুলি হল : ১. সীবলি যাঁকে পছন্দ করবে, ২. মহাধনুকে যে ছিলা পরাতে পারবে, ৩. গোপন ধনরাশি কোথায়

আছে যে বলে দিতে পারবে, ৪. পালঙ্কের শিয়রের দিকটি যিনি নির্দেশ করতে পারবেন।

রাজার মৃত্যুর পর সেনাপতি ও অমাত্যরা শর্ত পূরণের চেষ্টা করতে গিয়ে একে একে লাঞ্ছিত হলেন। তখন ঠিক করা হল, যে কেউ একটিমাত্র শর্ত পূরণ করতে পারবে তাঁকেই মিথিলা-রাজ হিসেবে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু সে কাজও কেউ করতে পারল না। তখন পুরোহিতরা আলোচনা করে পুষ্পকরথ ছেড়ে দিলেন।

পুষ্পকরথ এপথ-সেপথ ঘুরে দ্রুতবেগে রাজার বাগানের দিকে ছুটে গেল। সেখানে মহাজনক শুয়ে ছিলেন। তাঁর চারপাশে একবার ঘুরপাক খেয়ে রথ থেমে গেল। পুরোহিতরা মহাজনকের পায়ের লক্ষণাদি বিচার করে বুঝলেন এই ব্যক্তি শুধু মিথিলা কেন, সমগ্র জম্বুদ্বীপের রাজা হতে পারেন। মহাজনককে অভ্যর্থনা করে প্রাসাদে নিয়ে আসা হল। মহাজনক অমাত্যদের সঙ্গে প্রাসাদে ঢুকলেন। যে চারটি শর্ত ছিল সেগুলিও অবলীলায় পূরণ করলেন। তারপর সীবলির সঙ্গে মহাজনকের বিয়ে হল। তিনি তখন চম্পানগর থেকে নিজের মা এবং মামাকে আনলেন।

৩

দীর্ঘকাল রাজ্যসুখ ভোগ করার পর একদিন মহাজনক আমবাগানে বেড়াতে গেলেন। সেখানে একটি আমগাছের শাখাপ্রশাখা ফলভারে নুয়ে ছিল। তিনি সেখান থেকে কয়েকটি আম পেড়ে খেলেন। তারপর সকলেই সেই গাছের আম পেড়ে খেতে লাগল। ফিরে আসার সময় মহাজনক দেখলেন, গাছটি হতশ্রী হয়েছে। কিন্তু গাছটির উল্টোদিকের ফলহীন একটি গাছের পাতা ও ডালগুলি অক্ষত রয়েছে। ভারি সুন্দর লাগছে তার সবুজ শ্রী। এ থেকে তিনি বুঝলেন, রাজসিংহাসন হল ফলবতী আমগাছ, আর প্রব্রজ্যা হল নিষ্ফল আম গাছ। মহাজনক বিলম্ব না করে প্রব্রজ্যা নিলেন।

সীবলি রাজাকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক সাধ্যসাধনা করলেন। রাজার অনুগামী হয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করলেন। কিন্তু প্রব্রজ্যার একাকীত্ব রক্ষা করার জন্য মহাজনক ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেজন্য সীবলিকে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে হল। তিনি পুত্রের হাতে রাজ্য শাসনের ভার দিয়ে নিজেও প্রব্রজ্যা নিলেন।

শ্যাম জাতক

পুরাকালে বারাণসীর নদীর দু পাড়ে দুটি গ্রাম ছিল। দুটি গ্রামই ছিল ব্যাধদের। প্রতিটি গ্রামে পাঁচশ ব্যাধ বাস করত। এই পাঁচশ ব্যাধের একজন করে দলপতি ছিল। দলপতি দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। দুজনের বন্ধুত্ব যাতে আরও দীর্ঘকাল অটুট থাকে সেজন্য তারা ঠিক করেছিল যদি কখনও একজনের ছেলে আর একজনের মেয়ে হয়, তাহলে তাদের পরস্পরের সঙ্গে বিয়ে দেবে।

একসময় দুজনেরই দুটি সন্তান জন্মাল। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলের নাম হল দুকূলক, মেয়েটির নাম রাখা হল পাবিকা। ছেলেমেয়ে দুটি দেখতে খুব সুন্দর হয়েছিল। সাধারণত ব্যাধদের মধ্যে কেউ অত সুন্দর হয় না। এরা বড় হতে ওদের বাবা-মা চাইলেন বিয়ে দিতে। কিন্তু দুজনেই পূর্ব জন্মে ছিলেন দেবতা। তাঁরা বিয়ে করতে চাইলেন না। বাবা-মা সে কথায় কান না দিয়ে দুকূলকের সঙ্গে পাবিকার বিয়ে দিলেন।

দুকূলক ও পাবিকা বিয়ের পরেও আশ্রমবাসীদের মত থাকতে লাগলেন। দুকূলক পশু-পাখি বধ করতেন না। তাঁর বাবা মা জানতে চাইল, 'ব্যাধকুলে জন্মেও যদি পশু-পাখি না মার তাহলে তোমরা কি করে খাবে? বল দেখি বাপু তোমাদের মনের ইচ্ছেটা কি?' একথা শুনে দুকূলক বললেন, 'বাবা, আমি প্রব্রজ্যা নিতে চাই।' পাবিকাও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমিও প্রব্রজ্যা নিতে চাই।' বাবা-মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে আটকাচ্ছে কোথায়?' তাঁরা বললেন, 'আপনাদের অনুমতির জন্যই অপেক্ষা করছি।' দুকূলক ও পাবিকার বাবা-মা অনুমতি দিলেন। দুজনে তখন হিমালয়ের দিকে যাত্রা করলেন।

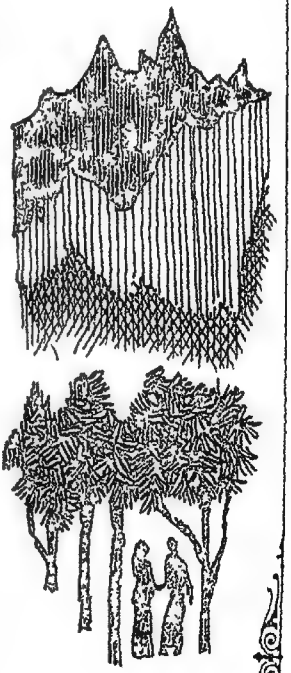

তাঁরা চলেছেন হিমালয়ের দিকে। শক্র দেখলেন দুজন মহাতপস্বী হিমালয়ে যাচ্ছেন। এঁদের আশ্রম দরকার। তিনি বিশ্বকর্মাকে নির্দেশ দিলেন, 'যাও, এরা পৌঁছবার আগেই দুটি সুন্দর কুটির গড়ে দাও। আর প্রব্রজ্যার জন্য দরকারী জিনিসও দিয়ে দাও।' বিশ্বকর্মা তাই করলেন। দুকূলক এবং পাবিকা সেই আশ্রমে উঠে মৈত্রী ভাবনায় সময় কাটাতে লাগলেন। দুকূলক বন্য ফুল জোগাড় করে আনতেন।

পারিকা আশ্রমের কাজ করতেন। এভাবে চলতে লাগল। শক্র একদিন দেখলেন, 'ওরা দুজনেই অন্ধ হবেন, সুতরাং ওঁদের একটি ছেলে দরকার।' শক্র এসে সে কথা দুকূলককে বললেন। দুকূলক এতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'তাহলে সংসারে থাকতে কি বাধা ছিল?' যাই হোক, শেষ পর্যন্ত শক্রের আশীর্বাদে ওঁরা একটি পুত্র সন্তান উপহার পেলেন। তার নাম রাখা হল সুবর্ণশ্যাম।

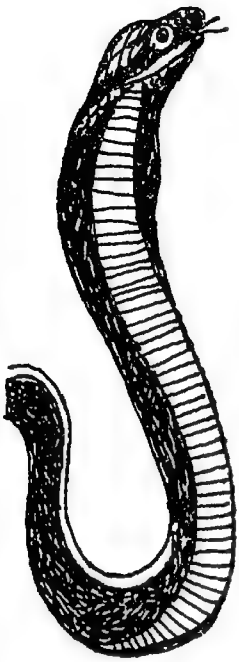

সুবর্ণশ্যামকে বাবা-মা 'শ্যাম' বলেই ডাকতেন। এভাবে দিন যায়। একদিন শ্যামের ষোল বছর পূর্ণ হল। এরপর দুকূলক ও পারিকা ফলের খোঁজে বনে গেলেন। বনে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। এক গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়লেন। ঐ গাছের গুঁড়ির মধ্যে এক বিষাক্ত সাপ থাকত। দুকূলক ও পারিকার ঘাম বৃষ্টির জলের সঙ্গে সেই সাপের নাকে এসে লাগল। তাঁদের ঘামের অম্ল ও লোনা স্বাদে সাপটি ক্ষিপ্ত হল। সে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলল। তাতে দুজনেরই চক্ষুদুটি চিরতরে নষ্ট হল। অন্ধ হয়ে তাঁরা বাড়ি ফেরার রাস্তাটাও হারিয়ে ফেললেন।

শোনা যায়, পূর্বজন্মে দুকূলক ও পারিকা ছিলেন বৈদ্য এবং বৈদ্য-পত্নী। একবার এক কৃপণ ধনী রোগীর চোখদুটি যেতে বসেছিল। বৈদ্য তখন চিকিৎসা করে তার চোখ সারান। কিন্তু কৃপণ বৈদ্য তাঁর পারিশ্রমিক দিতে চায় না। তখন পত্নীর পরামর্শে বৈদ্য ঐ রোগীর চোখে এমন ওষুধ দিলেন যে তার দুটি চোখই অন্ধ হয়ে যায়। সেই পাপের ফলেই তাঁরা এ জন্মে অন্ধ হলেন।

শ্যাম এবার থেকে বাবা-মার সেবার ভার পেলেন। তিনিই তখন তাঁদের চোখের মণি। অন্ধ বাপ-মা সব ব্যাপারেই শ্যামের ওপর নির্ভরশীল। কি জল তুলে আনা, কি ফল জোগাড় করা, সমস্ত কাজই শ্যামকে করতে হচ্ছে। একদিন শ্যাম আশ্রমের জল আনতে নদীতে গেলেন। ঘড়াটি রাখলেন দুটি হরিণের পিঠে। সেদিন ঐ বনে বারাণসীর রাজা পিলিয়ক্ষ শিকারের সন্ধানে ঘুরছিলেন। এই রাজা হরিণের মাংস খেতে খুব ভালবাসতেন। তিনি ধনুর্বিদ্যায় চৌখস ছিলেন। বনের মধ্যে হঠাৎ দুটি হরিণ ও শ্যামকে আসতে দেখে তিনি ভাবলেন, 'এ কোন কিম্ভূত জন্তু হবে। এতদিন এ অঞ্চলে ঘুরছি,

কিন্তু কোনদিন তো মানুষ দেখিনি। এর সম্পর্কে জানতে হবে। তবে তার আগে এক তীর মেরে একে দুর্বল করে দিতে হবে।'

পিলিয়ক্ষের বিষাক্ত তীর শ্যামকে মৃত্যুমুখে নিয়ে গেল। শ্যাম বৃথাই তাঁর চারদিকে তাকিয়ে আক্রমণকারীর খোঁজ করলেন। পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার কোন শত্রু নেই, আমাকে মেরেও কারও কোন লাভ হবে না, তবু আমাকে মারলেন। যিনি আমাকে মেরেছেন আমি তাঁর পরিচয় পেতে ইচ্ছুক, দয়া করে সামনে আসুন।' এই ভদ্র সম্ভাষণে পিলিয়ক্ষ খুবই লজ্জা পেলেন। তবু তিনি শেষ পর্যন্ত শ্যামের কাছে এলেন। কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারলেন, অন্ধ তপস্বী ও তপস্বিনীর কথা। পিলিয়ক্ষ মৃত্যুমুখযাত্রীকে আশ্বাস দিলেন, 'তোমার অবর্তমানে আমি তোমারই মত ভালবাসায় তোমার পিতামাতার সেবা করব।'

বহুসুন্দরী নামে এক স্বর্গীয় দেবী একবার বোধিসত্ত্বের মা হয়েছিলেন। তারপর থেকে চিরকাল তিনি বোধিসত্ত্বের কথা ভেবে এসেছেন। সেদিন ভাবতে গিয়ে শ্যামের ঐ করুণ অবস্থা দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলেন, 'সত্য প্রতিজ্ঞা করে ওঁকে বাঁচাতে হবে।' এই ভেবে তিনি আকাশদেবতা হয়ে রাজাকে বললেন শ্যামের আশ্রমে যেতে। রাজা পিলিয়ক্ষ শ্যামের আশ্রমে গিয়ে তপস্বী ও তপস্বিনীকে নিজের পাপের কথা বললেন। এরপর তাঁরা রাজার সঙ্গে শ্যামের কাছে এলেন। তাঁরা সেখানে আসার পর প্রতিজ্ঞা করলেন, 'যদি শ্যাম সত্য পথে চলে থাকে তাহলে বিষের তেজ নষ্ট হবে।' এতে শ্যাম পাশ ফিরলেন। তখন বহুসুন্দরীও প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আমি যদি শ্যামকে সবচেয়ে ভালবেসে থাকি তাহলে ও যেন আরোগ্য লাভ করে।'

কিছুক্ষণ পরে শ্যাম তো উঠে বসলেনই, শ্যামের বাবা-মাও ফিরে পেলেন নিজেদের দৃষ্টিশক্তি। তখন শ্যাম রাজাকে আপ্যায়ন করলেন। জানালেন তিনি বিষের প্রকোপে মূর্ছা গিয়েছিলেন। শ্যাম বললেন, 'তাছাড়া আমি বাবা-মাকে সেবাযত্ন করি, তাই আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন দেবকুল।' এ কথা শুনে রাজা বিস্মিত হয়ে গেলেন।

শ্যাম রাজাকে অনেক ধর্মকথা শোনালেন।

রাজা বারাণসীতে ফিরে এসে পোষধ পালন করলেন। প্রাণী-হিংসা ত্যাগ করলেন। দানধ্যানে রত থেকে আয়ুক্ষয় করতে লাগলেন। যথাসময়ে রাজার স্বর্গলাভ হল। বোধিসত্ত্ব বাপ-মার সেবা করে বোধি লাভ করলেন।

ভূরিদত্ত জাতক

১

পুরাকালে বারাণসীতে রাজত্ব করতেন ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্ত তাঁর ছেলেকে যুবরাজ করেন। একদিন যুবরাজের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি দেখে ব্রহ্মদত্ত মনে মনে ভয় পেলেন। ভাবলেন, 'যুবরাজের ক্ষমতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, হয়ত আমি বেঁচে থাকতেই তাঁর রাজা হওয়ার ইচ্ছে হবে।' এই ভেবে তিনি যুবরাজকে আদেশ দিলেন, 'তুমি এ রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও। আমার মৃত্যুর পর এখানে এসে রাজত্ব করবে।'

রাজাকে সম্মান দেখিয়ে কুমার দেশত্যাগ করলেন। কিন্তু তাঁর মন বিষাদে ভরে গেল। ঠিক করলেন, প্রব্রজ্যা নেবেন। এই ভেবে যমুনা নদীর তীরে পাতার কুটির তৈরি করে থাকতে শুরু করলেন। তখন সমুদ্রের নাগকন্যাদের মধ্যে এক বিধবা নাগকন্যা ছিলেন। তাঁর খুব ইচ্ছে হল আবার বিয়ে করেন। এই আশায় তিনি নাগভবন ছেড়ে পৃথিবীতে উঠে এলেন। যমুনাতীরে ঘুরতে ঘুরতে ঐ কুটিরটি দেখতে পেলেন। নাগকন্যা ভাবলেন, 'যদি এই তপস্বী শুদ্ধাচারী হন তাহলে তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন না। কিন্তু যদি মনের দুঃখে প্রব্রজ্যা নিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর সংসার করার ইচ্ছে ক্ষয়ে যায় নি।'

এর পর নাগকন্যা পরপর তিনদিন এসে কুমারের কঠিন শয্যাকে ফুলশয্যা করে রেখে গেলেন। কুমার তিন রাত্রি ঐ ফুলশয্যায় শয়ন করে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। চতুর্থ দিন সকালে তিনি লুকিয়ে রইলেন। নাগকন্যা ফুল নিয়ে এলে তিনি তাঁকে ধরে ফেললেন। তারপর তাঁরা গান্ধর্বমতে বিবাহ করে সেখানে সুখে বসবাস করতে লাগলেন। তাঁদের দুটি সন্তান হল। বড়টি ছেলে, তার নাম রাখা

হল সাগর ব্রহ্মদত্ত। আর মেয়ের নাম রাখা হল সমুদ্রজা। একদিন বারাণসীবাসী এক বনচর কুমারকে দেখে ফেলল। সে কয়েকদিন কুমারের কাছে কাটিয়ে ফিরে গেল।

ওদিকে বারাণসীরাজ আয়ু ক্ষয় করে দেহান্তরিত হলেন। তখন কুমারের খোঁজ পড়ল। বনচরের সাহায্যে অমাত্যরা কুমারের কাছে রাজ-অভিষেকের প্রস্তাব নিয়ে এলেন। কুমারকে ঐ বনেই রাজপদে অধিষ্ঠিত করা হল। নাগকন্যা কিন্তু কুমারের সঙ্গে যেতে রাজি হলেন না। পুত্র-কন্যাকে কুমারের হাতে তুলে দিয়ে তিনি বললেন, 'মহারাজ, আমি গেলে আপনার অমঙ্গল হবে। সেখানে অত লোকজন। কোন কারণে আমার রাগ হলে দৃষ্টিপাতমাত্র লোক ভস্ম হয়ে যাবে। এতে আপনারই দুর্নাম হবে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' কাঁদতে কাঁদতে তাঁরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। যাওয়ার সময় নাগকন্যা রাজাকে সতর্ক করে বলে গেলেন, 'সাগর আর সমুদ্রজার শরীর খুবই নমনীয়। জলীয় পদার্থে গড়া। যাওয়ার সময় এদের জলপূর্ণ পাত্রে করে নিয়ে যাবেন। প্রাসাদেও এদের জলকেলির ভাল ব্যবস্থা করবেন। তাহলেই সাগর আর সমুদ্রজা ভাল থাকবে।'

২

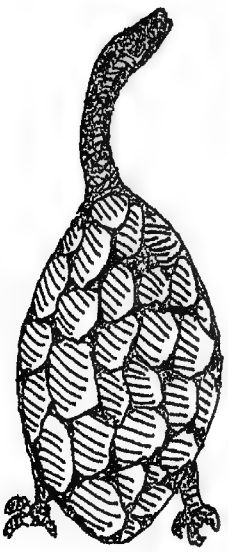

নাগকন্যার নির্দেশমত রাজা প্রাসাদের কাছে একটি পুকুর কাটিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েরা সেই পুকুরের জলে মনের আনন্দে খেলা করে বেড়াত। একদিন পুকুরের ফুটো দিয়ে জল ঢোকানোর সময় কি করে যেন একটা কচ্ছপ ঢুকে পড়ে। রাজার ছেলেমেয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে কচ্ছপটিকে দেখে আঁতকে ওঠে। চিৎকার করতে থাকে। তখন রাজার নির্দেশে জাল ফেলে কচ্ছপকে ধরা হল।

কচ্ছপটিকে তোলার পর অমাত্যরা বিচারে বসলেন। এই দুর্বিনীত কচ্ছপের কি শাস্তি দেওয়া উচিত এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হল। তারপর ঠিক হল, কচ্ছপটাকে যমুনার আবর্তে ফেলে দেওয়া হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। যমুনার আবর্তে পড়ে ঘুরতে ঘুরতে কচ্ছপ তলিয়ে যেতে লাগল। থামল একেবারে নাগপুরীতে গিয়ে। সেখানে সহস্র নাগ খেলা করছিল। তারা কচ্ছপকে আক্রমণ করতে এল।

কচ্ছপ তখন বুদ্ধি করে বলল, সে বারাণসীরাজের দূত হিসেবে নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসেছিল। কচ্ছপকে তখন নাগরাজের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। কচ্ছপ বলল 'বারাণসীরাজ নাগরাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান। সেজন্য তিনি নিজের মেয়ে সমুদ্রজাকে নাগরাজের সঙ্গে বিবাহ দিতে চান।' কচ্ছপের কথায় ধৃতরাষ্ট্র খুশি হয়ে তাঁর সঙ্গে কয়েকজন নাগকে পাঠালেন বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করার জন্য।

পৃথিবীতে আসার সময় কচ্ছপ কৌশল করে সরে পড়ল। নাগদূতরা রাজার কাছে গিয়ে বলল, 'আমরা নাগরাজের কাছ থেকে আসছি।'

'আপনাদের আসার উদ্দেশ্য ?'

'আমরা নাগরাজের দূত।'

'আপনার রাজার কি কোন প্রস্তাব আছে ?'

'হ্যাঁ আছে।'

'বলুন।'

'আপনি যে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন··'

'আমি !'

'আজ্ঞে।'

'বেশ, বলে যান।'

'নাগরাজ আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছেন।'

মহারাজ তখন জানালেন, 'নাগলোকের সঙ্গে মনুষ্যলোকের কোন বৈবাহিক সম্পর্ক হতে পারে না। আমি এরকম কোন প্রস্তাবও পাঠাই নি। ক্ষত্রিয়কুলের পক্ষে সাপ নেহাতই অযোগ্য পাত্র।' এ কথা শুনে নাগদূতেরা ভীষণ রেগে গেল। তাদের ইচ্ছে হল এক্ষুনি বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলে রাজাকে মেরে ফেলে। কোনরকমে নিজেদের সংযত করে তারা নাগলোকে ফিরে গেল। নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্র সব শুনে নাগদের আদেশ দিলেন বারাণসী আক্রমণের। কিন্তু তিনি নাগদের সতর্ক করে দিলেন, 'তবে কাউকে হত্যা কোরো না।' এর দু-এক দিন পরেই অসংখ্য নাগ রাজপ্রাসাদ অবরোধ করল। বারাণসী রাজ্যের সর্বত্র কেবল বিষাক্ত সাপের ফণা দেখা যেতে লাগল। বারাণসীরাজ তখন বাধ্য হয়ে নাগরাজের সঙ্গে সন্ধি করলেন। সমুদ্রজার সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের বিয়ে হয়ে গেল।

ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী হয়ে সমুদ্রজার তেমন কোন বিপত্তি ঘটে নি। কারণ ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে নাগরা সমুদ্রজার কাছে সর্বদাই মানুষরূপ ধারণ করে আসত। তাই দীর্ঘকাল সে জানতেই পারেনি যে নাগরাজের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। যথাসময়ে ধৃতরাষ্ট্র ও সমুদ্রজার চারটি পুত্র সন্তান জন্মাল। সবচেয়ে ছোটটির নাম অরিষ্ট। অরিষ্ট একদিন মায়ের দুধ খাওয়ার সময় সাপের শরীর ধারণ করে লেজ দিয়ে মায়ের পিঠে মৃদু আঘাত করল। এতে সমুদ্রজা চিৎকার করে ওঠে। অরিষ্টের এক চোখে নখ ঢুকিয়ে দেয়। ঘটনার বিবরণ শুনে ধৃতরাষ্ট্র অরিষ্টের ওপর খুবই রেগে যান। কিন্তু মাতৃস্নেহে সমুদ্রজা অরিষ্টকে রক্ষা করল। সেদিনই সে জানতে পারল যে নাগকুলে তার বিয়ে হয়েছে।

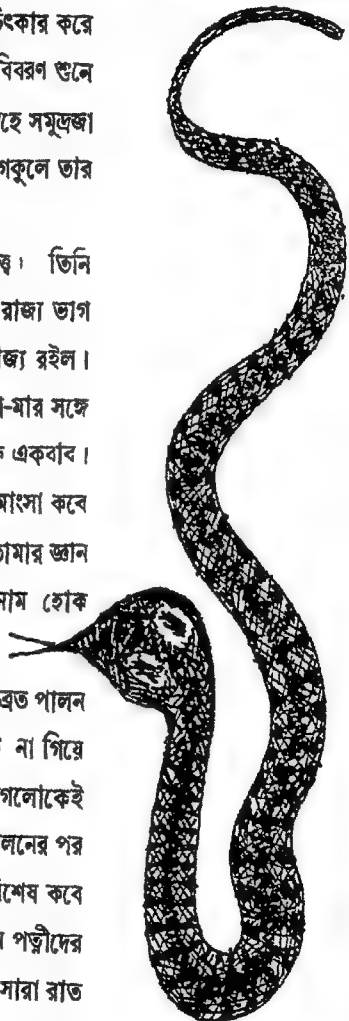

ধৃতরাষ্ট্রের চার ছেলের মধ্যে ছোটটি স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। তিনি অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র চার পুত্রের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিলেন। তাঁর নিজের হাতে মাত্র একশ যোজন রাজ্য রইল। আলাদা হয়ে যাওয়ার পর তাঁর পুত্ররা মাসে একবার বাপ-মার সঙ্গে দেখা করতে আসত। কিন্তু বোধিসত্ত্ব আসতেন প্রতি পক্ষে একবার।

বোধিসত্ত্ব একবার স্বর্গে গিয়ে এক কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করে আসেন। দেবরাজ শক্র তখন খুশি হয়ে বলেন, 'দত্ত, তোমার জ্ঞান বিপুলা পৃথিবীর সমান। তাই আজ থেকে তোমার নাম হোক ভূরিদত্ত।'

ভূরিদত্ত নাগলোকে ফিরে এসে ইচ্ছে করলেন পোষধ ব্রত পালন করবেন। তাঁর পত্নীরা বলল, 'প্রভু, আপনি পৃথিবীতে না গিয়ে নাগলোকেই তা পালন করুন।' বোধিসত্ত্ব পত্নীদের কথায় নাগলোকেই ব্রত পালন শুরু করলেন। পর পর কয়েকদিন ব্রত পালনের পর দেখলেন, সেখানে পোষধ পালনে বড় বিঘ্ন ঘটছে। বিশেষ করে সুন্দরী নর্তকীরা তাঁর একাগ্রতা নষ্ট করে দিচ্ছে। তখন তিনি পত্নীদের বললেন, 'যমুনার তীরে গিয়ে আমি পোষধ পালন করব। সারা রাত সেখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকব। সকালে গিয়ে তোমরা আমার পুজো করবে।' এরপর থেকে তিনি তাই শুরু করলেন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাগকন্যারা যেত তাঁকে অর্চনা করে ফিরিয়ে আনতে।

৪

যে সময়ের কথা, তখন বারাণসী নগরের কাছাকাছি এক গ্রাম থেকে এক ব্রাহ্মণ বনে পশু শিকারের জন্য যেত। ঐ ব্রাহ্মণের ছেলেটিও তার সঙ্গে থাকত, তার নাম সোমদত্ত। ব্রাহ্মণ হলেও সে ছিল গরীব এক গ্রামবাসী। ব্যাধের বৃত্তি নিয়ে জীবিকার ব্যবস্থা করত। ব্রাহ্মণের স্ত্রী ছিল খুবই ভয়ঙ্করী। সে রেগে গেলে ব্রাহ্মণকেও মারতে কসুর করত না।

একদিন সোমদত্তকে সঙ্গে নিয়ে বনে বনে ঘুরে ব্রাহ্মণ একটা গোসাপ পর্যন্ত মারতে পারল না। ছেলেকে ডেকে ব্রাহ্মণ বলল, 'দেখ, আজ তো কিছুই জুটল না। এখন খালি হাতে ফিরলে তোর মা আর আমাকে আস্ত রাখবে না। কিছু একটা জোটাতেই হবে।' তারপর বোধিসত্ত্ব যেখানে পোষধ পালন করছিলেন সেখানে গেল। সেখানে যমুনায় একটা হরিণ জল খাচ্ছিল। তারা সেটাকে মেরে তার মাংস কেটে নিল। কিন্তু এসব করতে করতে রাত হয়ে গেল। তাই যেখানে বোধিসত্ত্ব পোষধ পালন করছিলেন তার কাছাকাছি একটা গাছে চড়ে বসল রাতটা কাটিয়ে দেওয়ার জন্য।

ভোরবেলা নাগকন্যাদের নৃত্য, ফুল আর সুগন্ধির প্রভাবে ব্রাহ্মণের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখল সেই নাগরাজ দৈত্যরূপ ধারণ করেছেন। নাগকন্যারা তার পুজো করছে। ব্রাহ্মণ ওঁর পরিচয় জানার জন্য ব্যাকুল হল।

আপনি দেব, দানব, না মানব ?'

'আমি নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ভূরিদত্ত।'

বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে দেখে বুঝলেন, 'এই ব্রাহ্মণ খুব খারাপ স্বভাবের লোক। এ সুযোগ পেলেই আমার ক্ষতি করবে। ওকে বরং নাগলোকে নিয়ে যাই। তাহলে নির্বিঘ্নে এখানে পোষধ পালন করতে পারব।' এরপর তিনি ব্রাহ্মণ ও তার ছেলেকে রাজি করিয়ে নাগলোকে নিয়ে এলেন। নাগলোকে ব্রাহ্মণ ও তার ছেলের দিন চরম আনন্দে কাটতে লাগল।

ব্রাহ্মণ যে নাগলোকে আসতে পারল, তার কারণ তার অতীত পুণ্যের ফল। ক্রমে সেই ফল ফুরিয়ে গেল। ব্রাহ্মণের মনে দুশ্চিন্তা দেখা দিল। তারা ফিরতে চাইল। সব কাজে সাফল্য অর্জন করা যায় যে মণির সাহায্যে, বোধিসত্ত্ব তখন তাকে সেই মণি দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ কিন্তু বোধিসত্ত্বের পোষধের ব্যাপারটি তুলে বললেন, 'আপনি এই রাজসুখ পাওয়ার পরেও স্বর্গে যাওয়ার জন্য পোষধ পালন করছেন। আর আমি কিনা বিষয়সুখে আবদ্ধ থাকব!' বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, 'হয়ত সত্যিই ব্রাহ্মণের মনে ধর্মভাব জেগেছে।' তিনি একটা থলিতে কিছু রত্ন বেঁধে ব্রাহ্মণের হাতে দিলেন। তারপর তার ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করলেন।

পৃথিবীতে ফিরে এসে ব্রাহ্মণ ছেলেকে দেখিয়ে বলল, 'এই জায়গায় আমরা হরিণটাকে মেরেছিলাম, এখানে নাগকন্যারা নাচছিলেন।' তারপর রত্নের পুঁটলি রেখে বাপ-ছেলে মিলে স্নান করতে লাগল। স্নান সেরে উঠে দেখল পুঁটলিটা নেই। ব্রাহ্মণীর কাছে ফিরে ব্রাহ্মণ সমস্ত বৃত্তান্ত বলল। এতে ব্রাহ্মণী তাদের শুধু মারতে বাকি রাখল। আবার তারা বনে ঢুকল হরিণের মাংসের খোঁজে।

৫

কাশীরাজ্যে তখন এক ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা নিয়ে সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি বাস করতেন হিমালয়ে পর্বতের কোলে। একবার গরুড় পাখি বিশাল একটা সাপ ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। ঝুলন্ত সাপটা বাঁচার আশায় লেজ দিয়ে সেই ব্রাহ্মণ যে গাছের তলায় বসে তপস্যা করতেন, সেই গাছটিকে জড়িয়ে ধরে। এই গাছটাও উপড়ে ফেলেন গরুড়। পরে হিমালয় পাহাড়ে বসে সাপটিকে খেতে গিয়ে দেখলেন গাছটা পড়ে যাচ্ছে। গাছটাকে দেখার পর গরুড়ের মনে পড়ে গেল, 'এই গাছটা ঋষিকে ছায়া দিত, এখন তিনি যদি আমাকে অভিশাপ দেন!' এই ভেবে গরুড় ঋষির কাছে গেল। ঋষি বললেন, না দেখে অপরাধ করলে পাপ হয় না।' এতে গরুড় খুব খুশি হয়ে ঋষিকে বিষঝাড়ার মন্ত্র শেখালেন।

বারাণসীর এক গরীব ব্রাহ্মণ ঋণের দায়ে শহর ছেড়ে বনে চলে আসেন। তিনি ঐ ঋষির আশ্রমে উঠে ঋষির খুব সেবাযত্ন করলেন।

চলে যাবার সময় ঋষি তাঁকে মন্ত্রটি শিখিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণ তখন ঠিক করলেন, তিনি সাপুড়েগিরি করে খাবেন। বিষঝাড়ার মন্ত্র নিয়ে ব্রাহ্মণ যখন যমুনাতীরে এসেছেন ঠিক তখনই নাগকন্যারা ঐ সর্বকামদ মণি সমেত যমুনাতীরে উঠে এসেছেন ভূরিদত্তের অর্চনা করতে। ব্রাহ্মণ মন্ত্র জপ করতে করতে যাচ্ছিলেন। তা শুনে নাগকন্যারা ভাবলেন, 'সাপুড়ে এসেছে।' এই ভয়ে তাঁরা মণিটা ফেলে পালালেন। ব্রাহ্মণ মণিটা কুড়িয়ে নিলেন।

এমন সময় সোমদত্ত আর তার বাবা বনে যাচ্ছিল শিকারের জন্য। ব্রাহ্মণের হাতে মণি দেখে সোমদত্তের বাবা ভাবল, 'যেভাবে হোক মণিটা এর কাছ থেকে নিতে হবে। বিষঝাড়ার মন্ত্র শিখে ব্রাহ্মণ সেই মন্ত্রকেই কাজে লাগাতে চাইছে। ফলে সোমদত্তের বাবা যখন এটা-ওটার বিনিময়ে মণি চাইল সে রাজি হল না। সে বলল, 'যদি উগ্র বিষধর মহানাগ পাই তাহলে এই মণি তোমায় দিই।' সোমদত্তের বাবা তখন তাঁকে দেখিয়ে দিলেন বোধিসত্ত্বের বিশাল শরীর। ব্রাহ্মণও মণিটি সোমদত্তের বাবাকে দিলেন। কিন্তু মণিটি তার হাত থেকে পিছলে ভূগর্ভে চলে গেল আপনা আপনি। এতে বাপ-ছেলে দুজনেই খুব মুষড়ে পড়ল। ঐ ব্রাহ্মণ তখন মন্ত্র পড়তে পড়তে বোধিসত্ত্বের দিকে এগিয়ে চললেন। বোধিসত্ত্ব তাঁকে আসতে দেখে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আর চোখ খুলব না, কেননা রেগে তাকালেই ব্রাহ্মণ ভস্ম হয়ে যাবে। যাই ঘটুক না কেন, আমি হিংসার পথে যাব না।'

৬

এরপর থেকে ঐ বাজিকর বোধিসত্ত্বকে নিয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়ান। নাগপুরীতে বৃদ্ধা সমুদ্রজা দীর্ঘকাল বোধিসত্ত্বকে না দেখে কাতর হলেন। নাগ সৈন্যরা চারদিকে তাঁকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। শেষে বারাণসীরাজের সভায় বোধিসত্ত্ব খেলা দেখাচ্ছেন দেখা গেল। নাগ-সৈন্যরা তখন নিজেদের অলৌকিক শক্তির প্রভাবে বোধিসত্ত্বকে মুক্ত করল। সমস্ত বৃত্তান্ত বারাণসীরাজের কাছে প্রকাশ পেলে তিনি ভূরিদত্তকে জিজ্ঞেস করলেন :

'তুমি মহাবিষধর হয়েও বাজিকরের হাতে ধরা পড়লে কি করে?'

'আমি তখন পোষধে ছিলাম।'

তারপর বারাণসীরাজ ভাগ্নেদের চিনতে পারলেন। ভূরিদত্ত রাজাকে ধর্মকথা শোনালেন। ভূরিদত্ত রাজাকে বললেন, 'মামা, আমাদের দাদামশায় এখন অমুক বনে প্রব্রজ্যা নিয়ে বাস করছেন। মা সামনের মাসের প্রথম রবিবার দাদামশায়কে দেখতে সেখানে যাবেন। আপনিও আসুন। সকলের একসঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে।'

এরপর ভূরিদত্ত নাগলোকে ফিরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আর তাঁর ভাই সুভগ মিত্রদ্রোহী সেই ব্রাহ্মণকে লেজে বেঁধে নিয়ে নাগলোকে ফিরে এলেন। কিন্তু অরিষ্ট বললেন, 'ভাই, ওঁকে মেরো না। ও ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ আর্য।'

'সুভগ, তুমি কি জান কে জগৎ সৃষ্টি করেছেন?'

'না, জানি না।'

'ব্রাহ্মণদের পিতামহ।'

'আমি জানতাম না।'

'ব্রাহ্মণদের দান করলে মানুষ আর জন্মান্তর গ্রহণ করে না।'

'ব্রাহ্মণদের কিভাবে দান করতে হয়?'

'সকলের আগে।'

'ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে আমাকে আরও বল।'

'জান কি কিভাবে সমুদ্রের জল নোনা হল?'

'না, জানি না।'

'তা জান না, অথচ ব্রাহ্মণদের মারতে জান।'

'আমি না জেনে অন্যায় করেছি।'

'এক ব্রাহ্মণকে সাগরের জল উথলে উঠে গ্রাস করে।'

'তারপর?'

'সেই থেকে সাগরের জল নোনা আর অপেয় হয়েছে।'

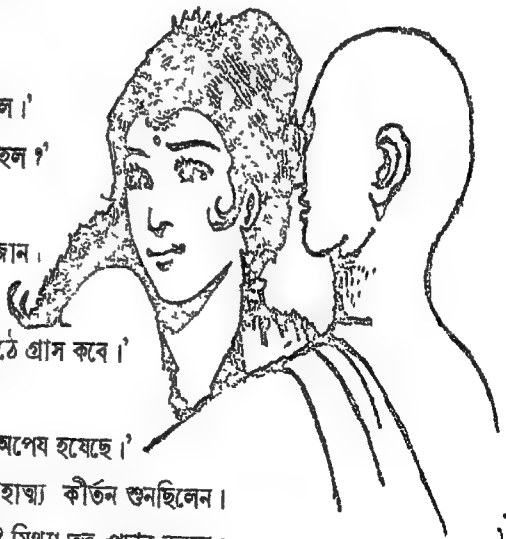

ভূরিদত্ত রোগশয্যায় শুয়ে ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য কীর্তন শুনছিলেন। শুনতে শুনতে তাঁর রাগ হল। কেননা অরিষ্ট মিথ্যা তত্ত্ব প্রচার করছে। অযথা ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য কীর্তন করছে। ভূরিদত্ত তখন বললেন:

'প্রাজ্ঞের কাছে বেদপাঠ কল্যাণদায়ী নয়। বেদ তিনটি

মরীচিকার মতই মায়াময়। প্রাজ্ঞ লোকদের তা ভুল পথে নিয়ে যায়। হত্যাকারী আর মিত্রদ্রোহীরা বেদ পড়লে রক্ষা পাবে, এ নেহাতই বাজে কথা। ভেজা বা শুকনো কোন কাঠই নিজে থেকে আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে না, চেষ্টা না করলে কোন মানুষই প্রজ্ঞাবান হতে পারে না। মন্ত্র উচ্চারণ করে পুজো করলেই প্রাজ্ঞ হওয়া যায় না। বেদ পাঠ ব্রাহ্মণের কাজ, ক্ষত্রিয়ের কাজ পৃথিবীকে পালন করা, আর বৈশ্যের কাজ চাষবাস করা। শূদ্রের কাজ তিন বর্ণের লোকদের সেবা করা। এই চতুরাশ্রম প্রথা ব্রাহ্মণরা তৈরি করেছে। কিন্তু এ যদি সত্য হতো তাহলে ক্ষত্রিয় ছাড়া কেউ রাজ্য শাসন করতে পারত না। ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ বেদ পাঠ করতে পারত না। কিন্তু তা যে সত্যি নয় সে কথা সবাই জানে। যে প্রাণী বধ করে সে এবং যাকে বধ করা হয় উভয়েরই স্বর্গবাস হয়—ব্রাহ্মণরা এই কথা বলে থাকে। ভাই, তাহলে ব্রাহ্মণেরা পরস্পর খুনোখুনি করে স্বর্গে যায় না কেন? এসব কথা সত্যি নয়। এরা মিথ্যুক, ছলচাতুরি করে লোক ঠকায়। এরা নিকৃষ্ট জীব।'

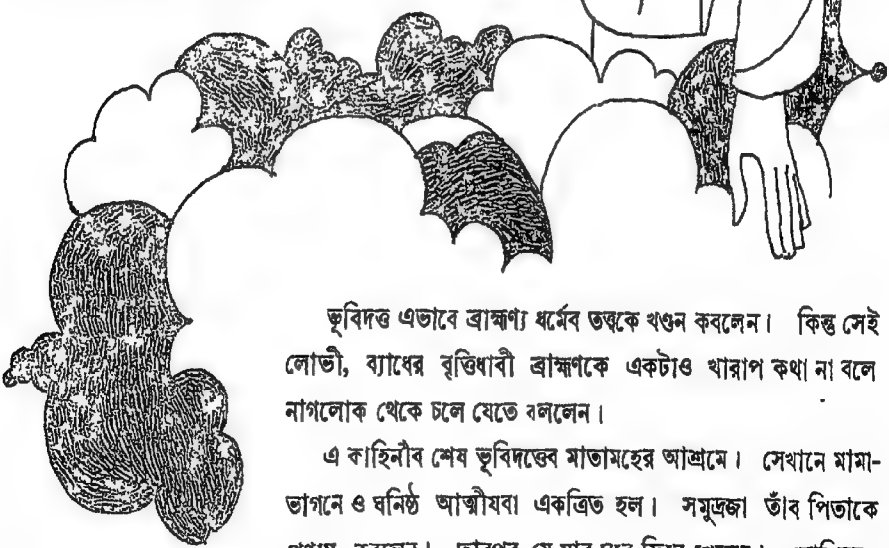

ভূরিদত্ত এভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তত্ত্বকে খণ্ডন করলেন। কিন্তু সেই লোভী, ব্যাধের বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণকে একটাও খারাপ কথা না বলে নাগলোক থেকে চলে যেতে বললেন।

এ কাহিনীর শেষ ভূরিদত্তের মাতামহের আশ্রমে। সেখানে মামা-ভাগনে ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা একত্রিত হল। সমুদ্রজা তাঁর পিতাকে প্রণাম করলেন। তারপর যে যার ঘরে ফিরে গেলেন। বোধিসত্ত্বও যতদিন বেঁচে রইলেন সর্ববিধ শীল রক্ষা করে গেলেন। আয়ু ক্ষয় করে একদিন তিনি দেবলোকে চলে গেলেন।

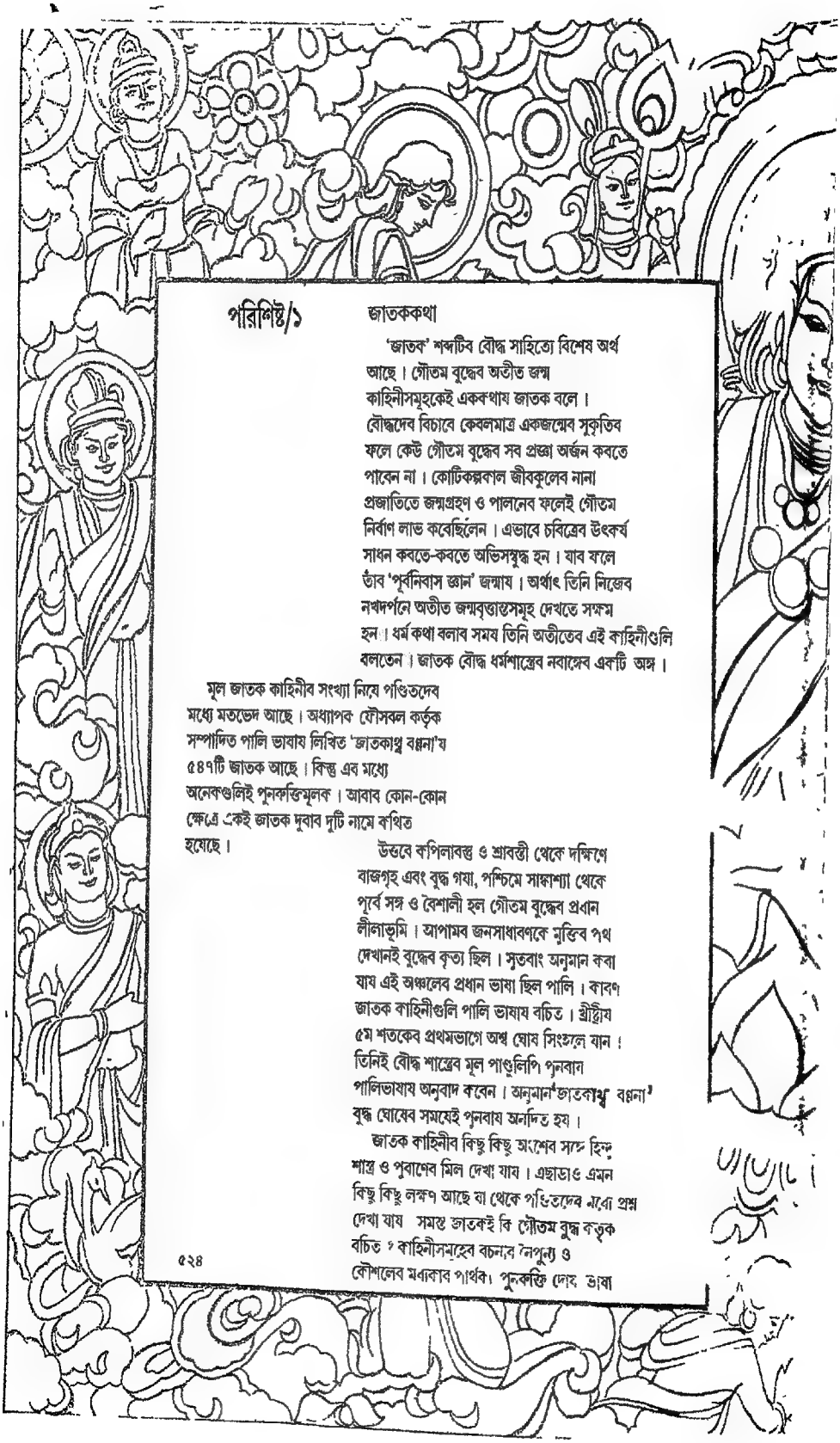

পরিশিষ্ট/১

জাতককথা

'জাতক' শব্দটির বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষ অর্থ আছে। গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্ম কাহিনীসমূহকেই এককথায় জাতক বলে। বৌদ্ধদের বিচারে কেবলমাত্র একজন্মের সুকৃতির ফলে কেউ গৌতম বুদ্ধের সব প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারেন না। কোটিকল্পকাল জীবকুলের নানা প্রজাতিতে জন্মগ্রহণ ও পালনের ফলেই গৌতম নির্বাণ লাভ করেছিলেন। এভাবে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করতে-করতে অভিসম্বুদ্ধ হন। যার ফলে তাঁর 'পূর্বনিবাস জ্ঞান' জন্মায়। অর্থাৎ তিনি নিজের নখদর্পনে অতীত জন্মবৃত্তান্তসমূহ দেখতে সক্ষম হন। ধর্ম কথা বলার সময় তিনি অতীতের এই কাহিনীগুলি বলতেন। জাতক বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের নবাঙ্গের একটি অঙ্গ।

মূল জাতক কাহিনীর সংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধ্যাপক ফৌসবল কর্তৃক সম্পাদিত পালি ভাষায় লিখিত 'জাতকাত্থ বণ্ণনা'য় ৫৪৭টি জাতক আছে। কিন্তু এর মধ্যে অনেকগুলিই পুনরুক্তিমূলক। আবার কোন-কোন ক্ষেত্রে একই জাতক দুবার দুটি নামে কথিত হয়েছে।

উত্তরে কপিলাবস্তু ও শ্রাবস্তী থেকে দক্ষিণে রাজগৃহ এবং বুদ্ধ গয়া, পশ্চিমে সাঙ্কাশ্যা থেকে পূর্বে সঙ্গ ও বৈশালী হল গৌতম বুদ্ধের প্রধান লীলাভূমি। আপামর জনসাধারণকে মুক্তির পথ দেখানই বুদ্ধের কৃত্য ছিল। সুতরাং অনুমান করা যায় এই অঞ্চলের প্রধান ভাষা ছিল পালি। কারণ জাতক কাহিনীগুলি পালি ভাষায় রচিত। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকের প্রথমভাগে অশ্ব ঘোষ সিংহলে যান। তিনিই বৌদ্ধ শাস্ত্রের মূল পাণ্ডুলিপি পুনরায় পালিভাষায় অনুবাদ করেন। অনুমান 'জাতকাত্থ বণ্ণনা' বুদ্ধ ঘোষের সময়েই পুনরায় অনূদিত হয়।

জাতক কাহিনীর কিছু কিছু অংশের সঙ্গে হিন্দু শাস্ত্র ও পুরাণের মিল দেখা যায়। এছাড়াও এমন কিছু কিছু লক্ষণ আছে যা থেকে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা যায় সমস্ত জাতকই কি গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক রচিত? কাহিনীসমূহের রচনার নৈপুণ্য ও কৌশলের মধ্যকার পার্থক্য। পুনরুক্তি দোষ ভাষা

ও ভাষাগত ত্রুটি দেখে তাঁদের অনুমান, দীর্ঘ সময় কাল ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে জাতক রচিত হয়। এমনকি কোন কোন জাতক কাহিনীতে বৌদ্ধভাব নেহাতই বাহ্যিক ব্যাপার। জাতকের সঙ্কলনের কাজটি হয়েছিল খ্রীষ্টের জন্মের ৩৭০ বছর আগে। জাতকের গল্পের প্রভাব ভারতবর্ষীয় সাহিত্যেই শুধু প্রবল নয়, বিদেশী সাহিত্যেও জাতক-প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

জাতক কাহিনীতে বিশ্বপ্রেম, পুরাতত্ত্ব, উদ্ভিদ প্রেম, পরিবেশ ভাবনা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি জাতকের গল্প থেকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃতি বেশ সহজ, সরল ভাবে বোঝা যায়।

পরিশিষ্ট/২

জাতকের ব্রহ্মদত্ত

বেশিরভাগ জাতকের গল্পের শুরুতেই একটি লাইন আছে, 'অতীতে বারাণসীয়ম ব্রহ্মদত্তে রাজ্জং কারেন্তে'। এই লাইনটিকে গল্প বলার ঢঙ বা ভণিতা বলেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ঠিক যেমনটি দেখা যায় সহস্র এক আরব্য রজনীর গল্পে বা বিক্রমাদিত্যের নাম জড়িয়ে পঞ্চতন্ত্রের উপাখ্যানে।

অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন বুদ্ধদেবের শতাধিক বছর আগে কাশীতে যথার্থ ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি কোশলরাজ দীর্ঘীতিকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করে দীর্ঘীতির রাজ্য দখল করেন। পরে অবশ্য কোশলরাজের দেশ দীর্ঘীতির উদারতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তার পিতৃরাজ্য ফিরিয়ে দেন।

তবে জাতককাহিনীর বিচারের সময় এ তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। কাহিনী শুরুর একটা রীতি সব ভাষায় সর্বকালে থাকে। একদা এক দিয়ে যেমন পাশ্চাত্যের রূপকথা শুরু হয়।

পরিশিষ্ট/৩

বুদ্ধ

জাতক উল্লেখিত বুদ্ধ সব সময়ই অতীত বুদ্ধ। অর্থাৎ বুদ্ধের পূর্ব জন্মের বৃত্তান্তসমূহ। গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী ২৭ জন বুদ্ধের কথা জাতকে পাওয়া যায়। এই ২৭ জনের মধ্যে প্রথম ৪ জনের নাম তণহঙ্কর, মেধঙ্কর, শরণঙ্কর এবং দীপঙ্কর যেভাবে কাহিনীর বিন্যাস করা হয়েছে তাতে বুদ্ধকে

লৌকিক সময় অতিক্রম করে ভাবা হয়েছে। প্রাচীনকালে তত্ত্বজ্ঞ তপস্বীদের সঙ্গে বুদ্ধের একটি যোগসূত্রও কল্পনা করা হয়েছে।

গৌতমবুদ্ধ এই সব অতীত বুদ্ধেরই ফলস্বরূপ বলে বৌদ্ধরা মনে করেন। কপিলাবস্তুর রাজা শাক্য বংশীয় শুদ্ধোদনের পুত্র হয়ে গৌতম বুদ্ধ জন্মান। তাঁর মায়ের নাম মায়া দেবী। তিনি জন্মান বৈশাখী পূর্ণিমায় শাল বৃক্ষমূলে। মহামায়া তখন পিত্রালয়ে যাচ্ছিলেন। বিশ্বামিত্র আচার্যের নিকট সিদ্ধার্থ সর্ববিদ্যায় শিক্ষিত হন। সারথি ছন্দকের সঙ্গে রথে ভ্রমণের সময় জরা, মৃত্যু প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করেন। এতে তাঁর মধ্যে গভীর বৈরাগ্যভাব জাগে। আর এক বৈশাখী পূর্ণিমায় বোধিবৃক্ষের মূলে বসে তিনি বুদ্ধত্ব অর্জন করেন।

পরিশিষ্ট/৪

টীকাটিপ্পনি

কপিলবস্তু—বারাণসীর উত্তরে নেপাল প্রদেশে রোহিনী নদীর তীরে এক প্রাচীন নগর।

কৌশাম্বী—এলাহাবাদের উত্তর পশ্চিমে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। বাসবদত্তা, রত্নাবলী ইত্যাদি সংস্কৃত নাটকের সৌজন্যে কৌশাম্বী সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

জম্বুদ্বীপ—চারটি মহাদ্বীপের একটি। জম্বুদ্বীপের অবস্থান সব থেকে দক্ষিণে। ভারতবর্ষ এই দ্বীপের অন্তর্গত।

বৈশালী—গঙ্গার উত্তর তীরের জনপদ। কানিংহামের মতে হাজিপুরের উত্তরে 'বেলচর' নামে যে অঞ্চলটি আছে সেটিই প্রাচীন বৈশালী।

রাজগৃহ—প্রাচীন নাম সিরিব্রজ। বুদ্ধগয়া থেকে বিহারে যাওয়ার পথে পাটনা জেলায় অবস্থিত।

শ্রাবস্তী—বর্তমান নাম শেট মহেঠ। অযোধ্যা প্রদেশে গোণ্ডা জেলায় অবস্থিত।

হিমবন্ত—হিমালয় অঞ্চল। বা জম্বুদ্বীপের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল।

চুল্লক চুল্ল—ছোট।

ত্রিরত্ন—বুদ্ধ ধর্ম এবং সঙ্ঘ-ই হল বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন।

খুল্ল—ক্ষুদ্র।

শীল—চরিত্র চরিত্ররক্ষার উপায়।

পঞ্চশীল—প্রাণীহত্যা চৌর্যবৃত্তি অব্রহ্মচর্য মিথ্যাচার ও সুরাপানে বিরত থাকাই পঞ্চশীলত্ব।

অর্হত্ব—অবিদ্যা, কাম আর ভব এই তিনটিকে বৌদ্ধরা আস্রব বলেন। আস্রবের বিনাশ ঘটলে অর্হত্ব লাভ হয়।

আচার্য—শিক্ষক।

প্রত্যন্তগ্রাম—রাজ্যের সীমানায় যে গ্রাম অবস্থিত।

সপ্তরত্ন—সুবর্ণ, রজত, মুক্তা, মণি, বৈদূর্য হীরক ও প্রবাল।

আমকশ্মশান—যে শ্মশানে দাহ করা হয় না, শব ফেলে আসা হয় শিয়াল শকুনের খাবার জন্য।

লাঙ্গলীষা—লাঙ্গল+ঈষা।

কটাহক—কাঠের ফলক।

চতুর্মধু—মধু, গুড়, তেল ও সর।

অভিজ্ঞা—অলৌকিক জ্ঞান।

রজক—যারা কাপড় রঙ করে।

মহাসাল বা মহাশাল—যার মহাশালা (বড় বাড়ি) আছে। অর্থাৎ ধনী ব্যক্তি।

অজাতশত্রু—মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র।

অগতি—মিথ্যাচার, দ্বেষ, মোহ ও ভীতিকে অগতি বলা হয়।

দশরাজ ধর্ম—দান শীল, ত্যাগ অক্রোধ, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব, আর্হব, তপ ও অবিরোধন।

গান্ধার—বর্তমান পেশোয়ারের কাছাকাছি অঞ্চল।

তিন্দুক গাছ—গাব গাছ ও আবলুশ গাছ।

আজানেয়—উৎকৃষ্ট জাতীয়।

শক্র—দেবরাজ। পালি সাহিত্যে শক্রকে ভূতনাথ বা ভূতপতিও বলা হয়ে থাকে।

যক্ষ—বৌদ্ধ সাহিত্যে এরা রাক্ষসের নামান্তর।

প্রব্রজ্যা—সন্ন্যাস গ্রহণ, ভিক্ষুধর্ম।

নিযামক—পথ প্রদর্শক।

উপরাজ—রাজপ্রতিনিধি।

মহানিষ্ক্রমণ—বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ।

লমীকা—শরীরের মধ্যকার রস।

বিশাখা—বৌদ্ধ উপাসিকা হিসাবে খ্যাতা। ইনি মগধের প্রসিদ্ধ ধনী ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা।

উপালি—গৌতমবুদ্ধের প্রধানতম শিষ্যদের একজন।

ধর্মগণ্ডিকা—হাঁড়িকাঠ।

শ্বেতচ্ছত্র—রাজ চিহ্ন।

মহাসত্ত্ব—বোধিসত্ত্বকে অনেক ক্ষেত্রেই মহাসত্ত্ব বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

আদ্রাহলপথ—আর কোনদিন শত্রুতা করব না এই প্রতিজ্ঞা।

অভীক্ষ্ণ—পুন পুনঃ।

সুপর্ণ—দেবলোকের পাখি, গরুড়ের অপর নাম।

চতুর্মহারাজ—পূর্বাশা দিক্‌পাল, ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়ক, বিরূপাক্ষ ও বৈশ্রবণ

প্রত্যেকবুদ্ধ—নিজের ক্ষমতায় যিনি নির্বাণ লাভের যোগ্য অথচ জনসাধারণকে ধর্ম উপদেশ দেন না। প্রত্যেকবুদ্ধ সর্বজ্ঞ নন।

পঞ্চ মহানদী—গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরযূ এবং মাহী।

মার—বৌদ্ধ মতে মার পাপ প্রবৃত্তির দেবতা। মারের তিন কন্যা তৃষ্ণা, রতি ও অরতি (ক্রোধ)।

চোররাজ—রাজ্য অপহরণকারী।

কিম্ফল—কি রকম ফল তা জানা নেই।

অঙ্গবিদ্যা—যার দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লক্ষণ দেখে ভবিষ্যৎ গণনা করা যায়।

শক্রের আসন—বৌদ্ধধর্মে সাধু ব্যক্তির বিপদ হলে শক্রের আসন উত্তপ্ত হয়। যেমন হিন্দুশাস্ত্রে দেবতার আসন টলে।

যমজপাপ—যে পাপ একা থাকে না, যেমন রাগ আর হিংসা।

নিত্য-অনিত্য—বৌদ্ধ মতে আকাশ আর নির্বাণ এই দুটি জিনিসই নিত্য, বাদবাকি সবই অনিত্য।

অপ্রমত্ত—অবিচলিত থাকা। যারা প্রমত্ত অমধুর ও অপ্রিয় জিনিস তাদের কাছে লোভনীয় মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।

অনুশাসিকা—যে সব সময় সবাইকে সতর্ক হয়ে চলতে বলে।

বভ্রু বিড়াল।

চর্মকীল—আঁচিল।

বৈশ্রবন—কুবেরের আরেকটি নাম।

শীলমীমাংস—চরিত্রের বলের মীমাংসা।

বিড়াল জাতক—এই জাতকে শিয়ালের কথা থাকলেও, শিয়ালের কাজটিকে বিড়ালব্রত বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

মৈত্রী ভাবনা—নিজেকে শত্রুহীন করার বাসনা, আত্মীয় স্বজন-সহ সমগ্র প্রাণীকূল সুখে থাকুক এইরকম চিন্তা করা।

ধনপাল—রাজার কোষাগার থেকে লোকজনকে তাদের প্রাপ্য যে দিয়ে থাকে।

ময়ূর জাতক—ময়ূরের রঙ সোনার মত। সেইজন্যে রাজা তার মাংস খেতে চেয়েছেন। জাতকের ইংরেজী অনুবাদক প্রদত্ত টীকা থেকে জানা যায় যে চীন দেশের লোকেরা বিশ্বাস করত যে সোনা খেলে যতদিন শরীরের মধ্যে সোনা থাকবে দেহ-ও ততদিন সোনার মত রঙ ধরে রাখবে।

হস্তিমঙ্গল—গজোৎসব। সুসজ্জিত হাতির এক শোভাযাত্রা।